প্রায় প্রতি সপ্তাহের 'বেস্ট সেলার' প্রাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

ফ্রান্সিস সমগ্র

অনিল ভৌমিক

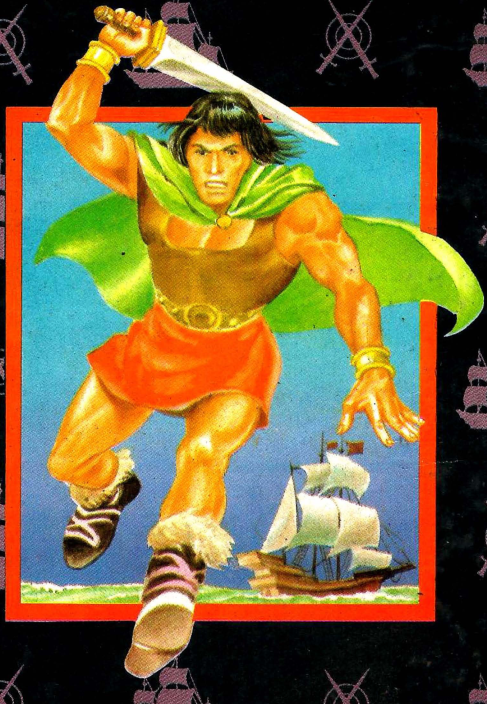

সোনার ঘণ্টা ★ হীরের পাহাড় ★ মুক্তোর সমুদ্র ★ তুষারে গুপ্তধন

ফ্রান্সিস সমগ্র (১ম)

অনিল ভৌমিক

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

FRANCIS SAMAGRA PART 1
by Anil Bhowmick
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market
Calcutta-700 007

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০০০

পরিবেশক
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা
শরৎ চন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রন
জি. পি. ডি. বক্স

নব্বই টাকা মাত্র

ISBN-81-7334-122-2

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার
www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আজকের দিনে যে সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সবকিছুর পরেই তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথ

নেশা সাহিত্য হলেও পেশায় শিক্ষক আমি। ছাত্রদের কাছেই প্রথম বলতে শুরু করি দুঃসাহসী ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের গল্প। দেশ, কাল, মানুষ সবই ভিন্ন, তবু গভীর আগ্রহ নিয়ে ছেলেরা সেই গল্প শুনতো। তখনই মাথায় আসে-ফ্রান্সিসদের নিয়ে লিখলে কেমন হয়। "শুকতারা" পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদারকে একটা পরিচ্ছেদ লিখে পড়তে দিই। উনি সেটুকু পড়ে খুশী হন। তাঁরই উৎসাহে শেষ করি প্রথম খণ্ড "সোনার ঘণ্টা"। "শুকতারা" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় সেটা। পরবর্তী খণ্ড "হীরের পাহাড়" ও "শুকতারা"তেই প্রকাশিত হয়। পরের খণ্ডগুলো প্রকাশের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেন 'উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির'-এর কর্ণধার কিরীটিকুমার পাল। উভয়ের কাছেই আমি ঋণী।
ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের দুঃসাহসিক অভিযানের সমগ্র কাহিনী একটি বইয়ের মধ্যে পেয়ে কিশোর কিশোরীরা খুশী হবে, এই আশাতেই "ফ্রান্সিস সমগ্র"র খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

অক্টোবর, ১৯৯০
অনিল ভৌমিক

এই লেখকের কয়েকটি বই

সোনার ঘণ্টা
হীরের পাহাড়
মুক্তোর সমুদ্র
তুষারে গুপ্তধন
রুপোর নদী
মনিমানিক্যের জাহাজ
বিষাক্ত উপত্যকা
চিকামার দেবরক্ষী
চুনীপান্নার রাজমুকুট
কাউন্ট রজারের গুপ্তধন
যোদ্ধামূর্তি রহস্য
রাণীর রত্নভাণ্ডার
যীশুর কাঠের মূর্তি
মাজোরকা দ্বীপে ফ্রান্সিস
চার্লসের স্বর্ণসম্পদ
রূপোর চাবি
ভাঙা আয়নার রহস্য
সম্রাটের রাজকোষ
রত্নহার উদ্ধারে ফ্রান্সিস
রাজা ওভিড্ডোর তরবারি
চিচেন ইতজার রহস্য
স্বর্ণখনির রহস্য
পাথরের ফুলদানি
হীরক সিন্দুকের সন্ধানে
ফ্রান্সিস সমগ্র ১
ফ্রান্সিস সমগ্র ২
ফ্রান্সিস সমগ্র ৩
ফ্রান্সিস সমগ্র ৪
ফ্রান্সিস সমগ্র ৫
ফ্রান্সিস সমগ্র ৬
এছাড়াও
সোনার শেকল
সর্পদেবীর গুহা
মেরীর স্বর্ণমূর্তি
হাতিপাহাড়ের গুপ্তধন
অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র
কিশোর গল্পসম্ভার

কসবা জগদীশ বিদ্যাপীঠ এর
প্রাক্তন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে-

নিবেদন

একটি চিত্রকাহিনীই 'সোনার ঘন্টা' উপন্যাসটির মূল প্রেরণা। সেই কাহিনী ঢেলে সাজাতে গিয়ে ঘটনা, চরিত্র সবকিছু আমাকে নতুন করে ভাবতে হয়েছে। উদাহরন স্বরূপ-ইহুদী জ্যাকব, কাসেম, মকবুল, ফজল, হ্যারি প্রভৃতি চরিত্রগুলো আমারই চিন্তার ফসল। কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের প্রতিকূলতা পেরিয়ে সোনার ঘন্টার দ্বীপে যাওয়া ও ফেরা, দুটো মোহরে খোদিত নক্সার কাহিনী ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার মতো করে আমাকে সাজাতে হয়েছে। অনেক স্থলে চিত্রকাহিনীর ফাঁক ও পূরন করতে হয়েছে। এইভাবে বর্তমান উপন্যাসের পূর্ণরূপ গড়ে উঠেছে।

সবশেষে নিবেদন-উপন্যাসটি কিশোরদের জন্য রচিত। তাই কাহিনীর নায়ক ফ্রান্সিসকে-নিছক অ্যাডভেঞ্চার বিলাসীরূপে অঙ্কন না করে তাকে একটা জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছি। কিশোরদের মনে এই দৃষ্টিভঙ্গিটুকু স্বীকৃতি পেলেই ''সোনার ঘন্টা'' রচনা সার্থক বলে মনে করবো

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'সোনার ঘন্টা' প্রথমে শুকতারা পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয়েছিল

আজকের দিনে যেসব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সবকিছুর উপরেই তাদের অপ্রতিহত উৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে।

সোনার ঘন্টা প্রসঙ্গে

ঘন্টা সোনার কি রুপোর কি নেহাৎই তামার বা পিতলের সেটা কোন বিচারের কথাই নয়। আসল যা হল বিচার্য তা হচ্ছে ঘন্টার ধ্বনি। যে ধ্বনি দিয়েই ঘন্টার সত্যকার পরিচয়। 'সোনার ঘন্টা' নামটির দরুন যে কথাগুলি বলবার সুযোগ পেলাম শ্রী অনিল ভৌমিকের সেই কিশোর উপন্যাসটি সম্বন্ধে সেগুলি বিশেষভাবে খাটে। বাঙলা ভাষায় ছোটদের জন্য লেখা বই এর সংখ্যা ইদানীং যথেষ্ট বাড়লেও সত্যিকার সার্থক লেখার দেখা কমই মেলে। 'সোনার ঘন্টা' তার মধ্যে বিশেষভাবে সমাদর পাবার বই, একথা অসঙ্কোচে বলতে পারি। গল্পের বিষয় ও বলবার মুন্সিয়ানা, সবদিক দিয়েই বইটি মনে রাখার মতো।

- প্রেমেন্দ্র মিত্র

সোনার ঘণ্টা

অনেকদিন আগের কথা। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে চলেছে একটা নিঃসঙ্গ পালতোলা জাহাজ। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল—সীমাহীন সমুদ্র।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে পশ্চিমের আকাশটা যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে সেইদিকে তাকিয়ে ছিল ফ্রান্সিস। সে কিন্তু পশ্চিমের আবির-ঝরা আকাশ দেখছিল না। সে ছিল নিজের চিন্তায় মগ্ন। ডেক-এ পায়চারি করতে-করতে মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিল, কখনো আকাশের দিকে, কখনো সমুদ্রের দিকে। তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা—সোনার ঘণ্টার গল্প কি সত্যি, না সবটাই গুজব। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী একটা ঘণ্টা—বিরাট ঘণ্টা—এই ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি কোন দ্বীপে নাকি আছে সেটা। কেউ বলে সেই সোনার ঘণ্টাটা নাকি জাহাজের মাস্তুলের সমান উঁচু, কেউ বলে সাত-আট মানুষ সমান উঁচু। যত বড়ই হোক —নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী একটা ঘণ্টা, সোজা কথা নয়।

এই ঘণ্টাটা তৈরী করার ইতিহাসও বিচিত্র। স্পেন দেশের সমুদ্রের ধারে ডিমেলো নামে ছোট্ট একটা শহর। সেখানকার গীর্জায় থাকতো জনপঞ্চাশেক পাদ্রী। তারা দিনের বেলায় পাদ্রীর কাজকর্ম করতো। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই পাদ্রীর পোশাক খুলে ফেলে সাধারণ পোশাক পরে নিতো। তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরুত ডাকাতি, লুটপাট করতে। প্রতি রাত্রে দশ-পনেরোজন করে বেরুত। টাকা-পয়সা লুঠ করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য শুধু একটাই—সোনা সংগ্রহ করা। শুধু সোনাই লুঠ করত তারা।

ধারে-কাছে শহরগুলোতে এমন কি দূর-দূর শহরেও তারা ডাকাতি করতে যেত। ভোর হবার আগেই ফিরে আসত ডিমেলোর গীর্জায়। গীর্জার পেছনে ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে একটা ঘণ্টার ছাঁচ মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল। সোনার মোহর বা অলংকার যা কিছু ডাকাতি করে আনত, সব গলিয়ে সেই ঘণ্টার ছাঁচে ফেলে দিত। এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সোনা দিয়ে ছাঁচ ভরানো চলল।

কিন্তু ঘণ্টা অর্ধেক তৈরি হবার পর কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এত ডাকাতি হতে দেখে দেশের সব বড়লোকেরা সাবধান হয়ে গেল। তারা সোনা সরিয়ে ফেলতে লাগল। ডাকাতি করে সিন্দুক ভেঙে পাদ্রী ডাকাতরা পেতে লাগল শুধু রুপোর মুদ্রা। মোহর বা সোনার অলংকারের নামগন্ধও নেই।

কি করা যায়? ডাকাত পাদ্রীরা সব মাথায় হাত দিয়ে বসল। সোনার ঘণ্টাটা অর্ধেক হয়ে থাকবে? তারা যখন ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না, তখন একজন পাদ্রী খবর নিয়ে এল—দেশের সব বড়লোকেরা বিদেশে সোনা সরিয়ে ফেলছে জাহাজে করে। ব্যাস। অমনি পাদ্রী ডাকাতরা ঠিক করে ফেলল; এবার জাহাজ লুঠ করতে হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। একটা জাহাজ কিনে ফেলল তারা। তারপর নিজেদের মধ্যে থেকে তিরিশজন বাছাই করা লোক নিয়ে একদিন গভীর রাত্রে তারা সমুদ্রে জাহাজ ভাসাল। বাকি পাদ্রীরা গীর্জাতেই রইল। লোকের চোখে ধুলো দিতে হবে তো! ডিমেলো শহরের লোকেরা জানল—গীর্জার তিরিশজন পাদ্রী বিদেশে গেছে ধর্ম প্রচারের জন্যে। কারো মনেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দীর্ঘ তিন-চার মাস ধরে পাদ্রী ডাকাতরা সমুদ্রের বুকে ডাকাতি করে বেড়াল। স্পেনদেশ থেকে যত জাহাজ সোনা নিয়ে বিদেশে যাচ্ছিল, কোন জাহাজ রেহাই পেল না।

লুঠতরাজ শেষ করে ডাকাত পাদ্রীরা ডিমেলো শহরের গীর্জায় ফিরে এল। জাহাজ থেকে নামানো হল সোনাভর্তি বাকস। দেখা গেল কুড়িটা কাঠের বাকস ভর্তি অজস্র মোহর আর সোনার অলংকার। সবাই খুব খুশী হল। যাক এতদিনে ঘণ্টাটা পুরো তৈরী হবে।

ফ্রান্সিস নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখাল।

ঘণ্টাটা সম্পূর্ণ তৈরী হল। কিন্তু মাটির ছাঁচটা ভেঙে ফেলল না। ছাঁচ ভেঙে ফেললেই তো সোনার ঘণ্টাটা বেরিয়ে আসবে। যদি সোনার ঝকমকানি কারোর নজরে পড়ে যায়।

তারপরের ঘটনা সঠিক জানা যায় না। তবে ফ্রান্সিস বুড়ো নাবিকদের মুখে গল্প শুনেছে, ডাকাত পাদ্রীরা নাকি একটা মস্তবড় কাঠের পাটাতনে সেই সোনার ঘণ্টা তুলে নিয়ে জাহাজের পেছনে বেঁধে নিরুদ্দেশে যাত্রা করেছিল। সোনার ঘণ্টার গায়ে ঘন কালো রং লাগিয়ে দিয়েছিল যাতে কেউ দেখলে বুঝতে না পারে যে ঘণ্টাটা সোনার। ভূমধ্যসাগরের ধারে কাছে এক নির্জন দ্বীপে তারা সোনার ঘণ্টাটা লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ডাকাত পাদ্রীদের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। একজনও বাঁচেনি। কাজেই সেই নির্জন দ্বীপের হদিস আজও সবার কাছে অজানাই থেকে গেছে।

—এই যে ভায়া!

ফ্রান্সিসের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ভুঁড়িওলা জ্যাকব কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ও বুঝতেই পারেনি। জ্যাকব হাসতে-হাসতে বলল—ভুরু কুঁচকে কি ভাবছিলে অত?

ফ্রান্সিস নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখাল।

—ওখানে কি? জ্যাকব বোকাটে মুখে জিজ্ঞেস করল।

—ওখানে—আকাশে কত সোনা —অথচ সব ধরাছোয়াঁর বাইরে। জ্যাকব এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাজখাঁই গলায় হেসে বললো— ফ্রান্সিস তোমার নির্ঘাৎ ক্ষিদে পেয়েছে, খাবে চলো।

খেতে বসে দুজনে কথাবার্তা বলতে লাগল। ফ্রান্সিস জাহাজের আর কোন নাবিকের সঙ্গে বেশী মিশত না। ওর ভালও লাগত না। কিন্তু এই ভুঁড়িওলা জ্যাকবের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ও জ্যাকবের কাছে মনের কথা খুলে বলত।

ফ্রান্সিস ছিল জাতিতে ভাইকিং। ইউরোপের পশ্চিম সমুদ্রতীরে ভাইকিংদের দেশ। ভাইকিংদের অবশ্য বদনাম ছিল 'জলদস্যুর' জাত বলে। শৌর্যে-বীর্যে আর জাহাজ চালনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্যে ইউরোপের সব জাতিই তাদের সমীহ করত। ফ্রান্সিস কিন্তু সাধারণ ঘরের ছেলে না। ভাইকিংদের রাজার মন্ত্রীর ছেলে সে। কিন্তু এই ভিনদেশী জাহাজে

যাচ্ছিল সাধারণ নাবিকদের কাজ নিয়ে নিজের পরিচয় গোপন করে। এটা জানত শুধু ভুঁড়িওলা জ্যাকব।

মুরগীর ঠ্যাং চিবুতে-চিবুতে জ্যাকব ডাকল—ফ্রান্সিস?

—হুঁ।

—তুমি বাপু দেশে ফিরে যাও।

—কেন?

—আমাদের এই দাঁড়বাওয়া, ডেক-মোছা-এসব কম্মো তোমার জন্যে নয়।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—তোমার কথাটা মিথ্যে নয়। এত পরিশ্রমের কাজ আমি জীবনে করিনি। কিন্তু জানো তো—আমরা ভাইকিং— যেকোনোরকম কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের জন্মগত। তা ছাড়া—

—কি?

—ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি সেই সোনার ঘণ্টার গল্প—

—ও! সেই ডাকাত পাদ্রীদের সোনার ঘণ্টা? আরে ভাই ওটা গাঁজাখুরী গপ্পো।

—আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

—তবে?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভূমধ্যসাগরের ধারে-কাছে কোন দ্বীপে নিশ্চয়ই সেই সোনার ঘণ্টা আছে।

—পাগল! জ্যাকব খুক-খুক করে হেসে উঠল।

ফ্রান্সিস একবার চারদিক তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বললো—জানো—দেশ ছাড়বার আগে একজন বুড়ো নাবিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বুড়োটা বলত—ও নাকি সোনার ঘণ্টার বাজনা শুনেছে।

—যাঃ বলো কি! জ্যাকব অবাক চোখে তাকাল।

—লোকে অবশ্য বুড়ো নাবিকটাকে পাগল বলে ক্ষেপাত। আমি কিন্তু মন দিয়ে ওর গল্প শুনেছিলাম।

—কি গল্প?

—ভূমধ্যসাগর দিয়ে নাকি ওদের জাহাজ আসছিল একবার। সেই সময় এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ওরা দিক ভুল করে ফেলে। তারপর ডুবো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ওদের জাহাজ ডুবে যায়। ডুবন্ত জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় ও একটা ঘণ্টার শব্দ শুনেছিল [illegible] ঝড়জলের শব্দ ছাপিয়ে বেজেই চলেছিল ঢং [illegible] ঢং।

[illegible] ওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে হাঁ করে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে [illegible] সোনার ঘণ্টার শব্দ?

—নিশ্চয়ই। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

ভুঁড়িওয়ালা জ্যাকবের মু[illegible] আর কথা সরলো না।

পরের দু'দিন জাহাজের নাবিকদের বেশ আনন্দেই কাটলো। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। জোর বাতাস। জাহাজের পালগুলো হাওয়ার তোড়ে বেলুনের মত ফুলে উঠল। জাহাজ চলল তীরবেগে। দাঁড়টানার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নাবিকরা এই দু'দিন রেহাই পেল। কিন্তু জাহাজের ডেক পরিষ্কার করা, জাহাজের মালিকের ফাই-ফরমাস খাটা, এসব করতে হল। তবু নাবিকেরা সময় পেল—তাস খেলল, ছক্কা-পাঞ্জা খেলল, আড্ডা দিল, গল্পগুজব করল অনেক রাত পর্যন্ত।

ফ্রান্সিস যতক্ষণ সময় পেয়েছে হয় ডেক-এ পায়চারি করেছে, নয়তো নিজের বিছানায় শুয়ে থেকেছে। ভুঁড়িওলা জ্যাকব মাঝে-মাঝে ওর খোঁজ করে গেছে। শরীর ভালো আছে কিনা, জিজ্ঞেস করেছে। একটু খোশগল্পও করতে চেয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সিসের তরফ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে অন্য নাবিদের আড্ডায় গিয়ে গল্প জুড়েছে। ফ্রান্সিসের একা থাকতে ভালো লাগছিল, নিজের চিন্তায় ডুবে থাকতে। দেশ ছেড়েছে কতদিন হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছে ও। কবে ফিরবে অথবা কোনদিন ফিরবে কি না কে জানে। মাথায় ওর মাত্র একটাই সংকল্প, যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে সোনার ঘণ্টার হদিস।

সোনার ঘণ্টার কথা ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল, ফ্রান্সিস জানে না। হঠাৎ নাবিকদের হৈ-চৈ চিৎকার ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু হল কি? এদের এত উত্তেজনার কারণ কি? এমন সময় জ্যাকব ছুটতে-ছুটতে ফ্রান্সিসের কাছে এল।

—সাংঘাতিক কাণ্ড। জ্যাকব তখনও হাঁপাচ্ছে।

—কি হয়েছে?

—ওপরে—ডেক-এ চল—দেখবে'খন।

দ্রুতপায়ে ফ্রান্সিস ডেক-এর ওপরে উঠে এল। জাহাজের সবাই ডেক-এর ওপর এসে জড়ো হয়েছে। ফ্রান্সিস জাহাজের চারপাশে সমুদ্রও আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল তখন। আর বেলাও হয়েছে। অথচ চারদিকে কুয়াশার ঘন আস্তরণ। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। চারদিকে কেমন একটা মেটে আলো। এক ফোঁটা বাতাস নেই। জাহাজটা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছাপ। এই অসময়ে কুয়াশা? কোন এক অমঙ্গলের চিহ্ন নয় তো?

জাহাজের মালিক সর্দার-নাবিককে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। বোধহয় কি করবে এখন তারই শলা-পরামর্শ করতে। সবাই বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ফ্রান্সিস খুশীতে শিস দিয়ে উঠল। আশ্চর্য! শিসের শব্দ অনেকের কানেই পৌঁছল। এই বিপত্তির সময় কোন বেআক্কেলে শিস দেয় কেউ? সবাই ফ্রান্সিসের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। দেখল—ফ্রান্সিসের মুখে মৃদু হাসি। এবার ওদের আরো অবাক হবার পালা। ফ্রান্সিসকে ওরা কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। সব সময় গোমড়া মুখে ভুরু কুঁচকে থাকতেই দেখেছে। মাথায় যেন রাজ্যের দুশ্চিন্তা। সেই লোকটা হাসছে? অবাক কাণ্ড!

ফ্রান্সিসের এই খুশীতে অর্থাৎ শিস দিয়ে ওঠাটা কেউই ভালো চোখে দেখল না। তবে সবাই মনে-মনে গজরাতে লাগল। জ্যাকব গম্ভীর মুখে ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল—বেশী বাড়াবাড়ি করো না।

—কেন?

—সবাই ভয়ে মরছি, আর তুমি কিনা শিস দিচ্ছো?

ফ্রান্সিস হেসে উঠল। জ্যাকব মুখ বেঁকিয়ে বলল, তোমরা ভাইকিং—খুব সাহসী তোমরা, কিন্তু তাই বলে তোমার কি মৃত্যু ভয়ও নেই?

—আছে বৈ-কি! তবে আমার খুশী হবার অন্য কারণ আছে।

—বলো কি?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস জ্যাকবের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা খুশীর স্বরে বলতে লাগল—জানো সেই বুড়ো পাগলা নাবিকটা বলেছিল—ওদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়বার আগে

ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার আগে—এমনি ঘন কুয়াশার মধ্যে আটকে গিয়েছিল—ঠিক এমনি অবস্থা—বাতাস নেই, কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার—

ফ্রান্সিস আর জ্যাকব ডেক-এর কোনায় দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছিল, তখন লক্ষ্য করেনি যে, ডেক-এর আরএক কোনে নাবিকদের একটা জটলার সৃষ্টি হয়েছে। ওরা ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। দু'-একজন চোখের ইশারায় জ্যাকবকে দেখাল। ব্যাপারটা সুবিধে নয়। কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে। জ্যাকব সজাগ হল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। ও উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে সামনের সাদাটে কুয়াশায় আস্তরণের দিকে তাকিয়ে নিজের চিন্তায় বিভোর।

নাবিকদের জটলা থেকে তিন-চারজন ষণ্ডাগোছের নাবিক ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। জ্যাকব ওদের মুখ দেখেই বুঝলো, কিছু একটা কুমতলব আছে ওদের। ফ্রান্সিসকে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিল। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জ্যাকবের দিকে তাকাল। জ্যাকব চোখের ইশারায় ষণ্ডাগোছের লোকগুলোকে দেখাল। তাদের পেছনে-পেছনে আর সব নাবিকেরা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। ফ্রান্সিস কিন্তু এই থমথমে আবহাওয়াটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে হেসে গলা চড়িয়ে বলল—ব্যাপার কি? অ্যাঁ—এখানে নাচের আসর বসবে নাকি? কিন্তু কেউ ওর কথার জবাব দিল না। ষণ্ডাগোছের লোক ক'জন ওদের দু'জনের কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরে এসে দাঁড়াল। দলের মধ্যে থেকে ইয়া দশাসই চেহারার একজন গম্ভীর গলায় ডাকল—এই জ্যাকব, শোন্ এদিকে।

ফ্রান্সিস তখন হেসে বলল—যা বলবার বাপু ওখান থেকেই বলো না।

সেই নাবিকটা এবার আঙ্গুল দিয়ে জ্যাকবকে দেখিয়ে পেছনের নাবিকদের বলল—এই জ্যাকব ব্যাটা ইহুদী। এই বিধর্মীটা যতক্ষণ জাহাজে থাকবে—ততক্ষণ কুয়াশা কাটবে না—বিপদ আরো বাড়বে! তোমরাই বলো ভাই—এই অলুক্ষুণেটাকে কি করবো?

হই-হই চীৎকার উঠল নাবিকদের মধ্যে।

কেউ-কেউ তীক্ষ্মস্বরে চেঁচিয়ে বলল—জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

—খুন কর বিধর্মীটাকে।

—ফাঁসীতে লটকাও।

ভয়ে জ্যাকবের মুখ সাদা হয়ে গেল। কিছু বলবার জন্য ওর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। কিছুই বলতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ও কেঁদে উঠল। দশাসই চেহারার নাবিকটা জ্যাকবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই ফ্রান্সিস জ্যাকবকে আড়াল করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের তখন অন্য চেহারা। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সমস্ত শরীরটা ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করছে। দাঁতচাপা স্বরে ফ্রান্সিস বলল—জ্যাকব আমার বন্ধু। যে ওর গায়ে হাত দেবে, তার হাত আমি ভেঙে দেব।

একমুহূর্তে গোলমাল হই-চই থেমে গেল। ষণ্ডা ক'জন থমকে দাড়াল। কে যেন চীৎকার করে উঠল—দু'টোকেই জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

আবার চিৎকার, মার-মার রব উঠল। ফ্রান্সিস আড়চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখল ডেক-এর কোণার দিকে একটা ভাঙা দাঁড়ের হাতলের অংশটা পড়ে আছে। চোখের নিমেষে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে লাঠির মত বাগিয়ে ধরল। চেঁচিয়ে বলল—সাহস থাকে তো এক-একজন করে আয়।

দশাসই চেহারার লোকটা ফ্রান্সিসের দিকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্যুৎগতিতে একপাশে সরে গিয়ে ফ্রান্সিস হাতের ভাঙা দাঁড়টা চালাল ওর মাথা লক্ষ্য করে। লোকটার

মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরল শুধু—'অঁ-ক্'। তারপরই ডেকের ওপর সে মুখ থুবড়ে পড়ল। মাথাটা দু-হাতে চেপে কাতরাতে লাগল। ওর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই থমকে দাড়াল। কিন্তু একমুহূর্ত। তারপরেই আর একটা ষণ্ডাগোছের লোক ঘুঁষি বাগিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তেড়ে এল। ফ্রান্সিস তৈরী হয়েই ছিল। ভাঙা দাঁড়টা সোজা লোকটার থুতনি লক্ষ্য করে চালাল। লোকটা বেমক্কা মার খেয়ে দু'হাত শূন্যে তুলে ডেক-এর পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল। দাঁত ভাঙল কয়েকটা। মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। মুখ চেপে ধরে লোকটা গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস উত্তেজিত নাবিকদের জটলার দিকে চোখ রেখে চাপাস্বরে ডাকাল—জ্যাকব।

জ্যাকব এতক্ষণে সাহস ফিরে পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে ফ্রান্সিসের মত রুখে না দাঁড়াতে পারলে মরতে হবে। জ্যাকব চাপাস্বরে উত্তর দিল—কী?

—ঐ যে ডেকঘরের দেয়ালে সর্দারের বেল্টসুদ্ধু তরোয়ালটা ঝোলানো রয়েছে—ঐ দেখছো?

—হ্যাঁ।

—এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এসো। ভয় নেই—একবার তরোয়ালটা হাতে পেলে সব'কটাকে আমি একাই নিকেশ করতে পারবো—জল্‌দি ছোট—

জ্যাকব পড়ি কি মরি করে ছুটল ডেক-ঘরের দেয়ালের দিকে। নাবিকদের দল কিছু বোঝবার আগেই ও দেওয়ালে ঝোলানো তরোয়ালটা খাপ থেকে খুলে নিল। এতক্ষণে নাবিকের দল ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সবাই হই-হই করে ছুটল জ্যাকবকে ধরতে। জ্যাকব ততক্ষণে তরোয়ালটা ছুঁড়ে দিয়েছে ফ্রান্সিসের দিকে। তরোয়ালটা ঝনাৎ করে এসে পড়ল ফ্রান্সিসের পায়ের কাছে। তরোয়ালটা তুলে নিয়েই ও ছুটল ভিড়ের দিকে। ততক্ষণে ক্রুদ্ধ নাবিকের দল জ্যাকবকে ঘিরে ধরেছে। কয়েকজন মিলে জ্যাকবকে ধ'রে ডেক-ঘরের কাঠের দেয়ালে ওর মাথা ঠুকিয়ে দিতে শুরু করেছে। কিন্তু খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসকে ছুটে আসতে দেখে ওরা জ্যাকবকে ছেড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে সরে গেল। ফ্রান্সিস সেই নাবিকদলের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—জ্যাকব বিধর্মী হোক, আর যাই হোক—ও আমার বন্ধু। যদি তোদের প্রাণের মায়া থাকে জ্যাকবের গায়ে হাত দিবি না।

ফ্রান্সিসের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে সবাই বেশ ঘাবড়ে গেল। ওরা জানতো—ফ্রান্সিস জাতিতে ভাইকিং। তরোয়াল হাতে থাকলে ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল। ডেক-এর ওপরে এত হই-চই চীৎকার ছুটোছুটির শব্দে মালিক আর নাবিক-সর্দার ছুটে ওপরে উঠে এল। ওরা ভাবতেই পারেনি, যে ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে। এদিকে দু'জন ডেক-এর ওপর রক্তাক্ত দেহে কাতরাচ্ছে—ওদিকে ফ্রান্সিস খোলা তরোয়াল হাতে রুদ্রভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

জাহাজের মালিক আশ্চর্য হয়ে গেল। সে দু'হাত তুলে চীৎকার করে বলল—শোন সবাই—মারামারি করবার সময় পরে অনেক পাবে, এখন যে বিপদে পড়েছি, তা থেকে উদ্ধারের কথা ভাবো।

এতক্ষণ উত্তেজনা মারামারির মধ্যে সবাই বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন আবার সবাই ভয়-ভয় চোখে চারদিকে ঘন কুয়াশার দিকে তাকাতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই। এমন সময় ষণ্ডাগোছের নাবিকদের মধ্যে একজন চীৎকার করে বলল—এই যে জ্যাকব—ও ইহুদী —ওর জন্যই আমাদের এই বিপদ।

আবার গোলমাল শুরু হল। মালিক দু'হাত তুলে সবাইকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগল। গোলমাল কম্‌লে বলল—এটা বাপু জাহাজ—গীর্জে নয়'কার কি ধমমো, তাই দিয়ে ...র কি দরকার। আমি ... ...জের লোক। জ্যাকব ... ...

আবার চীৎকার শুরু হল—আমরা ওসব শুনতে চাইনা।

—জ্যাকবকে জাহাজ থেকে ফেলে দাও।

—ফাঁসিতে লটকাও।

জাহাজের মালিক ব্যবসায়ী মানুষ। সে কেন একটা লোকের জন্যে ঝামেলা পোহাবে। সে বলল—বেশ তোমরা যা চাইছ, তাই হবে।

ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলে উঠল—আমার হাতে তরোয়াল থাকতে সেটি হবে না।

জাহাজের মালিক পড়ল মহাফাঁপরে! তবে সে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। খুনোখুনি-রক্তপাত এসবে বড় ভয়। বলল—ঠিক আছে—আর একটা দিন সময় দাও তোমরা। দাঁড়ে হাত লাগাও—জাহাজ চলুক—দেখা যাক—যদি একদিনের মধ্যেও কুয়াশা না কাটে তাহলে জ্যাকবকে ছুঁড়ে ফেলে দিও।

নাবিকদের মধ্যে গুঞ্জন চলল। একটু পরে সেই ষণ্ডাগোছের নাবিকটা বলল, ঠিক আছে—আমরা আপনাকে একদিন সময় দিলাম।

—তাহলে আর দেরি করো না। সবাই যে যার কাজে লেগে পড়ো। মালিক নাবিক সর্দারের দিকে ইশারা করল। সর্দার ফ্রান্সিসের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস একবার সেই নাবিকদের জটলার দিকে তাকাল। তারপর তরোয়ালটা সর্দারের হাতে দিল। চাপাস্বরে জ্যাকবকে বলল—ভয় নেই। দেখো—একদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যাবে।

নাবিকদের জটলা ভেঙে গেল। যে যার কাজে লেগে পড়ল। একদল পাল সামলাতে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসদের দল সর্দারের নির্দেশে সবাই জাহাজের খোলে নেমে এল। সেখানে দু'ধারে সার-সার বেঞ্চির মত কাঠের পাটাতন পাতা। সামনে একটা লম্বা দাঁড়ের হাতল। বেঞ্চিতে বসে ওরা পঞ্চাশজন দাঁড়ে হাত লাগাল। তারপর সর্দারের ইঙ্গিতে একসঙ্গে পঞ্চাশটা দাঁড় পড়ল জলে—ঝপ্—ঝপ্। জাহাজটা নড়েচড়ে চলতে শুরু করল। ফ্রান্সিসের ঠিক সামনেই বসেছিল জ্যাকব। দাঁড় টানতে টানেত ফ্রান্সিস ডাকল—জ্যাকব?

—হুঁ।

—যদি সেই বুড়ো নাবিকটার কথা সত্যি হয়, তাহলে—

—তাহলে কী?

—তাহলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঝড়ের মুখে পড়ব।

—তারপর?

—ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে—

—জলের তলায় অক্কা পাবে—

—তার আগে সোনার ঘণ্টার বাজনা তো শুনতে পাবো।

জ্যাকব এবার মুখ ফিরিয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল—

—পাগল!

জাহাজ চলল। ছপ্-ছপ্। পঞ্চাশটা দাঁড়ের শব্দ উঠছে। চারিদিকে জমে থাকা কুয়াশার মধ্য দিয়ে জাহাজ চলছে। কেমন একটা গুমোট গরম। দাঁড়িদের গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। একফোঁটা হাওয়ার জন্যে সবাই হা-হুতাশ করছে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় সমস্ত জাহাজটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। কে কোথায় ছিটকে পড়ল, তার ঠিক নেই। পরক্ষণেই প্রবল বৃষ্টিধারা আর হাওয়ার উন্মত্তবেগ। তালগাছ সমান উঁচু-উঁচু ঢেউ জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়তে লাগল।

জাহাজটা কলার মোচার মত ঢেউয়ের আঘাতে দুলতে লাগল। এই একবার জাহাজটা ঢেউ-এর গভীর ফাটলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই প্রচণ্ড ধাক্কায় উঠে আসছে ঢেউয়ের মাথায়।

ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় ফ্রান্সিস মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে সামলে নিয়েছিল খুব। কারণ ও তৈরীই ছিল—ঝড় আসবেই। আর সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে কাঠের পাটাতন ধরে-ধরে অনেকেই নিজের জায়গায় ফিরে এল। এল না শুধু জ্যাকব। কিছুক্ষণ আগে যে ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে। তারপর ঝড়ের ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে পাটাতনের কোণায় জোর ধাক্কা খেয়ে ও অজ্ঞানের মত পড়েছিল একপাশে। ফ্রান্সিস কয়েকবার জ্যাকব কে ডাকল। ঝড়ের গোঁ-গোঁয়ানি মধ্যে সেই ডাক-জ্যাকবের কানে পৌঁছল না। ফ্রান্সিস দাঁড় ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে জ্যাকবকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় জ্যাকব? আর খোঁজা সম্ভব নয়। প্রচণ্ড দুলুনির মধ্যে টাল সামলাতে না পেরে বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল ফ্রান্সিস।

হঠাৎ শক্ত কিছুতে ধাক্কা লেগে জাহাজের তলাটা মড়মড় করে উঠল। দাঁড়গুলো প্যাকাটির মত মটমট করে ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল—ডুবোপাহাড়! আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ফ্রান্সিস বহু কষ্টে টলতে-টলতে ডেক-এর ওপর উঠে এল। দেখল, ঝোড়ো হাওয়ার আঘাতে বিরাট ঢেউ ডেক-এর ওপর আছড়ে পড়ছে। আর সে কি দুলুনি! ঠিক তখনই সমস্ত জল-ঝড় বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে শুনতে পেল ঘণ্টার শব্দ— ঢং-ঢং-ঢং। ঘণ্টা বেজেই চলল। সোনার ঘণ্টার শব্দ—ঢং-ঢং—।

ফ্রান্সিস উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ঠিক তখনই মড়মড় শব্দে জাহাজের তলাটা ভেঙে গেল, আর সেই ভাঙা ফাটল দিয়ে প্রবল-বেগে জল ঢুকতে লাগল। মুহূর্তে জাহাজের খোলটা ভরে গেল। জাহাজটা পেছন দিকে কাৎ হয়ে ডুবতে লাগল। সশব্দে মাস্তুলটা ভেঙ্গে পড়ল। জাহাজের রেলিঙের কোণায় লেগে মাস্তুলটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। উত্তাল সমুদ্রের বুকে মাস্তুলের যে টুকরোটা পড়ল, সেটার দিকে লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে কোনোরকমে ভাঙা মাস্তুলটা জড়িয়ে ধরল। বহুকষ্টে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা দিয়ে নিজের শরীরটা মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে নিল। ওদিকে ঘণ্টার শব্দ ফ্রান্সিসের কানে এসে তখন বাজছে—ঢং-ঢং-ঢং।

ভোর হয়-হয়। পূবদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় আকাশটায় লালচে রঙ ধরেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই। সাদা-সাদা সমুদ্রের পাখীগুলো উড়ছে আকাশে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির মধ্যে সমুদ্রের জলের ধার ঘেঁষে ফ্রান্সিস পড়ে আছে মড়ার মতো। কোন সাড়া নেই। ঢেউগুলো বালিয়ারির ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওর গা পর্যন্ত চলে আসছে।

সমুদ্র-পাখীর ডাক ফ্রান্সিসের কানে গেল। অনেক দূরে পাখীগুলো ডাকছে। আস্তে-আস্তে পাখীর ডাক স্পষ্ট হল। চেতনা ফিরে পেল ফ্রান্সিস। বেশ কষ্ট করেই চোখ খুলতে হল ওকে। চোখের পাতায় নুনের সাদাটে আস্তরণ পড়ে গেছে। মাথার ওপরে আকাশটা দেখল ও। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে আড়ষ্ট ঘাড়টা ফেরাল। দেখলো সূর্য উঠছে। মস্তবড় থালার মতো টকটকে লাল সূর্য। আস্তে-আস্তে সূর্যটা ঢেউয়ের গা লাগিয়ে উঠতে লাগল। সবটা উঠল না বড় বিন্দুর মত একটা অংশ লেগে রইল জলের সঙ্গে। তারপর টুপ করে উঠে ওপরের লাল থালাটার সঙ্গে মিশে গেল। সমুদ্রে এই সূর্য ওঠার দৃশ্য ফ্রান্সিসের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু আজকে এটা নতুন বলে মনে হল। বড় ভাল লাগল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে ও।

ফ্রান্সিস জোরে শ্বাস ফেলল—আঃ কি সুন্দর এই পৃথিবী!

বেশ কষ্ট করে শরীরটা টেনে তুলল ফ্রান্সিস। হাতে ভর রেখে একবার চারদিকে তাকাল। ভরসা–যদি জাহাজের আর কেউ ওর মত ভাসতে-ভাসতে এখানে এসে উঠে থাকে। কিন্তু বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে যতদূর চোখ যায় ও কাউকেই দেখতে পেল না। ওদের জাহাজের কেউ বোধহয় বাঁচেনি। জ্যাকবের কথা মনে পড়ল। মনটা ওর বড় খারাপ হয়ে গেল। গা থেকে বালি ঝেড়ে ফেলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হাঁটুদুটো কাঁপছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগছে। তবু উপায় নেই। চলতে হবে। লোকালয় খুঁজতে হবে। খাদ্য চাই, কিন্তু কোন দিকে মানুষের বসতি?

কাছে আসতেই নজরে পড়ল তাঁবুর সারি।

সূর্যের আলো প্রখর হতে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস চোখে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে চারদিকে দেখতে লাগল। একদিকে শান্ত সমুদ্র। অন্যদিকে শুধু বালি আর বালি। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। এ কোথায় এলাম? আর ভেবে কি হবে! ফ্রান্সিস পা টেনে সেই ধু-ধু বালির মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল।

মাথার ওপর সূর্য উঠে এল। কি প্রচণ্ড তেজ সূর্যের আলোর। তৃষ্ণায় জিভ পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে। হু-হু হাওয়া বইছে বালি উড়ছে। শরীর আর চলছে না। মাথা ঘুরছে। মাথার ওপর আগুন-ঝরানো সূর্য। বালির দিগন্ত দুলে-দুলে উঠছে। শরীর টলছে। তবু হাঁটতেই হবে। একবার থেমে পড়লে, বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। জোরে শ্বাস নিল ফ্রান্সিস। অসম্ভব! থামা চলবে না।

একি? মরীচিকা নয় তো? ফ্রান্সিস হাত দিয়ে চোখদুটো ঘষে নিল। নাঃ। ঐ তো সবুজের ইশারা। কয়েকটা খেজুর গাছ। হাওয়ায় পাতাগুলো নড়ছে। কাছে আসতেই নজরে পড়ল তাঁবুর সারি, খেজুর গাছে বাঁধা অনেকগুলো ঘোড়া, একটা ছোট্ট জলাশয়। একটা লোক ঘোড়াগুলোকে দানা-পানি খাওয়াবার তদারকি করছিল। সেই প্রথম ফ্রান্সিসকে দেখতে পেল। লোকটা প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তারপর তীক্ষ্ণস্বরে কি একটা কথা বলে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুগুলো থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এল। তাদের গায়ে আরবীদের পোশাক। ঢোলা জোব্বা পরনে। মাথায় বিড়েবাঁধা সাদা কাপড়। কান পর্যন্ত ঢাকা। ফ্রান্সিসের বুকে আর দম নেই। মুখ দিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস শুধু দেখতে পেল লোকগুলোর মধ্যে কারো কারো হাতে খোলা তরোয়াল রোদ্দুরে ঝিকিয়ে উঠছে। আর কিছু দেখতে পেল না ফ্রান্সিস। সব কেমন আবছা হয়ে আসছে। ফ্রান্সিস মুখ থুবড়ে পড়ল বালির ওপর। অনেক লোকের কণ্ঠস্বর কানে এল। ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে-করতে এদিকেই আসছে। তারপর আর কোন শব্দই ফ্রান্সিসের কানে গেল।

ফ্রান্সিস যখন চোখ মেলল তখন রাত হয়েছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে বুঝল, এটা তাঁবু। আস্তে-আস্তে ওর সব কথা মনে পড়ল। চারিদিকে তাকাল। এককোণে মৃদু আলো

জ্বলছে। একটা বিছানার মত নরম কিছুর ওপর ও শুয়ে আছে। শরীরটা এখন অনেক ভাল লাগছে। ওপাশে কে যেন মৃদুস্বরে কথা বলছে। ফ্রান্সিস পাশ ফিরল। লোকটা তাড়াতাড়ি এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। লোকটার মুখে দাড়ি-গোঁফ। কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। হয়তো তরোয়ালের কোপের। লোকটা হাসল—'কি? এখন ভাল লাগছে?'

মৃদু হেসে ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

—খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ।

লোকটা দ্রুতপায়ে তাঁবুর বাইরে চলে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল—এই লোকটাই তার সেবাশুশ্রূষার ভার নিয়েছে।

পরের দিন বিকেল পর্যন্ত ফ্রান্সিস প্রায় সমস্তক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল। কপালকাটা লোকটাই তার দেখাশুনা করল। ফ্রান্সিস ঐ লোকটার কাছ থেকে শুধু এইটুকুই জানতে পারল, যে এরা একদল বেদুইন ব্যবসায়ী। এখান থেকে কিছুদূরেই আমদাদ শহর। এখানকার সুলতানের রাজধানী। ওখানেই যাবে এরা। সারাদিন এদের দলপতি বারদুয়েক ফ্রান্সিসকে দেখে গেছে। দলপতির দীর্ঘ দেহ, পরনে আরবীয় পোশাক, কোমরে সোনার কাজকরা খাপে লম্বা তরোয়াল! দলপতি বেশ হেসেই কথা বলছিল ফ্রান্সিসের সঙ্গে। ফ্রান্সিসকে তার যে বেশ পছন্দ হয়েছে, এটা বোঝা গেল। দলপতির সঙ্গে সবসময়ই একটা লোককে দেখছিল ফ্রান্সিস। মুখে বসন্তের দাগ। কেমন এবড়ো-খেবড়ো কঠিন মুখ। ধূর্ত চোখের দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারিদিক। ফ্রান্সিস তাঁবু থেকে বেরিয়ে একটা খেজুর গাছের নীচে এসে বসল। জলাশয়ের ওপর একজন বেদুইন একটা তেড়াবাঁকা তারের যন্ত্র বাজিয়ে নাকিসুরে গান করছে। ফ্রান্সিস চুপ করে বসে গান শুনতে লাগল। হঠাৎ ফ্রান্সিস দেখল দূরে ছায়া-ছায়া বালি-প্রান্তর দিয়ে কে যেন খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। লোকটা এল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমেই সোজা দলপতির তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই দলপতির তাঁবু থেকে কয়েকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কয়েকজন ঢুকল। বেশ একটা ব্যস্ততার ভাব। কি খবর নিয়ে এল লোকটা? ফ্রান্সিসের হঠাৎ মনে হল, ওর পাশেই কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। আরে? সেই কপাল-কাটা লোকটা। ওর জন্যে অনেক করেছে অথচ নাম জানা হয়নি।

—আরে বসো-বসো। ফ্রান্সিস সরে বসবার জায়গা করে দিল। লোকটাও বসল।

—কি কাণ্ড দেখ—তোমার নামটাই জানা হয় নি। ফ্রান্সিস বলল।

—ফজল আলি, সবাই ফজল বলেই ডাকে—লোকটা আস্তে-আস্তে বলল।

এবার কি জিজ্ঞেস করবে ফ্রান্সিস ভেবে পেল না।

ফজলই কথা বলল—তুমি আমার কপালের দাগটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলে।

ফ্রান্সিস একটু অপ্রস্তুত হল। বলল—তা ওরকম দাগ তো বড় একটা দেখা যায় না।

—আমার ভাই তরোয়াল চালিয়েছিল। এটা তারই দাগ।

—সে কি!

—হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

—সেইদিন থেকে তরোয়াল একটা রাখতে হয় তাই রাখি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা খাপ থেকে বের করিনি। যাকগে—ফজল একটু থেমে বলল—তুমি তো ভাই এখানকার লোক

নও।

—ঠিক ধরেছো—আমি ভাইকিং।

—ভাইকিং! বাপস্রে, তোমাদের বীরত্বের অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি।

—তাই নাকি? ফ্রান্সিস হাসল।

—তোমার নাম?

—ফ্রান্সিস।

—কোথায় যাচ্ছিলে?

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। সোনার ঘণ্টার খোঁজে যাচ্ছিলাম, এ সব বলা বিপজ্জনক। তা ছাড়া ও সব বললে পাগলও ঠাউরে নিতে পারে। বলল—এই—ব্যবসায় ফিকিরে—

—জাহাজ ডুবি হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

দু'জনের কেউ আর কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস একবার আকাশের দিকে তাকাল। পরিষ্কার আকাশজুড়ে তারা। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। হঠাৎ ফজল চাপাস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস?

—কি?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দল ছেড়ে পালাও।

ফ্রান্সিস চমকে উঠে বললো—কেন?

ফজল চারিদিক তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল—এটা হচ্ছে বেদুইন মরুদস্যুদের দল।

—সেকি!

—হ্যাঁ।

—তুমিও তো এই দলেরই।

—উপায় নেই ভাই—একবার এই দস্যুদলে ঢুকলে পালিয়ে যাওয়ার সব পথ বন্ধ।

—কেন?

—এই তল্লাটের সব শহরে, বাজারে, মরূদ্যানে এদের চর রয়েছে। তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবে। তারপর—

—মানে—খুন করবে?

—বুঝতেই পারছো।

—কিন্তু—ফ্রান্সিসের সংশয় যেতে চায় না। বলল—সর্দারকে তো ভালো লোক বলেই মনে হল।

—তা ঠিক কিন্তু সর্দারকে চালায় কাসেম—কাসেমকে দেখেছো তো? সব সময় সর্দারের সঙ্গে থাকে।

—হ্যাঁ—বীভৎস দেখতে।

—যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। ওর মত সাংঘাতিক মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

—হুঁ। কাসেমকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে।

—কালকেই দেখতে পাবে, কাসেমের নিষ্ঠুরতার নমুনা।

—তার মানে?

আজকে শেষ রাত্তিরে আমরা বেরুবো। গুপ্তচর খবর নিয়ে এসেছে এইমাত্র—মস্তবড় একটা ক্যারাভান (মরুপথের যাত্রীদল) এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূর দিয়ে যাবে।

—ক্যারাভ্যান?

—হ্যাঁ। ব্যবসায়ীদের ক্যারাভ্যান। দামী-দামী মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মোহর, সোনার গয়নাগাঁটি এসব তো রয়েইছে। ক্যারাভ্যানে তো শুধু ব্যবসায়ীরাই যায় না—অন্য লোকেরাও যায় তাদের পরিবারের লোকজন নিয়ে। দল বেঁধে গেলে ভয় কম।

—তোমরা ক্যারাভ্যান লুঠ করবে?

—সর্দারের হুকুম। কথাটা বলেই ফজল গলা চড়িয়ে অন্য কথা বলতে শুরু করল—শুনেছি তোমাদের দেশে নাকি বরফ পড়ে—আমরা বরফ কোনদিন চোখেও দেখিনি। ফ্রান্সিস কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। তবে অনুমান করলো কাউকে দেখেই ফজল অন্য কথা বলতে শুরু করেছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল খেজুর গাছের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এল। কাসেম! কাসেম গম্ভীর গলায় বলল—ফজল, শেষ রাত্তিরে বেরুতে হবে—ঘুমিয়ে নাও গে যাও।

—হ্যাঁ এই যাচ্ছি। ফজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। চলে যেতে-যেতে গলা চড়িয়ে বলল—তাহলে ঐ কথাই রইল—তুমি ওখান থেকে বরফ চালান দেবে, বদলে আমি এখান থেকে বালি চালান দেবো।

কাসেম এবার কুৎসিত মুখে হাসলো—এই সাদা ভিনদেশী—তুইও যাবি সঙ্গে।

ফ্রান্সিসের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। কথা বলার কি ভঙ্গী! কিন্তু ও চুপ করে রইল। শরীর দুর্বল। এখন আশ্রয়ের প্রয়োজন খুবই, চটাচটি করলে নিজেরই ক্ষতি। সময় আসুক। অপমানের শোধ তুলবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। পেছনে শুনল কাসেমের বীভৎস হাসি —'ওঃ শাহজাদার গোঁসা হয়েছে—হা—হা।'

মরুদস্যুর দল ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। শেষ রাত্রির আকাশটা কেমন ঘোলাটে। তারাগুলো অস্পষ্ট। একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া বইছে। ফ্রান্সিস উটের লোমের কম্বল কান অব্দি তুলে দিল। কোমরে নতুন তরোয়ালটার খাপটায় হাত দিল একবার।

বালিতে ঘোড়ার ক্ষুরের অস্পষ্ট শব্দ। ঘোড়ার শ্বাস ফেলার শব্দ। মাঝে-মাঝে ঘোড়ার ডাক। মরুদস্যুর দল ছুটে চলেছে। কাসেমের চীৎকার শোনা গেল—আরো জোরে। ফ্রান্সিস ঘোড়ার রাশ অনেকটা আলগা করে দিল। ঘোড়ার পেটে পা ঠুকলো। সকলেই ঘোড়ার চলা গতি বাড়িয়ে দিল।

পূবের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই লাল টকটকে সূর্য উঠল। তারপর নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ল ধুধু বালির প্রান্তরে। সেই আলোয় হঠাৎ দূরে দাখা গেল —একটা আঁকাবাঁকা সচল রেখা। ক্যারাভ্যান চলেছে। কাশেমের উল্লসিত উচ্চস্বর শোনা গেল—আরো জোরে।

বিদ্যুৎগতিতে ধুলোর ঝড় তুলে মরুদস্যুর দল ছুটলো ক্যারাভ্যান লক্ষ্য করে। একটু পরেই দেখা গেল ক্যারাভ্যানের আঁকাবাঁকা রেখাটা ভেঙে গেল। ওরা মরুদস্যুর লোকদের দেখতে পেয়েছে। যেদিকে পারছে ছুটছে। কিন্তু মালপত্র আর সওয়ারী পিঠে নিয়ে উটগুলো আর কত জোরে ছুটবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মরুদস্যুর দল ওদের দু'দিক থেকে ঘিরে ধরল। সকালের আকাশটা ভরে উঠল নারী আর শিশুদের ভয়ার্ত চিৎকারে।

শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। ক্যারাভ্যানের ব্যবসায়ীরা কিছু ভাড়াকরা পাহারাদার নিয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই লড়াই শুরু হল প্রথমে। উটের পিঠে কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া ছইগুলো থেকে ভেসে আসতে লাগল ভয়ার্ত কান্নার চিৎকার। কিন্তু সেদিকে কারো কান নেই। সকালের

আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তরোয়ালের ফলা। তারপর তরোয়ালের সঙ্গে তরোয়ালের ঠোকাঠুকি মুমূর্ষুদের চীৎকার, গোঙানি।

ফ্রান্সিস একপাশে ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে যুদ্ধ দেখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যারাভ্যানের প্রহরীরা প্রায় সবাই বালির উপর লুটিয়ে পড়ল।

এমন সময় ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে আরো কয়েকজন তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখল তার মধ্যে একটি কিশোর ছেলে। ছেলেটি অদ্ভূত দক্ষতার সঙ্গে তরোয়াল চালাতে লাগল। পাঁচ-ছয়জন মরুদস্যু ওকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারছে না কেউ! ছেলেটির তরোয়াল চালানোর নিপুণ ভঙ্গী আর দুর্জয় সাহস দেখে ফ্রান্সিস মনে-মনে তার তারিফ না করে পারল না। যারা ওকে ঘিরে ধরেছিল তাদেরই দু'জন রক্তাক্ত শরীরে পালিয়ে এল। ছেলেটি তখনও অক্ষত। সবিক্রমে তরোয়াল চালাচ্ছে। কিশোর ছেলেটিকে দেখে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল, নিজের ছোট ভাইটির কথা। তার ভাইটিও এমনি তেজী, এমনি নির্ভীক।

এবার আট-দশজন মরুদস্যু ছেলেটিকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে ওদের বার বার হার স্বীকার করতে হল।

হঠাৎ দেখা গেল, কাসেম ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল কাসেমের নিশ্চয়, কোন কুমতলব আছে। লড়াই তখন শেষ। ক্যারাভ্যানের দলের মাত্র কয়েকজন পুরুষ তখনও কোনরকমে টিকে আছে। বাকী সবাই মৃত নয় তো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। রয়েছে শুধু নারী আর শিশুরা। কাজেই লুঠতরাজ চালাতে এখন আর কোন বাধাই নেই। কিন্তু কাসেমের মতলব বোধহয় কাউকেই বেঁচে থাকতে দেবে না। ফ্রান্সিস ঘোড়াটা চালিয়ে নিয়ে একটু এগিয়ে দাঁড়ালো।

কাসেম তক্কে-তক্কে রইল। ছেলেটি তখন ঘোড়ার মুখ উল্টোদিকে ফিরিয়ে অন্য দস্যু ক'টার সঙ্গে লড়াই চালাতে লাগল। কাসেম যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে নিচু হয়ে ছেলেটির ঘোড়ার পেটের দিকে জিনের চামড়াটায় তরোয়াল চালাল। জিনটা কেটে দু'টুকরো হয়ে গেল। ছেলেটি জিনসুদ্ধ হুড়মুড় করে গড়িয়ে বালির ওপর পড়ে গেল। ঘোড়ার গা থেকে রক্ত ছিটকে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। ছেলেটি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কাসেম অট্টহাসি হেসে উঠল। ওর কুৎসিত মুখটা আরো বীভৎস হয়ে উঠল। এবার অন্য দস্যুগুলো ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু কাসেমের ইঙ্গিতে থেমে গেল।

ফ্রান্সিস বুঝল—কাসেমের নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক অভিসন্ধি আছে। ঠিক তাই। কাসেম নিজের ঘোড়াটাকে ছেলেটির কাছে নিয়ে গেল। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়াল। ছেলেটির সর্বাঙ্গে রক্তের ছোপ। সে বেশ ক্লান্ত এটাও বোজা যাচ্ছে। কিন্তু মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাসেম নিচু হয়ে তরোয়ালের ডগায় বালি তুলে ছেলেটির চোখে মুখে ছিটোতে লাগল। দস্যুদলের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল। ওরা ছেলেটিকে চারদিক থেকে ঘিরে মজা দেখতে লাগল। একসময় অনেকটা বালি ছেলেটির চোখে ঢুকে পড়ল। সে বাঁ হাতে চোখ রগড়াতে লাগল। কিন্তু হাতের তলোয়ার ফেলল না ঠিক তখনই বালিতে প্রায় অন্ধ ছেলেটির মাথা লক্ষ্য করে কাসেম তরোয়াল তুললো। ফ্রান্সিস আর সহ্য করতে পারল না। বিদ্যুৎবেগে ঘোড়াটাকে কাসেমের সামনে নিয়ে এল! কাসেম কিছু বোঝবার আগেই কাসেমের উদ্যত তরোয়ালটায় আঘাত করল। আগুনের ফুলকি ছুটল। বেকায়দায় তরোয়াল চালিয়ে ছিল ফ্রান্সিস। তাই মুঠি আলগা হয়ে ওর তরোয়ালটা ছিটকে পড়ে গেল। কাসেম তীব্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর দাঁতে-দাঁত ঘষে গর্জে উঠল—কাফের। তারপরেই ছুটল

ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস বিপদ গুনলো। কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে আসছে। ফ্রান্সিসের সাধ্য নেই, খালি হাতে ওকে বাধা দেয়।

—ফ্রান্সিস! চাপাস্বরে কে ডাকল। ফ্রান্সিস দ্রুত ঘুরে তাকাল। ফজল! ফজল ওর তরোয়ালটা এগিয়ে দিল। তরোয়ালটা হাতে পেয়েই ফ্রান্সিস কাসেমের প্রথম আঘাতটা সামলাল। কাসেম আবার তরোয়াল তুলল। ঠিক তখনই সর্দারের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কাসেম ভুলে যেও না, আমরা লুঠ করতে এসেছি।'

কাসেম উদ্যত তরবারি নামাল। শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেল। দু'জনে কি কথা হল। কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে ক্যারাভ্যানের দিকে ইঙ্গিত করল। কি হয় দেখবার জন্যে মরুদস্যুরা এতক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করছিল। সেই স্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেঙে গেল তাদের চীৎকারে। সবাই চিৎকার করতে করতে ছুটল ক্যারাভ্যানের দিকে। তারপর পৈশাচিক উল্লাসে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যারাভ্যানের ওপর। আবার আর্তচীৎকার কান্নার রোল উঠল। অবাধ লুঠতরাজ চলল।

এবার ফেরার পালা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলোর ওপর দিয়েই দস্যুর দল ঘোড়া ছোটাল। ফ্রান্সিস অতটা অমানুষ হতে পারল না। অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখল সেই ছেলেটি মাটিতে হাঁটু গেড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফ্রান্সিস একবার ভাবল নেমে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু উপায় নেই। মরূদস্যুর দল অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস ঘোড়া ছুটিয়ে দলের সঙ্গে এসে মিশল। ওরা যখন সেই মরুদ্যানে ফিরে এল তখন সূর্য মাথার ওপরে। চারদিকে বালির ওপর দিয়ে আগুনের হল্কা ছুটছে যেন।

বিকেলে খেজুর গাছটার তলায় ফজলের সঙ্গে দেখা হল। ফজল বললো

—অতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচালে তুমি ভাই।

—কেন?

—তোমার কাছে বাধা পেয়েই তো কাসেম আর এগোতে সাহস করেনি।

—তা না হলে কি করতো?

—সব ক'জনকে মেরে ফেল্‌তো।

—সে কি! মেয়ে বাচ্চাগুলো—ওরা তো নিরপরাধ।

—কাসেমের নিষ্ঠুরতার পরিমাণ করতে পারবে না! জাহান্নামেও ওর ঠাঁই হবে না।

—হুঁ।

—ও কিন্তু তোমাকে সহজে ছাড়বে না। সাবধানে থেকো।

—ও আমার কি করবে?

—জানো না তো ভাই, দলের কেউ ওকে ঘাঁটাতে সাহস করে না; এমন কি সর্দারও না। হঠাৎ পেছনে কাকে দেখে ফজল থেমে গেল। কাসেম নয়। দস্যু দলের একজন। কাছে এসে ফ্রান্সিসকে ডাকল—এই ভিনদেশী—তোমাকে সর্দার এত্তেলা পাঠিয়েছেন।

—চলো, ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকটার সঙ্গে তাঁবুর দিকে চলল।

একটা মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় সর্দার রূপোর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিল। ফ্রান্সিস গিয়ে দাঁড়াতে নল থেকে মুখ না তুলে ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললো। জাজিমপাতা ফরাসের ওপর বসতে গিয়ে ফ্রান্সিস দেখল, কাসেমও একপাশে বসে আছে। কাসেম তীব্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকাল। পরক্ষণেই যেন প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। এতক্ষণে সর্দার কেশে নিয়ে ডাকল—ফ্রান্সিস।

—বলুন।

—তুমি বিদেশী—আমাদের রীতিনীতি তোমার জানবার কথা নয়। তুমি আজকে যা করেছ, অন্য কেউ হলে তাকে এতক্ষণে বালিতে পুঁতে ফেলা হত।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সর্দার বললো—কাশেম তুমি ওর সঙ্গে লড়তে রাজি আছ?

কাসেম সঙ্গে-সঙ্গে খাপ থেকে একটানে তরবারিটা বের করে বললো—এক্ষুণি।

সর্দার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল—তুমি?

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি রাজী।

—হুঁ। সর্দার গড়গড়ার নলটা মুখে দিল। কয়েকবার টানল। তারপর বলল—রাত্তিরে তোমাকে ডেকে পাঠানো হবে। তৈরী হয়ে আসবে।

* * *

বালিতে কয়েকটা মশাল পুঁতে রাখা হয়েছে। চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে মরুদস্যুদলের লোকেরা। পরিষ্কার আকাশে লক্ষ-তারার ভিড়। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বালিতে ফুটফুটে চাঁদের আলো।

ফ্রান্সিসকে আসতে দেখে মরু-দস্যুদলের ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ওরা ভিড় সরিয়ে পথ করে দিল। ফ্রান্সিস সহজ ভঙ্গিতে ভিড়ের মাঝখানকার ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। একদিকে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তার নিচে সর্দার বসে আছে। সেদিকে দাঁড়িয়ে আছে কাসেম। হাতে খোলা তরোয়ালে মশালের আলো পড়ে চক-চক করছে। মশালের আলো কাঁপছে তার টকটকে লাল আলখাল্লায়। ওকে দেখতে আরো বীভৎস লাগছে। ফ্রান্সিস তখনও খাপ থেকে তরোয়াল খোলেনি।

ফজলকে ডেকে সর্দার কি যেন বলল। ফজল কাসেমকে ফাঁকা জায়গার মাঝখানে এগিয়ে আসতে বলল। ফ্রান্সিসকেও ডাকল। ফ্রান্সিস এবার তরোয়াল খুলল। তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে কাসেমের মুখোমুখি দাঁড়াল। সর্দার হাততালি দিয়ে কি একটা ইঙ্গিত করতেই কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই অতর্কিত আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কাসেমের তরোয়ালের আঘাত ঠেকাল বটে, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে বালির ওপর বসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে থেকে হাসির হররা উঠল। আবার কাসেম তরোয়াল চালাল। এবারও একই ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস কাসেমের তরোয়ালের ঘা থেকে আত্মরক্ষা করল। তারপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে কাসেমকে লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। শুরু হল দু'জনের লড়াই। বিদ্যুৎগতিতেই দু'জনের তরোয়াল ঘুরছে। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় চকচক করছে তরোয়ালের ফলা। ঠং-ঠং ধাতব শব্দ উঠছে তরোয়ালের ঠোকাঠুকিতে।

কাসেম তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মরুদস্যুর দল দেখতে লাগল এই তরোয়ালের লড়াই। কেউ কম যায় না। দুজনেরই ঘন-ঘন শ্বাস পড়তে লাগল। কপালে ঘামের রেখা ফুটে উঠল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের একটা প্রচণ্ড আঘাত সামলাতে না পেরে বালিতে কাসেমের পা সরে গেল। কাসেম কাত হয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তরোয়াল চালাল। কাসেম মরীয়া হয়ে সে আঘাত ফেরাল। কিন্তু মুঠি আলগা হয়ে তরোয়াল ছিটকে পড়ল একটু দূরে। কাসেম চিৎ হয়ে বালিতে পড়ে গেল, ফ্রান্সিস তরোয়াল নামিয়ে কাসেমের দিকে তাকাল। কাসেমের চোখে মৃত্যুভীতি। মুখ হাঁ করে সে শ্বাস নিচ্ছে তখন। ফ্রান্সিসও হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালের ছুঁচলো ডগাটা কাসেমের লাল আলখাল্লায় বিঁধিয়ে একটা টান দিল। লাল আলখাল্লাটা দু'ফালি হয়ে গেল। বুকের অনেকটা জায়গা কেটেও গেল, রক্তে ভিজে উঠল আলখাল্লাটা। মরুদস্যুদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। কোনদিকে না তাকিয়ে ফ্রান্সিস চলল সর্দারের কাছে। ও তো জানে এ রকম দু'জনের মধ্যে তরোয়ালের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বেদুইনদের রীতি কী? সর্দার যা বলবে তাই সে করবে।

'ফ্রান্সিস!' ফজলের অস্পষ্ট সতর্ক কণ্ঠস্বর শুনে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। খোলা গা, উদ্যত তরোয়াল হাতে কাসেম ছুটে আস। ঠিক ওর মাথার ওপর কাসেমের তরোয়াল। পলকমাত্র সময় হাতে। ফ্রান্সিস উবু হয়ে মাটিতে বসে পড়ল। কাসেমের তরোয়াল নামল। বাঁ কাঁধে একটা তীব্র যন্ত্রণা। তরোয়ালের ঘা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফ্রান্সিসের কাঁধ ছুঁয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল কাঁধ থেকে। রক্ত দেখে ফ্রান্সিসের মাথায় খুন চেপে গেল। কাপুরুষ! ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কাসেমের ওপর। কাঁধের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে আঘাতের পর আঘাত হানল। কাসেম সেই তীব্র আক্রমণের সামনে অসহায় হয়ে পড়ল। পিছিয়ে যেতে-যেতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না সেই আক্রমণের মুখে। তার হাত অবশ হয়ে এল। উপর্যুপরি কয়েকবার আঘাত হেনে সুযোগ বুঝে ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল চালাল কাসেমের বুক লক্ষ্য করে। কাসেমের গলা দিয়ে শুধু একটা কাতরধ্বনি উঠল। পরক্ষণেই সে বালির ওপর লুটিয়ে পড়ল। বুকে বেঁধা তরোয়ালটা টেনে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর শরীর স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে তখনও হাঁপাচ্ছে।

তরোয়াল যুদ্ধের এই ফলাফল দস্যুদলের কেউই আশা করেনি। কারণ, এর আগে কাসেমের সঙ্গে তরোয়ালের যুদ্ধে হেরে গিয়ে অনেককেই তারা মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে। তরোয়াল যুদ্ধে কাসেম ছিল অজেয়। সেই কাসেম আজ একজন ভিনদেশীর কাছে শুধু হার স্বীকার করা নয়, একেবারে মৃত্যুবরণ করবে, এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দস্যুদলে কাসেমের অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল না। তারা দল বেঁধে খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে গেল। ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল তারা, কিন্তু ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করবার আগেই সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল, তারপর ধীর পায়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল।

কাঁধের যন্ত্রণাটা অনেকখানি কমেছে। একটু আগে সর্দার একজন লোক পাঠিয়েছিল। এই দলে হেকিমের কাজ করে লোকটা। কি একটা কালো আঠার মত ওষুধ ক্ষতস্থানে লাগিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হল। একটু পরে ব্যথাটা কমতে শুরু করল। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। অনেক রাত পর্যন্ত ও জেগে রইল। দেশ ছেড়েছে কতদিন হয়ে গেল, তারপর জাহাজে নাবিকের জীবন 'বন্ধু জ্যাকব' জাহাজডুবি, সোনার ঘণ্টার ঢং-ঢং শব্দ, আর আজ কোথায় এসে পড়েছে। নাঃ, এখন থেকে পালাতে হবে। ছেলেবেলা থেকে

যে সোনার ঘণ্টার স্বপ্ন ও দেখেছে, তার হদিশ পেতেই হবে। ভাবতে-ভাবতে কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকারে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল! কে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। ফ্রান্সিস কান পেতে রইল। আবার চীৎকার। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল।

ভোর হয়—হয়, সূর্য উঠতে আর দেরি নেই। আবছা আলোয় ফ্রান্সিস দেখল—চার-পাঁচজন ঘোড়সওয়ার দস্যু কাকে যেন দড়িতে হাত বেঁধে বালির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলছে। লোকটা হাতে বাঁধা দড়িটা টানছে। কাকুতি-মিনতি করছে। ফ্রান্সিস সেই আবছা আলোতেও চিনল। লোকটা আর কেউ না—ফজল। কিন্তু ফজলকে ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে? হঠাৎ ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করল। ফজল বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। পৈশাচিক আনন্দে ওরা ফজলকে বালির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

এমন সময় একজন দস্যু মাথার ওপর তরোয়াল তুলল দড়িটা কাটবার জন্য।

ফ্রান্সিস বুঝতে পারল—ফজল ওকে সাহায্য করেছে—প্রাণে বাঁচিয়েছে। সেই অপরাধের শাস্তিটা ওকে পেতে হচ্ছে। ও আর দাঁড়াল না। যে করেই হোক ফজলকে বাঁচাতে হবে! তাঁবুতে ফিরে এসে পোশাক পরে নিল! কোমরে তরোয়াল বাঁধলো। তারপর নিঃসাড়ে খেজুর গাছে বাঁধা ঘোড়াটাকে খুলে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। নিজে চলল ঘোড়াটার আড়ালে। জলাশয়ের ওপাশ দিয়ে কিছুটা এগোতেই একটা উঁচু বালিয়াড়ির পেছনে মরূদ্যানটা আড়াল পড়তে ঘোড়ার পিঠে উঠে বালি উড়িয়ে ঘোড়া ছোটাল।

সূর্য উঠল। সকালের রোদে তেজ কম। তাই ফ্রান্সিসের পরিশ্রম হচ্ছিল কম। বেশী দূর যেতে হল না। ফ্রান্সিস দেখল—একটা নিঃসঙ্গী খেজুর গাছে ফজলের হাত বাঁধা দড়িটার একটা কোণা বাঁধা রয়েছে। আর ফজলকে ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফজলের হাত বাঁধা। পা ছুঁড়ে নানাভাবে ও বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে পারবে কেন? ফ্রান্সিস ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দস্যুগুলোর কাছাকাছি আসতেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ও শিউরে উঠল! কি সাংঘাতিক! ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। চোরাবালিতে আটকে গেলেই গাছের সঙ্গে বাঁধা ফজলের হাতের দড়িটা কেটে দেবে। ফ্রান্সিসের অনুমানই সত্যি হল। ফজলের একটা মর্মান্তিক চীৎকার ওর কানে এল। দেখল—ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে দিয়েছে। ফজল প্রাণপণ শক্তিতে গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টেনে ধরে চোরাবালি থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে। এমন সময় একজন

দস্যু মাথার ওপর তরোয়াল তুললো দড়িটা কাটবার জন্যে। এক মুহূর্ত। দড়িটা কেটে গেলে ফজল চোরাবালির অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। ওর চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফ্রান্সিস উল্কার বেগে ঘোড়া ছোটাল। তারপর চলন্ত ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে সেই দস্যুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দড়ি আর কাটা হল না। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। শুধু ডান হাতেই তাকে টানতে হচ্ছিল। কারণ বাঁ হাতটা তখনও প্রায় অবশ হয়ে আছে। দুটো তিনটে হ্যাঁচকা টান মারতেই ফজল চোরাবালির গহ্বর থেকে শক্ত বালিতে উঠে এল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বালিতে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণের শারীরিক নির্যাতন, তার ওপর এই মৃত্যুর বিভীষিকা, এই সবকিছু তার দেহমনের শেষ শক্তিটুকু শুষে নিয়েছিল।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল। দস্যুর দল কি করবে, বুঝে উঠতে পারল না। ফজলকে চোরাবালি থেকে উঠে আসতে দেখে ওদের টনক নড়ল। এবার ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস একবার চারদিক থেকে ঘিরে ধরা দস্যুদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চীৎকার করে বলে উঠল—ফজল আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। যে ওর গায়ে হাত দেবে, আমি তাকে দু'টুকরো করো করে ফেলব।

ফ্রান্সিসের সেই ক্রোধোন্মত্ত চেহারা দেখে দস্যুর দল বেশ ঘাবড়ে গেল। এটা যে ফ্রান্সিসের শূন্য আস্ফালন নয়, সেটা ওরা বুঝল। গত রাত্রে তার প্রমাণও পেয়েছে ওরা। কাজেই ফ্রান্সিসকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করল না। নিজেদের মধ্যে ওরা কী যেন বলাবলি করল। তারপর ঘোড়া ছোটালো সেই মরূদ্যানের দিকে। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুতপায়ে ফজলের কাছে এল। জলের পাত্রটা খুলে ফজলের চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিল। ফজল দু'একবার চোখ পিটপিট করে ভালো ভাবে তাকাল। মুখ হাঁ করে জল খেতে চাইল। ফ্রান্সিস ওর মুখে আস্তে-আস্তে জল ঢেলে দিতে লাগল। জল খেয়ে ফজল যেন একটু সুস্থ হল। ফ্রান্সিস ওর হাতের দড়িটা কেটে দিল। তারপর ডাকল—ফজল।

ফজল ম্লান হাসল। ফ্রান্সিস বললো—চলো—ঘোড়ায় বসতে পারবে তো?

ফজল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফ্রান্সিস ওকে ধরেধরে কোনরকমে ঠেলেঠুলে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিল। তারপর নিজে লাফিয়ে উঠে পেছনে বসল। আর সময় নষ্ট না করে ঘোড়া ছোটাল। এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে হবে। বলা যায় না, হয়তো দলে ভারী হয়ে ওরা এখানে আসতে পারে। হলোও তাই। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে দেখল—বালির দিগন্ত রেখায় কালো বিন্দুর মত কালো ঘোড়সওয়ার দস্যুর দল ছুটে আসছে।

ফজল এতক্ষণে যেন গায়ে জোর পেল। ও একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল।

—তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে ভাই।

ফ্রান্সিস হেসে বললো, এখনও আমাদের প্রাণের ভয় যায় নি ফজল।

—কেন?

—পেছনে তাকিয়ে দেখ।

ফজল ফিরে তাকাল। ধুলো উড়িয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে মরুদস্যুর দল। একে অসুস্থ ফজলকে ধরে রাখতে হচ্ছে, তার ওপর কাঁধের কাটা জায়গাটার যন্ত্রণা। ফ্রান্সিস খুব জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারছিল না। ক্রমেই মরুদস্যুদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান কমে আসছিল।

—ফ্রান্সিস; ফজল ডাকল।

—হুঁ—

—সামনের ঐ যে পাহাড়ের মত একটা বালির ঢিবি দেখছো?

—হ্যাঁ।

—ঐ ঢিবিটার ও'পাশেই একটা মরূদ্যান আছে।

—ওখানেই যাবে?

—না . . . না। ঐ ঢিবিটার আড়ালে আড়ালে আমরা ডানদিকে বাঁক নেব।

—কিন্তু—

—এ-ছাড়া বাঁচবার কোন পথ নেই। ওরা ধরেই নেবে আমরা নিশ্চয়ই ঐ মরূদ্যানে আশ্রয় নেব, কারণ আমরা দু'জনেই অসুস্থ—বেশীদূর যেতে পারবো না।

—তা ঠিক।

—কাজেই আমাদের আশ্রয়ের জন্যে অন্য কোথাও যেতে হবে।

—কোথায় যাবে সেটা বলো—

—ডানদিকে মাইল কয়েক গেলেই আমদাদ শহর। একবার ঐ শহরে ঢুকতে পারলে তোমার আর কোন ভয় নেই।

—কেন?

—ওরা অনেকেই দাগী দস্যু—সুলতানের সৈন্যরা চিনে ফেলবে, এইজন্যে ওরা আমদাদ শহরে ঢুকবে না।

—কিন্তু তুমি?

—আমি আর কোথাও আস্তানা খুঁজে নেব।

কথা বলতে-বলতে ওরা পাহাড়ের মত উঁচু বালির ঢিবিটার আড়াল দিয়েদিয়ে ঘোড়া ছোটাল। অনেকদূর পর্যন্ত আড়াল পেল ওরা। এক সময় ঢিবিটা শেষ হয়ে গেল। সামনে অনেক দূরে দেখা গেল হলদে-সাদা রঙের লম্বা প্রাচীর। ফজল বলল—এই হচ্ছে আমদাদ শহর। আর ভয় নেই।

ফ্রান্সিস পেছনে তাকাল। ধু-ধু বালি। মরুদস্যুর চিহ্নমাত্র নেই।

আমদাদ শহরের প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছল ওরা। ফ্রান্সিস দেখল—শহরের পশ্চিমদিকে তামাটে রঙের পাথরের একটা পাহাড়। ফজল আঙুল দিয়ে পাহাড়টা দেখিয়ে বলল—ঐ পাহাড়ের নীচেই সুলতানের প্রাসাদ। আর পাহাড়ের ও'পাশে সমুদ্র।

—সমুদ্র? —ফ্রান্সিস অবাক হল।

—হ্যাঁ, কেন বল তো?

—জাহাজডুবি হয়ে ভাসতে-ভাসতে ঐ সমুদ্রের ধারেই এসে ঠেকেছিলাম। যদি সমুদ্রের ধারে ধারে পশ্চিমদিকে যেতাম, তাহলে আগেই এই শহরে এসে পৌঁছতাম।

—তুমি তাহলে উলটোদিকে গিয়েছিলে—মরুভূমির দিকে।

গম্বুজঅলা শহরের তোরণ। কাছাকাছি আসতেই ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা নজরে পড়ল। উটের পিঠে, ঘোড়ায় চড়ে শহরে লোকজন ঢুকছে, বেরোচ্ছে। ফজল বলল—এবার ঘোড়া থামাও —আমি এখান থেকে অন্যদিকে চলে যাব।

ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল।

—ফ্রান্সিস? —ফজল ডাকল।

—হুঁ।

—তোমার তরোয়ালটা আমাকে দাও। ওপরের জামাটাও খুলে দাও।

—কেন? ফ্রান্সিস একটু অবাক হলো।

—এই পোশাক আর তরোয়াল নিয়ে শহরে ঢুকলে বিপদে পড়বে। এসব মরুদস্যুদের পোশাক। সুলতানের সৈন্যরা তোমাকে দেখলেই গ্রেফতার করবে। আর ভাই কিছু মনে করো না—তোমার ঘোড়াটা আমি নেব। কোথাও আশ্রয় তো নিতে হবে আমাকে।

—বেশ তো।

—আর একটা কথা।

—বলো।

—শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ, মদিনা মসজিদ। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। মদিনা মসজিদের বাঁ পাশের গলিতে কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে মীর্জা হেকিমের বাড়ি। দেখা করে বলো— ফজল পাঠিয়েছে। বিনা খরচে তোমার জখমের চিকিৎসা হয়ে যাবে।

—সে হবে'খন কিন্তু তোমার জন্যে—

—আমার জন্যে ভেবো না। হ্যাঁ, ভালো কথা, ফজল কোমর বন্ধনীর মধ্যে থেকে একটা ছোট সবুজ রঙের রুমাল বের করল। রুমালের গিট খুলে দু'টো মোহর বের করল। বলল—জানো ভাই, এই মোহর দু'টোর পেছনে ইতিহাস আছে। আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষ বিরাট এক মরুদস্যুদলের সর্দার ছিল। একটা ক্যারাভ্যান লুঠ করতে গিয়ে সে এই মোহর দুটো পেয়েছিল। কিন্তু মজার কথা কি জানো। শুনেছি যে লোকটার কাছে মোহর দুটো ছিল, সে কিন্তু বণিক বা ব্যবসায়ী ছিল না।

—তবে?

—তার পরনে নাকি ছিল পাদরীর পোশাক।

—পাদ্রী? ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

—হ্যাঁ— তোমাদের ওদিককার লোকই ছিল সে। দাড়ি গোঁফ—কালো জোব্বা পরনে। গলায় চেন বাঁধা ক্রুশ।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছো—পাদ্রীই ছিল সে।

—কাণ্ড দেখ— ধর্ম-কর্ম করে বেড়ায়, তার কাছে সোনার মোহর।

—তারপর?

—তারপর থেকে মোহর দুটো বারবার পুরুষানুক্রমে আমাদের কাছেই ছিল। সবশেষে আমার হাতে এসে পড়ে। যাকগে—মোহর দুটো তুমিই নাও।

—না—না।

—ফ্রান্সিস —তুমি তো ঐ দেশেরই মানুষ। ডাকাতি করে পাওয়া জিনিস তুমি নিলে আমাদের পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

মোহর দুটো হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস উলটে-পালটে দেখল। একদিকে একটা আবছা মাথার ছাপ। অন্যদিকে আঁকা-বাঁকা রেখাময় নকশার মত কি যেন খোদাই করা। ফ্রান্সিস কোমরবন্ধনী একটু সরিয়ে মোহর দুটো রেখে দিল।

ঘোড়া থেকে নামল দুজনে। ফ্রান্সিস ওর তরোয়াল আর ওপরের জামা খুলে দিল। হঠাৎ আবেগকম্পিত হাতে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল ফজল। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। বোধহয় ফ্রান্সিসের কল্যাণ কামনা করলো। বিদায় জানিয়ে ফজল উঠল ঘোড়ার পিঠে। তারপর মরুভূমির দিকে ঘোড়া ছোটাল। ফজলের কথা ভেবে ফ্রান্সিসের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে ধীর-পায়ে হাঁটিতে-হাঁটিতে তোরণ পেরিয়ে আমদাদ শহরে ঢুকল। তারপর শহরের মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

আমদাদ শহরটা নেহাৎ ছোট নয়। ফ্রান্সিস বেশিক্ষণ ঘুরতে পারল না। কাঁধটা ভীষণ টনটন করছে। ব্যথাটা কমানো দরকার। ফ্রান্সিস খুঁজে-খুঁজে মীর্জা হেকিমের বাড়িটা বের করল। দেউড়িতে পাহারাদার ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস অনুরোধ করল—ভাই আমি অসুস্থ, চিকিৎসার জন্যে এসেছি।

—সবাই এখানে চিকিৎসার জন্যেই আসে। গম্ভীর গলায় পাহারাদার বলল—আগে হেকিম সাহেবের পাওনা জমা দাও—তারপর।

—আমি গরীব মানুষ—

—তাহলে ভাগো— পাহারাদার চেঁচিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস পাহারাদারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল। লোকটা আঁতকে উঠল। কান কামড়ে দেবে নাকি? ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—হেকিম সাহেবকে বলো গে—একজন রোগী এসেছে—ফজল আলি পাঠিয়েছে।

—ফজল আলি কে?

—সে তুমি চিনবে না। তুমি গিয়ে শুধু এই কথাটা বলো।

—বেশ। পাহারাদার চলে গেল। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি বলল—কি মুশকিল আগে বলবে তো ভাই। আমার চাকরি চলে যাবে। শীগগির যাও—হেকিম সাহেব তোমাকে ডাকছে।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে ভেতরে ঢুকল। কার্পেট পাতা মেঝে। ঘরের মাঝখানে ফরাস পাতা। তার ওপর হেকিম সাহেব বসে আছেন। বেশ বয়েস হয়েছে। চুল, ভুরু তুলোর মত সাদা। কানে কম শোনেন। কয়েকজন রোগী ঘরে ছিল। তাদের বিদায় করে ফ্রান্সিসকে ডাকলেন। ফ্রান্সিস সব কথাই বলল। মাথাটা এগিয়ে সব কথা শুনে জামাটা খুলে ফেলতে বললেন। ক্ষতস্থানটা দেখলেন। তারপর একটা কাঁচের বোয়াম থেকে ওষুধ বের করে লাগিয়ে দিলেন। একটা পট্টিও বেঁধে দিলেন। বললেন— দিন সাতেকের মধ্যেই সেরে যাবে। ফ্রান্সিস কোমরে গোঁজা থলি থেকে একটা মোহর বের করল। তাই দেখে হেকিম সাহেব হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—না—না কিছু দিতে হবে না।

হেকিম সাহেবের বাড়ি থেকে ফ্রান্সিস এবার আমদাদ শহর ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। দেখার জিনিস তো কতই আছে। সব কি আর একদিনে দেখা যায়? সুলতানের শ্বেতপাথরের তৈরী প্রাসাদ, প্রাসাদের পিছনে সমুদ্রের ধারে খাড়া পাহাড়ের গায়ে দুর্গ, মন্ত্রীর বাড়ি, বিরাট ফুল বাগিচা, বাজার-হাট এসব দেখা হল। বেড়াতে-বেড়াতে খিদে পেয়ে গেল খুব। কিন্তু খাবে কি করে? খাবারের দোকানে তো আর মোহর নেবে না। সুলতানী মুদ্রাও তো সঙ্গে কিছু নেই। ফ্রান্সিস একটা সোনা-রূপো দোকান খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল।

শুঁটকে চেহারার দোকানী খুব মনোযোগ দিয়ে পাথরে মোহরটা বারকয়েক ঘষল। তারপর জিজ্ঞেস করলে—এ সব মোহর তো এখানে পাওয়া যায় না—আসল জিনিষ। আপনি পেলেন কোথায়?

—ব্যবসার ধান্ধায় কত জায়গায় যেতে হয়।

—তা তো বটেই। যাকগে—আমি আপনাকে পাঁচশো মুদ্রা দিতে পারি।

—বেশ তাই দিন।

শুঁটকে চেহারার দোকানীটা মনে মনে ভীষণ খুশী হল। খুব দাঁও মারা গেছে। অর্ধেকের কম দামে মোহরটা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস কিন্তু ক্ষতির কথা ভাবছিল না। খিদেয় পেট জ্বলছে। কিছু না খেলেই নয়। সুলতানী মুদ্রা তো পাওয়া গেল। এবার খাবারের দোকান খুঁজে দেখতে হয়। খুব বেশী দূর যেতে হল না। বাজারটার মোড়েই জমজমাট

খাবারের দোকান। শিক কাবাবের গন্ধ নাকে যেতেই ফ্রান্সিসের খিদে দ্বিগুণ বেড়ে গেল। খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোগ্রাসে গিলতে লাগল। যেভাবে ও খেতে লাগল তা দেখে যে কেউ বুঝে নিতো, ওর রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে। ব্যাপারটা একজনের নজরেও পড়ল। সেই লোকটা অন্য জায়গায় বসে খাচ্ছিল।

এবার ফ্রান্সিসের সামনে এসে লোকটি বসল। ফ্রান্সিস তখন হাপুস-হুপুস খেয়েই চললো। লক্ষ্যই করেনি, কেউ ওর সামনে এসে বসেছে। কাজেই লোকটা যখন প্রশ্ন করল—আপনিও বোধহয় আমার মতই বিদেশী।

ফ্রান্সিস বেশ চমকেই উঠেছিল। খেতে-খেতে মাথা নাড়ল।

—আমার নাম মকবুল হোসেন—কার্পেটের ব্যবসা করি।

—ও! ফ্রান্সিস সে কথার কোন উত্তর দিল না। খেয়ে চলল। মকবুলও চুপ করে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হয়। মকবুলের চেহারাটা বেশ নাদুসনুদুস। মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। ওর ধৈর্য দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল—একে এড়ানো মুসকিল। লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার কায়দাকানুন ওর নখদর্পণে।

খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস ঢেকুর তুলল। মকবুল এবার নড়েচড়ে বসল। হেসে বলল—আপনার খাওয়ার পরিমাণ দেখে অনেকেই মুখ টিপে হাসছিল।

—হাসুক গে। তাই বলে আমি পেট পুরে খাবো না?

—আমিও তাই বলি—মকবুল একইভাবে হেসে বলল—আপনার মত অত সুন্দর স্বাস্থ্য অটুট রাখতে গেলে এটুকু না খেলে চলবে কেন! আলবৎ খাবেন—কাউকে প'রোয়া করবেন কেন?

ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হল। এতক্ষণ মকবুল আর কোন কথা বলেনি। এবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বলল—জানেন ঠিক আপনার মত আমিও একদিন গোগ্রাসে খাবার গিলেছিলাম। কোথায় জানেন, ওঙ্গালিতে।

—ওঙ্গালি? ফ্রান্সিস কোনদিন জায়গাটার নামও শোনে নি।

—হ্যাঁ—মকবুল হাসল—ওঙ্গালির বাজার। কারণ কি জানেন? তার আগে চারদিন শুধু বুনো ফল খেয়ে ছিলাম!

—কেন?

—বেঁচে থাকতে হবে তো! হীরে তো আর খাওয়া যায় না।

—হীরে? ফ্রান্সিস অবাক হয়ে বেশ গলা চড়িয়েই বলল কথাটা।

—শ-শ-। মকবুল ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল। তারপর আর একবার চারদিক তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বলতে লাগল—এখানকার মদিনা মসজিদের গম্বুজটা দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ!

—তার চেয়েও বড়।

—বলেন কি?

—কিন্তু সব বেফরদা।

—কেন?

—আমরা তো আর জানতাম না, যে হীরেটা নাড়া খেলেই পাহাড়টায় ধ্বস নামবে?

—আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল?

—হ্যাঁ, ওঙ্গালির এক কামারকে নিয়েছিলাম হীরের যতটা পারি কেটে আনবো বলে।

—সেটা বোধহয় আর হল না।

—হবে কি করে, তার আগেই ধস নামা শুরু হয়ে গেল।

—ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন? এতক্ষণে ফ্রান্সিস উৎসুক হল। মদিনা মসজিদের গম্বুজের চেয়েও বড় হীরে। শুধু হীরে না বলে হীরের ছোটখাটো পাহাড় বলতে হয় এও কি সম্ভব?

—তাহলে একটু মুরগীর মাংস হয়ে যাক।

—বেশ! ফ্রান্সিস দোকানদারকে ডেকে আরো মুরগীর মাংস দিয়ে যেতে বললো। মাংস খেতে-খেতে মকবুল শুরু করল—কার্পেট বিক্রীর ধান্ধায় গিয়েছিলাম ওঙ্গালিতে জায়গাটা তেকরুর বন্দরের কাছে। আমার ঘোড়ায় টানা গাড়ির চাকাটা রাস্তায় পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল ভেঙে! কাজেই এক কামারের কাছে সারাতে দিলাম। এই কামারই আমাকে প্রথম সেই অদ্ভুত গল্পটা শোনাল। ওঙ্গালি থেকে মাইল পনের উত্তরে একটা পাহাড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়টার মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে একটা গুহা। দূর থেকে গাছগাছালি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গুহাটা প্রায় দেখাই যায় না। সূর্যটা আকাশে উঠতে-উঠতে যখন ঠিক গুহাটার সমান্তরালে আসে—সূর্যের আলো সরাসরি গিয়ে গুহাটায় পড়ে। তখনই দেখা যায় গুহার মুখে আর তার চারপাশের গাছের পাতায়, ডালে, ঝোপে এক অদ্ভুত আলোর খেলা। আয়না থেকে যেমন সূর্যের আলো ঠিকরে আসে—তেমনি রামধনুর রঙের মত বিচিত্র সব রঙীন আলো ঠিকরে আসে গুহাটা থেকে। অনেকেই দেখেছে এই আলোর খেলা। ধরে নিয়েছে ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা! ভূতপ্রেতকে ওরা যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। কাজেই কেউ এই রঙের খেলার কারণ জানতে ওদিকে পা বাড়াতে সাহস করে নি।

—আচ্ছা, এই আলোর খেলা কি সারাদিন দেখা যেত।

—উঁহু। সূর্যের আলোটা যতক্ষণ সরাসরি সেই গুহাটায় গিয়ে পড়তো, ততক্ষণই শুধু তারপর আবার যেই কে সেই।

—সেই কামারটা এর কারণ জানতে পেরেছিল।

—না, তবে অনুমান করেছিল। ও বলেছিল--ঐ আলো হীরে থেকে ঠিকরানো আলো না হয়েই যায় না। ও নাকি প্রথম জীবনে কিছুদিন এক জহুরীর দোকানে কাজ করেছিল। হীরের গায়ে আলো পড়লেই সেই আলো কিভাবে ঠিকরোয়, এই ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। আমি তো শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—ভেবে দেখুন—অত আলো—মানে আমি তো সেই আলো আর রঙের খেলা পরে দেখেছিলাম—মানে—ভেবে দেখুন হীরেটা কত বড় হলে অত আলো ঠিকরোয়।

তা-তো বটেই। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল! বলল—তারপর?

—তারপর বুঝলেন, একদিন তল্পিতল্পা নিয়ে আমরা তো রওনা হলাম। যে করেই হোক গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই পাহাড়টার কাছে পৌঁছে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। নীচ থেকে গুহা পর্যন্ত পাহাড়টা খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কিছু ঝোপ-ঝাড়, দু-একটা জংলী গাছ আর লম্বা-লম্বা বুনো ঘাস—এছাড়া সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে আর কিস্যু নেই। নিরেট পাথুড়ে খাড়া গা। কামার ব্যাটা বেশ ভেবেচিন্তেই এসেছে বুঝলাম। ও বললো--চলুন আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নামবো ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভব। কারণ পাহাড়টার মাথা থেকে শুরু করে গুহার মুখ অবধি, আর তার আশে-পাশে বেশ ঘন জঙ্গল। দড়ি ধরে নামা যাবে।

সন্ধ্যের আগেই পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে রইলাম। ভোরবেলা নামার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলাম। পাহাড়টার মাথায় একটা মস্ত বড় পাথরে দড়ির একটা মুখ বাঁধলাম। তারপর দড়ির অন্য মুখটা পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুলিয়ে দিলাম। দড়ি গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছল কিনা বুঝলাম না। কপাল ঠুকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম। দড়ির শেষ মুখে পৌঁছে দেখি, গুহা তখনও অনেকটা নীচে। সেখান থেকে বাকি পথটা গাছের ডাল গুঁড়ি লতাগাছ এসব ধরে, শ্যাওলা ধরে পাথরের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা রেখে-রেখে একসময় গুহার মুখে এসে দাঁড়ালাম। বুঙ্গা মানে কামারটাও কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে এল। ও যে বুদ্ধিমান, সেটা বুঝলাম ওর এক কাণ্ড দেখে। বুঙ্গা দড়ির মুখটাতে আরো দড়ি বেঁধে নিয়ে পুরোটাই দড়ি ধরে এসেছে। পরিশ্রমও কম হয়েছে ওর।

—তারপর?

ফ্রান্সিস তখন এত উত্তেজিত, যে সামনের খাবারের দিকে তাকাচ্ছেও না। মকবুল কিন্তু বেশ মৌজ করে খেতে-খেতে গল্পটা বলে যেতে লাগল।

—দু'জনে গুহাটায় ঢুকলাম। একটা নিস্তেজ মেটে আলো পড়েছে গুহাটার মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাই—তারপরেই একটা খাদ। খাদ থেকে উঠে আছে একটা ঢিবি। ঠিক পাথরে ঢিবি নয়। অমসৃণ এবড়ো-খেবড়ো গা অনেকটা জমাট আলকাতরার মত। হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ শক্ত। সেই সামান্য আলোয় ঢিবিটার যে কি রঙ, ঠিক বুঝলাম না! তবে দেখলাম যে, ওটা নীচে অনেকটা পর্যন্ত রয়েছে, যেন পুঁতে রেখে দিয়েছে কেউ।

বুঙ্গা এতক্ষণ গুহার মুখের কাছে এখানে ওখানে ছড়ানো-ছিটানো বড়-বড় পাথরগুলোর ওপর একটা ছুঁচালো মুখ হাতুড়ির ঘা দিয়ে দিয়ে ভাঙা টুকরোগুলো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। তারপর হতাশ হয়ে ফেলে দিচ্ছিলো। আমি বুঙ্গাকে ডাকলাম—বুঙ্গা দেখ তো, এটা কিসের ঢিবি?

বুঙ্গা কাছে এল। এক নজরে ঐ এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটার দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। ওর মুখে কথা নেই।

ঠিক তখনই সূর্যের আলোর রশ্মি সরাসরি গুহার মধ্যে এসে পড়ল। আমরা ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম। সেই এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটায় যেন আগুন লেগে গেল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড যেন! সে কি তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ। সমস্ত গুহাটায় তীব্র চোখঝলসানো আলোর বন্যা নামল যেন। ভয়ে বিস্ময়ে আমি চীৎকার করে বললাম —বুঙ্গা শীগ্‌গির চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়—নইলে অন্ধ হয়ে যাবে।

দু'জনেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়লাম। কতক্ষণ ধরে সেই তীব্র তীক্ষ্ণ চোখ অন্ধ করা আলোর বন্যা বয়ে চলল জানি না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে চোখ খুললাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারদিকে। অসীম নৈঃশব্দ। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিল বুঙ্গার ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। অবাক কাণ্ড! ও কাঁদছে কেন? অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে বুঙ্গার কাছে এলাম। এবার ওর কথাগুলো স্পষ্ট শুনলাম। ও দেশীয় ভাষায় বলছে—অত বড় হীরে—আমার সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে—আমি কত বড়লোক হয়ে যাব—আমি পাগল হয়ে যাবো।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাহলে ঐ অমসৃণ পাথুরে ঢিবিটা হীরে? অত বড় হীরে। এ যে অকল্পনীয়। বুঝলাম, প্রচণ্ড আনন্দে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় বুঙ্গা কাঁদতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করলাম। আস্তে-আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। বুঙ্গাকে বললাম—এসো, আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু কাকে বলা। বুঙ্গা তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেছে। হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল সেই হীরের ঢিবিটার দিকে। হাতের ছুঁচালো হাতুড়িটা নিয়ে পাগলের মত আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে। টুকরো হীরে চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগল। হাতুড়ির ঘা বন্ধ করে বুঙ্গা হীরের টুকরোগুলো কোমরে ফেট্টিতে গুঁজতে লাগল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতুড়িটা নিয়ে। আবার হীরের টুকরো ছিটকোতে লাগল। আমি কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ও তখন পাগল হয়ে গেছে।

—তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল।

—এবার বুঙ্গা করল এক কাণ্ড! গুহার মধ্যে পড়ে থাকা একটা পাথর তুলে নিল। তারপর দু'হাতে পাথরটা ধরে হীরেটার ওপর ঘা মারতে লাগল, যদি একটা বড় টুকরো ভেঙে আসে। কিন্তু হীরে ভাঙা অত সোজা? সে কথা কাকে বোঝাব তখন? ও পাগলের মত পাথরের ঘা মেরেই চলল। ঠক-ঠক পাথরের ঘায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুহাটায়। হঠাৎ—

—কি হল?

—সমস্ত পাহাড়টা যেন দুলে উঠল। গুহার ভিতর শুনলাম, একটা গম্ভীর গুড়-গুড় শব্দ। শব্দটা কিছুক্ষণ চলল। তারপর হঠাৎ একটা কানে তালা লাগানো শব্দ। শব্দটা এলো পাহাড়ের মাথার দিক থেকে। গুহার মুখের কাছে ছুটে এলাম। দেখি পাহাড়ের মাথা থেকে বিরাট-বিরাট পাথরের চাই ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। বুঝলাম, যে কোন কারণেই হোক পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা পাথরের স্তর নাড়া খেয়েছে, তাই এই বিপত্তি। এখন আর ভাববার সময় নেই। গুহা ছেড়ে পালাতে হবে। অবলম্বন একমাত্র সেই দড়িটা। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরলাম। টান দিতেই দেখি—ওটা আলগা হয়ে গেছে। বুঝলাম—যে পাথরের চাঁইয়ে ওটা বেঁধে এসেছিলাম, সেটা নড়ে গেছে। এখন দড়িটা কোন গাছের ডালে বা ঝোপে আটকে আছে। একটু জোরে টান দিলাম। যা ভেবেছি তাই। দঁড়ির মুখটা ঝুপ করে নীচের দিকে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। পায়ের নীচের মাটি দুলতে শুরু করেছে। ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছি না। টলে-টলে পড়ে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি দড়ির মুখটা একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। এখন দড়ি ধরে নামতে হবে। কিন্তু বুঙ্গা? ও কি সত্যিই পাগল হয়ে গেল? এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, বুঙ্গার হুঁশও নেই। ও পাথরটা ঠুকেই চলছে। ছুটে গিয়ে ওর দু'হাত চেপে ধরলাম। বুঙ্গা শীগ্গির চল—নইলে মরবে। কে কার কথা শোনে। এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিল। আবার ওকে থামাতে গেলাম। তখন হাতের পাথরটা নামিয়ে ছঁচোলো মুখ হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরল। বুঝলাম, ওকে বেশী টানাটানি করলে ও আমাকে মেরে বসবে। ওকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। গুহার মধ্যে তখন পাথরের টুকরো, ধুলো ঝুপ-ঝুপ করে পড়তে শুরু করেছে। আর দেরি করলে আমারও জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে। পাগলের মত ছুটলাম গুহার মুখের দিকে।

তারপর গুহার মুখে এসে দড়িটা ধরে কিভাবে নেমে এসেছিলাম, আজও জানি না। পর-পর পাঁচদিন ধরে বুনো ফল আর ঝরনার জল খেয়ে হাঁটতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলে কতবার পথ হারালাম, বুনো জন্তুজানোয়ারের পাল্লায় পড়লাম। তারপর যেদিন এক সন্ধ্যার মুখে ওঙ্গালির বাজারে এসে হাজির হলাম, সেদিন আমার চেহারা দেখে অনেকেই ভূত দেখবার মত চমকে উঠেছিল।"

মকবুলের গল্প শেষ। দু'জনেই চুপ করে বসে রইল। দু'জনের কারোরই খেয়াল নেই যে রাত হয়েছে। এবার দোকান বন্ধ হবে।

—এই দেখুন—মকবুল ডান হাতটা বাড়াল। মাঝের মোটা আঙুলটায় একটা হীরের আংটি।

—সেই হীরের টুকরো নাকি? ফ্রান্সিস বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

মকবুল মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল, বলল—বুঙ্গা যখন হাতুড়ি চালাচ্ছিল তখন কয়েকটা টুকরো ছিটকে এসে আমার জামার আস্তিনে আটকে গিয়েছিল। তখন জানতে পারিনি, পরে দেখেছিলাম।

দোকানী এসে তাড়া দিল, রাত হয়েছে দোকান বন্ধ করতে হবে।

দু'জনে উঠে পড়ল। দোকানীর দাম মেটাতে গিয়ে ফ্রান্সিস ওর থলিটা বের করল। সুলতানী মুদ্রাগুলোর সঙ্গে মোহরটাও ছিল। মোহরটা দেখে মকবুল যেন হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে পড়ল। থাকতে না পেরে বলেই ফেলল—মোহরটা একটু দেখব?

—দেখুন না—ফ্রান্সিস মোহরটা ওর হাতে দিল। ফ্রান্সিস দাম মেটাতে ব্যস্ত ছিল। তাই লক্ষ্য করল না মোহরটা দেখতে দেখতে মকবুলের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু নিজের মনের ভাব গোপন করে ও মোহরটা ফিরিয়ে দিল।

—সুন্দর মোহরটা, রেখে দেওয়ার মত জিনিস।

—হুঁ, —রাখতে আর পারলাম কই? ফ্রান্সিস সখেদে বলল।

—কেন?

—আর একটা ঠিক এরকম দেখতে মোহরও ছিল।

—কি করলেন সেটা?

—এখানকার বাজারে এক জহুরীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।

—ইস, —মকবুল মাথা নাড়ল—ও ব্যাটা নিশ্চয়ই ঠকিয়েছে আপনাকে।

—কি আর করব, নইলে না খেয়ে মরতে হত।

—কোন জহুরীর কাছে বিক্রি করেছেন?

—রাস্তায় চলুন—দেখাচ্ছি।

রাস্তায় নেমে মকবুল জিজ্ঞেস করল—কোথায় থাকেন আপনি?

—এখনো কোন আস্তানা ঠিক করিনি।

—বাঃ, —বেশ- মকবুল হাসল —চলুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—সুলতানের এতিমখানায়।

—এতিমখানায়!

—নামেই এতিমখানা —গরীব মানুষরা থাকতে পায় না। আসলে বিদেশীদের আড্ডাখানা ওটা।

—চলুন —মাথা তো গোঁজা যাবে।

রাস্তায় আসতে-আসতে ফ্রান্সিস মকবুলকে জহুরীর দোকানটা দেখাল। মকবুল গভীরভাবে কি যেন ভাবছিল। দোকানটা দেখে মাথা নেড়ে শুধু বলল—ও।

ফ্রান্সিস আন্দাজও করতে পারেনি মকবুল মনে-মনে কি ফন্দি আঁটছে।

মকবুলের কথা মিথ্যে নয়। সত্যিই এতিমখানা বিদেশী ব্যবসায়ীদের আড্ডাখানা। কত দেশের লোক যে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। আফ্রিকার কালো-কালো কোঁকড়া চুল মানুষ যেমন আছে, তেমনি নাক চ্যাপ্টা কুতকুতে চোখ মোঙ্গল দেশের লোকও আছে।

মকবুল একটা ঘরে ঢুকল। দু'জন লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আর একটা বিছানা খালি, ওটাই বোধহয় মকবুলের বিছানা। ঘরের খালি কোণটা দেখিয়ে মকবুল বলল—ওখানেই আপনার জায়গা হয়ে যাবে, সঙ্গে তো আপনার বিছানা-পত্তর কিছুই নেই?

—না।

—আমার বিছানা থেকেই কিছু কাপড়চোপড় দিচ্ছি, পেতে নিন। ফ্রান্সিস বিছানামত একটা করে নিল। সটান শুয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজল। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল ঘরের দু'জন লোকের সঙ্গে মকবুল মৃদুস্বরে কি যেন কথাবার্তা বলছে। সে সব কথার অর্থ সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল বেশ বেলা হয়েছে। লোকজনের কথাবর্তায় এতিমখানা সরগরম। ফ্রান্সিস পাশ ফিরে মকবুলের বিছানার দিকে তাকাল। আশ্চর্য! কোথায় মকবুল? মকবুলের বিছানাও নেই। পাশের বিছানায় লোকটি তখন দু'হাত ওপরে তুলে মুখ হাঁ করে মস্ত বড় হাই তুলছিল। ফ্রান্সিস তাকেই জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, মকবুল কোথায়?

লোকটা মৃদু হেসে হাতের চেটো ওল্টাল, অর্থাৎ সে কিছুই জানে না। মরুক গে এখন হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাওয়ার চেষ্টা দেখতে হয়, ভীষণ খিদে পেয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এসে ফ্রান্সিস দেখল, ঘরের আর একজন তখন ফিরছে। কিন্তু মকবুল একেবারেই বেপাত্তা। ফ্রান্সিস খেতে যাবে বলে থলেটা কোমর থেকে বের করল, কিন্তু এ কি? থলে যে একেবারে খালি। সুলতানী মুদ্রাগুলো তো নেই-ই, সেই সঙ্গে মোহরটাও নেই! সর্বনাশ! এই বিদেশ বিভুঁই। কে চেনে ওকে? মাথা গোঁজার ঠাঁই না হয় এই এতিমখানায় জুটল। কিন্তু খাবে কি? খেতে তো দেবে না কেউ। তার ওপর কাঁধের ঘা'টা এখনও শুকোয় নি। শরীরের দুর্বলতাও সবটুকু কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই অবস্থায় ও একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সিস চোখে অন্ধকার দেখল।

ওর চোখমুখের ভাব দেখে ঘরের আর দু'জনেও বেশ অবাক হল। হল কি ভিনদেশী লোকটার? ওদের মধ্যে একজন উঠে এল। লোকটার চোখের ভুরু দুটো ভীষণ মোটা। মুখটা থ্যাবড়া। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে?

ফ্রান্সিস প্রথমে কথাই বলতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল—হল কি? ও-রকম ভাবে তাকিয়ে আছেন?

—আমার সব চুরি গেছে।

—ও, তাই বলুন। লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। বলল

—এটা এতিমখানা —চোর, জোচ্চোরের বেহেস্ত মানে স্বর্গ আর কি? তা কত গেছে?

ফ্রান্সিস আ গজে হিসেব করে বলল। মোহরটার কথাও বলল।

—ও বাবা। (াহর-ফোহর নিয়ে এতিমখানায় এসেছিলেন? কত সরাইখানা রয়েছে, সেখানেই গেলে পা তেন।

—মকবুলই তো যত নষ্টের গোড়া।

—কে মকবুল?

—কাল রাত্তিরে যার সঙ্গে আমি এসেছিলাম।

—কত লোক আসছে-যাচ্ছে।

—কেন, আপনারা তো কথাবার্তা বলছিলেন মকবুলের সঙ্গে বেশ বন্ধুর মত।

—হতে পারে। হাত উল্টে লোকটা বলল।

ফ্রান্সিস লোকটার ওপর চটে গেল। একে ওর এই বিপদ কোথায় লোকটা সহানুভূতি দেখাবে তা নয়, উলটে এমনভাবে কথা বলছে যেন সব দোষ ফ্রান্সিসের।

ফ্রান্সিস বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল—আপানারা মকবুলকে বেশ ভাল করেই চেনেন, এখন বেগতিক বুঝে চেপে যাচ্ছেন।

অন্য বিছানায় আধশোয়া লোকটা এবার যেন লাফিয়ে উঠল। বলল—তাহলে আপনি কি বলতে চান, আমরা গাঁট কাটা?

—আমি সেকথা বলিনি।

—আলবৎ বলেছেন। ভুরু মোটা লোকটা বিছানা ছেড়ে ফ্রান্সিসের দিকে তেড়ে এল। ফ্রান্সিস বাধা দেবার আগেই ওর গলার কাছে জামাটা মুঠো করে চেপে ধরল। কাঁধে জখমের কথা ভেবে ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আর বলবি? লোকটা ফ্রান্সিসকে ঝাঁকুনি দিল।

—কি?

—আমরা গাঁটকাটা।

—আমি সেকথা বলিনি।

—তবে রে! লোকটা ডান হাতের উল্টা পিঠ ঘুরিয়ে ফ্রান্সিসের গালে মারল এক থাপ্পড়। অন্য লোকটি খ্যাক্-খ্যাক্ করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিস আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। ওর নিজের গেল টাকা চুরি, আর উল্টে ওকেই চোরের মার খেতে হচ্ছে। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর লোকটা কিছু বোঝবার আগেই হাঁটু দিয়ে ওর পেটে মারল এক গুঁতো। লোকটা দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়ল। অন্য লোকটা এরকম কিছু একটা হতে পারে, বোধহয় ভাবতেই পারেনি। এবার সে তৎপর হল। ছুটে ফ্রান্সিসকে ধরতে এল। ফ্রান্সিস ওর চোয়াল লক্ষ্য করে সোজা ঘুষি চালাল। লোকটা চিৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল—এর পরের ধাক্কা সামলানো মুশকিল হবে। কাজেই আর দেরি না করে এক ছুটে ঘরের বাইরে চলে এল। ভুরু মোটা লোকটাও পেছনে ধাওয়া করল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে হুড়কো তুলে দিয়েছে। বন্ধ দরজার ওপর দুমদাম লাথি পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে এতিমখানা থেকে বেরিয়ে এল।

এতবড় আমদাদ শহর। এত লোকজন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কোথায় খুঁজবে মকবুলকে কিন্তু ফ্রান্সিস দমল না। যে করেই হোক মকবুলকে খুঁজে বের করতে হবে। সব আদায় করতে হবে। তারপর বন্দরে গিয়ে খোঁজ করতে হবে ইউরোপের দিকে কোন জাহাজ যাচ্ছে কি না। জাহাজ পেলেই উঠে পড়বে। কিন্তু মকবুলকে না খুঁজে বের করতে পারলে কিছুই হবে না। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে না খেয়ে মরতে হবে।

সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াল ফ্রান্সিস। বাজার, বন্দর, অলি-গলি কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু কোথায় মকবুল? একজন লোককে তো মকবুল ভেবে ও উত্তেজনার মাথায় কাঁধে হাত রেখেছিল। লোকটা বিরক্ত মুখে ঘুরে দাঁড়াতে ফ্রান্সিসের ভুল ভাঙল। মাফ-টাফ চেয়ে সে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। উপোসী পেটে সারাদিন ওই ঘোরাঘুরি। দুপুরে অবশ্য একফালি তরমুজ চালাকি করে খেয়েছিল।

বাজারের মোড়ে একটা লোক তরমুজের ফালি বিক্রি করছিল। খিদেয় পেট জ্বলছে। সেই সঙ্গে জলতেষ্টা। একফালি তরমুজ খেলে খিদেটাও চাপা পড়বে সেই সঙ্গে তেষ্টাটাও দূর হবে। কিন্তু দাম দেবে কোত্থেকে? অগত্যা চুরি। ফ্রান্সিস বুদ্ধি ঠাওরাল। রাস্তার ধারে এক দল ছেলে খেলা করছিল। ফ্রান্সিস ছেলেগুলোকে ডাকল। ছেলেগুলো কাছে আসতে

বলল—ঐ যে তরমুজওলাটাকে দেখছিস, ও কানে শুনতে পায় না। তোরা গিয়ে ওর সামনে বলতে থাক—"এক ফালি তরমুজ দাও—তা'হলেই তুমি কানে শুনতে পাবে।" লোকটা খুশী হয়ে ঠিক তোদের একফালি করে তরমুজ দেবে।"

ব্যাস! ছেলের দল হল্লা করতে-করতে ছুটে গিয়ে তরমুজওলাকে ঘিরে ধরল। তারপর তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগল—"এক ফালি তরমুজ দাও—তাহলে তুমি কানে শুনতে পাবে।" তরমুজওলা পড়ল মহা বিপদে। আসলে ওর কানের কোন দোষ নেই। ও ভালই শুনতে পায়। ও হাত নেড়ে বারবার সেকথা বোঝাতে লাগল। কিন্তু ছেলেগুলো সেকথা শুনবে কেন?

তাদের চীৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। একদিকের ছেলেগুলোকে তাড়ায় তো অন্যদিকের ছেলেগুলো মাছির মত ভিড় করে আসে। আর সেই নামতা পড়ার মত চীৎকার। অতিষ্ঠ হয়ে তরমুজওলা ঝোলা কাঁধে নিয়ে অন্যদিকে চলল। ছেলের দলও চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পিছু নিল। এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। তরমুজওলাকে ডেকে দাঁড় করাল, বলল—তোমার ঝোলায় সব চাইতে বড় যে তরমুজটা আছে, বের কর। তরমুজওলা বেশ বড় একটা তরমুজ বের করল।

—এবার কেটে সবাইকে ভাগ করে দাও।

ছেলেরা তো তরমুজ খেতে পেয়ে বেজায় খুশী। ফ্রান্সিসও একটা বড় টুকরো পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কামড় দিল, আঃ কি মিষ্টি! হাপুস-হুপুস করে খেয়ে ফেলল তরমুজের টুকরোটা। তরমুজওলা এবার দাম চাইলে ফ্রান্সিস অবাক হবার ভঙ্গি করে বলল—বাঃ, এই যে তুমি বললে কানে শুনতে পেলে সবাইকে তরমুজ খাওয়াবে।

—ও কথা আমি কখন বললাম? তরমুজওলা অবাক।

—এই তো তুমি কানে শুনতে পাচ্ছো।

ছেলেগুলো আবার চেঁচাতে শুরু করল—কানে শুনতে পাচ্ছে।

তরমুজওলা ছেলেদের ভিড় ঠেলে আসার আগেই ফ্রান্সিস ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

একফালি তরমুজে কি আর খিদে মেটে? তবু সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটাল। যদি ওর দুরবস্থার কথা শুনে কারো দয়া হয়, এই আশায় ফ্রান্সিস কয়েকটা খাবারের দোকানে গেল। সব চুরি হয়ে যাওয়ার কথা বলল। অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউই ওকে বিশ্বাস করল না।

সন্ধ্যার সময় শাহীবাগের কোণার দিকে একটা পীরের দরগার কাছে এসে ফ্রান্সিস দাঁড়াল। একটু জিরোনো যাক। দরগার সিঁড়িতে বসল ফ্রান্সিস। ভেতরে নজর পড়তে দেখল অনেক গরিব-দুঃখী সার দিয়ে বসে আছে। সবাইকে একটা করে বড় পোড়া রুটি আর আলুসেদ্ধ দেওয়া হচ্ছে। তাই দেখে ফ্রান্সিসের খিদের জ্বালা বেড়ে গেল। সেও সারির মধ্যে বসে পড়ল। যে লোকটা রুটি দিচ্ছিল, সে কিন্তু ফ্রান্সিসকে দেখে একটু অবাকই হল। খাবার দিল ঠিকই, কিন্তু মন্তব্য করতেও ছাড়ল না "অমন ঘোড়ার মত শরীর—সুলতানের সৈন্যদলে নাম লেখাও গে যাও।" ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মুখ নীচু করে পোড়া রুটি চিবুতে লাগল। হঠাৎ দেশের কথা, মা'র কথা মনে পড়ল। কোথায় এই অন্ধকার খোলা উঠোনে ভিখিরিদের সঙ্গে বসে পোড়া রুটি আলুসেদ্ধ খাওয়া আর কোথায় ওদের সেই ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত খাওয়ার ঘর, ফুলের কাজকরা সাদা টেবিল ঢাকনা, ঝকঝকে পরিষ্কার কাঁটা-চামচ, বাসনপত্র। খাওয়ার জিনিসও কত। কত বিচিত্র স্বাদ সে-সবের। সেই সঙ্গে মা'র সস্নেহ হাসিমুখ—ফ্রান্সিস চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল। না—না—এসব ভাবনা মনকে দুর্বল করে দেয়। এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। বাড়ির নিশ্চিত বিলাসী জীবনের

নাম জীবন নয়। জীবন রয়েছে বাইরে—অন্ধকার ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, আগুন-ঝরা মরুভূমিতে তরবারির ঝলকানিতে, দেশবিদেশের মানুষের স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে।

তখনও রাত বেশী হয় নি। ফ্রান্সিস এতিমখানায় এসে ঢুকল। খুঁজে-খুঁজে নিজের ঘরটার দিকে এগোল। সেই লোক দুটো কি আর আছে? ব্যবসায়ী লোক—হয় তো এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। সকালে নিশ্চয়ই দরজায় ধাক্কাধাক্কি লাথি মারার শব্দে আশেপাশের ঘরের লোক এসে দরজা খুলে দিয়েছে। তারপর দুপুর নাগাদ পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে।

দরজাটা বন্ধ। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত মনেই দরজাটা ঠেলল। দরজা খুলে গেল। এই সেরেছে। সেই মূর্তিমান দু'জনেরই একজন যে। মোটা ভুরু নাচিয়ে লোকটা ডাকল—এসো ভেতরে। ফ্রান্সিস নড়ল না। লোকটা এবার হেসে ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখতে গেল। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল। ঘরে চোখ পড়তে দেখল অন্য লোকটাও রয়েছে।

—তোমার এখনও রাগ পড়েনি দেখছি। লোকটা হাসল।

ফ্রান্সিস ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি বললো—বিশ্বাস করো ভাই সকালে তোমার সঙ্গে আমরা যে ব্যবহার করেছি, তার জন্যে আমরা দুঃখিত।

ফ্রান্সিস তবু নড়ল না।

—ঠিক আছে, তুমি ভেতরে এসো। যদি মাফ চাইতে বলো—আমরা তাও চাইবো।

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকল। লোকটা দরজা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতেই ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। বললো দরজা বন্ধ করতে পারবে না।

-সেই লোকটা হেসে দরজা খোলা রেখেই ওর কাছে এগিয়ে এল। বলল—এবার বিছানায় বসো।

ফ্রান্সিস নিজের বিছানায় গিয়ে বসল। অন্য লোকটি তখন একটা পাত্র হাতে এগিয়ে এল। পাত্রটা ফ্রান্সিসের সামনে রেখে বলল—খাও। সারাদিন তো তরমুজের একটা ফালি ছাড়া কিছুই জোটেনি।

ফ্রান্সিস বেশ অবাক হল। এসব এই লোকটা জানলো কি করে? মোটা ভুরুঅলা লোকটা এবার বলল—তুমি ঠিকই ধরেছো। মকবুল আমাদের খুবই পরিচিত। ওকে আমরা অনেকদিন ধরেই জানি। গাঁট কাটার মত নোংরা কাজ ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের উল্টে তোমাকেই সন্দেহ হয়েছিল।

--আমাকে?

—হ্যাঁ। তাই দুপুরবেলা আমরা দুজন তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে ছিলাম। পেলামও তোমাকে। বাজারের মোড়ে তুমি তখন তরমুজ খাচ্ছিলে।

ফ্রান্সিস হাসল। লোকটা বললো খুব বেঁচে গেছো। তুমিও গা-ঢাকা দিলে আর ঠিক তখুনি সুলতানের পাহারাদার এল। অবশ্য কোন বিপদ হলে আমরাও তৈরী ছিলাম তোমাকে বাঁচাবার জন্যে।

—তাহলে তো তোমরা সবই দেখেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ তখনি বুঝলাম—তুমি মিথ্যে বলোনি। সত্যি তোমার সব চুরি হয়েছে— নইলে এসব চুরির ফন্দী আঁটো। খাও ভাই—এবার হাত চালাও—খেয়ে নাও আগে।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বললো না-নিঃশব্দে খেতে লাগল। পরোটা, মাংস। উটের দুধের তৈরী মিষ্টি চেটেপুটে খেয়ে নিল সব।

এবার মোটা ভুরুঅলা লোকটা বলল—শোন ভাই—আমার নাম হাসান। কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমরাও খোঁজে থাকব—মকবুলের দেখা পেলেই সব আদায় করে লোক মারফত তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি তো এখানেই থাকবে?

—হ্যাঁ, যতদিন না জাহাজের ভাড়া যোগাড় করতে পারি।

—বেশ। এবার তাহলে ঘুমোও। অনেক রাত হল।

ফ্রান্সিসও আর জেগে থাকতে পারছিল না। পরদিন কি খাবে, কি ভাবে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করবে—এইসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল—হাসান আর তার বন্ধু দুজনেই চলে গেছে! ঘরে শুধু ও একা। শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল এবার কি করা যায়? কি করে প্রতিদিনের খাবার যোগাড় করবে, অর্থ জমাবে, মকবুলকে খুঁজে বের করবে? দেশে তো ফিরতে হবে? তারপর নিজেদের একটা জাহাজ নিয়ে সোনার ঘণ্টা খুঁজতে আসতে হবে। সঙ্গে আনতে হবে সব বিশ্বস্ত বন্ধুদের। কিন্তু সেসব তো পরের কথা। এখন কি করা যায়? ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের একটা বুদ্ধি এল। আচ্ছা মকবুলের সেই মস্ত বড় হীরের গল্পটা বাজারের কুয়োর ধারে বসে লোকদের শোনালে কেমন হয়? কত বিদেশী বণিকই তো বাজারে আসে। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে গল্পটা আগে শুনেছে! তাহলেই মকবুলের খোঁজ পাওয়া যাবে। কারণ মকবুল ছাড়া এই গল্প আর কে বলবে? ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এতক্ষণে বাজারে লোকজন আসতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই। কুয়োর ধারে খেজুরগাছটার তলায় বসতে হবে।

"সে এক প্রকাণ্ড হীরে! মদিনা মসজিদের গম্বুজের চেয়েও বড়! কি চোখ ধাঁধানো আলো তার! দু'হাতে চোখ ঢেকে আমরা শুয়ে পড়লাম। সমস্ত গুহাটা তীব্র আলোর বন্যায় ভেসে যেতে লাগল।" ফ্রান্সিস গল্পটা বলে চলল। লোকেরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। কেউ-কেউ বিরূপ মন্তব্য করে গেল "গাঁজাখুরী গপ্পো—অত বড় হীরে হয় নাকি?" কিন্তু বেশির ভাগ লোকই হাঁ করে গল্পটা শুনল। প্রথম দিন তো। ফ্রান্সিস খুব একটা গুছিয়ে গল্পটা বলতে পারল না। তবু লোকের ভাল লাগল। গল্প বলা শেষ হলে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাতে কিছু মুদ্রা দিল। দেখাদেখি আরো কয়েকজন কিছু মুদ্রা দিল। ফ্রান্সিস মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। যাক, প্রাণে বেঁচে থাকার একটা সহজ উপায় পাওয়া গেল। গল্প বলে যদি এইরকম রোজগার হয়, তাহলে খাওয়ার ভাবনাটা অন্তত মেটে।

পরের দিন থেকে ফ্রান্সিস আরো গুছিয়ে গল্পটা বলতে লাগল। কয়েকদিনের মধ্যেই সে বেশ ভালো গল্প বলিয়ে হয়ে গেল। গল্পটাকে আরো বাড়িয়ে, আরো নানারকম রোমহর্ষক ঘটনা যোগ করে লোকদের শোনাতে লাগল। রোজগারও হতে লাগল। কিন্তু এতদিনে এমন কাউকে পেল না, যে গল্পটা আগে শুনেছে। তবু ফ্রান্সিস হাল ছাড়ল না। প্রতিদিন গল্পটা বলে যেতে লাগল। সেই বাজারের কুয়োটার ধারে, খেজুরগাছটার নীচে বসে।

একদিন ফ্রান্সিস গল্পটা বলছে—"সব সময় নয়, যখন সূর্যের আলো সরাসরি গুহাটায় এসে পড়ে, তখনি দেখা যায় আলোর খেলা, কত রঙের আলো—"

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল এ গল্পটা আমার শোনা।

ফ্রান্সিস গল্প বলা থামিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিদেশী ব্যবসায়ী। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কোথায় শুনেছেন গল্পটা?

—হায়াৎ-এর সরাইখানায়।

—যে লোকটা গল্পটা বলেছে, তার নাম জানেন?

—না, সে নাম বলেনি।

—দেখতে কেমন?

—মোটাসোটা গোলগাল, বেশ হাসিখুশী।

ফ্রান্সিসের আর বুঝতে বাকি রইল না—লোকটা আর কেউ নয়, মকবুল। কিন্তু হায়াৎ? সে তো অনেকদূর। তিনদিনের পথ। উটের ভাড়া গুনবে, সে ক্ষমতা তো নেই। এদিকে শ্রোতারা অস্বস্তি প্রকাশ করতে লাগল। গল্পটা শেষ হয় নি। ফ্রান্সিস ফিরে এসে আবার গল্পটা বলতে লাগল।

কিছুদিন যেতেই কিন্তু গল্পটা লোকের কাছে পুরোনো হয়ে গেল। কে আর একই গল্প প্রতিদিন শুনতে চায়? বিদেশী বণিক-ব্যবসায়ী যারা আসত, তারাই যা দু-চারজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনত। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল—রোজগার বাড়াতে হলে আরও লোক জড়ো করতে হবে। নতুন গল্প শোনাতে হবে। এবার তাই সে সোনার ঘণ্টার গল্পটা বলতে শুরু করল। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ানো শ্রোতাদের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস সুন্দর ভঙ্গীতে গল্পটা বলতে থাকে—"নিশুতি রাত। ডিমেলোর গীর্জার পেছনে ঘন জঙ্গলে আগুনের আভা কিসের? সোনা গলানো চলছে। বিরাট কড়াইতে সোনা গলিয়ে ছাচে ফেলা হচ্ছে। কেন না সোনার ঘণ্টা তৈরী হবে। কবে তৈরী শেষ হবে? ডাকাত পাদরীরা সোনা গলায় আর ছাঁচে ঢালে। খুব জমে যায় গল্পটা। শ্রোতারা অবাক হয়ে সোনার ঘণ্টার গল্প শোনে। কেউ-কেউ মন্তব্য করে যত সব বাজে গল্প। চলেও যায় কেউ-কেউ। কিন্তু নতুন লোক জড়ো হয় আরো বেশী। এক সময় গল্পটা শেষ হয়। শ্রোতাদের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলে—সোনার ঘণ্টা এখনও আছে, এই সমুদ্রের কোন অজানা দ্বীপে। তোমরা ভাই খুঁজে দেখতে পার।

গল্প শেষ। শ্রোতাদের ভিড় কমতে থাকে। ফ্রান্সিস হাত পাতে। যাবার আগে অনেকেই কিছু কিছু সুলতানী মুদ্রা হাতে দিয়ে যায়। গল্পটা শুনে সবাই যে খুশী হয়েছে—ফ্রান্সিস বোঝে। ও আরও উৎসাহ পায়, কিন্তু বিপদ হল, এই গল্পটা বলতে গিয়েই।

জোব্বাপরা নিরীহগোছের লম্বামত চেহারার একজন লোক মাঝে-মাঝে ফ্রান্সিসের পেছনে দাঁড়িয়ে গল্প শুনত। ফ্রান্সিস যেদিন থেকে প্রথম সোনার ঘণ্টার গল্প বলতে লাগল, সেদিন থেকে লোকটা প্রত্যেক দিন আসতে লাগল। অনেকেই গল্প শুনতে জড়ো হয়। সবাইকে তো আর মনে রাখা যায় না। ফ্রান্সিস আপন মনে গল্পই বলে যায়।

একদিন ফ্রান্সিস যেই গল্পটা শেষ করেছে, পেছন থেকে লোকটা জিজ্ঞেস করল—তুমি সেই সোনার ঘণ্টা দেখেছ?

ফ্রান্সিস পেছনে ফিরে লোকটাকে দেখল। গোবেচারা গোছের চেহারা। রোগা আর বেশ লম্বা। ফ্রান্সিস ওকে আমলই দিল না। হাত বাড়িয়ে শ্রোতাদের দেওয়া মুদ্রাগুলো নিতে লাগল।

—সেই সোনার ঘণ্টা তুমি দেখেছ? লোকটা একই সুরে আবার করল প্রশ্নটা।

—না। ফ্রান্সিস বেশ রেগেই গেল।

—সেই ঘণ্টার বাজনা শুনেছো?

—তোমার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয়ে তুমি সব জান।

ফ্রান্সিস এবার অবাক চোখে লোকটার দিকে তাকাল। ঠাট্টা করে বলল—সবই যদি জানব, তাহলে কি এখানে গল্প বলে ভিক্ষে করি?

—তুমি নিশ্চযই জানো সেই সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে।

ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিতে চাইল। বিরক্তির সুরে বলল—বাবে, গল্প গল্পই— গল্পের ঘণ্টা সোনারই হোক আর রুপোরই হোক, তাকে চোখেও দেখা যায় না—তার বাজনাও শোনা যায় না।

হঠাৎ লোকটা পরনের জোব্বাটা কোমরের একপাশে সরাল। ফ্রান্সিস দেখল—তরোয়ালের হাতল। লোকটা একটানে খাপ থেকে খুলে চকচকে তরোয়ালের ডগাটা ফ্রান্সিসের থুতনির কাছে চেপে ধরে গম্ভীর গলায় বলল—আমার সঙ্গে চলো।

নিরীহ চেহারার মানুষটা যে এমন সাংঘাতিক, ফ্রান্সিস আগে সেটা কল্পনাও করতে পারেনি। কয়েক মুহূর্ত ও অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। টুকটাক কথা থেকে একেবারে থুতনিতে তরোয়াল ঠেকান! ফ্রান্সিস ভাবল, আজকে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

—চল। লোকটা তাড়া লাগাল।

—কোথায়?

—গেলেই দেখতে পাবে।

এ আবার কোন ঝামেলায় পড়লাম! কিন্তু উপায় নেই। লোকটা যেমন তেরিয়া হয়ে আছে, গাঁইগুঁই করলে হয়তো গলায় তরোয়ালই চালিয়ে দেবে।

—বেশ, চল। ফ্রান্সিস লোকটার নির্দেশমত বাজারের পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। লোকটা খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে ঠিক ওর পেছনে-পেছনে যেতে লাগল।

পথে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস কোনদিকে যেতে হবে, তা বুঝতে না পেরে মাঝে-মাঝে থেমে পড়ছিল। লোকটা ওর পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে পথ দেখিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস মনে-মনে কেবল পালাবার ফন্দি আঁটিতে লাগল। কিন্তু পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারল, লোকটা ভীষণ সতর্ক। একটু এদিক-ওদিক ওর পা পড়লেই লোকটা ধমক দিচ্ছে—সোজা হাঁট। পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে। ফ্রান্সিস আবার সহজভাবে হাঁটতে লাগল। এবার খুব সরু গলি দিয়ে যেতে লাগল ওরা।

হাত বাড়ালেই বাড়ির দরজা, এত সরু গলি সেটা। ফ্রান্সিস নজর রাখতে লাগল কোন খোলা দরজা পায় কি না। পেয়েও গেল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ফ্রান্সিস বসে পড়ল। লোকটা তরোয়াল নামিয়ে ওর গায়ের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল—কি হল?

ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, ত্বড়িৎগতিতে মাথা দিয়ে লোকটার পেটে গুঁতো মারলো লোকটা টাল সামলাতে পারল না, সেই পাথুরে গলিটায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। বাঁদিকের খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপরেই ছুটল ভিতরের ঘরের দিকে। বোঝাই যাচ্ছে গৃহস্থ বাড়ি, কিন্তু লোকজন কেউ নেই সে ঘরে। পাশের একটা ঘরে লোকজনের কথাবার্তা শোনা গেল, বোধহয় ওঘরে খাওয়া-দাওয়া চলছে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল দেয়ালে একটা বোরখা ঝুলছে। যাক আত্মগোপনের একটা উপায় পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বোরখাটা পরে নিল, তারপর এক ছুটে ভিতরে উঠোনে চলে এল। দেখল ছাদটা বেশী উঁচু নয়। জানালার গরাদে পা রেখে তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে পড়ল। তারপর ছাদের পর ছাদ লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হতে-হতে বেশ দূরে চলে এল। এবার নামা যেতে পারে। এই জায়গায় ফ্রান্সিস মারাত্মক ভুল করল। আগে থেকে দেখে নিল না গলিটা ফাঁকা আছে কিনা। কাজেই লাফ দিয়ে পড়বি তো পড়, একটা লোকের নাকের ডগায় সে পড়ল। লোকটা বোধহয় গানটান করে। আপন মনে সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে যাচ্ছিল। একটা বোরখা পরা মেয়ে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল দেখে তো ওর গান বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা হাঁ করে প্রায় চেঁচিয়ে

উঠতে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার আগেই ওর ঘাড়ে এক রদ্দা মারল। ব্যস! লোকটার মুখ দিয়ে আর টুঁ শব্দটি বেরুল না। সে বেচারা কলাগাছের মত ধপাস করে পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটল গলি পথ দিয়ে। একটু পরেই একটা পাতকুয়ো। কুয়োটার ওপরে কপিকল লাগানো। দড়ি দিয়ে চামড়ার থলিতে করে মেয়েরা জল তুলছে। কুয়োটার চারপাশে বোরখা পরা মেয়েদের ভিড়। সবাই জল নিতে এসেছে। ফ্রান্সিসও সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু হলে হবে কি? সেদিন ফ্রান্সিসের কপালটা সত্যিই মন্দ ছিল। সে তখনও জানত না সমস্ত এলাকাটাই সুলতানের সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে।

বাড়ি-বাড়ি ঢুকে তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। একটু পরেই সুলতানের সৈন্যরা কুয়োতলায় এসে হাজির। কুয়োতলার চারপাশের বাড়িতে তল্লাশি শেষ হল। ঠিক তখনই সৈন্যরা একজন লোককে ধরে নিয়ে এল। লোকটা হাত মুখ নেড়ে কি যেন বলতে লাগল। বোরখার আড়াল থেকে ফ্রান্সিস সবই দেখছিল। সে লোকটাকে চিনতে পারল। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে সে এই লোকটার সামনেই এসে পড়েছিল। এবার আর রক্ষে নেই। সৈন্যদের দলনেতা চীৎকার করে কি যেন হুকুম দিল। সব সৈন্য দল বেঁধে তরোয়াল উঁচিয়ে কুয়োতলার দিকে আসতে লাগল। মেয়েরা ভয়ে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল। সৈন্যদের নেতা হাত তুলে অভয় দিল। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। দু' তিনজনের জলের পাত্র ভেঙে গেল। যে যেদিকে পারল পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সৈন্যরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল এই সুযোগ।

ছুরিটা সামনের কাঠের দরজায় গভীর হয়ে বিঁধে গেল।

ফ্রান্সিস কুয়োতলার পথর বাঁধানো চত্বর থেকে এক লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল সামনের বাড়িটা লক্ষ্য করে। দরজার কাছে পৌঁছেও গেল। কিন্তু—শন ন্—ন্—একটা ছুরি ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। ছুরিটা সামনের কাঠের দরজায় গভীর হয়ে বিঁধে গেল। একটুর জন্যে ওর ঘাড়ে লাগেনি।

পালাবার চেষ্টা করো না। পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। ফ্রান্সিস আর নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। ওর গা থেকে কেউ যেন বোরখা খুলে নিল। ফ্রান্সিস দেখল সেই রোগা লম্বামত লোকটা।

লোকটা হেসে বলল—আর হেঁটে নয়—এবার ঘোড়ায় চেপে চল।

ফ্রান্সিসের আর পালান হল না। ফ্রান্সিসকে রাখা হল মাঝখানে। চারপাশে সৈন্যদল ওকে ঘিরে নিয়ে চলল। ওর পাশেই চলল সেই রোগা লম্বামত লোকটা। আমদাদের পাথর বাঁধানো রাজপথে অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল। ওরা চলল সদর রাস্তা দিয়ে। ফ্রান্সিস তখনও জানতে পারেনি, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ও সব কিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল। তবু কৌতূহল যেতে চায় না।

ব্যাপার কি? ওকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন?

সৈন্যদলের সঙ্গে ফ্রান্সিসও এগিয়ে চলল। আড়চোখে একবার লম্বামত লোকটাকে দেখে নিল! লোকটা নির্বিকার। কোন কথা না বলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস এবার লোকটাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

—গেলেই দেখতে পাবে। লোকটা শান্ত স্বরে বলল।

—তবু আগে থেকে জানতে ইচ্ছে করে।

—সুলতানের কাছে।

ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। বলে কি! দেশের সুলতান! দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাঁর। ফ্রান্সিসের মত নগণ্য একজন বিদেশীর সঙ্গে কি সম্পর্ক তার?

—কিন্তু আমার অপরাধ?

—সোনার ঘণ্টার হদিশ তুমি জান।

—আমি কিছুই জানি না।

—সুলতানকে তাই বলো। এখন বকবক বন্ধ কর, আমরা এসে গেছি!

বিরাট প্রাসাদ সুলতানের। ফ্রান্সিস প্রাসাদটা দেখেছে আগে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে। আজকে প্রাসাদে ঢুকছে। স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন সে এই প্রাসাদে ঢুকবে।

মস্তবড় খিলানঅলা দেউড়ি পেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা পাথর বাঁধানো চত্বর। চত্বরটায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল—ঠক্—ঠক্। এক কোণার দিকে ঘোড়াশাল। সেখানে ঘোড়া থেকে নামল সবাই। এবারে সামনে সেই লম্বামত লোকটা চলল। তারপর ফ্রান্সিস। পেছনে তরোয়াল হাতে দু'জন সৈন্য। ওরা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকল।

বিরাট-বিরাট দরজা—ঘরের পর ঘর পেরিয়ে চলল ওরা। সবগুলো ঘরই সুসজ্জিত দামী কার্পেট মোড়া মেঝে। রঙীন কাঁচ বসানো শ্বেতপাথরের দেয়াল। এখানে-ওখানে সোনালী রঙের কাজকরা লতা-পাতা ফুল। লাল টকটকে গদিতে মোড়া ফরাস, বসবার জায়গায় বড়-বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে ছাদ থেকে। দরজা জানালা মীনে করা। সুন্দর কারুকাজ তাতে। দরজায়-দরজায় ঝকঝকে বর্শা হাতে দ্বাররক্ষীরা দাঁড়িয়ে আছে। লম্বামত লোকটাকে দেখেই ওরা পথ ছেড়ে দিতে লাগল। একটা ঘরে ঢুকে লোকটা হাততালি দিল। সৈন্য দুজন দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরটা অন্য ঘরের তুলনায় ছোট। মাঝখানে লাল গদিমোড়া বাঁকানো পায়ার টেবিল দু'পাশের বসবার জায়গাগুলোও লাল গদিমোড়া। দেয়ালে, দরজায়, জানালায় অন্য ঘরগুলোর চেয়ে বেশী কারুকাজ। লোকটা ফ্রান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস বসল। লোকটা ভেতরের দরজা দিয়ে কোথায় চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। কেমন সন্ত্রস্ত ভঙ্গি। ফ্রান্সিসের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল—সুলতান আসছেন। উঠে দাঁড়িয়ে আদাব করবে।

ভেতরের দরজা দিয়ে সুলতান ঢুকলেন। ফ্রান্সিস সুলতান রাজা-বাদশাহের কাহিনী শুনেছেই এতদিন। চোখে দেখেনি কোনদিন। আজকে প্রথম দেখল। সুলতান বেশ দীর্ঘদেহী, গায়ের রঙ যেন দুধে-আলতায় মেশান। দাড়ি-গোঁফ সুন্দর করে ছাঁটা। মাথায় আরবীদের মতই বিড়েবাঁধা সাদা দামী কাপড়ের টুকরো। তবে পরনে জোব্বা নয়, একটা আঁটোসাঁটো পোশাক। তাতে সোনা দিয়ে লতাপাতার কাজ করা। বুকে ঝুলছে একটা মস্তবড় হীরে বসানো গোল লকেট। গলায় মুক্তোর মালা। সুলতানকে দেখেই লম্বামত লোকটা মাথা নুইয়ে আদাব করল। লোকটার দেখাদেখি ফ্রান্সিসও আদাব করল। সুলতান ফ্রান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করে নিজেও বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি?

—ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে ভাল করে সুলতানের মুখের দিকে তাকাল। সুলতানের চোখের দৃষ্টিটা ফ্রান্সিসের ভাল লাগল না। কেমন ক্রুরতা সেই দৃষ্টিতে। বড় বেশী স্থির, মর্মভেদী।

—তুমি বাজারে যে গল্পটা বল—সোনার ঘণ্টার গল্প—

—আজ্ঞে হ্যাঁ –মানে পেটের দায়ে--

—গল্পটা কোথায় শুনেছ?

—দেশে—বুড়ো নাবিকদের মুখে।

—তোমার কি মনে হয়? গল্পটা সত্যি না মিথ্যে?

—কি করে বলি? তবে সত্যিও হতে পারে।

সুলতানের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। বললেন—ওকথা বলছ কেন?

—আমি সেই সোনার ঘণ্টার বাজনা শুনেছি।

সুলতান ক্রুর হাসি হাসলেন, বললেন—শুধু বাজনা শোনা নয়, একমাত্র তুমিই জানো সেই সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে, কেমন করেই বা ওখানে যাওয়া যায়।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। বলল—বিশ্বাস করুন সুলতান, আমি এসবের বিন্দু-বিসর্গও জানি না।

—তুমি নিজের চোখে সোনার ঘণ্টা দেখেছ। সুলতান দাঁত চেপে কথাটা বললেন।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বুঝল —ভীষণ বিপদে পড়েছে সে। এমন লোকের খপ্পরে পড়েছে, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যে যাই বলুক না কেন, যতই বোঝাবার চেষ্টাই করুক না কেন—সুলতান কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করবেন না। তবু ফ্রান্সিস বোঝাবার চেষ্টা করল—সুলতান আমি বললাম তো সোনার ঘণ্টার বাজনা আমি শুনেছি। তখন প্রচণ্ড ঝড়ে আর ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল। তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্তকর অবস্থা। কোত্থেকে বাজনার শব্দটা আসছে, কতদূর সেটা, এসব ভাববার সময় কোথায় তখন?

—মিথ্যেবাদী ফেরেববাজ। সুলতান গর্জন করে উঠলেন। তারপর আঙুল নেড়ে লম্বামত লোকটাকে কি যেন ইশারা করলেন। লোকটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের পিঠে ধাক্কা দিল—চলো।

ঘরের বাইরে আসতেই সৈন্য দুজন পেছনে দাঁড়াল। সামনে সেই লোকটা। ফ্রান্সিস ভেবেই পেল না, তাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাসাদের পেছন থেকেই শুরু হয়েছে পাথরে বাঁধানো পথ। দুপাশে উঁচু প্রাচীর টানা চলে গেছে দুর্গের দিকে। কালো থমথমে চেহারার সেই বিরাট দুর্গের দিকে তারা ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিসের আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। এই দুর্গেই তাকে বন্দী করে রাখা হবে। কতদিন কে জানে? ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। সব শেষ। সোনার ঘণ্টার স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই এই দুর্গের অন্ধকার কোন ঘরে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাহারে অনিদ্রায় তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই তার ভাগ্যের লিখন। আর তার মুক্তি নেই। কড়কড় শব্দ তুলে দুর্গের বিরাট লোহার দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস বাইরের মুক্ত পৃথিবীর হাওয়া বুক ভরে টানল। তারপর অন্ধকার স্যাঁতসেতে দুর্গের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল।

যে ঘরে ফ্রান্সিসকে রাখা হল, সেই ঘরটার দেওয়াল এবড়োখেবড়ো পাথর দিয়ে গাঁথা। দুপাশে দুটো মশাল জ্বলছে। তাতে অন্ধকারটা যেন আরো ভীতিকর হয়ে উঠেছে।

দেয়ালে দুটো মস্তবড় আংটা লাগানো। তাই থেকে শেকল ঝুলছে। সেই শেকল দিয়ে ফ্রান্সিসের দুহাত বেঁধে রাখা হয়েছে।

সারারাত ঘুমুতে পারেনি ফ্রান্সিস। দুটো হাত শেকলে বাঁধা ঝুলছে। এ অবস্থায় কি ঘুম আসে? তন্দ্রা আসে। শরীর এলিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু লোহার শেকলে টান পড়তেই ঝনঝন শব্দ ওঠে। তন্দ্রা ভেঙে যায়। যে কজন পাহারাদার দরজার কাছে আছে, যে পাহারাদার খাবার দিয়ে গেছে—সবাইকে সে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করছে—আমাকে এই শাস্তি দেবার মানে কি? কি অপরাধ করেছি আমি? কিন্তু পাহারাদারগুলো বোধহয় বদ্ধ কালা আর বোবা। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছে অথবা আপন মনে নিজেদের কাজ করে গেছে। কথাও বলেনি, তার কথা যে ওদের কানে গেছে মুখ দেখেও তা মনে হয়নি। ঘুম হল না। হবার কথাও নয়। শেকলে ঝুলে ঝুলে কি ঘুম হয়? তন্দ্রার মধ্য দিয়ে রাত কাটাল। একসময় ভোর হল। সামনে একটা জানালা দিয়ে ভোরের আলো দেখা গেল। সারারাত ঘুম নেই। চোখ দুটো জ্বালা করছে।

একটু বেলা হয়েছে তখন। হঠাৎ লোহার দরজায় শব্দ উঠল— ঝন্ ঝনাৎ। ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ তুলে দরজাটা খুলে গেল। ফ্রান্সিস দেখল—সুলতান ঢুকছে। পেছনে সেই লম্বামত লোকটা। তার পেছনে মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি, কালো আলখাল্লা পরা আর একটা লোক। তার হাতে চাবুক। সে চাবুকটা পেঁচিয়ে মুঠো করে ধরে রেখেছে।

—এই যে সাহেব—কেমন আছো? সুলতান ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—যাক গে,সুলতান ব্যস্তভাবে বললেন—আমার তাড়া আছে। কি ঠিক করলে? সাররাত ভাবার সময় পেলে।

—কোন ব্যাপারে? ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

সুলতান হো-হো করে হেসে উঠলেন—তুমি তো বেশ রসিক হে সব জেনেশুনে রসিকতা করছো—তাও আমার সঙ্গে।

—আমি যা জানি বলেছি—এর বেশি আমি আর কিছুই জানি না।

সুলতান একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দাঁতে-দাঁত ঘষে বললেন—সোনার ঘণ্টা আমার চাই। তার জন্যে যদি তোমার মত দু'চারশ লোকের মৃতদেহ ডিঙিয়ে যেতে হয়—আমি তাই যাবো। তবু সোনার ঘণ্টা আমার চাই।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সুলতান আঙুল তুলে ইঙ্গিত করলেন। চাবুক হাতে লোকটা এগিয়ে এল। কপাল পর্যন্ত ঢাকা কালো পাগড়ি। মুখটা দেখা না গেলেও শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। যেন খুশীতে জ্বলজ্বল করছে। কি নিষ্ঠুর! ফ্রান্সিস ঘৃণায় মুখ ফেরাল।

ঝপাৎ—চাবুকের আঘাতটা পেটের কাছ থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল। ফ্রান্সিসের সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল। ঝ পাৎ—আবার চাবুক। তার সবটুকু শরীরে লাগল না। তবু হাতটা জ্বালা করে উঠল। সুলতান হাত তুলে চাবুক থামাতে ইঙ্গিত করলেন। বললেন—এখনও বলো কোথায় আছে সেই সোনার ঘণ্টা?

—আমি যা জানি বলেছি।

ঝপাৎ—আবার চাবুক। "বন্ধ মুখ কি করে খুলতে হয় আমি জানি।" কথাটা বলে সুলতান চাবুকওয়ালার দিকে তাকালেন। বললেন, যতক্ষণ না কথা বলতে চায়—ততক্ষণ চাবুক চালাবে। কিছু বলতে চাইলে—সুলতান আঙুল দিয়ে লম্বামত লোকটাকে দেখালেন—রহমানকে খবর দেবে। কালো পোশাক পরা চাবুকঅলা মাথা ঝুঁকিয়ে আদাব করল। সুলতান দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোলেন। রহমানও পেছনে-পেছনে চলল।

ঝপাৎ—চাবুকের শব্দে ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

কিন্তু আশ্চর্য! এবারের চাবুকটা ওর গায়ে পড়ল না—দেয়ালে পড়ল। আবার ঝপাৎ—এবারও দেওয়ালে লাগল। লোকটা কি নিশানা ঠিক করতে পারছে না? ঝপাৎ—ঝপাৎ হঠাৎ কয়েকবার দ্রুত চাবুকটা দেয়ালে মেরে লোকটা চাবুক হাতে ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। যেন ফ্রান্সিসকে পরীক্ষা করেছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা—এমনি ভঙ্গিতে ফ্রান্সিসের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর কপালের কাছ থেকে পাগড়িটা ওপরের দিকে তুলল। কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল—ফজল! এবার ফ্রান্সিস ভালোভাবে লোকটার মুখের দিকে তাকাল। আরে? এ তো সত্যিই ফজল! মুখে ভূষোমত কি মেখেছে তাই চেনা যাচ্ছিল না। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—ফজল।

ফজল ঠোঁটে হাত রাখল। তারপর ফিসফিস করে বলল—সামনে জানালাটা দেখেছো!

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিসও চাপাস্বরে উত্তর দিলে।

—গরাদ নেই।

—হ্যাঁ।

—সোজা ওখান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। খাড়া পাহাড়ের গা—কোথাও ঘা খাবার ভয় নেই—নীচে সমুদ্রের জল, তারপর ডুব সাঁতার, পারবে তো?

—নিশ্চয় পারবো।

এমন সময় দুজন সৈন্য ঘরে ঢুকল। ফজল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাবুক চালাল। এবারে চাবুকের ঘাটা ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল। ফ্রান্সিসের মুখ দিয়ে কাতরোক্তি বেরিয়ে এল। সৈন্যদের একজন বলল—কি হল এখনও যে মুখ থেকে শব্দ বেরুচ্ছে।

ফজল ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে-চেয়ে চোখ টিপে বলল—এই শেষ ঘা,এটা আর সহ্য করতে হচ্ছে না বাছাধনকে। বলেই চাবুক চালাল—ছপাৎ। ফ্রান্সিসের গায়ে লাগল না। দেয়ালে লেগেই শব্দ উঠল।

ফ্রান্সিস অজ্ঞান হবার ভঙ্গি করল। হাত ছেড়ে দিয়ে শেকলে ঝুলতে লাগল।

—এঃ। নেতিয়ে পড়েছে—একজন সৈন্য ফজলকে লক্ষ্য করে বলল—আর মেরো না।

ফজল চটে ওঠার ভান করল—তোমরা নিজেরা নিজেদের কাজ করো গে যাও। আমি এই ভিনদেশীটাকে একেবারে নিকেশ করে ছাড়বো।

—তাহলে তোমারই গর্দান যাবে। একজন সৈন্য বলল।

—কেন?

—সুলতান বলেছেন, যে করেই হোক এই ভিনদেশীটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—নইলে সোনার ঘন্টার হদিশ দেবে কে?

—হুঁ, তা ঠিক। তাহলে এখন থাক, কি বল?

দু'জন সৈন্যই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। ফজল চাবুকটা হাতে পাকাতে-পাকাতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—যাঃ জোর বেঁচে গেলি।

সবাই চলে গেল। ক্যাঁচ-কোঁচ্ শব্দ তুলে দরজাটা বন্ধ হল। পাহারাদার দরজায় তালা লাগাল।

ফ্রান্সিস এবার আস্তে-আস্তে শব্দ না করে উঠে দাঁড়াল। জানালাটার দিকে ভালো করে তাকাল। ফজল ঠিকই বলেছে। জানালাটায় কোন গরাদ নেই। পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে

কেউ নেমে যাবে এটা অসম্ভব। তাই বোধহয় সুলতান জানালাটাকে সুরক্ষিত করবার প্রয়োজন মনে করেননি। জানালার ওপাশে রাত্রির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস কেবল পালাবার ফন্দি করতে লাগল। যে করেই হোক পালাতেই হবে। পালাতে গিয়ে যদি মৃত্যু হয় আফশোসের কিছু নেই। কারণ না পালালেও তার মৃত্যু অবধারিত।

পরের সমস্তটা দিন কেউ এল না। একজন পাহারাদার শুধু খাবার দিয়ে গেল। সুলতানও এলো না—চাবুক মারতে ফজলও এল না। কি ব্যাপার।

ফ্রান্সিস ভাবল—হয়তো সুলতান সদয় হয়েছেন। সে যে সত্যিই সোনার ঘণ্টার হদিশ জানে না, এটা বোধহয় সুলতান বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু সন্ধ্যের পরেই ফ্রান্সিসের ভুল ভাঙল। সুলতান যে কত বড় শয়তান, সে পরিচয় পেতে বিলম্ব হল না।

সন্ধ্যের একটু পরে তিনচারজন পাহারাদার এল ফ্রান্সিসের ঘরটায়। বড়-বড় সাড়াশি দিয়ে একটা গনগনে উনুন ধরাধরি করে নিয়ে এল ওরা। ফ্রান্সিস অবাক। উনুন দিয়ে কি হবে? ফ্রান্সিস দেখল—দুটো লম্বা লোহার শিক উনুনটায় গুঁজে দেওয়া হল।

একটু পরেই সুলতান এলেন। সঙ্গে রহমান। ফ্রান্সিস রহমানের পেছনে তাকাল। না ফজল আসে নি। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একমাত্র ভরসা ছিল ফজল। আজকে সেও নেই। ফ্রান্সিস মনকে শক্ত করল। ফজল যা বুদ্ধি দেবার দিয়ে গেছে। এর বেশী ও একা আর কি করতে পারে? এবার বাঁচতে হলে ফ্রান্সিসকে নিজের সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হবে। সারারাত ধরে যে ফন্দিটা মনে মনে এঁটেছে, সেটাকে কাজে লাগাতে হবে।

—কি হে—চাবুকের মার খেয়েও তো বেশ চাঙ্গা আছ দেখছি। সুলতান মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললেন।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সুলতান বললেন—এবার চটপট বলে ফেল বাছাধন, নইলে—

—সুলতান আপনি মিছিমিছি একটা নির্দোষ মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন।

—ঠিক আছে সোনার ঘণ্টার হদিশ বলে ফেল—আমি এক্ষুণি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি।

—আমি যা জানি সেটা—

ফ্রান্সিসের কথা শেষও হল না। সুলতান আঙুল নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। একজন পাহারাদার গনগনে উনুন থেকে লাল টকটকে শিক দুটো তুলে নিল। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

—এখন বলো—নইলে জন্মের মত চোখ দুটো হারাতে হবে। সুলতানের চড়া গলা শোনা গেল।

ফ্রান্সিস শিউরে উঠল। মানুষ এমন নৃশংসও হয়? ততক্ষণে লোকটা শিক দুটো ওর চোখের সামনে নিয়ে এসেছে। আগুনের উত্তাপ মুখে লাগছে। চোখের একেবারে কাছে লাল শিক দুটো। লাল টকটকে শিকের মুখ ছাড়া ও আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আর এক মুহূর্ত। পৃথিবীর সমস্ত আলো রং হারিয়ে যাবে চিরদিনের মত। আর দেরি করা যায় না। ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠল—না-না সব বলছি আমি।

সুলতান ইঙ্গিতে লোকটাকে সরে যেতে বললেন।

-এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে। সুলতান হাসলেন।

-সব বলছি সুলতান। কিন্তু তার আগে আমার হাতের শেকল খুলে দিতে বলুন।

সুলতান ইঙ্গিত করলেন। একজন পাহারাদার এসে ফ্রান্সিসের হাতের শেকল খুলে দিল। দুহাতে কবজির কাছে লোহার কড়ার দাগ পড়ে গেছে। সেই দাগের ওপর হাত বুলিয়ে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে একজন পাহারাদারের খাপ থেকে তরোয়ালটা খুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য পাহারাদাররা সাবধান হয়ে গেল। সবাই যে যার তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। এমন কি সুলতানও। ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর তরোয়ালটা দিয়ে পাথরের মেঝেতে দাগ কাটাতে লাগল। সবাই দেখলো ফ্রান্সিস একটা জাহাজের ছবির মত কিছু আঁকছে। সুলতানেরও কৌতূহল। সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—সুলতান এই হল আপনার জাহাজ। এখান থেকে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ লক্ষ্য করে আপনাকে যেতে হবে।

সুলতান মাথা ঝাঁকালেন। ফ্রান্সিস এখানে-ওখানে কয়েকটা ঢ্যাঁড়া দিল, বলল—এইগুলো হল দ্বীপ। জনবসতি নেই। সব কটাই পাথুরে দ্বীপ। এসব পেরিয়ে যেতে হবে একটা ডুবো পাহাড়ের কাছে। ডুবো পাহাড়টা উঁচু হবে—এই ধরুন ঐ জানালাটা থেকে—ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে জানালাটার দিকে এগোল। বলতে লাগল— এই জানালাটা থেকে হাত পাঁচেক— বলেই ফ্রান্সিস হঠাৎ তরোয়ালটা দাঁতে চেপে ধরে জানালাটার দিকে তীরবেগে ছুটল, এবং কেউ কিছু বোঝবার আগেই জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের অন্ধকার রাত্রির শূন্যতায় ঝাঁপ দিল। কানের দুপাশে সমুদ্রের মত্ত হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ। বাতাস কেটে ফ্রান্সিস নামছে তো নামছেই।

হঠাৎ—ঝপাং। জলের তলায় তলিয়ে গেল ফ্রান্সিস। পরক্ষণেই ভেসে উঠল—জলের ওপর। সমুদ্রের ভেজা হাওয়া লাগছে চোখেমুখে। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত আকাশ। ফ্রান্সিসের সমস্ত দেহমন আনন্দের শিহরণে কেঁপে উঠল। আঃ—মুক্তি!

ওদিকে দুর্গের জানালায়, জানালায়, প্রাচীরের ওপর সৈন্যরা মশাল হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ফ্রান্সিসকে খুঁজছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কোমরে গুঁজে নিল। তারপর গভীর সমুদ্রের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। চপ্-চপ্—জল কেটে তীর ঢুকছে। সৈন্যরা আন্দাজে তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস আর মাথা ভাসিয়ে সাঁতার কাটতে ভরসা পেল না। যদি একবার নিশানা করতে পারে! সে ডুব সাঁতার দিতে লাগল। ডুব সাঁতার দিতে-দিতে অনেকটা দূরে চলে এল। পেছন ফিরে দেখল—দুর্গটা। এখনও দেখা যাচ্ছে। মশালের ক্ষীণ আলোগুলো নড়ছে। আবার ডুব দিল ফ্রান্সিস। হঠাৎ কিসের একটা টান অনুভব করল। সমুদ্রের নীচের স্রোত ওকে টানছে। একটু পরেই টানটা আরো প্রবল হল আর তাকে মুহূর্তের মধ্যে অনেকদূরে নিয়ে গেল। এবার ভেসে উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখল—সব অন্ধকার। দুর্গের চিহ্নমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত মনে সাঁতার কাটতে লাগল।

সারারাত সাঁতার কাটল ফ্রান্সিস। অবসাদে হাত নড়তে চায় না। তখন কোনরকমে শুধু ভেসে থাকা। এইভাবে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে সাঁতার কেটে চলল। পুবের আকাশে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। একটু পরেই পুবকোণায় লাল সূর্য উঠল। আবার সমুদ্রে সেই সূর্যোদয়ের দৃশ্য। ফ্রান্সিস ভালো করে তাকাতে পারছে না। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। সবকিছু যেন ঝাপসা দেখাচ্ছে।

তবু চেয়ে-চেয়ে সূর্য ওঠা দেখল। কত পরিচিত দৃশ্য। তবু ভালো লাগল। আবার নতুন করে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা—আবার এই পুরোনো পৃথিবী, আকাশ, সূর্যোদয় দেখা। ফ্রান্সিসের হাত আর চলছে না। হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে চলল অনেকক্ষণ। হঠাৎ সামনেই দেখে একটা পাথুরে দ্বীপ। হোক ছোট দ্বীপ—হাত পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম তো, নেওয়া যাবে। দ্বীপটার কাছাকাছি আসতেই পায়ের নীচে পাথুরে মাটি ঠেকল।

শ্যাওলা ধরা পাথরে পা টিপে টিপে দ্বীপটায় উঠল। তারপর একটা মস্ত বড় পাথরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। কানে আসছে সামুদ্রিক পাখির ডাক আর দ্বীপের পাথরে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে হল—সামুদ্রিক পাখিরা তো এমনি সব দ্বীপেই ডিম পাড়ে। দেখাই যাক না দুটো একটা ডিম পাওয়া যায় কি-না। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। পাথরের খাঁজে-খাঁজে গর্ত খুঁজতে লাগল। প্রথম গর্তটায় কিছুই পেল না। শুধু খড়কুটো শুকনো ঘাস। পরের গর্তটায় ডিমের মস্ত খোল হাতে ঠেকল। দুটো ডিম। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ডিম দুটো পাথরে ঠুকে ভেঙে খেয়ে নিল। আঃ কি তৃপ্তি! কিন্তু আর শুয়ে থাকা নয়। এখনও নিরাপদ নয় সে। যদি সুলতানের সৈন্যরা জাহাজ বা নৌকা নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরোয়? অনেকক্ষণ তো বিশ্রাম নেওয়া গেল। পেটেও কিছু পড়ল। এবার জলে নামতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এলাকা থেকে দূরে পালাতে হবে।

ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পূর্ণোদ্যমে সাঁতার কাটতে লাগল। সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। উজ্জ্বল রোদ জলের ঢেউয়ের মাথায় ঝিকিয়ে উঠছে। ফ্রান্সিস এবার ডুব দিল—আশা—যদি জলের তলায় কোন স্রোতের সাহায্য পায়। কিন্তু নাঃ। নীচে কোন স্রোত নেই। ওপরে ভেসে ওঠার আগে হঠাৎ দেখল ওর ঠিক হাত পাঁচেক সামনে একটা মাছের লেজের মত কি যেন দ্রুত স'রে গেল।

হাঙর! হাঙরের মুখে করাতের দাঁতের মত দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মনে-মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল। এখন ভয় পাওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। হাঙরটা আর একবার সাঁৎ করে ওর পায়ের খুব কাছ দিয়ে ঘুরে গেল। বোধহয় পরখ করে নিচ্ছে—লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিনা—হাতে অস্ত্র আছে কিনা।

ফ্রান্সিস ভেবে দেখল—ওটাকে এক আঘাতেই নিকেশ করতে হবে—নইলে—একটু আধটু খোঁচা খেলে সঙ্গে-সঙ্গে সাবধান হয়ে যাবে। তখন আর এঁটে ওঠা যাবে না। হাঙরের চলাফেরা জলের ওপর থেকে বোঝা যাবে না। ডুব দিয়ে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়ালটা খুলল। তারপর ডুব দিল। ঝাপসা দেখল—হাত দশেক দূরে হাঙরটা এক পাক ঘুরেই সোজা ওর দিকে ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলটা শক্ত করে ধরল। হাঙরটা কাছাকাছি আসতেই ফ্রান্সিস দু'পায়ে জলে ধাক্কা দিয়ে আরো নিচে ডুব দিল। হাঙরটা তখন ওর মাথার ওপরে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে তরোয়ালটা হাঙরের বুকে বসিয়ে দিল। হাঙরটা শরীর এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে ল্যাজ ঝাপটাতে লাগল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ছাড়ল না। এখন ঐ তরোয়ালটাই একমাত্র ভরসা। ওটাকে কিছুতেই হারানো চলবে না। ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলটা ধরে জলের ওপরে মুখ তুলল। তখন ও হাঁপাচ্ছে। কিন্তু হাঙরটা যেভাবে শরীর মোচড়াচ্ছে—তাতে তরোয়ালটা ধরে রাখাই কষ্টকর।

ফ্রান্সিস আবার ডুব দিল। হাঙরটার পেটে একটা পা চেপে প্রাণপণ শক্তিতে তরোয়ালটা টানল। তরোয়ালটা উঠে এল। সঙ্গে-সঙ্গে গাঢ় লাল রক্তে জলটা লাল হয়ে যেতে লাগল। হাঙরটা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি তরোয়ালটা কোমরে গুঁজে পাগলের মত সাঁতার কাটতে লাগল। এই সাংঘাতিক জায়গাটা এখুনিই ছেড়ে যেতে হবে। রক্তের গন্ধ পেলে আরো হাঙর এসে জুটবে—তখন?

ফ্রান্সিস আর ভাবতে পারল না। সাঁতারের গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

কতক্ষণ এভাবে সাঁতার কেটেছে তা সে নিজেই জানে না, কিন্তু শরীর আর চলছে না। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসতে চাইছে। ঠিক তখনই ফ্রান্সিস

অস্পষ্ট দেখতে পেল বাতাসে ফুলে ওঠা পাল। জাহাজ! ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি জল থেকে মুখ তুলে দু'চোখ কচলে তাকাল। হ্যাঁ—জাহাজই। খুব বেশি দূরে নয়। আনন্দে ফ্রান্সিস চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি গায়ের ঢোলাহাতা জামাটা তরোয়ালের ডগায় আটকে জলের ওপর নাড়তে লাগল। একটুক্ষণ নাড়ে। তারপর তরোয়ালটা নামিয়ে দম নেয়। আবার নাড়ে। জাহাজের লোকগুলো বোধহয় ওকে দেখতে পেয়েছে। জাহাজটা ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

'ঝপাং—' জাহাজ থেকে দড়ি ফেলার শব্দ হল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি দড়ির ফাঁসটা কোমরে বেঁধে নিল। তারপর দু'হাত দিয়ে ঝোলান দড়িটা ধরল। কপিকলে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ উঠল। নাবিকেরা ওকে টেনে তুলতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল—জাহাজের রেলিঙে অনেক মানুষের উৎসুক মুখ। নিচে জলের মধ্যে ল্যাজ ঝাপটানোর শব্দে ফ্রান্সিস নিচের দিকে তাকাল। মাত্র হাত সাতেক নিচে জলের মধ্যে হাঙরের পাল অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল।

জাহাজটা ছিল মালবাহী জাহাজ। নাবিকেরা বেশিরভাগই আফ্রিকার অধিবাসী। কালো-কালো পাথরের কুঁদে তোলা শরীর যেন। ইউরোপীয় সাদা চামড়ার মানুষ যে ক'জন ছিল, ফ্রান্সিস তাদের মধ্যে নিজের দেশের লোক কাউকে দেখতে পেল না।

ফ্রান্সিসের বিছানার চারপাশে নাবিকদের ভিড় জমে গেল। সবাই জানতে চায় ওর কি হয়েছিল, কোথা থেকে আসছিল, যাবেই বা কোথায়? কিন্তু ফ্রান্সিস তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের দেখছিল শুধু। কথা বলার মত শক্তি ওর অবশিষ্ট নেই। শুধু ইশারায় জানাল—ভীষণ খিদে পেয়েছে। কয়েকজন নাবিক ছুটল খাবার আনতে।

রুটি আর মুরগীর মাংস পেট পুরে খেল ফ্রান্সিস। ওর যখন খাওয়া শেষ হয়েছে তখনই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল জাহাজের ক্যাপ্টেন। গোলগাল মুখ, পাকানো গোঁফ, ছুঁচালো দাড়ি। ক্যাপ্টেনকে দেখে ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেল। যে যার কাজে চলে গেল। ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসের বিছানার পাশে বসল। জিজ্ঞেস করল—আপনার কি জাহাজডুবি হয়েছিল?

ফ্রান্সিস ঘাড় কাত করল। ক্যাপ্টেন বলল—কোথায় যাচ্ছিলেন? —যাবার কথা ছিল মিশরের দিকে। কিন্তু—। ফ্রান্সিস দুর্বল কণ্ঠে বলল।

--ও, তা আর কেউ বেঁচে আছে?

—জানি না।

ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়াল--আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনি বিশ্রাম করুন, দু'চার দিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন।

—এই জাহাজ কোথায় যাচ্ছে?

—পর্তুগাল।

খুশীতে ফ্রান্সিসের মন নেচে উঠল। যাক, দেশের কাছাকাছিই যাবে। তারপর ওখান থেকে দেশে যাওয়ার একটা জাহাজ কি আর পাওয়া যাবে না?

তিন দিন ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠল না। চার দিনের দিন ডেক-এ উঠে এল। এদিক-ওদিক একটু পায়চারি করল। রেলিঙে ভর দিয়ে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দু'একজন নাবিক এগিয়ে এসে ওর শরীর ভালো আছে কিনা জানতে চাইল। ফ্রান্সিস সকলকেই ধন্যবাদ দিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওরা তাকে বাঁচিয়েছে। নানা কথাবার্তা হল ওদের সঙ্গে। কিন্তু ফ্রান্সিস সোনার ঘণ্টার কথা, মরু-দস্যুদের কথা,

সুলতানের দুর্গে বন্দী হয়ে থাকার কথা—এসব কিছু বললো না। কে জানে আবার কোন বিপদে পড়তে হয়।

কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পর ফ্রান্সিসের শুধু শুয়ে-শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগল না। নাবিকের কাজ করবার অভিজ্ঞতা তো ওর ছিলই। একদিন ক্যাপ্টেনকে বলল সেকথা। ছুঁচালো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ক্যাপ্টেন বলল—এখন তোমার শরীর ভালো সারেনি।

—আমি পারবো।

—বেশ হালকা ধরনের কাজ দিচ্ছি তোমাকে।

এ বন্দরে সে বন্দরে মাল খালাস্ করতে-করতে প্রায় দু'মাস পরে জাহাজটা পর্তুগালের বন্দরে পৌঁছল।

যাত্রা শেষ! বন্দরে জাহাজ পৌঁছতেই নাবিকেরা সব শহরে বেরুল আনন্দ হই-হল্লা করতে। ফ্রান্সিস গেল অন্য জাহাজের খোঁজে। ওর দেশের দিকে কোন জাহাজ যাচ্ছে কিনা। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। পেয়েও গেল একটা জাহাজ। ওদের দেশের রাজধানীতে যাচ্ছে। পরদিন ভোর রাত্রে ছাড়বে জাহাজটা। আগের জাহাজে কাজ করে ফ্রান্সিস যা জমিয়েছিল, সবটাই দিল এই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন ওকে নিতে রাজি হল। জাহাজটা ছোট। মালবাহী জাহাজ। নাবিকের সংখ্যাও কম। অনেকের সঙ্গে আলাপ হল ফ্রান্সিসের। শুধু একজন বৃদ্ধ নাবিকের সঙ্গে ফ্রান্সিসের খুব ভাব হল। ডেক ধোয়া-মোছার সময় ফ্রান্সিস তাকে সাহায্য করত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই বৃদ্ধ নাবিকটি ডেক-এর রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট খাচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা একবার ফ্রান্সিসকে দেখে নিয়ে আগের মতই আপন মনে চুরুট খেতে লাগল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—আপনি কত জায়গায় ঘুরেছেন?

নাবিকটা শূন্যে আঙুলটা ঘুরিয়ে বলল—সমস্ত পৃথিবী।

—সোনার ঘণ্টার গল্পটা জানেন?

নাবিকটি ফ্রান্সিসের দিকে ঘুরে তাকাল। এ-রকম একটা প্রশ্ন সে বোধহয় আশা করেনি। মৃদুস্বরে জবাব দিল—জানি।

—আপনি বিশ্বাস করেন?

—করি।

—আমি সেই সোনার ঘণ্টার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম!

—কিছু হদিশ পেলে?

—ঠিক বলতে পারছি না, তবে ভূমধ্যসাগরের একটা জায়গায়—নাবিকটা ওকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ম্লান হাসল—কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড়—তাই কি না?

ফ্রান্সিস আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল–তাহলে আপনিও—

—হ্যাঁ, ভাই—আমাদের জাহাজ প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তবে আমরা বহু কষ্টে পেছনে হটে আসতে পেরেছিলাম। তাই জাহাজ ডুবির হাত থেকে বেঁচেছিলাম।

নাবিকটা একটু চুপ করে থেকে বলল—একটা কথা বলি শোন—চারদিকে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল—তুমি বোধহয় গল্পের শেষটুকু জান না।

—জানি বৈকি, ডাকাত পাদরিরা সবাই জাহাজডুবি হয়ে মরে গিয়েছিল।

—না। নাবিকটি মাথা নাড়ল—একজন বেঁচেছিল। সে পরে নিজের জীবন বিপন্ন করে সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যাওয়ার একটা পথ আবিষ্কার করেছিল। ফিরে আসার অন্য একটা পথও আবিষ্কার করেছিল।

—কেন, যাওয়া-আসার একটা পথ হতে বাধা কি?

—নিশ্চয়ই কোন বাধা ছিল। যাকগে—যাওয়া আসার দুটো সমুদ্র পথের নকশা সে দুটো মোহরে কুঁদে রেখেছিল। সব সময় নাকি গলায় ঝুলিয়ে রাখত সেই মোহর দুটো, পাছে চুরি হয়ে যায়। হয়তো ডাকাত পাদরিটার ইচ্ছে ছিল দেশে ফিরে জাহাজ, লোক-লস্কর নিয়ে যাবে। সোনার ঘণ্টা থেকে সোনা কেটে-কেটে আনবে, কিন্তু—ডাকাত পাদরিটা মারা গেল।

তাই নাকি?

—হ্যাঁ, মরু-দস্যুদের হাতে সে প্রাণ হারাল।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। ফজল তো ঠিক এমনি একটা ঘটনাই ওকে বলেছিল। ফ্রান্সিস আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করল—আর সেই মোহর দুটো?

—মরু-দস্যুরা লুঠ করে নিয়েছিল। তারপর সেই মোহর দুটোর হদিস কেউ জানে না।

—আচ্ছা, মরু-দস্যুরা কি জানত, মোহর দুটোয় নকশা আঁকা আছে?

—ওরা তো অশিক্ষিত বর্বর, নকশা বোঝার ক্ষমতা ওদের কোথায়।

এমন সময় কয়েকজন নাবিক কথা বলতে-বলতে ওদের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর কোন প্রশ্ন করল না। তার কেবল মনে পড়তে লাগল সেই মোহর দুটোর কথা। আবছা একটা মাথায় ছাপ ছিল, আর কয়েকটা রেখার আঁকিবুকি।

ঘুম আসতে চায় না ফ্রান্সিসের। নিজের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করছে! ইস-মোহর দুটো একবার ভালো করে দেখেও নি সে। এইবার মকবুলের মোহর চুরির রহস্য ফ্রান্সিসের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মকবুল নিশ্চয়ই জানত মোহর দুটোর কথা। তাই ও সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে ওকে এতিমখানায় নিয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সিসের মোহরটা চুরি করেছিল। কিন্তু আর একটা মোহর? সেটা হাতে-না পেলে তো মকবুল পুরো পথের নকশা পাবে না। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল একটা ঘটনা। আশ্চর্য! সেদিন ঐ ঘটনার গুরুত্ব সে বুঝতে পারেনি। একদিন সকালে বাজারে যাওয়ার পথে দেখেছিল সেই জহুরির দোকানটার কাছে বহুলোকের ভিড়। দোকানটা কারা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আশেপাশের দোকানগুলোর কোন ক্ষতি হয়নি, অথচ ঐ দোকানটা ভেঙেচুরে একশেষ। ফ্রান্সিস শুনল—গত রাত্রে দোকানটায় ডাকাত পড়েছিল। আজকে ঐ ডাকাতির অর্থ পরিষ্কার হল। আসলে মকবুল তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই দোকানটায় হানা দিয়েছিল। লক্ষ্য সেই মোহরটা চুরি করা। তাহলে মকবুলও সোনার ঘণ্টার ধান্ধায় ঘুরছে। আশ্চর্য!

পাঁচদিন পরে জাহাজটা ভাইকিংদের দেশের রাজধানীতে এসে পৌঁছাল। ফ্রান্সিসের যেন তর সয় না। কতক্ষণে শহর-বন্দরে ভিড়বে। জাহজটা ধীরে-ধীরে এসে জেটিতে লাগল। জেটির গেট খুলে দিতেই ফ্রান্সিস এক ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

তখন সকাল হয়েছে। কুয়াশায় ঢেকে আছে শহরের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল ফ্রান্সিস। 'টক্-টক্-টক্-টক্' ঘোড়ার গাড়ি চলল পাথর বাঁধানো পথে শব্দ তুলে। ফ্রান্সিসের আবাল্য পরিচিত শহর। খুশিতে ফ্রান্সিস কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। একবার এই জানালা দিয়ে তাকায়, আর একবার ঐ জানালা দিয়ে। কতদিন পরে দেশের লোকজন, পথঘাট দেখতে পেল!

বাড়ির গেট-এর লতাগাছটা দু'দিকের দেয়ালে বেয়ে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস ওটাকে চারাগাছ দেখে গিয়েছিল। কত অজস্র ফুল ফুটেছে গাছটায়। গেট ঠেলে

ঢুকল ফ্রান্সিস। প্রথমেই দেখল মা'কে। বাগানে ফুলগাছের তদারকি করছে। ফ্রান্সিস শব্দ না করে আস্তে-আস্তে মা'র পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। সেই ছোটবেলা সে মাকে এমনি করেই চমকে দিত। ওদের বুড়ো মালিটা হঠাৎ মুখ তুলে ফ্রান্সিসকে দেখেই প্রথমে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর ফোকলা মুখে একগাল হাসল। মা ওকে হাসতে দেখে ধমক লাগাল। তবু হাসছে দেখে মা পেছন ফিরে তাকাল। বয়সের রেখা পড়েছে মার মুখে। বড় শীর্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে মাকে। ফ্রান্সিস আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। মার কান্না আর থামে না। ফ্রান্সিসের মাথায় হাত বুলোয় আর বিড়বিড় করে বলে —পাগল, বদ্ধ পাগল তুই—আমার কথা একবারও মনে হয় না তোর? এ্যাঁ—পাগল কোথাকার—

গেট ঠেলে ঢুকল ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিসের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সে বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করল। ওর চোখে জল দেখলে মাও অস্থির হয়ে পড়বে।

বাবা বাড়ি নেই। রাজপ্রাসাদে গেছেন সেই ভোরবেলা। কি সব জরুরী পরামর্শ আছে রাজার সঙ্গে। যাক—বাঁচা গেল। এখন খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তে একটা ঘুম দেবে।

কিন্তু ফ্রান্সিসের কপালে নিশ্চিন্ত ঘুম নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মা'র কণ্ঠস্বর শুনল—বেচারা ঘুমুচ্ছে—এখন আর তুলে—

—হুঁ। বাবার সেই গম্ভীর গলা শোনা গেল।

একটু পরে দরজা খুলে গেল। আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের বাবা এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বিছানার ওপরে উঠে বসল। বাবা কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আমতা-আমতা করে বলতে লাগল—ম্-মানে ইয়ে হয়েছে—

—পুরো এক মাস এইখান থেকে কোথাও বেরোবে না।

—বেশ—ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলার চেষ্টা করল না।

—পালিয়েছিলে কেন?

—বললে তো আর যেতে দিতে না।

—হুঁ!

—বিশ্বাস কর বাবা, সোনার ঘণ্টা সত্যিই আছে।

—মুণ্ডু।

—আমি সোনার ঘণ্টার বাজনার শব্দ শুনেছি।

—এখন ঘরে বসেই সোনার ঘণ্টার বাজনা শোন।

—একটা জাহাজ পেলেই আমি—

—আবার! বাবা হেঁকে উঠলেন।

ফ্রান্সিস চুপ করে গেল। ফ্রান্সিসের বাবা দরজার দিকে পা বাড়ালেন। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—এদিকে এসো।

ফ্রান্সিস ভয়ে-ভয়ে বিছানা থেকে নেমে বাবার কাছে গেল।

—কাছে এসো।

ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে এগোল। হঠাৎ বাবা তাকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কয়েক মুহূর্ত। ফ্রান্সিস বুঝল বাবার শরীর আবেগে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। হঠাৎ ফ্রান্সিসকে ছেড়ে দিয়ে ওর বাবা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ফ্রান্সিস দেখল, বাবা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন।

বেশ কিছুদিন গেল। ফ্রান্সিস আবার সেই আগের মতই শক্তি ফিরে পেয়েছে—দৃপ্ত, সতেজ। কিন্তু মনে শান্তি নেই। এও তো আর এক রকমের বন্দী জীবন। ওর মত দুরন্ত ছেলের পক্ষে একটা ঘরে আটকা পড়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। তবু বাবার অজান্তে মা ওকে বাগানে যেতে দেয়, গেট-এ গিয়েও দাঁড়ায় কখনো-কখনো। কিন্তু বাড়ীর বাইরে যাবার উপায় নেই। মার কড়া নজর। বন্ধু-বান্ধবের দল বেঁধে আসে। ফ্রান্সিসের কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। বন্ধুরা সব অবাক হয়ে ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনে। ফ্রান্সিস বলে—ভাই তোমরা যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও, তাহলে সোনার ঘণ্টা আমার হাতের মুঠোয়।

ওরা তো সবাই ভাইকিং। সাহসে, শক্তিতে ওরাও কিছু কম যায় না; ওরা হইচই করে ওঠে—আমরা যাব। ফ্রান্সিস ঠোঁট আঙ্গুলে ঠেকিয়ে ওদের শান্ত হতে ইঙ্গিত করে। মা টের পেলে অনর্থ করবে।

ফ্রান্সিসের নিকট বন্ধু হ্যারি। কিন্তু সে চেঁচামেচিতে যোগ দেয় না। সে বারবারই ঠাণ্ডা প্রকৃতির, কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান। সে শুধু বলে—আগে একটা জাহাজের বন্দোবস্ত করো—আমাদের নিজেদের জাহাজ—তারপর কার কত উৎসাহ দেখা যাবে।

আবার চেঁচামেচি শুরু হয়। মা ঘরে ঢোকে। বলল—কি ব্যাপার?

সবাই চুপ করে যায়। মা সবই আন্দাজ করতে পারে। তাই ফ্রান্সিসের ছোট ভাইটাকে পাঠিয়ে দেয়। সে এসে ওদের আড্ডায় বসে থাকে। ব্যাস—আর কিছু বলবার নেই! ওরা যা বলবে ঠিক ফ্রান্সিসের মার কানে পৌঁছে যাবে। সব মাটি তাহলে—

একা-একা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে দিন কাটতে চায় না। সমুদ্রের উন্মত্ত গর্জন, উত্তাল ঢেউ তাকে প্রতিনিয়ত ডাকে। আবার কবে সমুদ্রে যাবে—বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে, ফ্রান্সিস শুধু ভাবে আর ভাবে। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করবে তারও উপায় নেই। মার কড়া নজর। অগত্যা একটা উপায় বের করতে হল। রাত্রে মা একবার এসে দেখে যায়, ছেলে ঘুমোল কিনা। ফ্রান্সিস সেদিন ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। মা নিশ্চিন্ত মনে ঘর থেকে চলে যেতেই ফ্রান্সিস জানলা খুলে মোটা লতাগাছটা বেয়ে নিচে বাগানে নেমে এল। তারপর দেয়াল ডিঙিয়ে রাস্তায়।

বন্ধুদের ডেকে পাঠাতে একটু সময় গেল। ততক্ষণ ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে একটা পোড়া বাড়িতে বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একজন-দুজন করে সবাই এল। সোনার ঘণ্টা আনতে যাবে, এই উত্তেজনায় হই-চই শুরু করে দিলো। ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল। গোলমাল একটু কমলে ফ্রান্সিস বলতে শুরু করল— ভাই সব,

শুধু উৎসাহকে সম্বল করে কোন কাজ হয় না। ধৈর্য চাই, চিন্তা চাই। দীর্ঘদিন ধরে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে আমাদের। নিজেদের দাঁড় বাইতে হবে, পাল খাটাতে হবে, ডেক পরিষ্কার করতে হবে, আবার ঝড়ের সঙ্গে লড়তে হবে, ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা সামলাতে হবে। কি, পারবে তোমরা?

—আমরা পারবো—সবই সমস্বরে বলে উঠল।

—হয়তো আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম, খাদ্য ফুরিয়ে গেল, জল ফুরিয়ে গেল—তখন কিন্তু অধৈর্য হবে না—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করাও চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বুক দিয়ে সব কষ্ট সহ্য করতে হবে। কি পারবে?

—পারবো। আবার সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

কয়েক রাত এই রকম সভাও পরামর্শ হল। কিভাবে একটা জাহাজ জোগাড় করা যায়? ফ্রান্সিস দু' একবার বাবাকে বলবার চেষ্টা করেছে—যদি উনি রাজার কাছ থেকে একটা জাহাজ আদায় করে দেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন।

হ্যারিই প্রথমে বুদ্ধিটা দিল। হ্যারি কথা বলে কম, কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সে বলল—আমরা রাজার জাহাজ চুরি করব।

—জাহাজ চুরি? সবাই অবাক।

—হ্যাঁ, রাজা যখন চাইলে জাহাজ দেবেন না, তখন চুরি ছাড়া উপায় কি।

—কিন্তু —ফ্রান্সিস দ্বিধাগ্রস্ত হল।

—আমরা তো সমুদ্রে ভেসে পড়ব, রাজা আমাদের ধরতে পারলেতো! তাছাড়া—যদি সত্যিই সোনার ঘণ্টা আনতে পারি—তখন—

—ঠিক—ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হল।

গভীর রাত্রি। বন্দরের এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। মশালের আলো জলে কাঁপছে। রাজার সৈন্যরা বন্দর পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে নোঙর করা রয়েছে রাজার জাহাজগুলো।

প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে ফ্রান্সিস আর তার পঁয়ত্রিশজন বন্ধু জাহাজগুলোর দিকে এগোতে লাগল। পাথরের ঢিবি, খড়ের গাদা, স্তূপীকৃত কাঠের বাক্সের আড়ালে-আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। হাতের কাছে সব চাইতে বড় যে জাহাজটা, সেটাতেই নিঃশব্দে উঠতে লাগল সবাই। যে সব প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছিল, তারা এতগুলো লোককে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে জাহাজে উঠতে দেখে অবাক হয়ে গেল। ওরা খাপ থেকে তরোয়াল খোলবার আগেই ফ্রান্সিসের বন্ধুরা একে-একে সবাইকে কাবু করে ফেলল। তারপর জাহাজ থেকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিল। জাহাজটা কূল ছেড়ে সমুদ্রের দিকে ভেসে চলল।

এদিকে হয়েছে কি, সেই জাহাজে রাজার নৌবাহিনীর সেনাপতি একটা গোপন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল রাজার বিরুদ্ধে। সেনাপতিই ছিল সেই ষড়যন্ত্রের নেতা। যাতে আরো সৈন্য তার দলে এসে যোগ দেয়, গোপন সভার সেটাই ছিল উদ্দেশ্য। তারা আলোচনায় এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, তারা জানতেও পারল না কখন জাহজাটা চুরি গেছে, আর জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ জাহাজটা দুলে-দুলে উঠতে লাগল। সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা তো অবাক। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে এল কি করে? ওরা সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল কি ব্যাপার দেখতে। ওরা উঠে আসছে বুঝতে পেরে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা সব লুকিয়ে পড়ল। সেনাপতি তার দলবল নিয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই সবাই লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। সেনাপতি খুব বুদ্ধিমান। বুঝল, এখন ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। লোকদের ইঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—সেনাপতি মশাই, আপনাকেও আমরা সঙ্গে পাব, এটা ভাবতেই পারিনি। যাকগে, মিছিমিছি তরোয়াল খুলবেন না, দেখতেই পাচ্ছেন আমরা দলে ভারি। এবার আপনাদের তরোয়াগুলো দিয়ে দিন।

সেনাপতি নিঃশব্দে নিজের তরোয়াল সুদ্ধ বেল্টটা ডেক-এর ওপর রেখে দিল।

সেনাপতি নিঃশব্দে নিজের তরোয়াল সুদ্ধ বেল্টটা ডেক-এর ওপর রেখে দিল। সেনাপতির দেখাদেখি তার দলের সৈন্যরাও তরোয়াল খুলে ডেক-এর ওপর রাখল। ফ্রান্সিসের দলের একজন তরোয়ালগুলো নিয়ে চলে গেল। সেনাপতি গম্ভীর মুখে বলল—তোমরা রাজার জাহাজ চুরি করেছ—এজন্যে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।

—সে আমরা বুঝবো —ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তোমরা জাহাজ নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

—সোনার ঘণ্টা আনতে—

সেনাপতি মুখ বেঁকিয়ে হাসল—ওটা একটা ছেলে ভোলানো গল্প।

—দেখাই যাক না। ফ্রান্সিস হাসল।

ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। পালগুলো ফুলে উঠেছে হাওয়ার তোড়ে। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজ চলতে লাগল দ্রুতগতিতে। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা খুব খুশী। দাঁড় টানতে হচ্ছে না। সমুদ্রও শান্ত। খুব সুলক্ষণ। নির্বিঘ্নেই ওঁরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে।

ফ্রান্সিস কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার মনে শান্তি নেই! সারাদিন যায় জাহাজের কাজকর্ম তদারকি করতে। তারপর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, ফ্রান্সিস তখন একা-একা ডেক-এর ওপর পায়চারী করে। কখনও বা রেলিং ধরে দূর অন্ধকার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। একমাত্র চিন্তা—কবে এই যাত্রা শেষ হবে—দ্বীপে গিয়ে পৌঁছবে। মাঝে-মাঝে হ্যারি বিছানা থেকে উঠে আসে। ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে—এবার শুয়ে পড়গে যাও।

—হ্যারি —ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলে—তুমি তো জানো সোনার ঘণ্টা আমার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন। যতদিন না সেটার হদিস পাচ্ছি, ততদিন আমি শান্তিতে ঘুমুতো পারব না। তবু শরীরটাকে তো বিশ্রাম দেবে! হ্যারি বলে।

—হ্যাঁ, বিশ্রাম। ফ্রান্সিস হাসল—চল।

কতদিন হয়ে গেল। জাহাজ চলেছে তো চলেছেই। এর মধ্যে তিনবার ফ্রান্সিসদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়েছিল। প্রথম দু'বারের ঝড় ওদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু শেষ ঝড়টা এসেছিল হঠাৎ। পাল নামাতে-নামাতে দুটো পাল ফেঁসে গিয়েছিল। পালের

দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে সব মেরামত করতে হয়েছে। কিন্তু সেলাই করা পালে তো ভরসা করা যায় না। জোর হাওয়ার মুখে আবার ফেঁসে যেতে পারে।

জাহাজ তখন ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। কোন বন্দরে জাহাজ থামিয়ে পালটা পালটে নিতে হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হল না। কেউ আর দেরি করতে চায় না। কতদিন হয়ে গেল দেশ-বাড়ি ছেড়ে এসেছে। ফেরার জন্যে সকলেই উদগ্রীব। কিন্তু ফ্রান্সিস দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—পালটা পাল্টাতেই হবে। যে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে তাদের পড়তে হবে, সে সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণাই নেই। শুধু ফ্রান্সিসই জানে তার ভয়াবহতা। সেই মাথার ওপর উন্মত্ত ঝড় আর নীচে ডুবো পাহাড়ের বিশ্বাসঘাতকতা। সে সব সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। প্রায় সকলেরই ধারণা হল, ফ্রান্সিস বিপদটাকে বাড়িয়ে দেখছে। এই নিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গীদের মধ্যে গুঞ্জনও চলল।

সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা এতদিন চুপ করে সব দেখছিল। ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে তার সঙ্গীদের ক্ষেপিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছিল। এবার সুযোগ পাওয়া গেল। এর মধ্যে ফ্রান্সিসের একটা হুকুমও সবাই ভালো মনে নিল না। ফ্রান্সিসেরই তিনজন সঙ্গী দেশে ফিরে যাবার জন্যে বারবার ফ্রান্সিসকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু ফ্রান্সিস অটল। অসম্ভব—ফিরে যাওয়া চলবে না। সে সোজা বলল—ওসব ভাবনা মন থেকে তাড়াও। কাজ শেষ না করে কেউ ফেরার কথা মুখেও এনো না। কিন্তু ওরাও নাছোড়বান্দা। ওদের প্যানপ্যানিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ফ্রান্সিস। তাই যে ছোট্ট বন্দরটায় পালটা পাল্টাবার জন্যে জাহাজটা থামল, ফ্রান্সিস ওদের সেখানে জোর করে নামিয়ে দিল। অন্য জাহাজে করে ওরা যেন দেশে ফিরে যায়। এমনিতেই ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনাটা তাতে আরো একটু ইন্ধন জোগাল। সেই ছোট্ট বন্দরে পালটা বদলে, জাহাজের টুকিটাকি মেরামত সেরে নিয়ে তাদের যাত্রা আবার শুরু হল।

দিন যায়, রাত যায়। কিন্তু কোথায় সেই দ্বীপ? কোথায় সেই সোনার ঘণ্টা? সকলেই হতাশায় ভেঙে পড়তে লাগল। এ কোথায় চলেছি আমরা? গল্পের সোনার ঘণ্টার অস্তিত্ব আছে কি? না কি সবটাই ফ্রান্সিসের উদ্ভট কল্পনা? সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা এতদিনে সুযোগ পেল। তারা গোপনে সবাইকে বোঝাতে লাগল—ফ্রান্সিস উন্মাদ। একটা ছেলে ভুলানো গল্পকে সত্যি ভেবে নিয়েছে। আর দিন নেই, রাত নেই, সেই কথা ভাবতে-ভাবতে ও উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ও পাগল বলে আমরা তো পাগল হতে পারি না? দীর্ঘদিন আমরা দেশ ছেড়েছি। কোথায় চলেছি, তার ঠিকানা নেই। কবে দেশে ফিরব, অথবা কেউ ফিরতে পারব কি না, তাও জানি না। একটা কাল্পনিক জিনিসের জন্যে আমরা এ ভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করতে যাব কেন?

কিন্তু উপায় কি? সবাই মুষড়ে পড়ল। সেনাপতিও ধীরে-ধীরে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে লাগল।

এর মধ্যে আর এক বিপদ। জাহাজে খাদ্যাভাব দেখা দিল। মজুত জলে তখনও টান পড়েনি। কিন্তু কম খেয়ে আর কতদিন চলে? খাদ্য যা আছে, তাতে আর কিছুদিন মাত্র চলবে। তারপর? সেনাপতি বুদ্ধি দিল সবাইকে।এখনও সময় আছে। চল আমরা ফিরে যাই। এই সবকিছুর মূল হচ্ছে ফ্রান্সিস। তার নেতৃত্ব অস্বীকার করো। বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওকে জলে ফেলে দাও। তারপর জাহাজ ঘোরাও দেশের দিকে।

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। শুধু হ্যারি সবকিছু আঁচ করে বিপদ গুনলো।

ফ্রান্সিস কিন্তু এসব ব্যাপার কিছুই আঁচ করতে পারেনি। ওর তো একটাই চিন্তা যে করেই হোক সেই দ্বীপে পৌঁছতে হবে। আজকাল ওর বন্ধুরা কেমন যেন এড়িয়ে-এড়িয়ে

চলে। ওর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। একমাত্র হ্যারিই আগের মত ফ্রান্সিসের সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। তবে তার প্রশ্নেও সংশয়ের আভাস ফুটে ওঠে।

গভীর রাত্রিরে ডেক-এ দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল দু'জনে। হ্যারি জিজ্ঞাসা করল—ফ্রান্সিস তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর, সোনার ঘণ্টা বলে কিছু আছে?

—তোমার মনে সন্দেহ জাগছে? ফ্রান্সিস একটু হাসে।

—সে কথা নয়। এতগুলো লোক একমাত্র তোমার ওপর ভরসা করেই যাচ্ছে।

—হ্যারি আমি জাহাজ ছাড়ার সময়ই বলেছিলাম—যারা আমার সঙ্গে যাচ্ছে, সকলের জীবনের দায়িত্ব আমার। কাউকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাই আমি দেব।

—তোমাকে আমি ভালো করেই জানি ফ্রান্সিস—কথার খেলাপ তুমি করবে না! কিন্তু হাজার হোক মানুষের মন তো—

—আমি বুঝি হ্যারি! দীর্ঘদিন আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি— আত্মীয়স্বজন, বাড়ী ঘরের জন্যে মন খারাপ করবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে সব সময় পিছুটান অস্বীকার করতে হয়। নইলে আমরা এগোতেই পারব না।

—আচ্ছা ফ্রান্সিস, তুমি আমাদের যা-যা বলেছ, সে সব তোমার কল্পনা নয় তো?

ফ্রান্সিস কিছু বলল না। কাঁধের কাছে জামাটা একটানে খুলে ফেলল। ও তরোয়ালের কোপের সেই গভীর ক্ষতটা দেখিয়ে বলল—এটাও কি কল্পনা হ্যারি?

হ্যারি চুপ করে গেল। বলতে সাহস করল না যে, ওর বন্ধুরা সবাই ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস কথাটা শুনলে হয়তো ক্ষেপে গিয়ে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চূড়ান্ত রূপ নিল একদিন। সেদিন সকাল থেকেই সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা গোপনে ফ্রান্সিসের কয়েকজন বন্ধুকে বলল—জানো আমরা পথ হারিয়েছি। ফ্রান্সিস নিজেই জানে না, জাহাজ এখন কোনদিকে, কোথায় চলেছে।

এমনিতেই সকলের মনে অসন্তোষ জমেছিল। এই মিথ্যা রটনা যেন শুকনো বারুদের স্তূপে আগুন দিল। মুহূর্তে খবরটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সেনাপতির নেতৃত্বে গোপন সভা বসল। সবাই একমত হলো সেনাপতিই হবে জাহাজের ক্যাপ্টেন। ফ্রান্সিসের হুকুম আর চলবে না। হ্যারিও সভার ব্যাপারটা আঁচ করে সেখানে গিয়ে হাজির হল। সে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে উঠল। কিন্তু পারল না। তার আগেই কয়েকজন মিলে তাকে ধরে ফেলল। একটা ঘরে কয়েদী করে রেখে দিল। ফ্রান্সিস যাতে আগে থাকতে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে, তার জন্যে সবাই সাবধান হল।

তখন গভীর রাত। ফ্রান্সিস একা-একা ডেকে পায়চারী করছে! পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। ফ্রান্সিসের কিন্তু কোনদিকে চোখ নেই। ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে জ্যোৎস্নাধোয়া দিগন্তের দিকে।

হঠাৎ পেছনে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। ও ভেবেছিল হ্যারি এসেছে বোধহয়। কিন্তু না। হ্যারি নয়—সেনাপতি। পেছনে তার দলের কয়েকজন। ফ্রান্সিসের আশ্চর্য হওয়ার তখনও বাকি ছিল। নীচ থেকে সিঁড়ি বেয়ে ফ্রান্সিসের সবাই দল বেঁধে উঠে আসছে ডেক-এ। ব্যাপারটা কি?

সেনাপতি এগিয়ে এসে ডাকল— ফ্রান্সিস?

—হুঁ।

—আমরা কেন উঠে এসেছি বুঝতে পেরেছ?

—না।

—তোমাকে একটা কথা জানাতে।

—কি কথা?

—এই জাহাজ তোমার হুকুমে আর চলবে না।

—কেন?

—তোমাকে কেউ আর বিশ্বাস করে না।

—তাহলে কাকে বিশ্বাস করে?

—আমাকে। এই জাহাজের দায়িত্ব এখন আমার।

ফ্রান্সিসের কাছে এবার সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ষড়যন্ত্রের মূলে সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা। তারাই ওর বন্ধুদের মন বিষিয়ে তুলেছে। ফ্রান্সিস এবার সকলের দিকে তাকাল। চীৎকার করে বলল—ভাইসব, আমাকে বিশ্বাস করো না তোমরা?

কেউ কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউ-কেউ মুখ ফেরাল। কেউ-কেউ মাথা নিচু করল। আশ্চর্য! হ্যারি কোথায়?

ফ্রান্সিস বুঝল, তা'হলে ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর দুঃখে তার বুক ভেঙে যেতে লাগল। একটা স্বপ্নকে কেন্দ্র করে এত কষ্ট, এর পরিশ্রম, সব ব্যর্থ হয়ে গেল! স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। ফ্রান্সিস অশ্রু-রুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, 'ভাইসব, অতি নগণ্যসংখ্যক হলেও পৃথিবীর এমন কিছু মানুষ আছে, ঘরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাদের ঘরে আটকে রাখতে পারে না। বাইরের পৃথিবীতে জীবনমৃত্যুর যে খেলা চলছে—নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেই খেলায় মাতে সে। এর মধ্যেই সে বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায়। আমিও তেমনি একজন মানুষ —ফ্রান্সিস একটু থামল। তারপর বলতে লাগল, তোমাদের কারো মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, সোনার ঘণ্টা খুঁজে বের করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য কি? উত্তর খুবই সহজ—আমি বড়লোক হতে চাই? কিন্তু তোমরা আমার বন্ধু। ভালো করেই জানো আমাদের পরিবার যথেষ্ট বিত্তশালী। তবে কেন এত আগ্রহ? কেন এই অভিযান? ভাইসব, উদ্দেশ্য আমার একটাই। ছেলেবেলা থেকে যে গল্প শুনে আসছি, কত রাতের স্বপ্নে দেখেছি যে সোনার ঘণ্টা সেটা খুঁজে বের করব। তারপর দেশে নিয়ে যাব। আমাদের রাজাকে উপহার দেব। ব্যস্—আমার কাজ শেষ। এর জন্যে যে কোন দুঃখকষ্ট, বিপদ-বিপর্যয় এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও আমি দ্বিধাবোধ করব না।

ফ্রান্সিস একটু থেমে আবারবলতেলাগল—তোমরা সেনাপতিকে ক্যাপ্টেন বলে মেনে নিয়েছো। ভালো কথা। জাহাজের মুখ ঘোরাও দেশের দিকে। ফিরে গিয়ে ঘরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাওগে। কিন্তু আমি ফিরে যাব না। ফেরার পথে প্রথমে যে বন্দরটা পাব, আমি সেখানেই নেমে যাব। জাহাজ জোগাড় করে আবার আসবো। আমাকে যদি সারাজীবন ধরে সোনার ঘণ্টার জন্যে আসতে হয়, আমি আসব।

ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ সেনাপতি চেঁচিয়ে বলল—এসব বাজে কথা শোনার সময় নেই আমার। জাহাজের মুখ ঘোরাও।

ভীড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। দেশে ফিরে যাবে, এই আনন্দে সবাই চীৎকার করে উঠল। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করেনি, চাঁদের আলো ম্লান হয়ে গেছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের মত কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। বাতাস থেমে গেছে। জাহাজের গতিও কমে এসেছে। ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলল—এত কুয়াশা এল কোত্থেকে?

কথাটা কারো-কারো কানে গেল। তারা কুয়াশা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য! এত কুয়াশা? এই অসময়ে? গুঞ্জন উঠল ওদের মধ্যে। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কুয়াশার সেই আস্তরণের দিকে।

ফ্রান্সিস রেলিঙে ভর দিয়ে হাতে মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সেও লক্ষ্য করেনি চারিদিকের পরিবেশ এই পালটে যাওয়ার ঘটনাটা। হঠাৎ ওর কানে গেল সকলের ভীত গুঞ্জন। ফ্রান্সিস মুখ তুলল। এ কি! চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। কুয়াশার ঘন আস্তরণ ঢেকে অস্তরণ ঢেকে দিয়েছে সমুদ্র আকাশ।

ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল-- 'এক মুহূর্ত নষ্ট করবার মত সময় নেই। দাঁড়ে হাত লাগাও। সামনেই প্রচণ্ড ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের বাধা। সবাই তৈরী হও।

কিন্তু সেই ভীড়ে কোন চাঞ্চল্য জাগল না। সবাই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। কি করছে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না।

হঠাৎ সেনাপতি চীৎকার করে ব'লে উঠল—সব ধাপ্পাবাজি।

ফ্রান্সিস সেনাপতির দিকে একবার তাকাল। তারপর দুহাত তুলে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল—আমাকে বিশ্বাস কর। আমার বন্ধুত্বের মর্যাদা দাও। সবাই তৈরি হও দেরি করো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরা সোনার ঘণ্টার বাজনার শব্দ শুনতে পাবে।

—পাগলের প্রলাপ—সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না। ফ্রান্সিস তবু বলে যেতে লাগল— পাল নামাও, দাঁড়ে হাত লাগাও।

ফ্রান্সিস আর বলতে পারল না। পিঠে কে যেন তরোয়ালের ডগাটা চেপে ধরেছে। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াতে গেল। পারলো না। সঙ্গে-সঙ্গে তরোয়ালের চাপ বেড়ে গেল। শুনল সেনাপতি দাঁত চাপা স্বরে বলছে—আর একটা কথা বলেছো তো, জন্মের মত তোমার কথা বলা থামিয়ে দেব।

সেনাপতির কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় সমস্ত জাহাজটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। উত্তাল ঢেউ জাহাজের রেলিঙের ওপর দিয়ে ছুটে এসে ডেকে আছড়ে পড়ল। সেনাপতি কোথায় ছিটকে পড়ল। অন্য সকলেও এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। শুরু হল জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনি। ডেকে দাঁড়ায় তখন কার সাধ্য। ঠিক তখনই ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে বেজে উঠল সোনার ঘণ্টার গম্ভীর শব্দ—ঢং—ঢং—ঢং।

ডেকে এখানে-ওখানে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলো উৎকর্ণ হয়ে শুনল সেই ঘণ্টার শব্দ। এই ঘণ্টা যেন মন্ত্রের মত কাজ করল। সোনার ঘণ্টা—এত কাছে। জাতে ভাইকিং ওরা। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের নিবিড় সম্পর্ক। ঝড় প্রচণ্ড সন্দেহ নেই। সমুদ্রও উন্মত্ত। কিন্তু ওরাও জানে কীভাবে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। ওরা আর কারো নির্দেশের অপেক্ষা করল না। একদল গেল দাঁড় বাইতে, আর একদল গেল মাস্তুলের দিকে পাল নামাতে।

মাস্তুলের মাথায় উঠে দেখতে হবে ঘণ্টার শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে। ফ্রান্সিস জাহাজের ভীষণ দুলুনি উপেক্ষা করে মাস্তুল বেয়ে উঠতে লাগল। একেবারে মাথায় উঠে প্রাণপণ শক্তিতে মাস্তুলটা আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর যেদিক থেকে ঘণ্টার শব্দ আসছে, সেইদিকে তাকাল। ঝড়-বৃষ্টির আবছা আবরণের মধ্যে দিয়ে দেখল, দু'টো পাহাড়ের মত পাথুরে দ্বীপ। মাঝখানে সমুদ্রের জল বিস্তৃত। আশ্চর্য! সেখানে সমুদ্র শান্ত। সেই সমুদ্রের মধ্যে দূরে একটা নিঃসঙ্গী পাহাড়ের মত দ্বীপ। পাথুরে দ্বীপ নয়। সবুজ ঘাস আছে দ্বীপটার গায়ে। তার মাথায় একটা সাদা রং-এর মন্দির ' মত। শব্দটা আসছে সেই দিক থেকেই। ফ্রান্সিস আর কিছুই দেখতে পেল না। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা কাত হয়ে গেল। মাস্তুল

থেকে প্রায় ছিটকে পড়ার মত অবস্থা। ও তাড়াতাড়ি মাস্তুল বেয়ে নীচে নামতে লাগল। ডেকে পা দেবার আগেই দুটো পাল খাটাবার কাঠ সশব্দে ভেঙে পড়ল। ডেকে কয়েকজন চীৎকার করে উঠল। কি হল, তা আর তাকিয়ে দেখবার অবকাশ নেই।

ফ্রান্সিস ডেকে নেমেই ছুটল সিঁড়ির দিকে। নীচে নেমে চলে এল দাঁড় টানার লম্বা ঘরটায়। সারি-সারি বেঞ্চিগুলোর দিকে তাকাল। দেখলো, সবাই প্রাণপণে দাঁড় টানছে। জাহাজের দুলুনিতে ভালোভাবে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস সেই দুলুনির মধ্যে কোনরকমে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল—ভাইসব, সামনেই ডুবো পাহাড়। আমরা আর সামনের দিকে যাব না। জাহাজ পিছিয়ে আনতে হবে। ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়াতে হবে। তারপর ঝড়ের ঝাপটায় জাহাজ যে দিকে যায় যাক।

সবাই দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে ফ্রান্সিসের কথা শুনল। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ফ্রান্সিস যে সত্য কথাই বলেছে, এ বিষয়ে কারও মনে আর সন্দেহ রইল না। এবার সবাই উল্টোদিকে দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ পিছিয়ে আসতে লাগল। ঝড়ের কয়েকটা প্রচণ্ড ধাক্কায় অনেকটা পিছিয়ে এল। কিন্তু ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়াতে পারলো না। খুব জোরে ধাক্কা লাগল না তাই রক্ষে। পেছনের হালটা মড়-মড় করে ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে পেছনের রেলিঙের কাছে অনেকটা জায়গা ভেঙে খোঁদল হয়ে গেল। তবু খোঁদলটা বেশ উঁচুতে হল বলে বেশী জল ঢুকতে পারলো না। জাহাজ ডোবার ভয়ও রইল না। তারপর ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কলার মোচার মত নাচতে-নাচতে জাহাজ কোনদিকে যে চললো কেউ বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিস ততক্ষণে জাহাজের খোলার ঘরগুলো খুঁজতে আরম্ভ করেছে। এ ... দরজায় ও ঘরের কাঠের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে-খেতেও হ্যারিকে খুঁজতে লাগল। একটা বন্ধ ঘরের দরজায় ফ্রান্সিস জোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকল—'হ্যারি!'

ভেতর থেকে হ্যারির উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—'কে? ফ্রান্সিস!'

ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় লাথি মারতে লাগল। কিন্তু দরজা ভাঙল না। মরচে ধরা কড়াটা একটু আলগা হল। তালাটা ঠিকই ঝুলতে লাগল। এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে একটা হাতলভাঙা হাতুড়ি নজরে পড়ল। সেটা এনে মরচে ধরা কড়াটায় দমাদ্দম ঠুকতে লাগল। কয়েকটা ঘা পড়তেই কড়াটা দুমড়ে ভেঙে গেল। খোলা দরজা দিয়ে হ্যারি কোনরকমে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

ফ্রান্সিস দ্রুত বলল—এখন কথা বলার সময় নেই, ডেকে চলো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস বুঝলো জাহাজটা আর তেমন দুলছে না। ডেকে উঠে দেখলো, জল-ঝড় তেমন নেই আর। তবে সমুদ্রে আকাশে এখনও পাতলা কুয়াশার আস্তরণ রয়েছে। হাওয়ায় কুয়াশা উড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। হলোও তাই। কুয়াশা উড়ে গেল। আকাশে দিগন্তের দিকে হেলে পড়া পাণ্ডুর চাঁদটা দেখা গেল। রাত শেষ হয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি!

হ্যারি এগিয়ে আসতে ফ্রান্সিস বললো—চলো, হালের অবস্থাটা একবার দেখে আসি।

দেখা গেল, হালটা একেবারেই ভেঙে গেছে। তার সঙ্গে জাহাজের অনেকটা জায়গা ভেঙে হাঁ হয়ে গেছে। সব দেখে-শুনে ফ্রান্সিস বললো—বে-হাল জাহাজ, কোথায় যে চলেছে তা ঈশ্বরই জানে।

—সে সব কাল ভাবা যাবে। এখন ঘুমিয়ে নেবে চল। হ্যারি তাগাদা দিলো।

—হ্যাঁ চল। খুব পরিশ্রান্ত আমি। পা টলছে, দাঁড়াতে পারছি না। পরদিন ঘুম ভেঙে যেতেই ফ্রান্সিস ধড়মড় করে উঠল। সকাল হয়ে গেছে। সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। গত রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ডেকের দিকে ছুটল। ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলো, আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। সমুদ্রও শান্ত। সাদা রংয়ের সামুদ্রিক পাখিগুলো উড়ছে। তীক্ষ্ণস্বরে ডাকছে। কিন্তু এ কোথায় এলাম? একটা ধূ-ধূ মরুভূমির মত জায়গায় জাহাজ কাত হয়ে বালিতে আটকে আছে! এখন আর ভাববার সময় নেই। সবাইকে ডেকে তুলতে হবে। জাহাজ মেরামত করতে হবে। তারপর সেই দ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ফ্রান্সিস সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কাউকে আস্তে পেটে ঘুঁষি মেরে, কারো পিঠে চাপড় দিয়ে সে গলা চড়িয়ে বলল—ওঠ সব, ডেক-এ চল।

সবাই একে-একে উঠে পড়ল। উপরে ডেকে এসে দাঁড়াল। ডাঙার ধূ-ধূ বালির দিকে তাকিয়ে বোধহয় ভাবতে লাগল—কোথায় এসে ঠেকলাম? ওদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল—সবাই কথা বলতে লাগল। সবার মুখে একই প্রশ্ন—কোথায় এলাম?

লোকটা আঙ্গুল তুলে সেই মরুভূমির মত ধূ-ধূ বালির দিগন্ত দেখাল

ফ্রান্সিস ডেকে এসে দাঁড়াল। সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, ভাইসব, জাহাজ কোথায় এসে ঠেকেছে আমরা কেউই বলতে পারব না। ওসব ভাবনা পরে ভাবা যাবে।

এখন নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। একদল চলে যাও রসুই ঘরে—রান্নার বন্দোবস্ত করো। আর সবাই জাহাজ মেরামতির কাজে হাত লাগাও।

ফ্রান্সিস সেনাপতি আর তার দলের লোকেদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—আপনাদেরও হাত লাগাতে হবে।

সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা মুখ গোমড়া করে সকলের সঙ্গে চলল। ফ্রান্সিস আবার তার বন্ধুদের বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, এটা সেনাপতির দলের কাছে ভাল লাগল না। ওরা ধান্ধায় রইল, কি করে ফ্রান্সিসকে অপদস্থ করা যায়।

জাহাজ থেকে কাঠের তক্তা নামানো হল। হালের জায়গাটায় যেখানে খোঁদল হয়ে গেছে, সেই জায়গাটা জোড়া দেবার কাজ চলল। নির্জন সমুদ্রতীর মুখর হয়ে উঠল ওদের হাঁকডাক কথাবার্তায়।

পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছে। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল —ওটা কি রে? তার কণ্ঠে বিস্ময়। তার কথা যাদের কানে গেল, তারা ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল। কি ব্যাপার? লোকটা আঙ্গুল তুলে সেই মরুভূমির মত ধূ-ধূ বালির দিগন্ত দেখাল। সত্যিই তো। দিগন্ত রেখার

একটু উঁচুতে কি যেন চিকচিক করছে, একটা, দুটো, তিনটে, অনেকগুলো। চিকচিক করছে যে জিনিসগুলো, সেগুলো চলন্ত। এদিকেই এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে সবাই সেদিকে তাকাল। সকলের চোখমুখেই বিস্ময়। ওগুলো কি?

সবাই ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে ঝোলানো দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে পড়ল। রেলিঙে ভর দিয়ে দাড়িয়ে দিগন্ত রেখার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে খুব নিবিষ্টমনে দেখতে লাগল। একটু পরে নিচের দিকে তাকিয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল—একদল সৈন্য আসছে কালো ঘোড়ায় চেপে। ওদের পরনেও কালো পোশাক। ওদের গলায় লকেটের মত কিছু ঝুলছে। লকেটে সূর্যের আলো পড়েছে, তাই চিকচিক করছে। নিচে দাঁড়িয়ে থাকা আর সবাইও এতক্ষণে দেখতে পেল, একদল অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে বালির ঝড় তুলে ওদের দিকেই ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। এখন কি করা? সকলেই ফ্রান্সিসের দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে গম্ভীরভাবে চিন্তা করল। তারপর মুখে তুলে চীৎকার করে বললো—ওরা লড়তে চাইলে আমরাও লড়ব।

সবাই সমস্বরে হই-হই করে উঠল। চীৎকার ক'রে উঠল—ও-হো-হো। এবার অস্ত্র সংগ্রহ। সেনাপতি আর তার দলের লোকদের তরবারিগুলো জাহাজ থেকে আনা হ্ল। তাছাড়া যাদের তরবারি ছিল, তারাও সেগুলো নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস সেনাপতি আর দলের লোকদের তরবারিগুলো বেছে কয়েকজনের হাতে দিলো। বাদ-বাকিরা হাতের কাছে যে-যা পেলে জোগাড় করে নিয়ে এল। ভাঙা দাঁড়, লোহার শেকল, কুড়ুল, লোহার বড়-বড় পেরেক, কাঠের খুঁটি—এসব যে যা পেল, হাতে নিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াল।

সৈন্যদল ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস হিসেব করে দেখল সৈন্যরা সংখ্যায় ওদের চেয়ে বেশি নয়। সমানই হবে। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—সবাই তৈরি থাকো, কিন্তু আমি না বলা পর্যন্ত কেউ এগিয়ে যাবে না। ওরা ঘোড়ায় যুদ্ধ করবে, ওদেরই সুবিধে বেশি। আমাদের প্রথম কাজই হবে, যেভাবে হোক ওদের মাটিতে ফেলে দেওয়া। তাহলেই জিত আমাদের।

সৈন্যদল অনেক কাছে এসে পড়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের।

কালো পোশাক পরনে। গলায় ঝুলছে চকচকে লকেট। আরো কাছে। ফ্রান্সিস ওদের ঘোড়া ছোটানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝল, ওরা বন্ধুত্ব করতে আসছে না। ওদের লক্ষ্য যুদ্ধ। হঠাৎ ফ্রান্সিসের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এগোও— আক্রমণ করো—

প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ভাইকিংদের মধ্যে। চীৎকার করতে-করতে সবাই ছুটল সৈন্যদলের দিকে।

প্রথম সংঘর্ষেই বেশ কিছু সৈন্য ঘোড়া থেকে বালির ওপর পড়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যেও আহত হ'ল কয়েকজন। ভাইকিংরা অশ্বারোহী সৈন্যদের পায়ে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিতে লাগল। ভাঙা দাঁড়, পেরেক, কুড়ুল দিয়ে ওদের পেছনে আঘাত করতে লাগল। আরও কিছু সৈন্য বালির ওপর পড়ে গেল। এবার শুরু হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। ফ্রান্সিসের বাছাই করা দল নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। সৈন্যরা কিছুতেই ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। একে-একে সৈন্যরা প্রায় সবাই মারা গেল, নয়তো মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে বালির ওপর শুয়ে-শুয়ে গোঙাতে লাগল। জনা দশেক যারা বেঁচেছিল, ঘোড়ার পিঠে উঠে তারা পালাতে শুরু করল। ভাইকিংরা হই-চই করে তাদের তাড়া করলো। অশ্বারোহী সৈন্যরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে খুশির বন্যা বয়ে গেল। সবাই আনন্দে চীৎকার করতে লাগল—

উত্তেজনা স্তিমিত হতে সবাই আবার জাহাজ মেরামতির কাজে হাত লাগাল। আবার কাজ চালালো।

হঠাৎ চিক্‌চিক্—বালির দিগন্ত রেখায় আবার লকেটের ঝিকিমিকি। ফ্রান্সিস হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছিল। হ্যারি পেরেক এগিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস।

—কি?

—ওদিকে চেয়ে দেখ।

ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। দেখলো, দিগন্তরেখার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অজস্র লকেটের ঝিকিমিকি। এতক্ষণে সবাই দেখল। কাজ ফেলে দিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। সবাই উত্তেজিত—লড়াই হবে। একটু আগেই একটা লড়াইতে জিতেছে। সেই জয়ের উন্মাদনা এখনও কাটেনি। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল। বালির ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে কালো পোশাকপরা সৈন্যবাহিনী। সূর্যের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে লকেটগুলো। উত্তেজিত ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। কারও উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—লড়বো আমরা, পরোয়া কিসের? সবাই চীৎকার ক'রে উঠল—ও-হো-হো।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। গভীরভাবে কি যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে সকলের দিকে তাকাল। গুঞ্জন থেমে গেল। সবাই উৎসুক হলো—ফ্রান্সিস কি বলে?

ফ্রান্সিস হাত থেকে হাতুড়িটা বালির ওপর ফেলে দিল। বলল—না, আমরা লড়াই করব না।

ফ্রান্সিসের এই সিদ্ধান্ত অনেকেরই মনঃপূত হল না। আবার গুঞ্জন শুরু হল। সেনাপতি তার দলের লোকদের নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে শলাপরামর্শ করছিল। এবার সুযোগ বুঝে এগিয়ে এল। সেনাপতি বলল—ফ্রান্সিস, তুমি ভীরু কাপুরুষ, ভাইকিংদের কলঙ্ক। ভিড়ের মধ্যে কেউ-কেউ চীৎকার করে সেনাপতিকে সমর্থন করল। ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলল—আমাকে যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু এতগুলো মানুষের প্রাণ নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলতে পারব না।

—লড়তে গেলে প্রাণ নিতেও হবে, দিতেও হবে। তাই বলে কাপুরুষের মত আগে থাকতে হার স্বীকার করে বসে থাকবো? সেনাপতি ক্রুদ্ধস্বরে বলল।

ফ্রান্সিস আঙুল দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে থাকা সৈন্য-বাহিনীকে দেখাল—বলল আন্দাজ করতে পারেন ওরা সংখ্যায় কত?

—যতই হোক, আমরা লড়ব।

—সাধ করে নিশ্চিত মৃত্যুকে ডেকে আনছেন।

—তুমি ভীরু দুর্বল।

—বেশ আমার বন্ধুরা কি বলে শোনা যাক।

ফ্রান্সিস ভাইকিংদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব, আমি কাপুরুষ নই। তোমরা যদি লড়তে চাও, আমিও তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করব। কিন্তু তোমরা একটু ভেবে দেখ যদি ওরা আমাদের বন্দী করেও নিয়ে যায়, তবু সময় আর সুযোগ বুঝে আমরা পালাতে পারব। কিন্তু একবার এই লড়াইয়ে নামলে আর পালাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এই লড়াইতে আমরা কেউ বাঁচবো না।

সবাই ফ্রান্সিসের কথা মন দিয়ে শুনল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—তোমরা হয়তো ভাবতে পারো লড়াই না করে হার স্বীকার করা কাপুরুষের কাজ। আমি বলব—না। শুধু কবজির

জোরে লড়াই হয় না, সঙ্গে বুদ্ধির জোরও চাই। আজকে আমরা লড়ব না, কিন্তু পরে লড়তে আমাদের হবেই, শত্রুর দুর্বলতার মুহূর্তে। একেই বলে বুদ্ধির লড়াই।

সবাই চুপ করে রইল। শুধু সেনাপতি গজরাতে লাগল— আমরা ভাইকিং, এভাবে হার স্বীকার করা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। কিন্তু কেউ তাকে সমর্থন করল না। সেনাপতির দলের লোকেরা গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে তারা চুপ করে গেল।

সেই কালো পোশাক পরা সৈন্যদল কাছাকাছি এসে ঘোড়ার চলার গতি কমিয়ে দিল। সারবন্দী হয়ে ওরা ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল! ওদের সেই সারি থেকে দুজনকে সকলের আগে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল— একি! সুলতান আর রহমান। তা'হলে জাহাজডুবি হয়ে ও যে ভাসতে-ভাসতে যেখানে এসেছিল, এবার জাহজটাও সেইখানে এসেই ঠেকেছে।

সুলতান এবং ফ্রান্সিস দুজনেই দুজনকে দেখতে পেলেন। ফ্রান্সিসের সামনে ঘোড়া থামিয়ে সুলতান ক্রুর হাসি হাসলেন—এই যে, পুরোনো বন্ধু দেখছি।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। সুলতান বললেন—হ্যাঁ ভালো কথা, দুর্গের সেই জানালাটায় গরাদ লাগানো হয়েছে।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সুলতান তরোয়াল খুলে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন— সব কটাকে বেঁধে নিয়ে চলো।

সৈন্যদল থেকে কিছু সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে এল। সবাইকে সারি বেঁধে দাঁড় করাল। জাহাজে যারা রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাদেরও এনে সেই সারিতে দাঁড় করানো হল। সকলের বাঁধা হাতের ফাঁক দিয়ে একটা লোহার শেকল টেনে নেওয়া হল। শেকলটার দুই মাথা দুজন অশ্বারোহী সৈন্যের হাতে রইল। পেছনে চাবুক হাতে একজন অশ্বারোহী সৈন্য চলল। বন্দীরা বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলল। কেউ দল থেকে একটু পেছলেই চাবুকের ঘা পড়তে লাগল।

পায়ের নীচে বালি তেঁতে উঠেছে। গরম হাওয়া ছুটছে। এর মধ্য দিয়ে বন্দীরা চলল। কেউ-কেউ ভাবল, এই অপমানের চেয়ে লড়াই করা অনেক ভালো ছিল। কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই। এখন ওরা বন্দী। বন্দীদের নিয়ে সুলতান যখন আমদাদ শহরে এসে পৌঁছলেন, তখন সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে।

আমদাদ শহরের রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমে গেল। সবাই অবাক হয়ে ভাইকিং বন্দীদের দেখতে লাগল। মরুভূমির ওপর দিয়ে এতটা পথ ওরা হেঁটে এসেছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। পা দুটো যেন পাথরের মত ভারী। শরীর টলছে। অথচ দাঁড়াবার উপায় নেই, বসবার উপায় নেই। অমনি সপাং করে চাবুকের ঘা এসে পড়ছে।

দলের মধ্যে শুধু ফ্রান্সিসই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। একবারও পিছিয়ে পড়েনি। ওর মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই। কারণ বাইরের কোন কিছুই তাকে ছুঁতে পারছে না। ওর মাথায় শুধু চিন্তা আর চিন্তা—কি করে পালানো যাবে। এতগুলো মানুষের জীবনের দায়িত্ব তার ওপর, সে নিশ্চিন্ত থাকে কি করে?

সুলতানের প্রাসাদে যখন ওরা পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। প্রাসাদের সামনের চত্বরে একপাশে ঘোড়শালের কাছে বন্দীদের বসতে বলা হয়। সুলতান প্রাসাদের মধ্যে চলে গেলেন। রহমান কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে পাঠাল। চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা কি সব পরামর্শ করতে লাগল। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় ফ্রান্সিসের দলের সবাই কাতর হয়ে পড়ল। বিশেষ করে হ্যারি এমনিতে অসুস্থ ছিল, এখন প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে গেল।

যে সৈন্য ক'জন ওদের পাহারা দিচ্ছিল, ফ্রান্সিস তাদের একজনকে কাছে ডাকল। সৈন্যটি কাছে এলে ফ্রান্সিস রহমানকে দেখিয়ে বলল—ওকে ডেকে দাও। পাহারাদার ফ্রান্সিসের কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনি ভঙ্গিতে খোলা তরোয়াল হাতে যেমন হেঁটে বেড়াচ্ছিল, তেমনি হেঁটে বেড়াতে লাগল। ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলে উঠল—পেয়েছ কি আমাদের? আমরা জন্তু-জানোয়ার? এতদূর পথ চাবুক খেতে-খেতে হেঁটে এসেছি। আমাদের খিদে পায় না, তেষ্টা পায় না?

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হওয়া মাত্র তার দলের লোকেরা সব হই-হই করে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদার সৈন্যটা বেশ ঘাবড়ে গেল। কি করবে বুঝে উঠতে পারল না।

এখানকার চীৎকার হইচই রহমানের কানে গেল। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। সব শুনে সে তখনি একজন সৈন্যকে সুলতানের কাছে পাঠাল। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো—সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু সুলতানের হুকুম না হলে কিছুই দেবার উপায় নেই।

—তাহলে ক্ষুধায় তেষ্টায় আমরা মারা যাই, এই চান আপনারা?

—সুলতান যদি তাই চান, তবে তাই হবে।

ফ্রান্সিসের দলের লোকেদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগল। শেকলে ঝনঝন শব্দ উঠল। কিন্তু কিছুই করবার নেই। তাদের হাত বাঁধা। শেকলের দুটো মুখ দেয়ালে গাথা। সেই সৈন্যটা ফিরে এল। সুলতান বোধহয় অনুমতি দিয়েছে। রহমান জল আর খাবার আনতে হুকুম দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার এল। পিপে ভর্তি জল এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়ল। চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। শুধু কয়েকজন মিস্ত্রীর হাতুড়ি পেটানোর শব্দে মাঝে-মাঝে ওদের ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। মিস্ত্রীরা মোটা মোটা কাঠ পুঁতে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দিলো জায়গাটা। এটাই হল ভাইকিংদের বন্দীশালা। বন্দীশালা তৈরী হলে সকলের হাত খুলে দেওয়া হল। বাইরে খিলানওয়ালা দরজার পাশেও মিস্ত্রীরা কাজ করছিল। ফ্রান্সিসের দলের লোকেরা কেউ জানতে পারেনি যে, ওখানে মিস্ত্রীরা একটা ফাঁসিকাঠ তৈরী করছিলো।

রাত্রি গভীর হলো। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু মিস্ত্রীদের হাতুড়িঠোকার শব্দ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিচ্ছিল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। দু'হাতে মাথা রেখে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চিন্তার যেন শেষ নেই। হঠাৎ একজন পাহারাদার কাঁটাতারের দরজার কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সিস কে?

কেউ কোন উত্তর না দিতে লোকটা আবার বললো—ফ্রান্সিস কে?

প্রশ্নটা কয়েকজনের কানে যেতে তারা বললো—ফ্রান্সিসকে কেন?

—সুলতান ডেকেছেন।

এইসব কথাবার্তা কানে যেতে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সে যাবার জন্যে পা বাড়াল। কিন্তু যাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তারা ফের চেঁচিয়ে বলল—না ফ্রান্সিস যাবে না। সুলতানকে এখানে আসতে বল।

চিৎকার আর কথাবার্তায় অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। তারা সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে বললো—না, ফ্রান্সিস একা যাবে না।

এবার কাঁটাতারের দরজার কাছে রহমানের মুখ দেখা গেল। সে হেসে বলল—আমি ফ্রান্সিসকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের ভয় নেই, ওর কোন ক্ষতি হবে না।

ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে শান্ত করল। পাহারাদার কাঁটাতারের দরজার তালা খুলে দিল। ফ্রান্সিস বাইরে এসে রহমানের সামনে এসে বললো—চলুন।

রহমান ওকে সঙ্গে নিয়ে চলল। প্রাসাদে ঢোকার আগে রহমান একবার দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল—সুলতান তোমায় ডাকেননি।

সুলতানের বেগম তোমাকে, ডেকেছেন।

—তবে?

—সুলতানের বেগম তোমাকে ডেকেছেন।

ফ্রান্সিস আশ্চর্য হল। বেগমের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু— ফ্রান্সিস বলল— আমার মত একজন বিদেশীকে—

—বেগমের সঙ্গে কথা হোক, তাহলেই জানতে পারবে।

সুসজ্জিত ঘরের পর ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলে এল ওরা। অন্দরমহলের জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মেঝের দেয়ালে জাফরী কাটা জানালায় কি সুন্দর কারুকাজ! একসময়ে সিঁড়ি বেয়ে ওরা একটা পুকুরের সামনে এসে দাঁড়াল। পুকুরের চারিদিক শ্বেত পাথরে বাঁধানো। কাঁচের মত শান্ত জল টলটল করছে। পুকুরের ওপাশে বাগানে ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে গেছে। বাগানের কাছে একটা দোলনা রূপোর শেকলে বাঁধা। দোলনায় কে যেন বসে আছে। রহমান ফিস ফিস করে বলল—বেগমসাহেবা দোলনায় বসে আছেন।

—একা?

—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎটা খুবই গোপনীয়।

বেগম-সাহেবার কাছে গিয়ে রহমান আদাব করে সরে এল। ফ্রান্সিসও রহমানের দেখাদেখি আদাব করল। এখানে মশালের ক্ষীণ আলো এসে পৌঁছেছে, তাতে স্পষ্ট বেগমসাহেবার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তবু ফ্রান্সিস বুঝল, বেগমসাহেবা অপরূপ সুন্দরী। ভুরু দুটো যেন তুলিতে আঁকা। টানা লাল ঠোঁটের পাশে একটা তিল। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে বেগমের পোশাকের সোনার কারুকাজ করা নকশাগুলো।

—তুমিই ফ্রান্সিস? —সুরেলা গলায় বেগমসাহেবা প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, —ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—তুমি জানো সোনার ঘণ্টা কোথায় আছে?

—না।

—কিন্তু সুলতান বলেন, তুমি নাকি সব জানো।

—আমি যা জানি সুলতানকে বলেছি।

—সেই মোহর দু'টোর কথাও বলেছো?

—কোন মোহর? —ফ্রান্সিস আশ্চর্য হল।

—তোমার কাছে যে দুটো মোহর ছিল।

—তার একটা বিক্রি করে দিয়েছি, আর একটা চুরি হয়ে গেছে।

—তুমি জানো, এ দু'টো মোহরের একটাতে সেই সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যাওয়ার, অন্যটাতে ফিরে আসার নকশা খোদাই করা ছিল।

—না, আমি জানতাম না।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছো। মোহর দুটো তোমার কাছেই আছে।

ফ্রান্সিসের বেশ রাগ হলো। সে গম্ভীর স্বরে বলল—আমি মিথ্যে কথা বলছি না, বেগম-সাহেবা।

—তোমার মৃত্যু তুমি নিজেই ডেকে আনছো।

—তার মানে?

—দেউড়ির খিলানে এতক্ষণে ফাঁসিকাঠ তৈরি হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল—তাহলে আমাকে—

—হ্যাঁ, তোমাকে কাল সকালে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারল না। একবার মনে হলো, বেগমের কাছে সে প্রাণ ভিক্ষা করে। পরক্ষণেই মনে হল, না আমরা ভাইকিং। আমাদের মৃত্যু-ভয় থাকতে নেই। আমার বন্ধুদের কী হবে?

—তারা বন্দী থাকবে।

ফ্রান্সিসের মন শান্ত হল। যাক, আমার বন্ধুরা তো বেঁচে থাকবে। বেগম-সাহেবা কি যেন ইঙ্গিত করলেন। রহমান এগিয়ে এসে আদাব করল। মৃদুস্বরে ফ্রান্সিসকে বলল—চল।

এদিকে ফ্রান্সিসকে নিয়ে রহমান চলে আসার পর ফ্রান্সিসের বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে শলা-পারমর্শ করতে লাগল। পরামর্শ মত সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই হঠাৎ একজন উঠে পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করল। যেন সেই চীৎকার শুনেই উঠে পড়েছে, এমনি ভঙ্গি করে বেশ কয়েকজন ওর দিকে ছুটে এল। লোকটা তখন পেটে হাত দিয়ে গোঙাতে লাগল, আর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। একজন পাহারাদার ওদের চীৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে কাঁটাতারের দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালো —কি হয়েছে?

—দেখছো না, পেটের ব্যাথায় কাতরাচ্ছে।

—ও কিছু হয়নি।

—বেশ, তুমি নিজেই দেখে যাও।

—হুঁ। পাহারাদারটা ঘুরে দাঁড়ালো।

তখন সবাই মিলে ওকে চটাতে লাগল—ব্যাটা সবজান্তা, তালপাতার সেপাই।

পাহারাদারটা ভীষণ চটে গেল। হেঁকে উঠল—এ্যাই!

কে মুখ ভেংচে ওর হাঁকের নকল মুখে করে বলে উঠল—এ্যাই!

আর যায় কোথায়! পাহাড়াদারটা তালা খুলে ভেতরে ছুটে এল। কিন্তু খাপ থেকে তরোয়াল খোলবার আগেই পাঁচ-ছয়জন একসঙ্গে ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেচারা টুঁ শব্দটিও করতে পারল না। মাটিতে ফেলে কয়েকজন চেপে ধরল। বাদ-বাকিরা পাহারাদারের কোমর-বন্ধনীর কাপড়টা খুলে ফেলল তারপর ঐ কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে কোণায় ফেলে রাখলো।

এবার খোলা দরজা দিয়ে একজন বেরিয়ে বাইরের অবস্থাটা দেখতে গেল। দেখলো, ওদের যে আর একজন পাহারা দিচ্ছিল সে দেউড়ির কাছে অন্য পাহারাদারদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। প্রাসাদের সম্মুখে দুজন পাহারাদার শুধু টহল দিচ্ছে। দেউড়ি দিয়ে পালানো যাবে

না। ওখানে পাহারাদার সৈন্যদের সংখ্যা বেশি। একমাত্র পথ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে যদি অন্য কোন দিক দিয়ে পালানো যায়। শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হল। পা টিপে-টিপে সবাই বেরিয়ে এল। অসুস্থ হ্যারিকেও ওরা ধরা-ধরি করে সঙ্গে নিয়ে চলল। আস্তে-আস্তে নিঃশব্দে ওরা প্রাচীর টপকাল। প্রাচীরের ও'পাশেই দেখা গেল, একটা ছোট্ট বাগান মত। ফোয়ারাও আছে, তাতে। তারপরেই একটা দরজা। দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। কয়েকটা ঘর পেরোতেই দেখা গেল লম্বামত একটা ঘর। টানা টেবিলের মত দেয়ালে কাঠের তক্তা লাগানো। কতরকম খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। কোর্মা, কোপ্তা, শিক-কাবাবের গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, ওরা রসুই ঘরে ঢুকে পড়েছে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। তারপরেই পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর। দু'হাত ভরে যে যতটা পারল নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। কামড়ে-কামড়ে মাংস খেতে লাগল। এক সঙ্গে এত লোক, তার ওপর খাওয়ার আনন্দ। অল্প-সল্প শব্দ হতে-হতে একেবারে হই-চই শুরু হয়ে গেল। ওরা বোধহয় ভুলেই গেল, যে ওদের পালাতে হবে। খাবারের ঘরের দরজা দিয়ে তরোয়াল হাতে সৈন্যদল ঢুকতে লাগল। সৈন্যরা ঘিরে ফেলে ওদের পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে হুকুম করল—চলো।

এতক্ষণে এরা সম্বিত ফিরে পেল। কিন্তু এখন আর কিছু করবার নেই। আবার সেই ফিরে আসতে হল কাঁটার তার ঘেরা বন্দীশালায়।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে দেখলো, প্রাসাদের সামনের চত্বরে সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটোছুটি করছে। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। একজন সৈন্য রহমানকে এসে কি যেন বললো। রহমান ফ্রান্সিসকে বলল—কাণ্ড শুনেছ?

—কি?

—তোমার বন্ধুরা পালিয়েছে।

ফ্রান্সিস হাসলো। যাক, সমস্যার সমাধান ওরা নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছে তাহলে। রহমান আড়চোখে ফ্রান্সিসকে হাসতে দেখে বলল—কিন্তু ফিরে আসতে হবে। এখান থেকে পালানো অত সহজ নয়।

ফ্রান্সিসকে কাঁটাতারের বন্দীশালায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস দেখল, পাহারাদারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পালাবার সব পথই বন্ধ। যাক সান্ত্বনা, বন্ধুরা তো পালাতে পেরেছে। হঠাৎ পাথরে বাঁধানো চত্বরে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল—তবে কি ওরা ধরা পড়ল?

দরজার তালা খোলার শব্দ হল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল; ফ্রান্সিসের বন্ধুরা ঢুকছে। তখনও কারও হাতে পাঁঠার ঠ্যাং, কোর্মার মাংসের টুকরো, শিক-বেঁধা শিক-কাবাব। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে অসুস্থ হ্যারিকে ধরল। তারপর ধরে এনে ওকে শুইয়ে দিল। কেউ কোন কথা বলল না। পরদিন যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, একথা ফ্রান্সিস কাউকে বলল না। শুধু বাইরের সৈন্যদের টহল দেওয়ার শব্দ শোনা গেল—টক্-টক্।

তখন সকাল হয়েছে। দেউড়ির কাছে যেখানে ফাঁসিকাঠ তৈরী হয়েছে, সারা আমদাদ শহরের মানুষ সেখানে এসে ভেঙে পড়ল। দুর্গে তুরী বেজে উঠল। একটু পরেই ফাঁসিকাঠের পাশে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের এনে দাঁড় করানো হল। ভীড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই বন্দীদের দেখতে চায়। ফ্রান্সিসকে দাঁড় করানো হল ফাঁসিকাঠের মঞ্চের ওপর। একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে সুলতান এলেন। পেছনে রহমান। রহমানের পেছনে ও কে? এ কি! এ যে সেনাপতিমশাই।

এদিকে হয়েছে কি, ফ্রান্সিসরা যখন ভোরের দিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন সেনাপতি একজন পাহারাদারকে ডেকে বলেছিল—আমি রহমানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। পাহারাদারটি প্রথমে রাজী হয়নি। সেনাপতি তখন বলেছিল—রহমানকে শুধু বলবে ভাইকিং দেশের নৌবাহিনীর সেনাপতি দেখা করতে চায়। পাহারাদারটি কি ভেবে রাজি হল। একটু পরেই ফিরে এসে সেনাপতিকে নিয়ে গেল।

সবাই তখন অঘোর ঘুমে। শুধু অসুস্থ হ্যারি জেগেছিল। সে সবই দেখলো। বুঝল—সেনাপতি নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। এতে যদি অন্যদের প্রাণও যায়, ও ফিরে তাকাবে না। হ্যারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে শুয়ে রইল। কাউকে ডাকলও না। ভোর থেকেই সেনাপতিকেও ওরা দেখতে পায়নি। এবার মানে বোঝা গেল। সেনাপতি সুলতানের দলে ভিড়ে গিয়েছে।

সুলতান আসতেই দর্শকদের মধ্যে উল্লাসের বন্যা বইল। চীৎকার করে সবাই সুলতানের জয়ধ্বনি করল। সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বললেন, ফ্রান্সিস, গলায় দড়ির ফাঁস পরাবার আগে এখনও সময় আছে বলো—সেই মোহর দুটো কোথায়?

—আমি জানিনা।

—জাহাজ নিয়ে এসেছ, সোনার ঘণ্টা নিয়ে যাবে বলে। এবার জাহান্নামে যাও, সেখানে সোনার ঘণ্টার বাজনা শুনতে পাবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

সুলতান চীৎকার করে বলতে লাগলেন—আমাদের দরিয়ায় এসে আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে সোনার ঘণ্টা নিয়ে যাবে, তোমাদের দুঃসাহস তো কম নয়? সুলতান এবার ফ্রান্সিসের বন্ধুদের দিকে তাকালো। বললো, আমি জাহাজ নিয়ে যাব, তোমাদের জাহাজও মেরামত করিয়ে দেব। তোমরা যদি জাহাজ চালানোর ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো, তবে তোমাদের আমি মুক্তি দেব।

সবাই চুপ করে রইল। হঠাৎ হ্যারি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো—আমরা যেতে রাজি, কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন হবে কে?

সুলতান হাসলেন এবং বললেন—তোমাদেরই দেশের নৌবাহিনীর সেনাপতি।

—ওকে আমরা নেতা বলে মানি না, আমরা ফ্রান্সিসকে চাই। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা ফ্রান্সিসকে চাই—সবাই চীৎকার করে উঠল।

সুলতান মুশকিলে পড়লেন। এই ভাইকিংদের মত দক্ষ জাহাজ-চালকদের ছাড়া তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু নিজের এই সমস্যার আভাসও তিনি প্রকাশ পেতে দিলেন না। চীৎকার করে বলে উঠলেন—তোমরা যদি না যাও, তাহলে তোমাদের সকলের ফ্রান্সিসের দশা হবে। তাকিয়ে দেখ, ওকে কি ভাবে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে।

সুলতান রহমানকে কি যেন বললেন। রহমানের ইঙ্গিতে কালো কাপড়ের আলখাল্লা পরা, কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা একজন লোক ফাঁসির মঞ্চে উঠে এল। সে এসে ঘাড়ধাক্কা দিতে-দিতে ফ্রান্সিসকে দড়ির ফাঁসের কাছে নিয়ে এল। কালো কাপড়ের ফুটো দিয়ে লোকটার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে।

ফ্রান্সিস সম্মুখের সেই দর্শকদের ভিড়ের দিকে তাকাল। বন্ধুদের দিকে তাকাল। দেখলো, হ্যারি চোখের জল মুছছে। আরও কেউ-কেউ অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, পা চোখের জল দেখে ফ্রান্সিস দুর্বল হয়ে পড়ে। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝ নীল আকাশ। সাদা-সাদা হালকা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। পাখি উড়ছে। কি সুন্দর পৃথিবী!

ফ্রান্সিসের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। মা'র কথা, বাবার কথা মনে পড়ল। ছোট ভাইটাও কি ওর মতই আধপাগলা হবে? বাড়ির গেটের সেই লতা গাছটা একদিন সমস্ত দেওয়ালটায় ছড়িয়ে পড়বে। অজস্র নীল ফুল ফুটিয়ে জায়গাটাকে সুন্দর করে তুলবে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, তারাভরা আকাশ, ঢেউয়ের মাথায় সূর্য ওঠা—এসব আর কোনদিন দেখবে না সে।

কিন্তু ফ্রান্সিসের চিন্তায় বাধা পড়ল। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা লোকটা ফাঁসের দড়ি টেনে-টেনে পরীক্ষা করতে-করতে বিড়বিড় করে বলছে—ফাঁসটা আলগা, হাতের বাঁধনটা সময়মত কেটে নিও। পাটাতনের নীচে গর্তটা বুজিয়ে রেখেছি, নেমেই মাটি পাবে।

ফ্রান্সিসের সমস্ত শরীর আনন্দে কেঁপে উঠল—ফজল!

ফজল ধমকের সুরে বলল—তোমার মুখে যেমন খুশীর ভাব ফুটে উঠেছে যেন ফাঁসি হবে না, বিয়ে হবে তোমার। হুঃ!

ফ্রান্সিস সাবধান হলো। ফজল বলতে লাগল—'নীচে পড়েই দড়িটা ধরে দু'চারবার জোরে হ্যাঁচকা টান দেবে। তারপর চুপচাপ বসে থাকবে। রাত হলে পেছনের পাটাতনটা খুলে বেরোবে। সামনেই একটা ঘোড়া পাবে।'

ফজল থামলো। তারপর দুহাত তুলে সুলতানের দিকে ইঙ্গিত করল—সব ঠিক আছে। এবার সুলতানের হুকুম। সব গোলমাল থেমে গেল।

ফ্রান্সিস হঠাৎ হাত তুলে এগিয়ে এল। সুলতান জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার।

—মরবার আগে আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—কে সে?

—হ্যারি।

সুলতানের হুকুমে হ্যারিকে ধরে ধরে মঞ্চে নিয়ে আসা হল। হ্যারি আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। ওর ছেলেবেলার বন্ধু ফ্রান্সিস। কত হাসি-কান্না মান-অভিমানের জীবন কাটিয়েছে ওরা। হ্যারি ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিস নীচুস্বরে বলতে লাগল—হ্যারি, ভয় নেই, আমি মরবো না। যা বলছি, শোন। তোমরা কেউ সুলতানের বিরোধিতা বা সেনাপতির হুকুমের অবাধ্য হয়ো না। আমি আমাদের ভাঙা জাহাজটায় থাকবো। পরে দেখা হবে।

হ্যারি কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারল না। চোখ মুছে অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাতে-তাকাতে মঞ্চ থেকে নেমে এল।

ফজল ফ্রান্সিসের মাথায় কালো কাপড়ের ঢাকনা পরিয়ে দিল। কাপড়টা পরাবার সময় সকলের অলক্ষ্যে ফ্রান্সিসের হাতের বাঁধনটা আলগা করে দিল। তারপর গলায় দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে সুলতানের দিকে তাকাল। আবার চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কি হয় দেখবার জন্যে সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে। সুলতান হাত তুলে ইঙ্গিত করল। ফজল ফ্রান্সিসের পায়ের নীচের পাটাতনটা এক টানে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস ঝুপ করে নিচে পড়ে গেল। সকলেই দেখল দড়িটায় কয়েকটা হ্যাঁচকা টান পড়ল। দুলতে-দুলতে দড়িটা থেমে গেল।

ফ্রান্সিসের ফাঁসি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বধ্যভূমিতে উপস্থিত আমদাদবাসীরা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ওদের ফাঁসি দেখা হয়ে গেল। সুলতান, রহমান আর ভাইকিং সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। দর্শকরাও সব আস্তে-আস্তে চলে গেল। ভাইকিং বন্দীদের নিয়ে সৈন্যরা চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বধ্যভূমি নির্জন হয়ে গেল।

দুপুর গেল। সন্ধ্যে পার হল। রাত্রি বাড়তে লাগল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস হাতের দড়ির বাঁধনটা খুলে ফেলল। তারপর

আস্তে-আস্তে পেছনের পাটাতনটা ধরে নাড়া দিল। সত্যিই আলগা। ওটা খুলে এল সামনেই প্রাচীরের ধার ঘেঁষে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, লেজ ঝাপটাচ্ছে। ঘোড়াটার পিঠে জিন বাঁধা। ফ্রান্সিস এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে দ্রুত বেগে একটা গলিপথে ঢুকে পড়ল। আন্দাজে দিক ঠিক করে দুর্গের দিকে চলল। সমুদ্র ঐ দিকেই। একসময় হু-হু হাওয়া এসে গায়ে লাগল। সেই সঙ্গে সমুদ্রের মৃদু গর্জন। ঐ তো সমুদ্র। ওপাশে দুর্গের টানা প্রাচীর। সমুদ্রের ধার দিয়ে ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছোটাল। অল্প অল্প চাঁদের আলোয় জল ঝিকমিক করছে। হু-হু হাওয়া শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। সারাদিনের বন্দীদশা, পিপাসা, একফোঁটা জলও খেতে পায়নি। তবু মুক্তির আনন্দ, বেঁচে থাকার আনন্দ। ফ্রান্সিস প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাল। একটু পরেই দূর থেকে দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড কালো জন্তুর মত ওদের ভাঙা জাহাজটা কাত হয়ে পড়ে আছে জলের ধারে।

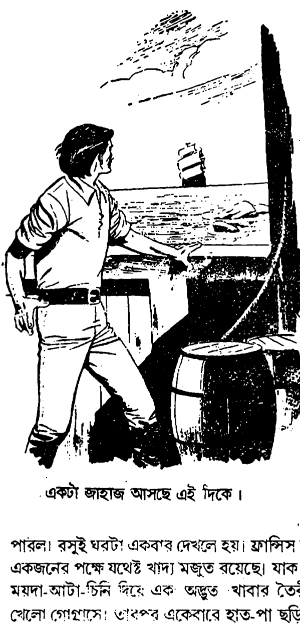

একটা জাহাজ আসছে এই দিকে।

কেবিন ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল ফ্রান্সিস। সারাদিন যে উত্তেজনা গেছে, শরীর আর চলছে না। কিন্তু খিদেও পেয়েছে ভীষণ। এতক্ষণে ও সেটা বুঝতে পারল। রসুই ঘরটা একবার দেখলে হয়। ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। রসুইঘর খুঁজে পেতে দেখলো একজনের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য মজুত রয়েছে। যাক কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। উনুন ধরিয়ে ময়দা-আটা-চিনি দিয়ে এক অদ্ভুত খাবার তৈরী করলো ফ্রান্সিস। খিদের জ্বালায় তাই খেলো গোগ্রাসে। তারপর একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম।

সকাল হয়েছে। রোদ্দুরের তেজ তখনও বাড়েনি। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে আর ভাবছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজটা মেরামত করতে হবে। আবার সমুদ্রে ভেসে পড়তে হবে। সোনার ঘণ্টা আনতেই হবে। কিন্তু কি করে হবে?

ফ্রান্সিস ভেবে-ভেবে কোন কুলকিনারা পেল না। পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ ফ্রান্সিস থমকে দাঁড়াল। একটা জাহাজ আসছে এই দিকে। খুব সুন্দর ঝকঝকে একটা জাহাজ। বাতাসের তোড়ে ফুলে ওঠা সাদা পালগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন উড়ন্ত রাজহাঁস। মাস্তুলে একটা পতাকা উড়ছে পত পত করে। ফ্রান্সিস ভাল করে লক্ষ্য করল—হ্যাঁ, সুলতানের জাহাজ। পতাকায় বাদশাহী চিহ্ন ছুটন্ত ঘোড়া আর সূর্য আঁকা।

ফ্রান্সিস আর ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ মনে করল না। কেবিন ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভিড় করে এল। সুলতানের জাহাজ এদিকে আসছে কেন?

তবে কি হ্যারি বিশ্বাসঘাতকতা করলো? অত্যাচারের মুখে সব বলে দিল? ফ্রান্সিসের হদিশ জানিয়ে দিলো? কিন্তু ওকে ধরিয়ে দিয়ে হ্যারির কি লাভ? লাভ আছে বৈকি? তাহলে সুলতান ওদের মুক্তি দেবে। সবাই দেশে ফিরে যেতে পারবে।

সুলতানের জাহাজটা বালিয়াড়িতে এসে ভিড়লো। ফ্রান্সিসের সব বন্ধুরা হই-হই করতে-করতে জাহাজ থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিস অনেকটা আশ্বস্ত হল। ওরা যখন এত আনন্দ হই-হল্লা করছে, তখন নিশ্চয়ই অন্য কারণে জাহাজটা এখানে আনা হয়েছে। গা ঢাকা দিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ডেক-এ উঠে এল। মাস্তুলের আড়ালে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা নেমে আসতেই সৈন্যের দল নেমে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল তারপর সবাই দল বেঁধে এই জাহাজটার দিকে আসতে লাগল। আরো কিছুলোক তখন সুলতানের জাহাজ থেকে করাত হাতুড়ী, পেরেক বড়-বড় কাঠের পাটাতন নামাতে লাগল। তাহলে ওদের ভাঙা জাহাজটা মেরামত হবে। ঐ লোকগুলো কাঠের মিস্ত্রী। ফ্রান্সিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

মালপত্র নামানো হল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটায় মেরামতির কাজ শুরু হল। ভাইকিংরাও হাত লাগাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্জন সমুদ্রতীর বহুলোকের হাঁকডাকে ভরে উঠল। ফ্রান্সিস আড়াল থেকে লক্ষ্য করল, হ্যারি কাজ করার ফাঁকে আড়চোখে এই জাহাজটার দিকে তাকাচ্ছে। বোধহয় ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ খুঁজছে।

দুপুর নাগাদ সুলতানের জাহাজে কার হাঁক শোনা গেল—খানা তৈরি। সবাই চলে এসো। সবাই কাজ রেখে দল বেঁধে জাহাজে খেতে চললো। শুধু হ্যারি থেকে গেল। কেউ-কেউ হ্যারিকে ডাকলো। হ্যারি বলল—হাতের কাজটা শেষ করেই যাচ্ছি। তোমরা এগোও।

জাহাজে ভাঙা হালের জায়গাটায় হ্যারি কাজ করছিল। সে জাহাজের আড়ালে পড়ে গেল। সুলতানের সৈন্যরাও খেয়াল করল না। সবাই জাহাজে উঠে গেল। হ্যারি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। যখন দেখলো কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না তখন দড়ি বেয়ে ভাঙা জাহাজটায় উঠে এল। সুলতানের জাহাজ থেকে যাতে পাহারাদার সৈন্যরা দেখতে না পায়, তার জন্যে ডেকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে সে কেবিনঘরে নামবার সিঁড়ির কাছে পৌঁছলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে চাপাস্বরে ডাকলো—ফ্রান্সিস!

ফ্রান্সিস মাস্তুলের আড়াল থেকে সবই দেখছিল। এবার ছুটে এসে হ্যারিকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। হ্যারি প্রথমে একটু চমকেই উঠেছিল পরক্ষণে গভীর আবেগে ফ্রান্সিসকে আলিঙ্গন করলো। দু'জনেরই চোখ জলে ভরে উঠল। আঃ! ফ্রান্সিস তাহলে সত্যিই বেঁচে আছে! সময় অল্প। বেশি কথা হল না। ফ্রান্সিস বললো—তোমরা কেউ সুলতান বা সেনাপাতির হুকুমের বিরোধিতা করো না।

—সে সব আমরা ভেবে রেখেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাহাজ নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবো তো?

—হ্যাঁ, আমি দিনরাত শুধু ঐ ভাবনা নিয়েই আছি।

—তোমার কি মনে হয়? পারবে?

—নিশ্চয়ই পারবো, পারতেই হবে।

হঠাৎ বাইরের বালিয়াড়িতে বহুকণ্ঠের কলবর শোনা গেলো। হ্যারি দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বললো—এখন চলি। নিশ্চয়ই ওরা আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

—আবার দেখা হবে। ফ্রান্সিস হেসে হাত বাড়াল। হ্যারি আবেগে ওকে চেপে ধরল। এক মুহূর্ত। তারপরেই দ্রুত ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে তীরে বন্ধুদের জটলার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। সবাই হই-হই করে উঠল। যাক, হ্যারির কোন বিপদ হয়নি। হ্যারি দড়ি বেয়ে

নেমে এল। তারপর বন্ধুরা ওর জন্যে যে খাবার নিয়ে এসেছিল, বালির ওপর বসে তাই খেতে লাগলো।

দিন পাঁচেক ধরে এইভাবে জাহাজ মেরামতির কাজ চললো, সুলতানের জাহাজে করে ভাইকিংরা আসে। সঙ্গে সৈন্য আর মিস্ত্রীরা। সারাদিন মেরামতির কাজ চলে। সন্ধ্যে নাগাদ আবার ওদের নিয়ে জাহাজটা আমদাদ বন্দরে ফিরে যায়।

জাহাজ মেরামত হয়ে গেল। নতুন পাল খাটানো হলো। জাহাজ রঙ করা হলো। দেখতে হলো যেন, ঝক্ঝকে নতুন জাহাজ একটা।

সেদিন হ্যারি লুকিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করল। বললো—কালকে জাহাজ ছাড়বে।

—কখন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—সকালবেলা।

—সুলতান যাচ্ছে নিশ্চয়ই।

—সে আর বলতে। সুলতানের নাকি ভালো করে ঘুমই হচ্ছে না।

—খুবই স্বাভাবিক—নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি ঘণ্টা তো।

—মরুক গে। তুমি কিন্তু ডেকে উঠবে না।

—হুঁ। ফ্রান্সিস অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, সুলতান সঙ্গে কত সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে।

—ঠিক বলতে পারবো না। তবে রহমান বলেছিল, বাছাই করা সৈন্য নেওয়া হবে।

—হুঁ। ফ্রান্সিস নিজের চিন্তায় ডুবে গেল।

—লড়বে নাকি?

—সে সব সময় সুযোগ বুঝে।

হ্যারি আর বসলো না। ওকে না দেখতে পেলে সৈন্যদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। হ্যারি চলে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল ফ্রান্সিস। কত চিন্তা মাথায়। ঘুম আসতে চায় না। এক সময় ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। দড়ি বেয়ে বালির ওপর নেমে এল। আকাশে চাঁদ, চারদিক ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। নতুন রঙ করা জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিস। সকালেই তো সমুদ্র যাত্রার শুরু। হয়তো এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা। হয়তো সবাই ফিরে যাবে দেশে, তার আর কোন দিন ফেরা হবে না। দেশ থেকে দূরে বহুদূরে এক অজানা সমুদ্রে তার মৃতদেহ ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে যাবে। হয়তো তার মৃত্যু নিয়ে দেশের লোকেরা কয়েকদিন জল্পনা-কল্পনা করবে। তারপর আস্তে-আস্তে সবাই তাকে একদিন ভুলে যাবে।

ফ্রান্সিস শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জাহাজটার দিকে। চাঁদের আলো যেন ঠিকরে পড়ছে জাহাজটার গা থেকে। চারদিকে সেই অসীম শূন্যতার মাঝখানে জাহজাটাকে মনে হতে লাগল, যেন কোন স্বপ্নপুরী থেকে ভেসে এসেছে। বালিয়াড়িতে কিছুক্ষণ পায়চারী করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

তখন সবে সকাল হয়ে সূর্য উঠেছে। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ওপরের ডেক-এ অনেক লোকের চালাফেরার শব্দ। দাড়ি-দড়া বাঁধছে। পাল খাটাচ্ছে। ওদের কর্মচাঞ্চল্যে ঘুমন্ত জাহজটা জেগে উঠল।

ফ্রান্সিস উঠে বসলো। তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে যে ঘরটায় হ্যারিকে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই ঘরটায় চলে এলো। এখন থেকে এই ঘরটাই হবে তার আস্তানা।

সুলতানের সৈন্যদের চোখের আড়ালে থাকতে হবে। ওরা যাতে ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে, ফ্রান্সিস বেঁচে আছে, আর এই জাহাজেই আছে।

রহমানের কথাই ঠিক। সুলতান ভাইকিংদের চেয়ে বেশিসংখ্যক বাছাই করা সৈন্য সঙ্গে নিয়েছেন। কিছু রেখেছেন তাঁর নিজের জাহাজে আর বাকি সব ফ্রান্সিসদের জাহাজে। ভাইকিংদের পাহারা দিতে হবে তো! যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়।

পাল খাটিয়ে দড়ি-দড়া বেঁধে দুটো জাহাজই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। দুটো জাহাজেই সুলতানের বাদশাহী চিহ্ন ছুটন্ত ঘোড়া আর সূর্য আঁকা পতাকা ভোরের হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে।

তখন সূর্য দিগন্তের একটু ওপরে উঠেছে। আলোর তেজ তখনও প্রখর হয়নি। সুলতান নিজের জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে রহমান আর ভাইকিংদের সেই সেনাপতি। সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে বেঢপ পোশাক পরা দাড়িওলা একটা লোক সুর করে কি যেন দ্রুত ভঙ্গিতে বলতে লাগলো। বোধহয় ঈশ্বরের কাছে দয়া প্রার্থনা করা হচ্ছে। সুলতান মাথা নীচু করে শুনতে লাগলেন। লোকটা বলা শেষ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। এবার সুলতান মাথা তুললেন। খাপ থেকে তরবারি খুলে নিলেন। তারপর তরবারিটা সমুদ্রের দিকে তুলে যাত্রার ইঙ্গিত করলেন। সকালের আলোয় সোনাবাঁধানো হাতলওলা তরবারিটা ঝকঝক করতে লাগল। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলতে শুরু করল। দাড়িরা দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজটা মাঝসমুদ্রের দিকে চললো। সুলতানের জাহাজটা চললো পেছনে-পেছনে। সমুদ্রের বুকে কিছুটা এগোতেই হাওয়া লাগল পালে। পালগুলো দুলে উঠল। পরিষ্কার আকাশের নীচে শান্ত সমুদ্রের বুকে দুটো জাহাজ, একটা সামনে আর একটা পেছনে। চলল জাহাজ দু'টো।

দিন যায়, রাত যায়। একা বন্ধ ঘরে ফ্রান্সিসের দিন কাটে, রাত কাটে। হ্যারি সারাদিনে একবার করে আসে। সব খবরাখবর দেয়। ভাইকিংদের মধ্যে বিশ্বস্ত কয়েকজন মাত্র জানে, ফ্রান্সিস এই ঘরে আছে। তারা কিন্তু ফ্রান্সিসের কাছে আসে না। ফ্রান্সিসের ঘরের বাইরে পালা করে দিনরাত পাহারা দেয়। ওর খাবার-টাবার দিয়ে যায়। সবাই খুব সাবধান—সুলতানের লোক যাতে ফ্রান্সিসের কোনো কথা না জানতে পারে।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—ঘুরে দাঁড়াও।

একদিন এক কাণ্ড হলো। সেদিন গভীর রাত। ফ্রান্সিসের ঘরের সামনে পাহারাদার ভাইকিংটা ঘুমে ঢুলছে। হঠাৎ একটা খুট করে শব্দ হতেই সে চমকে উঠে দেখল, একটা ছায়া পিঁপের আড়ালে সাঁৎ করে সরে গেল। ও তাড়াতাড়ি পাটাতনের আড়ালে লুকনো তরবারি বের করল। কিন্তু আর কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ একটা গড়গড় শব্দ হতেই ও চমকে ফিরে তাকাল। দেখলো, অন্ধকার থেকে দু-তিনটে পিঁপে ওর দিকে গড়াতে-গড়াতে ছুটে আসছে। প্রথম পিঁপেটার ধাক্কায় সে

কাঠের মেঝেটায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল। অন্ধকার থেকে ছায়ামূর্তিটা ছুটে এসে পাহারাদারটার পিঠের ওপর চড়ে বসল। তারপর নিজের কোমর-বন্ধনীর কাপড় দিয়ে পাহারাদারের মুখটা বেঁধে ফেলল।

বাইরের পিঁপের গড়গড় শব্দে, পাহারাদারের উপুড় হয়ে পড়ার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও নিঃশব্দে বিছানার তলায় লুকানো তরোয়ালটা বের করে পা টিপে-টিপে দরজার দিকে এগোল। কোনরকম শব্দ না করে দরজাটা খুলে বাইরে এসে দেখল, একটা ছায়ামূর্তি পাহারাদারের পিঠের ওপর চড়ে বসে আছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা ছায়ামূর্তির পিঠে ঠেকিয়ে বললো—উঠে পড়ো বাছাধন।

পাহারাদারের মুখ আর বাঁধা হল না। ছায়ামূর্তি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদারটা গোঙাতে লাগলো। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো—ঘুরে দাঁড়াও।

ছায়ামূর্তি ঘুরে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিসের চোখে তখন অন্ধকারটা সয়ে এসেছে। সে চোখ কুঁচকে ভালো করে দেখল। আরে? এ কি? এ যে ফজল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে ফজলকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। পাহারাদারটা তখনও গোঙাচ্ছে। ফজল তাড়াতাড়ি তার মুখ থেকে কাপড়টা খুলে দিল। পাহারাদারটা ওদের দুজনকে দেখেই হেসে উঠলো। ফ্রান্সিস পাহারাদারকে বলল—যাও ভাই ঘুমিয়ে নাও গে।

ফ্রান্সিস আর ফজল কাঁধ ধরাধরি করে ঘরে এসে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বলল—ফজল ভাই, তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না।

—কি যে বলো তোমার কাছেও কি আমার ঋণ কিছু কম।

—অবাক কাণ্ড—তুমি এখানে এলে কি করে?

—তোমাকে চাবুক মারা, ফাঁসি দেওয়া, এসব দেখে রহমান আমাকে বেশ বিশ্বাসী লোক বলে ধরে নিয়েছিল। তারপর কিছু ঘুষও দিয়েছি। কাজেই সুলতানের সৈন্যদলে জায়গা পেতে খুব অসুবিধে হলো না।

—আমি এই জাহাজেই যাচ্ছি, তুমি বুঝলে কি করে?

ফজল হাসলো। বললো—সোনার ঘণ্টা আনতে জাহাজ যাচ্ছে, আর তুমি বেঁচে থাকতে সেই জাহাজে যাবে না, এ কি হয়। ভাল কথা তোমাকে যে দুটো মোহর দিয়েছিলাম, সেগুলো আছে?

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহর বিক্রির কথা, মকবুলের মোহর চুরির কথাও বলল।

—মকবুল? ফজল বেশ চমকে উঠল।

— হ্যাঁ, লোকটা নিজের নাম বলেছিল মকবুল।

—কেমন দেখতে বলো তো?

—মোটাসোটা। গোলগাল বেশ হাসিখুশী।

—হুঁ। ফজল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—তুমি মকবুলকে চেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করলো।

—ফজল ম্লান হেসে কপালের কাটা দাগটা আঙ্গুল দিয়ে দেখালো—মকবুলের তরোয়ালের কোপের দাগ।

ফজল বলতে লাগল—হ্যাঁ, ভাই, মকবুল আমার খুড়তুতো দাদা। বাবা আর খুড়ো মারা গেল। তারপর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে লাগল গণ্ডগোল। বিষয়সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার সময় পাওয়া গেল একটা পুরানো বাক্স। তাতে সেই মোহর দুটো। বংশ পরম্পরায় ঐ বাক্সটা প্রাপ্য ছিল মকবুলেরই, কিন্তু সে ভীষণ লোভী। একটা ছোট মরূদ্যান আমার

ভাগে পড়েছিল। ঐ মরূদ্যানটার ওপর ওর লোভ ছিল বরাবর। সে বলল—তুই বরং এই মোহরের বাক্স বদলে আমাকে ঐ মরূদ্যানটা দে। আমি রাজী হলুম, কি হবে ঐ মরূদ্যানটা নিয়ে। আমি তো আর ব্যবসা করবো না। তার চেয়ে বরং আমাদের বংশের একটা স্মৃতি মোহরের বাক্সটাই আমি রাখি। মকবুলের হাতে পড়লে বিক্রি করে দেবে। আমি রাজী হলাম। মোহরেরে বা টা আমার কাছেই রইল।

—তারপর?

—মকবুল নতুন পাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যবসার ধান্ধায় আমদাদ গেল, হায়াৎ গেল, আরো কত জায়গায় ঘুরে বেড়ালো। আফ্রিকাও নাকি গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বাড়ি এলো। মোহরের বাক্সটা আমার কাছ থেকে ফেরৎ চাইলো। আমি দেব কেন? ওকে তো চিনি। নিশ্চয়ই মোহর দুটো বিক্রি করে দেব। আমি স্পষ্ট বলে দিলাম—এই বাক্স আমার, আমি দেব না।

—তারপর?

—সেই রাত্রেই মকবুল আমাকে খুন করতে এল। খুব ভাগ্যিস—আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তবু তরোয়ালের কোপ এড়াতে পারিনি। কপালে সেই চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছি।

—মকবুল মোহর দুটোর জন্যে এত পাগল হয়ে উঠেছিল কেন?

—কারণটা আমি পরে জেনেছি। সোনার ঘণ্টা যে দ্বীপে রয়েছে, সেই দ্বীপে যাবার এবং ফিরে আসার দুটো পথেরই নকশা আঁকা আছে সেই মোহর দুটোতে।

—তাহলে কথাটা সত্যি? ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বললো।

—কি সত্যি?

—জানো ফজল, আমিও ঠিক এই কথা শুনেছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—যা হোক এই কথাটা জানবার পরই আমি বাড়ি ছাড়লাম। মোহর দুটো রুমালে বেঁধে সব সময় আমার কোমরে রাখতাম। ইচ্ছে ছিল, ঐ নকশাটা কারো কাছে থেকে বুঝে নেব, তারপর কিছু টাকা জমিয়ে জাহাজ কিনে একদিন সোনার ঘণ্টা আনতে যাবো। কিন্তু—

—কেন যেতে পারলে না?

—আচ্ছা ফজল, তুমি আমাকে মোহর দুটো দিয়েছিলে কেন?

—মকবুলের হাত থেকে মোহর দুটো বাঁচাবার জন্যে।

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললো—আশ্চর্য! নিজের জীবন বিপন্ন করেও তুমি যে মোহর দুটো হাতছাড় করো নি—আমি খিদের জ্বালায় সেটা বিক্রি করে দিলাম।

—তোমার দোষ নেই ভাই। আমারই বোঝা উ চিত ছিল। তুমি বিদেশী-কে তোমাকে চেনে? কে খেতে দেবে তোমাকে? আশ্রয়ই বা দেবে কে? যাকগে যা হবার হয়ে গেছে।

—তোমার কি মনে হয়? মকবুল সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যেতে পেরেছে?

—মনে হয় না। কারণ ও একটা মোহরই পেয়েছে। দুটো মোহর আছে জেনে নিশ্চয়ই অন্যটার খোঁজে আছে। জহুরী ব্যাটা সোনার লোভে অন্যটা বোধহয় এতদিনে গালিয়েই ফেলেছে।

গল্প করতে-করতে দুজনের কারোরই খেয়াল নেই যে, রাত শেষ হয়ে এসেছে। ভোর হয়-হয়। হ্যারি ফ্রান্সিসের খোঁজখবর নিতে এল। তখন দুজনের খেয়াল হল যে ভোর হয়েছে। ফজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। যে ঝোলানো দড়িটা বেয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এসেছিল সেটা বেয়েই নেমে গেল সমুদ্রের জলে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে সাঁতরাতে সাঁতরাতে

সুলতানের জাহাজের কাছে গেল। ওখানে সে এক দড়ি ঝুলিয়ে নেমে এসেছিল। সেই দড়িটা বেয়ে জাহাজে উঠে গেল। তারপর দড়িটা তুলে রেখে পা টিপে-টিপে কেবিন ঘরের দিকে চলে গেল।

জাহাজ দুটো চলল। দিন যায়, রাত যায়। এদিকে ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। এক চিন্তা কি করে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে, ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা এড়িয়ে সে সাদা মন্দিরের দ্বীপটায় জাহাজ নিয়ে যাবে।

হ্যারি আসে। দুজনে পরামর্শ হয়।

একদিন গভীর রাত্রে ফজল এলো। তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। ফ্রান্সিস বেশ অবাকই হল। কি ঘটলো এমন? ফজল কোন কথা না বলে কোমরবন্ধনী থেকে খুব সাবধানে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। আস্তে-আস্তে ভাঁজ খুলে ফ্রান্সিসের সামনে পাতলো। পার্চমেণ্ট কাগজের মত শক্ত পুরোনো কাগজ। হলদেটে হয়ে গেছে। বললো যে বাক্সটাতে মোহর দুটো ছিল, সেই বাক্সে এই কাগজটা পেলাম।

—কিছু লেখা আছে এটাতে?

—না। তবে আমার বেশ মনে আছে, মোহর দুটো এই কাগজটায় জড়ানো ছিল। একটু লক্ষ্য করে দেখো—অনেকদিন জড়ানো ছিল ব'লে দুটো মোহরের দুপিঠের আবছা ছাপ পড়েছে কাগজটাতে।

ফ্রান্সিস এবার উৎসুক হল। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সত্যিই তাই। কাগজটার দুপাশে দুটো অস্পষ্ট ছাপ। একটাতে মাথার ছাপের মত। অন্যটাতে কয়েকটা ত্রিকোণের আভাস। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি পাহারাদারকে ডাকলো। বললো—রসুইঘর থেকে একটু কাঠকয়লার গুঁড়ো নিয়ে এসো।

খুব সন্তর্পণে ফ্রান্সিস সেই কাগজটায় কাঠকয়লার গুড়ো ঘষলো। আস্তে-আস্তে কালো ছাপগুলো স্পষ্ট হলো। একটাতে মাথা আঁকা। অন্যটাতে কয়েকটা ত্রিকোণ নকশা দেখা গেল। ফ্রান্সিস বললো—এটা উলটো ছাপ। আলোয় ধরলে সোজা ছাপ পাবো।

ফ্রান্সিস কাগজটাকে আলোর সামনে ধরল। একটা অস্পষ্ট নকশা ফুটে উঠল।

ফজল একটু উসখুস ক'রে ডাকলো—ফ্রান্সিস?

—কি হলো?

—এটা যাওয়ার পথের নকশা।

—হ্যাঁ। কিন্তু কয়েকটা চিহ্নের মানে বুঝতে পারছি না। ভাবতে হবে।

—কিন্তু আমি তো এখন—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ তুমি জাহাজে ফিরে যাও। কাগজটা থাক আমার কাছে।

—বেশ—ফজল চলে গেল।

পরের দিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে নকশাটা দেখালো। হ্যারি মাথামুণ্ড কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। গভীর মুখে বলল—ভূতুরে নকশা।

ফ্রান্সিস হাসলো। বললো—এই দেখ, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—বলে ফ্রান্সিস 'ক' 'খ' করে প্রত্যেকটি চিহ্নের আলাদা নাকমরণ করল। প্রত্যেকটি চিহ্নের অর্থ কি, তাও বলল।

হ্যারি হতবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তারপর বলল—তুমি কি ক'রে বুঝলে ত্রিকোণগুলো পাথুরে দ্বীপ?

—ঝড়ের সময় মাস্তুলে উঠে ঠিক যা-যা দেখেছিলাম—নকশাটাতে তাই আঁকা আছে।

—তাহলে এটাই যাওয়ার পথের নকশা?

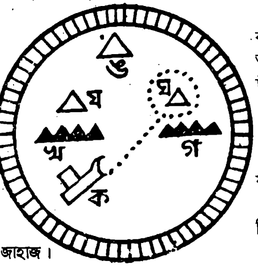

ক = জাহাজ। খ ও গ = ডুবো পাহাড়। য ও ঘ = প্যাথরে দ্বীপ। ঙ = সোনার ঘণ্টার দ্বীপ।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু গোলমাল বাধিয়েছে 'ক' থেকে 'ঘ' পর্যন্ত এই অস্পষ্ট রেখাটা। রেখাটা আবার 'ঘ' দ্বীপটার চারদিকেও রয়েছে।

—এ তো সোজা।

—সোজা?

—হ্যাঁ, জাহাজটা এই পথে যাবে।

—ধ্যোৎ, এ তো শিশুও বুঝবে—কিন্তু, প্রশ্ন হলো—কি করে?

হ্যারি এবার ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না। বললো— দাগটা মনে হয় সুতো।

—সুতো?

—হ্যাঁ—সুতো দিয়ে জাহাজটা টেনে নিয়ে যেতে বলছে।

ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো। পরক্ষণেই ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আচমকা এক রদ্দা কষালো হ্যারির ঘাড়ে। হ্যারি বিছানা থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে আর কি। ফ্রান্সিসের সেদিকে নজর নেই। সে তখন বিছানায় উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করেছে। হ্যারি ঘাড়ে হাত বুলোতে অবাক চোখে ফ্রান্সিসের নাচ দেখতে লাগল। নাচ থামিয়ে ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি-ঘাড়ে লেগেছে খুব?

—নাঃ —এমন আর কি! কিন্তু তোমার এই হঠাৎ পুলকের কারণটা কি?

—সুতো।

—সুতো?

—তুমি যে বললে, সুতো দিয়ে জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়া।

—তুমি কি তাই করতে চাও নাকি?

—হ্যাঁ, তবে সুতো নয়, মোটা কাছি। দ্বীপটার চারদিকে গোল দাগ মানে কাছিটা দ্বীপের পাথরের সঙ্গে বাঁধতে হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির পাশে এসে বসলো। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা, হ্যারি, আমাদের জাহাজে কাঠের পাটাতন কত আছে।

—আর একটা জাহাজ তৈরি করার মতো নেই।

—কিন্তু একটা বেশ শক্ত নৌকো'

—হ্যাঁ, তা তৈরি করা যাবে।

—আর দড়ি-কাছি এ সব?

—যথেষ্ট আছে।

—আজ থেকে তাহলে কাজে লাগতে হবে। আমাদের দলের লোকদের ডেকে বলে দাও—সবাইকে হাত লাগাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা শক্ত নৌকো তৈরি করতে হবে, আর একটা শক্ত লম্বা কাছি।

—কতটা লম্বা?

—যতটা লম্বা হতে পারে?

—বেশ।

দিন-রাত কাজ চললো। নৌকো, জাহাজ তৈরি করতে ভাইকিংরা খুবই দক্ষ। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সবই জাহাজে মজুত থাকে। দিনকয়েকের মধ্যেই একটা নৌকো তৈরি হয়ে গেল। দড়ি-দড়া যা ছিল, পাক দিয়ে-দিয়ে বেশ শক্ত কাছিও তৈরি হলো একটা। এবার কুয়াশা, ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের প্রতীক্ষা। পরদিন সকাল থেকেই সূর্যের আলো কেমন ম্লান হয়ে গেল। সমুদ্রের বুকে এদিক-ওদিক কুয়াশায় জটলা দেখা গেল। হ্যারি ছুটে এলো ফ্রান্সিসের কাছে। বললো—ফ্রান্সিস, আমরা এসে গেছি।

—কুয়াশা? ফ্রান্সিস শুধু এই কথাটাই বললো।

—হ্যাঁ।

—দাঁড়াও, সেনাপতি কি করে দেখা যাক।

—কিন্তু ওর ওপর নির্ভর করতে গেলে আমাদের জাহাজ টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে।

—সেনাপতিরও সেই ভয় আছে। দেখোই না, ও কি করে।

সেনাপতি ছিল ফ্রান্সিসদের জাহাজে। সে শিঙা বাজাবার হুকুম দিলো। এই জাহাজে শিঙা বাজাতে সুলতানের জাহাজেও শিঙা বেজে উঠল। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড় টানতে হবে। পাল নামাতে হবে। সবাই যে যার জায়গায় চলে গেল।

জাহাজ চললো। চারদিকের কুয়াশা ঘন হতে লাগল। একটু পরেই পরেই প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ঢেউগুলি ফুলে উঠে জাহাজের গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেনাপতি হুকুম দিল—দাঁড় বাইতে থাকো।

দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ একটু এগোয়, আবার ঝড়ের ধাক্কায় পিছিয়ে আসে। সেই ঝড়ের শব্দের মধ্যে সোনার ঘণ্টা বেজে উঠল—ঢং-ঢং-ঢং। সবাই সেই শব্দ শুনলো। সুলতান নিজের জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েই সেই শব্দ শুনলেন। তাঁর চোখ দুটো ক্ষুধার্ত বাঘের মত জ্বলে উঠল। সোনার ঘণ্টা—এত কাছে? সেই জল ঝড়ের মধ্যে সেনাপতি দেখলো—দুদিকে দুটো ডুবো পাহাড়। ঝড়ের ধাক্কাটা আসছে ডানদিক থেকে। ডানদিকের ডুবো পাহাড়ের জন্যে ভয় নেই। কারণ জাহাজ ওদিকে যাবে না। কিন্তু আর একটু এগোলে ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ছিটকে পড়বে। তারপরের কথা সেনাপতি আর ভাবতে পারলো না। সে আর এগোতো সাহস পেল না। জাহাজ ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসতে লাগল। দেখাগেল সুলতানের জাহাজটা এই জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। এই জাহাজের গায়ে এসে লাগল ওটা। ক্রুদ্ধ সুলতান ভাইকিংদের জাহাজে উঠে চীৎকার করে সেনাপতিকে ডাকলেন। সেনাপতি এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

—জাহাজ পিছিয়ে নিয়ে এলেন কেন?

—সামনেই ডুবো পাহাড়। পিছিয়ে না এলে এতক্ষণে দুটো জাহাজই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

—আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমাকে সোনার ঘণ্টার দ্বীপে নিয়ে যেতেই হবে। সুলতান গর্জে উঠলেন।

সেনাপতি চুপ করে রইলো। সুলতান কিছুক্ষণ সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—কি? আপনি জাহাজ নিয়ে যেতে পারবেন না?

সেনাপতি মাথা নাড়ল—না।

সুলতান চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালো ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন— তোমাদের মধ্যে কেউ পারবে?

কেউ কোন কথা বলল না। সুলতান অসহিষ্ণু স্বরে মন্তব্য করলেন— ভাইকিংরা নাকি খুব সাহসী। জাহাজ চালাতে ওস্তাদ?

হ্যারি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললো—কথাটা মিথ্যে নয়, সুলতান।

সুলতান কটমট করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ, তার প্রামাণ দাও।

—ডুবো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

—তাহলে তোমরা কেউই পারবে না?

—একজন হয় তো পারে।

—কে সে?

—ফ্রান্সিস!

সুলতান অবাক চোখে হ্যারির দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন—তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

—আজ্ঞে না। ফ্রান্সিস বেঁচে আছে, আর এই জাহাজেই আছে।

সুলতান ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রহমানের দিকে তাকালেন।

রহমান তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলো—কিন্তু ফ্রান্সিস বাঁচলো কী করে?

—আপনারা কি সেই ইতিহাসই শুনবেন এখন, না দ্বীপে যাবার চেষ্টা করবেন।

সুলতান এতক্ষণে যেন একটু শান্ত হলেন। ধীর স্বরে বললেন—যদি ফ্রান্সিস দুটো জাহাজই নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে ওকে মুক্তি দেবো।

—বেশ। তাহলে ফ্রাসিসকে ডাকি?

—হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। এবার আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে সুলতানের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিংরা ফ্রান্সিসকে দেখে অবাক। পরক্ষণেই সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠল। সুলতান ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি বোধহয় সবই শুনেছ।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি একা মুক্তি চাই না, আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।

সুলতান মাথা নীচু করে একটু ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—বেশ। তাই হবে।

সুলতান আর কোন কথা না বলে নিজের জাহাজে ফিরে গেলেন।

ফ্রান্সিস এবার ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—ভাইসব, আমি জানি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো। আমি জীবন দিয়েও তোমাদের সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব।

সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। ফ্রান্সিস বললো—অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। জীবনের কোন দুঃখ-কষ্টই বৃথা যায় না। আমরা সফল হবোই। সোনার ঘণ্টার সেই দ্বীপ আমাদের নাগালের মধ্যে। শুধু একটা বাধা ডুবো পাহাড়। সেই বাধা অতিক্রমের উপায় আমরা জানতে পেরেছি। এখন সবকিছু নির্ভর করছে আমাদের শক্তি সাহস আর বুদ্ধির ওপরে। তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

সবাই চীৎকার করে ফ্রান্সিসকে উৎসাহিত করলো।

ফ্রান্সিস বলতে লাগল—এবার আমাদের কি কাজ তাই বলছি। কয়েকজন চলে যাও জাহাজের পেছনে। সুলতানের জাহাজটা আমাদের জাহাজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধতে হবে। আর একদল চলে যাবে দাঁড় টানতে। বাকি সবাই থাকবে ডেকের ওপর।

ফ্রান্সিস একটু থেমে আবার বলতে লাগল—ঝড় শুরু হলেই আমি আর হ্যারি যে নৌকোটা আমরা তৈরি করেছি, সেটাতে চড়ে এগিয়ে যাবো। আমাদের সঙ্গে থাকবে একটা লম্বা কাছি। দুটো ডুবো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটু এগোতে পারলেই শান্ত সমুদ্র পাব। তার ডানপাশেই ন্যাড়া পাহাড়ের দ্বীপ। সেখানে পাহাড়ের মাথায় আমরা কাছির একটা প্রান্ত বাঁধবো। কাছিটায় আর একটা প্রান্ত থাকবে ডেকে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের হাতে। আমি কাছিটার তিনবার ঝাঁকুনি দিলেই তারা কাছি টানতে শুরু করবে। দাঁড়িরা দাঁড় বাইতে শুরু করবে। দুটো জাহাজই বিনা বাধায় ডুবো পাহাড় পেরিয়ে যেতে পারবে। আমরা সফল হবোই।

সুলতান ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বোধহয় সবই শুনেছ।

সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল—ও-হো-হো। ফ্রান্সিসের নির্দেশমত কাজে লেগে পড়ল সব। জাহাজ আবার এগিয়ে চলল সোনার ঘণ্টার দ্বীপের দিকে। একটু পরেই কুয়াশার ঘন আস্তরণ ঘিরে ধরলো জাহাজটাকে। তারপরেই শুরু হলো ঝড়ের তাণ্ডব। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নৌকোটা জলে ভাসালো। সেই মস্ত লম্বা কাছির একটা প্রান্ত ধরে রইলো জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো ভাইকিংরা। ফ্রান্সিস নৌকোর দাঁড় বাইতে লাগল। হালে বসল হ্যারি। ওরা কাছি ছাড়তে-ছাড়তে এগিয়ে চলল। কিন্তু সেই উঁচু-উচু ঢেউ পেরিয়ে এগোনো সোজা কথা নয়। তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, ঢেউয়ের ঝাপটা। ফ্রান্সিস প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল। সেই প্রচণ্ড দুলুনি উপেক্ষা করে হ্যারি হাল ধরে চুপ করে বসে রইলো।

এমন সময় সোনার ঘণ্টার গভীর শব্দ শোনা গেল—ঢং-ঢং-ঢং।

জাহাজ থেকে ভাইকিংরা মহা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে ওদের সেই চীৎকারের শব্দ ফ্রান্সিস আর হ্যারি শুনতে পেল। আজকে চূড়ান্ত লড়াই। দুজনে নতুন উদ্যমে নৌকো চালাতে লাগল। প্রচণ্ড ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস পাকা নাবিকের মত নৌকো চালাতে লাগল। এক-একবার মনে হচ্ছে নৌকোটা বোধহয় ঢেউয়ের গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ঢেউয়ের মাথায় উঠে আসছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস আবছা দেখলো বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ের ভেসে ওঠা মাথাটা। সমুদ্রের জলের ঢেউ সরে যেতেই মাথাটা ভেসে উঠছে, পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে। ঝড়ের ধাক্কাটা আসছে ডানদিক থেকে। কাজেই যে করেই হোক ডানদিক ঘেঁষেই ওদের বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে ঝড়ের ধাক্কায় নৌকো বাঁদিকের ডুবো পাহাড়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে। নকশাটাতে ডানদিক ঘেঁষে যাওয়ার নির্দেশ আছে। ফ্রান্সিস চীৎকার করে হ্যারিকে বললো—ডানদিক ঘেঁষে।

হ্যারি শক্ত করে হাল ধরে রইলো। আস্তে-আস্তে নৌকো এগোতে লাগলো। সমস্ত শরীর জলে ভিজে গেছে। যেন স্নান করে উঠছে দুজনে। সমুদ্রের নোনা জলে চোখ জ্বালা করছে। তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। বুকে যেন আর দম নেই। হাত অবশ হয়ে আসছে। শুধুতো দাঁড় টানাই না, কাছিটাও শক্ত করে ধরতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। সমস্ত কাছিটাই যাতে সমুদ্রের জলে পড়েনা যায়, তার জন্যে ফ্রান্সিস কাছির প্রান্তটি নৌকার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল।

হঠাৎ ডানদিকের ডুবো পাহাড়ের মাথাটা একবার ভেসে উঠেই ডুবে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পর-পর কয়েকটা ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকোটা সামনের দিকে এগিয়ে এলো। আশ্চর্য আর বৃষ্টি নেই। হাওয়ার তেজও কমে গেছে। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে তাকালো। নৌকো ডুবো পাহাড় ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। তারও পেছনে জাহাজ দুটো। ঝাপসা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন দেখছে ফ্রান্সিস, ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ দুটো একবার উঠছে, একবার পড়ছে। আর ঝড় নেই। আকাশে জ্বলন্ত সূর্য। পরিষ্কার নির্মেঘ আকাশ। সমুদ্রের ঢেউ শান্ত। সূর্যের আলোয় ঝকঝক্ করছে দুদিকের পাথুরে দ্বীপ। আরো দূরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা পাহাড়ের দ্বীপ। পাহাড়ের মাথায় একটা সাদা রঙের মন্দির মত। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল। হ্যারিও হাসল। কিন্তু আনন্দের সময় এখন নয়। আসল কাজই এখন বাকি।

ডানদিকের ন্যাড়া পাহাড়ের দ্বীপটায় ওরা নৌকো লাগাল। নৌকায় বাঁধা কাছির মুখটা খুলে কাঁধে নিলো ফ্রান্সিস। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল। ছোট্ট পাহাড়। শ্যাওলা ধরা পেছল পাথরে সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে ওরা এক সময় পাহাড়টার মাথায় উঠে এল। তারপর কাছিটাকে শক্ত প্যাঁচ দিয়ে পাহাড়ের মাথায় বাঁধলো। টেনে দেখলো যথেষ্ট শক্ত হয়েছে। দুজনে মিলে কাছিটাকে যথাসাধ্য টান-টান করে ধরল। তারপর তিনবার জোরে ঝাঁকুনি দিলো। জাহাজের ডেকে যারা কাছাটার আর একটা প্রাপ্ত ধরে ছিল, তারা সংকেতটা বুঝতে পারল। তারা এবার সবাই মিলে কাছিটা টানতে লাগল। দাঁড়িদেরও খবর দেওয়া হলো। তারাও প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল। জাহাজ দুটো সেই জল-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে দোল খেতে-খেতে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। একসময় ডুবো পাহাড় দুটোও পেরিয়ে গেল। হঠাৎ আর বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই। শান্ত সমুদ্র। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু ঝলমলে রোদ। সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠল। একদল ডেকের ওপর নাচতে শুরু করলো। কেউ-কেউ হেঁড়ে গলায় গান ধরলো। সুলতানের জাহাজেও আনন্দের বান ডাকলো। সৈন্যরা কেউ-কেউ চীৎকার করতে-করতে শূন্যে তরোয়াল ঘোরাতে লাগল। সুলতান ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে-নেড়ে সবাইকে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কাছি বেয়ে-বেয়ে জাহাজে উঠে এল। সবাই উঠে এলো ওদের জড়িয়ে ধরবার জন্যে। ওদের দুজনকে কাঁধে নিয়ে নাচা-নাচি শুরু হয়ে গেল। সেই শান্ত সমুদ্রের বুক ভরে উঠল বহু কণ্ঠের চীৎকার, হই-চই আনন্দধ্বনিতে। জাহাজ দুটো এবার চললো সামনের সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের দ্বীপটার দিকে। চূড়োয় সাদা গোল মন্দিরটায় সূর্যের আলো পড়ছে। ওখানেই আছে সোনার ঘণ্টা।

দূরত্ব বেশী নয়। একটু পরেই জাহাজ দুটো সবুজ ঘাসে ঢাকা দ্বীপটায় এসে ভিড়ল। দ্বীপে প্রথমে নামলেন সুলতান। তাঁর সঙ্গে রহমান, তারপর আরো কয়েকজন সৈন্য। সুলতান ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলো। তারপর সবাই সেই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গা বেয়ে-বেয়ে উঠতে লাগল। খাড়া পাহাড় নয়, কাজেই পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে ঝোপঝাড় ধরে উঠতে খুব একটা কষ্ট হলো না। মন্দিরের কাছে পৌঁছে সবাই থামলো। তাকিয়ে-তাকিয়ে গোল মন্দিরটা

দেখলো। সাদাটে রঙের আস্তরণ মন্দিরটায়। এখানে-ওখানে সবুজ শ্যাওলার ছোপ। জাহাজ থেকে যতটা ছোট মনে হচ্ছিল, ততো ছোট নয়। মন্দিরটায় একটা মাত্র ছোট দরজা। দরজাটা খোলা। কোনা পাল্লা নেই। সুলতান একাই মন্দিরটার দিকে এগোলেন। আর সবাই অপেক্ষা করতে লাগল। জাহাজের সবাই ডেকে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখছে এখানে কি ঘটছে। সবার মনেই বোধহয় এক প্রশ্ন—সোনার ঘণ্টা কি এখানেই আছে?

সুলতান মন্দিরে মধ্যে ঢুকলেন। সবাই উৎকণ্ঠিত। সবাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ হয়ে আছে। শুধু সমুদ্রে ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার শব্দ। শুধু বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ। আর কোন শব্দ নেই। এতগুলো মানুষ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

একটু পরে সুলতান ধীরে পায়ে মন্দিরটা থেকে বেরিয়ে এলেন। ফ্রান্সিসরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এসে একবার ফ্রান্সিসের দিকে আর একবার রহমানের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফ্রান্সিসের বুক দমে গেল। তবে কি সোনার ঘণ্টা এখানে নেই? এত দুঃখ-কষ্ট, এত পরিশ্রম সব অর্থহীন? সব ব্যর্থ?

ফ্রান্সিস আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে মন্দিরটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। কোথায় সোনার ঘণ্টা? মন্দিরটার মাথা থেকে পেতলের শেকলে ঝুলছে একটা পেতলের ছোট্ট ঘণ্টা। চারিদিকেই দেয়াল। আর কিছু নেই মন্দিরটাতে। রাগে-দুঃখে ফ্রান্সিসের চোখ ফেটে জল এলো। এই তুচ্ছ একটা পেতলের ঘণ্টার জন্যে এত দুঃখ-কষ্ট? সেই ছেলেবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছে, সেই স্বপ্ন, এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে? সোনার ঘণ্টার গল্প তাহলে একটা ছেলেভুলোনো কাহিনী মাত্র? ফ্রান্সিসের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে দুহাতে পেতলের ঘণ্টাটা জোরে ছুঁড়ে দিলো দেওয়ালের গায়ে।

ঢং-ঢং-ঢং—প্রচণ্ড শব্দে ফ্রান্সিস ভীষণ চমকে উঠল। দুহাতে কান চেপে বসে পড়ল। একি? তবে কি— তবে কি—সমস্ত গোলাকার মন্দিরটাই একটা সোনার ঘণ্টা?

ঢং-ঢং—ঘণ্টার শব্দ বেজে চললো। বাইরে সুলতান, রহমান হ্যারি, সঙ্গের সৈন্যরা, নীচে জাহাজের উৎসুক ভাইকিংরা সবাই প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল গোল মন্দিরটার দিকে। এত-বড় সোনার ঘণ্টা! ঢং-ঢং, গম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাথার ওপরে নীল আকাশের নিচে শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে দূর-দূরান্তরে।

সুলতানের মুখে হাসি ফুটলো। ফ্রান্সিস মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে হ্যারি তাকে জড়িয়ে ধরলো। আনন্দে অতগুলো মানুষের চীৎকার হৈ-হল্লায় নির্জন দ্বীপ মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু এই আনন্দ আর উল্লাসের মুহূর্তে কেউই লক্ষ্য করেনি, যে সেই ডুবো পাহাড়ের দিক থেকে একটা জাহাজ তীরবেগে সোনার ঘণ্টার দ্বীপের দিকে ছুটে আসছে।

সেই জাহাজটাকে প্রথম দেখলো রহমান। সে সুলতানের কাছে ছুটে এলো। সুলতান তখন সোনার ঘণ্টার বাইরের পলেস্তারটা কতটা শক্ত, তাই পরীক্ষা করছিলেন। রহমান সুলতানকে জাহাজটা দেখালো। তখন জাহাজটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এতক্ষণে সবাই দেখতে পেল সেই দ্রুত ছুটে আসা জাহাজটাকে। একটা কালো পতাকা উড়ছে জাহাজটা মাস্তুলে। তাতে সাদা রঙের মড়ার মাথার খুলি আর ঢ্যাঁড়ার মত দুটো হাড়ের চিহ্ন আঁকা। জলদস্যুদের জাহাজ! নীচের জাহাজ দুটোয় সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগলো। সুলতান, রহমান, ফ্রান্সিস সবাই দ্রুত পায়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে লাগল।

জলদস্যুদের জাহাজটা প্রথমে সুলতানের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। খালি গা, মাথায় কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা জাহাজে লাফিয়ে উঠে এল।

এবার ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে লাগল। সেখানেও শুরু হল তরোয়ালের যুদ্ধ। চীৎকার, হই-চই, তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ, আহত আর মুমূর্ষুদের আর্তনাদে ভরে উঠল সমস্ত এলাকাটা। লড়াই চলতে লাগল। সুলতান রহমান, ফ্রান্সিস তারাও ততক্ষণে নেমে এসেছে। তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল তরোয়াল হাতে জলদস্যুদের উপর।

যুদ্ধ করতে-করতে হঠাৎ ফ্রান্সিস মকবুলকে দেখতে পেল। তার পরনে জলদস্যুদের পোশাক নয়, আরবীয়দের পোশাক। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কাছে সব স্পষ্ট হলো। তাহলে মকবুলই এই জলদস্যুদের সোনার লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। যুদ্ধের ফাঁকে এক সময় ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে মকবুলকে ডাকলো—মকবুল, আমাকে চিনতে পারছো?

মকবুল ওর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—আমি বেঁচে থাকতে সোনার ঘণ্টা কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। নিপুণ হাতে তরোয়াল চালিয়ে জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল।

—ফ্রান্সিস! ডাক শুনে ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে দেখল ফজল।

—মকবুল এদের সঙ্গে এসেছে তাই না? ফজল জিজ্ঞেস করল।

—ঠিক ধরেছ।

—কিন্তু ওরা এল কি করে?

—আমাদের জাহাজ অনুসরণ করে ওরা এসেছে। আমরা যেভাবে ডুবো পাহাড় পেরিয়েছি, ওরাও ঠিক সেইভাবেই পেরিয়েছে।

—মকবুলকে দেখেছো?

—ঐ যে মাস্তুলটার ওপাশে লড়াই করছে।

ফজল আর দাঁড়ালো না। সেইদিকে ছুটলো। মকবুল কিছু বোঝবার আগেই ফজল মকবুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুজনের লড়াই শুরু হয়ে গেল। মকবুলের তুলনায় ফজলের হাত অনেক নিপুণ। ফজল বেশ সহজ ভঙ্গিতেই তরোয়াল চালাচ্ছিলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মকবুল বেশ হাঁপিয়ে পড়লো। ফজলও হাঁপাচ্ছিল। একবার দম নিয়ে ফজল বললো—মরুদস্যুদের দলে ঢুকেছিলাম, শুধু এই তরোয়াল চালানো শেখবার জন্যে। তারপর কপালের কাটা দাগটা দেখিয়ে বলল—এটার বদ্‌লা নিতে হবে তো।

মকবুল কোন কথা না বলে তরোয়াল উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার লড়াই শুরু হল। প্রথম আক্রমণের মুখে ভাইকিং আর সুলতানের সৈন্যরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে তাদের বেশি সময় লাগল না। সুলতানের বাছাই করা সৈন্য আর দুর্ধর্ষ ভাইকিংদের হাতে জলদস্যুরা কচু-কাটা হতে লাগল। ওরা পিছু হটতে লাগল। দুজন একজন করে

মকবুল তলোয়ার উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নিজেদের জাহাজে পালাতে লাগল। এদিকে মকবুল ফজলের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে হঠাৎ দড়িতে পা আটকে ডেকের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ফজল ওর বুকে তরোয়ালটা চেপে ধরল। দুজনেই ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে তখন। দেখতে পেয়ে ফ্রান্সিস ছুটে এলো। ফজলের হাত চেপে ধরে বলল—ফজল, ওকে মেরে ফেলো না।

ফজল দাঁত চিবিয়ে বললো—আমি যদি না মারি, ও আমায় মারবে।

—তবু আমার অনুরোধ, ওকে ছেড়ে দাও।

ফজল এক মুহূর্ত ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—বেশ। তোমার কথাই রাখলাম।

ফজল তরোয়াল সরিয়ে নিলো। মৃত্যু-ভয়ে মকবুলের মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। ও হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যে ও বেঁচে গেল, এটা ওর বুঝতে সময় লাগল। কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

তারপর আস্তে-আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস ডাকলো—মকবুল!

মকবুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো।

—এই জলদস্যুরা কি তোমার বন্ধু? তুমি কি এদের সঙ্গে ফিরে যেতে চাও?

—না।

—এখনও ভেবে দেখো, ওরা কিন্তু জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে।

সত্যিই জলদস্যুরা তখন নিজেদের জাহাজে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। বাকি কয়েকজন গিয়ে উঠলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে। মকবুল ভয়ার্ত চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো। বললো—না-না, আমাকে ঐ জাহাজে আর পাঠিয়ো না।

—কেন? ফ্রান্সিস ব্যঙ্গ করে বললো—তোমার বন্ধু ওরা। তোমার জন্যে সোনার ঘণ্টা উদ্ধার করে দিতে এসেছিলো। এক সঙ্গেই যেমন এসেছো, ফিরেও যাও একসঙ্গে।

—না-না, ওরা আমাকে পেলে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

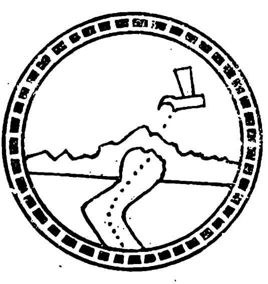

'সোনার ঘণ্টা'র দ্বীপ থেকে ফিরে আসবার সুড়ঙ্গ পথের নক্সা

—হুঁ। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বললো—এবার আমার মোহরটা ফেরত দাও।

মকবুল কোমরবন্ধনী থেকে একটা থলে বের করলো। থলে থেকে ফ্রান্সিসের সেই চুরি যাওয়া মুদ্রাগুলো আর মোহরটা বের করে ফ্রান্সিসের হাতে দিলো। মোহরটা হাতে পেয়েই ফ্রান্সিস আর ফজল মোহরটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। মনোযোগ দিয়ে উল্টো পিঠের দ্বীপ থেকে ফিরে আসার নকশাটা দেখতে লাগল।

মকবুল ক্রূর হাসি হেসে বললো—অন্য মোহরটা যদি পেতাম, তাহলে এই সোনার ঘণ্টা তোমরা নিয়ে যেতে পারতে না।

—জানি। ফ্রান্সিস মোহরটা থেকে চোখ না সরিয়েই বললো।

জলদস্যুদের দল দ্রুত জাহাজ চালিয়ে সরে পড়লো। ওদের জাহাজ সমুদ্রের দিগন্তে মিলিয়ে যেতেই সুলতান সোনার ঘণ্টা নামিয়ে আনার হুকুম দিলেন। সৈন্যরা সব দড়ি জোগাড় করে তৈরি হতে লাগলো।

নীচে জাহাজে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন সুলতানের হুকুমে মিস্ত্রীরা সোনার ঘণ্টার গা থেকে পলেস্তারা খসাচ্ছিলো। এতক্ষণে পলেস্তারা খসানো শেষ হলো। সবাই কাজ ফেলে ডেকে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। সে এক অপরূপ দৃশ্য। বিস্ময়ে অবাক চোখে সবাই তাকিয়ে দেখতে লাগল।

অন্ধকার নামলো সোনার ঘণ্টার দ্বীপে, বালিয়াড়িতে, সুদূর প্রসারিত সমুদ্রের বুকে। দ্বীপের সমুদ্রতীর বিরাট একটা কাঠের পাটাতন তৈরি করা হতে লাগল। ঐ পাটাতনে রাখা হবে সোনার ঘণ্টা তারপর জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে।

রাত গভীর তখন। আকাশে আধভাঙা চাঁদ। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ডেকের ওপরে পায়চারী করছে। কখনও দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছে মশালের আলোগুলো কাঁপছে। ঠক্-ঠক্ পেরেক পোঁতার শব্দ উঠছে। মিস্ত্রীদের কথাবার্তাও কানে আসছে। কিন্তু ফ্রান্সিসের সেদিকে কান নেই। নিজের চিন্তায় সে ডুবে আছে। এত দুঃখ-কষ্টর পর সোনার ঘণ্টা যদিও বা পাওয়া গেল, কিন্তু সেটাকে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়া হলো না! ফ্রান্সিস পাহাড়ী দ্বীপের চূড়োর দিকে তাকালো! জ্যোৎস্না পড়েছে সোনার ঘণ্টার মসৃণ গায়ে। একটা মৃদু আলো চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওটা যেন মাটিতে নেই। শূন্যে ভাসছে। স্বপ্নময় রহস্যেভরা এর অপার্থিব সৌন্দর্যের আভাস। ফ্রান্সিসের মন বিদ্রোহ করলো। অসম্ভব! এমন সুন্দর একটা জিনিস, যেটাকে ঘিরে তার আবাল্যের স্বপ্ন গড়ে উঠেছে, সেটা এভাবে শুধু অর্থ আর লোকবলের জোরে সুলতান নিয়ে যাবে? আর ওরা তাকিয়ে দেখবে? না, এ কখনই হতে পারে না। আপন মনেই ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল—না-না। যে করেই হোক, সোনার ঘণ্টা তারা নিজের দেশে নিয়ে যাবে। এতে যদি তাদের জীবন বিপন্ন হয় হোক্।

পরদিন সকালেই ঘণ্টার মাপ অনুযায়ী একটা মস্ত বড়কাঠের পাটাতন তৈরী হলো। এবার সোনার ঘণ্টা নামিয়ে আনবার পালা। পাহাড়ের ঢালু গায়ে যে ক'টা খাটো গাছ ছিল, তাতেই দড়িদড়া বেঁধে কপিকলের মত করা হলো। তারপর সোনার ঘণ্টা বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে নামানো হতে লাগল। কিন্তু দড়িদড়ার কপিকল সোনার ঘণ্টার অত ভার সহ্য করতে পারল না। দু'তিন জায়গায় দড়িছিঁড়েগেল। একটা গাছতো গোড়সুদ্ধ উপড়ে গেল। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে সোনার ঘণ্টা ঢং-ঢং শব্দ তুলে গড়িয়ে পড়লো বালিয়াড়ির ধারে। কয়েকজন ছেঁড়া দড়িদড়াসুদ্ধু ছিটকে মারা পড়লো। কিন্তু সুলতানের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। হুকুম দিলেন, যে করেই হোক সোনার ঘণ্টাকে কাঠের পাটাতনের ওপর তুলল। তারপর সেটাকে সুলতানের জাহাজের পেছনে বেঁধে যাত্রা শুরু হলো আমদাদ বন্দরের উদ্দেশ্যে।

মোহরের গায়ে যে নকশা আঁকা ছিল সেটা দেখে হিসাব করে ফ্রান্সিসই ফেরার পথের নিশানা বের করলো। জাহাজ দুটো চললো সেই পথ ধরে একটা অদ্ভুত পাহাড়ের নির্দেশ দেওয়া ছিল নকশাটায়। সেই উঁচু পাহারটার নীচে একটা টানা সুড়ঙ্গ পথ। ফ্রান্সিস হ্যারিকে যখন নকশাটা বোঝাল, হ্যারি বলল—তাহলে এই সুড়ঙ্গ পথটা দিয়েই তো ফ্রান্সিস হাসল। বলল— প্রথমতঃ,এই সুড়ঙ্গ পথের খবর আমরা জানতাম না।

—আর দ্বিতীয় কারণ?

—আমার মনে হয়, ঐ পথ দিয়ে একটা জাহাজ এদিক থেকে ওদিকে যেতে পারে, কিন্তু ওদিক থেকে এদিকে আসতে পারে না।

—এ আবার হয় নাকি। হ্যারি অবাক হলো।

—প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল। ফ্রান্সিস হাসলো।

সন্ধ্যের সময় সেই উঁচু পাহাড়টায় দেখা পাওয়া গেল। কাছে যেতে সুড়ঙ্গ পথটাও দেখা গেল। একটা জাহাজ যেতে পারে, এমনি বড় পথ সেটা। ফ্রান্সিসের অনুমানই ঠিক।

সামনে রাত্রির অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথে ঢোকা বিপজ্জনক। স্থির হলো। সকালের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

পরদিন সকালে প্রথমে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ধীরে-ধীরে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকলো। একটু এগোতেই বাইরের আলো ম্লান হয়ে গেল। কেমন ছায়া-ছায়া হয়ে এল ভেতরটা। তবু মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া ছাদ, দুপাশের পাথুরে দেওয়াল দেখা যাচ্ছিলো। সুড়ঙ্গটা একটা জায়গায় বাঁক নিয়েছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে দেওয়ালে ধাক্কা না লাগিয়ে জাহজাটাকে বাঁক ঘুরিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো। বাঁক ঘুরতে এক অপূর্ব দৃশ্য! এদিকে ওদিকে থামের মত গোল এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে দেয়াল জল থেকে উঠে ওপরের ছাদের সঙ্গে লেগে আছে যেন। সেগুলোর গায়ে নীলাভ দ্যুতিময় পাথরের টুকরো। ওপরের পাথুরে ছাদেও কত বিচিত্র বর্ণের পাথর। সেই ছাদের গা বেয়ে কোথাও বা শীর্ণ ঝরণার মত জল পড়ছে। যেটুকু আলো সুড়ঙ্গের থেকে বাইরে আসছিল, তাই দ্বিগুণিত হয়ে জায়গাটায় এক অপার্থিব আলোর জগৎ রচনা করেছে। বিচিত্র বর্ণের মৃদু আলোর বন্যা যেন। সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

ভাইকিংদের মধ্যে দু-একজন হাতুড়ি নিয়ে এলো। হাতের কাছে এত সুন্দর রঙিন পাথর। পাথুরে থামের গায়ে-গায়ে সেই নীলাভ পাথরের ঝিলিক। লোভ সামলানো দায়। ওরা নিশ্চয় থামগুলো ভেঙে পাথর নিয়ে আসতো। কিন্তু পারলো না ফ্রান্সিসের জন্যে।

ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বলল— কেউ থামগুলোর গায়ে হাত দেবে না।

ফ্রান্সিসের গম্ভীর কণ্ঠস্বর সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হলে লাগল।

—কেন? হাতুড়ি হাতে একজন ভাইকিং বললো।

—এই থামগুলো পাহাড়টার ভারসাম্য রক্ষা করছে। যদি কোন কারণে ভেঙে যায়, সমস্ত পাহাড়টাই জাহাজের ওপর ভেঙে পড়বে।

সবাই বিপদের গুরুত্বটা বুঝলো। অগত্যা চেয়ে-চেয়ে দেখা ছাড়া উপায় কি? সবাই নিঃশব্দে সেই অপূর্ব স্বপ্নময় জগতের রূপ দেখতে লাগল। জাহাজ এগিয়ে চললো।

একসময় সুড়ঙ্গের ওপাশে আলো ফুটে উঠল। সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে আসছে। সুড়ঙ্গের মুখ ছেড়ে জাহাজটা বাইরের রৌদ্রালোকিত সমুদ্রের বুকে আসতেই সবাই আনন্দে হই-চই করে উঠল! ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল–কিছু লক্ষ্য করেছিলে?

—কি?

—সুড়ঙ্গটা ভেতরের দিকে একটা অদ্ভুত বাঁক নিয়েছে। এপাশের কোন জাহাজই সেই বাঁক পেরোতে পারবে না।

—হ্যাঁ, এটা সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার।

পর-পর সুলতানের জাহাজ আর 'সোনার ঘণ্টা' বসানো কাঠের পাটাতনটাও সুড়ঙ্গ পেরিয়ে চলে এলো। আবার চললো জাহাজ শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে আমদাদ বন্দরের উদ্দেশ্যে।

সবাই নিশ্চিন্ত। যাক, অনেকদিন পরে আবার মাটির ওপর পা ফেলা যাবে। ভাইকিংদের কাছে আমদাদ বিদেশ। তবু হোক বিদেশ, মাটি তো! সুলতানের আদেশে মিস্ত্রীরা এর মধ্যেই বড়-বড় চাকা বানাতে শুরু করেছে। সোনার ঘণ্টা বসানো পাটাতনটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। চাকা লাগাতে পারলে কোন অসুবিধে নেই। ঘোড়া দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে। চাকা বানানোর কাজ চলছে পুরো দমে। জাহাজের সবাই খুসিতে মশগুল।

কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। শুধু হ্যারিই ওর একমাত্র সমব্যথী। গভীর রাত্রে ডেকের ওপর দুজন দেখা হয়। সোনার ঘণ্টার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলে—জানো হ্যারি, ওটা আমাদের প্রাপ্য, সুলতানের নয়।

—কিন্তু উপায় কি বলো!

—উপায় —বিদ্রোহ।

সে কি! হ্যারি চমকে উঠে।

ফ্রান্সিস ডেকে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে-করতে বলে—কালকে রাত্তিরে কয়েকজন ভাইকিংকে নিয়ে এসো। সুলতানের সৈন্যদের একটু কায়দা করে হার স্বীকার করাতে হবে। তারপর সোনার ঘণ্টা নিয়ে আমরা দেশের দিকে পাড়ি জমাবো।

—সুলতানের সৈন্যরা কিন্তু সংখ্যায় আমাদের প্রায় দ্বিগুণ।

—হ্যারি, আমি সব ভেবে রেখেছি।

পরের দিন গভীর রাত্রে ফ্রান্সিসের ঘরে সভা বসলো। কয়েকজন বিশ্বস্ত ভাইকিং এলো। কিভাবে বিদ্রোহ হবে, সুলতানের সৈন্যদের কিভাবে বোকা বানানো হবে, এসব কথা ফ্রান্সিস কিছু ভাঙলো না। শুধু ওদের মতামত চাইলো। দুজন বাদে সবাই ফ্রান্সিসকে সমর্থন করলো। সেই দুজন বললো—যদি বিদ্রোহ করতে গিয়ে আমরা হেরে যাই, সুলতান আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। কারণ ওর কাছে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস বলল—কথাটা সত্য! কিন্তু এ ছাড়া আমাদের উপায় কি? একবার আমদাদের রাজপ্রাসাদে সোনার ঘণ্টা নিয়ে যেতে পারলে আমরা কোনদিনই ওটা উদ্ধার করতে পারবো না।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, অন্য ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের কপাল মন্দ। এ-কান সে-কান হতে হতে কথাটা সুলতানের কানে গিয়েও উঠলো। সুলতান সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ভাইকিংদের কাছ থেকে তরবারি কেড়ে নেবার হুকুম দিলেন। তারপর নিরস্ত্র ভাইকিংদের জাহাজের নীচের কেবিনে বন্দী করে রাখা হল। সেনাপতি আর তার দলের লোকেরাও বাদ গেল না। সুলতান বোধহয় কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ফ্রান্সিসের বিদ্রোহের পরিকল্পনা সমস্ত-ভেস্তে গেল।

তখনও সূর্য ওঠেনি। আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দূরে আমদাদের দুর্গ চূড়া দেখা গেল। সূর্য উঠল। চারিদিক আলোয় ভেসে গেল। আমদাদ বন্দরের জাহাজ, লোকজন, দুর্গের পাহারাদার সৈন্য সব স্পষ্ট হল। বন্দর আর বেশি দূরে নেই।

জাহাজ দুটো বন্দরে ভিড়লো। কিন্তু এ কি হলো? জনসাধারণের মধ্যে সেই আনন্দ উল্লাস কোথায়? কই কেউ তো সুলতানের জয়ধ্বনি দিচ্ছে না। দলে-দলে ছুটে আসছে না, সেই আশ্চর্য সোনার ঘণ্টা দেখতে? সবাই যেন পুতুলের মত নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে দেখছে সুলতানের জাহাজ তীরে ভিড়লো, পেছনে সোনার ঘণ্টার পাটাতন, তারপর ভাইকিংদের জাহাজ।

সুলতান আর রহমান রাজপথ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চললেন রাজ প্রাসাদের দিকে। পেছনে হাতে দড়ি বাঁধা ভাইকিংদের দল। তাদের দুপাশে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। তাদের পেছনে সোনার ঘণ্টা টেনে নিয়ে আসছে আটটি ঘোড়া। চাকা বসানো পাটাতন গড়গড়িয়ে চলছে। এত কাণ্ড সব; তবু রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো আমদাদবাসীদের মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। সৈন্যরা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। এসব দেখে সুলতানের রাগ বেড়েই চললো। এর মধ্যে যে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, সেটা সুলতান বা ভাইকিংরা কেউই জানতো না। ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা ভাইকিং রাজার জাহাজ নিয়ে পালিয়ে আসার কয়েকদিন পরে ভাইকিংদের রাজা মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করেন। রাজার সঙ্গে ছিল দু জাহাজ ভরতি সৈন্য। তারা ফ্রান্সিসদের খোঁজ করতে-করতে এই আমদাদ নগরে এসে উপস্থিত হল। তখন সুলতান সৈন্য আর ভাইকিংদের নিয়ে সোনার ঘণ্টার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। সুলতানের সঙ্গে বাছাই করা সৈন্যারা চলে গেছে। ভাইকিংদের রাজা খুব সহজে যুদ্ধ করে আমদাদ দখল করে নিলেন। এবার সুলতানের আর ভাইকিংদের ফেরার জন্য অপেক্ষা করা।

যেদিন সুলতান সোনার ঘণ্টা নিয়ে ফিরলেন, সেদিন রাস্তার দু'পাশের দাঁড়ানো লোকজন আর সুলতানের সৈন্যদের আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হল—সবাই যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সুলতান যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারেন, আমদাদ শহর বিদেশীরা দখল করে নিয়েছে। তাই সেদিন কোথাও না ছিল উত্তেজনা, না ছিল উল্লাস। সুলতানের প্রত্যেকটা সৈন্যের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে ভাইকিং সৈন্যরা আত্মগোপন করেছিল। কেউ যেন টু শব্দটি না করে। ভাইকিংদের রাজা চাইছিলেন—সুলতান যেন আগে থাকতে কোনো বিপদ আঁচ করে পালাতে না পারেন।

রাজপথ দিয়ে চলেছেন সুলতান। পেছনে বন্দী ভাইকিংরা। তারও পেছনে সোনার ঘণ্টা। প্রাসাদের কাছে এসে সুলতান দেখলেন, প্রাসাদের প্রধান ফটকের কাছে একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে মন্ত্রী ও প্রধান-প্রধান অমাত্যরা বসে আছেন। মাঝখানে সুলতানের সিংহাসন, সেটা ফাঁকা। তার পাশে একটা সিংহাসনে বেগম বসে আছেন। সুলতান এগিয়ে চললেন।

হঠাৎ বেগম সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজপথ দিয়ে সুলতানের দিকে ছুটে আসতে লাগলেন। কারা যেন তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ততক্ষণে বেগম অনেকটা চলে এসেছেন। সুলতান স্পষ্ট শুনলেন, বেগম চীৎকার করে বললেন—পালাও, পালাও ভাইকিংরা এদেশ দখল করে নিয়েছে।

কিন্তু বেগম কথাটা আর দুবার বলতে পারলেন না। তার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা বর্শা বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে তাঁর পিঠে ঢুকে গেল! বেগম রাজপথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে গিয়ে বেগমের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বেগম ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—পালাও।

আর কিছু বলতে পারলেন না। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ততক্ষণে সুলতানের সৈন্যদের সঙ্গে ভাইকিং সৈন্যদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষেরা চীৎকার করতে-করতে যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাতে শুরু করেছে। ব্যাপার দেখে ফ্রান্সিসরা তো অবাক। তারপর ওরা সব বুঝতে পারলো। ভাইকিং সৈন্যরা ছুটে এসে ওদের হাতের দড়ি কেটে দিলো। তরোয়াল হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুলতানের সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু দুর্ধর্ষ ভাইকিং সৈন্যদের সঙ্গে তারা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলো না। প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। সুলতান

নিজেও তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর নিপুণ তরোয়াল চালনায় বেশ কয়েকজন ভাইকিং ঘায়েল হলো। যুদ্ধের এই ডামাডোলের মধ্যে ভাইকিং সেনাপতি আর তার অনুচরেরা পালিয়ে গেলো।

যুদ্ধ করতে-করতে ফ্রান্সিস হঠাৎ দেখলো, সুলতান রক্তমাখা খোলা তরোয়াল হাতে ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে হাসলো। বললো—সুলতান, আমি এই দিনটির অপেক্ষাতেই ছিলাম। সুলতান সে কথার কোন জবাব না দিয়ে উন্মত্তের মত ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফ্রান্সিস খুব সহজেই সে আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে পালটা আক্রমণ করলো। শুরু হলো দুজন নিপুণ যোদ্ধার যুদ্ধ।

যুদ্ধ চললো। দুজনের নাক দিয়ে ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে। দুজনেই দুজনের দিকে কুটিল চোখে তাকাচ্ছে। আঁচ করে নিচ্ছে, কোন দিক থেকে আক্রমণটা আসতে পারে। একসময় সুলতানের আক্রমণ ঠেকাতে-ঠেকাতে ফ্রান্সিস মঞ্চের সিঁড়িতে পা রেখে রেখে ওপরে উঠে গেল। পরক্ষণেই পালটা আক্রমণ করলো। সুলতান এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। হঠাৎ ফ্রান্সিসের পর-পর কয়েকটা তরোয়ালের আঘাত সামলাতে গিয়ে সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গেলেন। গড়িয়ে গেলেন কয়েকটা সিঁড়ির নীচে। ঠিক তখনই চাকাওয়ালা কাঠের প্যাটাতনটায় করে সোনার ঘণ্টাটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ একটা চাকা গেল ভেঙে। ঘোড়াগুলো টাল সামলালো, কিন্তু সোনার ঘণ্টাটা রাজপথে পড়ে ঢং-ঢং শব্দ তুলে কয়েকবার গড়িয়ে গেল। সুলতান ঠিক তখনই মঞ্চের সিঁড়িটা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু উঠতে আর পারলেন না। সোনার ঘণ্টা গড়িয়ে সুলতানের ওপর গিয়ে পড়ল। সুলতান আর্ত-চীৎকার করে দুহাত তুলে সোনার ঘণ্টাটাকে ঠেকাতে গেলেন, কিন্তু অত ভারী নিরেট সোনার ঘণ্টা—পারবেন কেন! সিঁড়ির সঙ্গে পিষে গেলেন। একটা মর্মান্তিক চিৎকার উঠল। ধারে-কাছের সকলেই ছুটে এলো। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় ফ্রান্সিসও বিমূঢ় হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। কিন্তু ততক্ষণে সুলতানের রক্তাপ্লুত দেহ বারকয়েক নড়ে স্থির হয়ে গেছে। সুলতান মারা গেছেন।

সুলতান পা পিছলে পড়ে গেলেন।

ফ্রান্সিস! ডাক শুনে ফ্রান্সিস মঞ্চের দিকে তাকালো। দেখলো বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে ভাইকিংদের রাজা। দুজনেই মিটিমিটি হাসছেন। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। রাজা বললেন—তুমি ভাইকিং জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছো।

—তবু— ফ্রান্সিসের বাবা বললেন, জাহাজ চুরির অপরাধটা?

রাজা বললেন—হ্যাঁ, শাস্তিটা তো পেতেই হবে, এই রাজত্বের শাসনভার তোমাকে দিলাম।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল দোহাই, ঐ-টি আমি পারবো না। জাহাজ চালানো, ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করা তরোয়াল চালানো, এসব এক জিনিস, আর একটা রাজত্ব চালানো, সে অন্য ব্যাপার। যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি, এই রাজত্বের ভার ফজলকে দিন।

—কে ফজল?

—আমার বন্ধু। সবদিক থেকে ফজলের মত উপযুক্ত আর কেউ নেই। সে এই দেশেরই মানুষ। যাদের দেশ, তারাই দেশ শাসন করুন, এটাই কি আপনি চান না?

—নিশ্চয়ই চাই। বেশ! ডাক ফজলকে।

ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকিয়ে ফজলকে খুঁজলো। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেল না। ফ্রান্সিস বললো—ফজল এখানেই আছে কোথাও। আমাকে সময় দিন, ওকে খুঁজে বের করব।

—বেশ, রাজা সম্মত হলেন।

ফ্রান্সিস দেখলো যুদ্ধ থেমে গেছে। সুলতানের সৈন্যদের বন্দী করা হচ্ছে। সুলতানের মৃতদেহ ঘিরে শোকার্ত মানুষের ভীড়। ফ্রান্সিসের ভালো লাগছিল না এসব। নাঃ আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। মাথার ওপরে অন্ধকার ঝোড়ো আকাশ, পায়ের কাছে পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ছে, উন্মত্ত বাতাসের বেগ। জীবন তো সেখানেই।

ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে রাজার কাছে গিয়ে বললো— এবার একটা ভাল জাহাজ দেবেন?

রাজা সবিস্ময়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—কেন?

—আফ্রিকার ওঙ্গালির বাজারে যাব—

—আবার?

—চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না—ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল—কি বিরাট হীরে! কি চোখ ধাঁধানো আলো ছিটকে পড়ছে!

ফ্রান্সিসের আর বলা হলো না। পেছন থেকে বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—এখান থেকে আমার সঙ্গে সোজা বাড়ি ফিরে যাবে।

সমাপ্ত

হীরের পাহাড়

অনিল ভৌমিক

হীরের পাহাড়

ফজল সুলতান হল। আমদাদ নগর জুড়ে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হল্লা চলল সাতদিন ধরে। ভাইকিংদের রাজা, মন্ত্রী, ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা সকলেই আনন্দ-উৎসবে যোগ দিল।

সাতদিন পরে আনন্দ-উৎসব শেষ হল। এবার ঘরে ফেরার পালা। আমদাদ বন্দরে ভাইকিং-রাজার তিনটে জাহাজ তৈরী হল। জাহাজগুলোর কিছু মেরামতির কাজ ছিল, তাও শেষ হল। যে কাঠের পাঠাতনে সোনার ঘণ্টাটা রাখা হয়েছে, সেটা একটা জাহাজের পেছনে কাছি দিয়ে বাঁধা হল। রাজা, মন্ত্রী, ফ্রান্সিস, তার বন্ধুরা, আর সব সৈন্যরা সবাই জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস ফজলকে অনুরোধ করল, মকবুলকে যেন তার সঙ্গে যেতে দেওয়া হয়। ফজলের আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই, কিন্তু মুশকিল হল ভাইকিংদের রাজাকে নিয়ে। তিনি বিদেশী বিধর্মী মকবুলকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে রাজি হলেন না। ফ্রান্সিস রাজামশাইকে বোঝাল—মকবুল মানুষ হিসেবে খুবই ভাল। তার দায়িত্ব ফ্রান্সিস নিজেই নিল। রাজা আর আপত্তি করলেন না। ফ্রান্সিস তাদের নৌকোটা একটা জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিল। এই নৌকোটাতে করেই বিরাট লম্বা কাছি নিয়ে ফ্রান্সিসরা কুয়াশা-ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের বিপদ পার হয়ে সোনার ঘণ্টা আনতে পেরেছিল। সবাই ঐ নৌকোটার কথা ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সিস তা ভোলে নি। নৌকোটাকে বরাবর নিজেদের জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। আসল কথা, ফ্রান্সিস আবার পালাবার ফিকির খুঁজছিল। নৌকোটা থাকলে জাহাজ থেকে পালানো সহজ হবে। ফ্রান্সিসের এই পালানোর ফন্দীর কথা কেউ জানত না, জানত শুধু ফ্রান্সিসের বন্ধু হ্যারি। নৌকো করে জাহাজ থেকে পালিয়ে আফ্রিকায় নামা যাবে।

—তা যাবে। কিন্তু সেই পাহাড়টাতে যেভাবে ধ্বস নেমেছিল, তারপর এখন যে ওটার কী অবস্থা হয়েছে—

—পাহাড়ের অবস্থা যাই হোক, হীরেটা তো আর পালাবে না?

—হুঁ, কিন্তু আমাদের তো প্রথমে ওঙ্গালির বাজারে যেতে হবে। অনেকটা পথ।

—তাই যাব আমরা।

—বেশ আমার কোন আপত্তি নেই।

—মকবুল, তুমি হবে গাইড। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

—বেশ।

ফ্রান্সিস বলল—মকবুল সমস্ত ঘটনাটা আর একবার বলো তো।

—কোন্ ঘটনা?

—সেই হীরের পাহাড়ের সন্ধান তুমি কীভাবে পেয়েছিলে। কী ঘটেছিল সেখানে।

—কেন? তোমাকে তো সব ঘটনাই বলেছিলাম।

—আবার শুনতে চাইছি। ঘটনাটা আবার শুনলে বুঝতে পারব, ওখানে যে হীরেটা ছিল, সেটার কী হল।

—বেশ, শোন; বলে মকবুল বলতে আরম্ভ করল—আমি কার্পেট বিক্রীর ধান্দায় গিয়েছিলাম ওঙ্গালিতে। জায়গাটাতে তেকরুর বন্দর থেকে যেতে হয়। আমি ঘোড়ায়

টানা গাড়ীতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ গাড়ীর চাকাটা রাস্তায় পাথরের সঙ্গে লেগে গেল ভেঙে। কাছেই এক কামারের কাছে সারাতে দিলাম। কামারটার নাম বুঙ্গা। ওই আমাকে প্রথম সেই অদ্ভুত গল্পটা শোনাল। ওঙ্গালি থেকে মাইল পনেরো উত্তরে একটা পাহাড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়টার মাঝা-মাঝি জায়গায় রয়েছে একটা গুহা। দূরে থেকে গাছ-গাছালি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুহাটার সমান্তরালে এসে সূর্যের আলো সরাসরি গিয়ে গুহাটায় পড়ে। তখনই দেখা যায় গুহার মুখে আর তার চারপাশের গাছের পাতায়, ডালে-ঝোপে এক অদ্ভুত আলোর খেলা। আয়না থেকে যেমন সূর্যের আলো ঠিকরে আসে, তেমনি রামধনুর রঙের মত বিচিত্র সব রঙীন আলো ঠিকরে আসে গুহাটা থেকে। অনেকেই দেখেছে এই আলোর খেলা। ধ'রে নিয়েছে ভুতুড়ে কাণ্ড কারখানা। ভূত-প্রেতকে ওরা যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। কাজেই কেউ এই রঙের খেলার কারণ জানতে ওদিকে পা বাড়াতে সাহস করে নি।

—আচ্ছা, এই আলোর খেলা সারাদিন দেখা যেত? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—উহুঁ, সূর্যের আলোটা যতক্ষণ সরাসরি সেই গুহাটায় গিয়ে পড়ছে, ততক্ষণই শুধু। তারপর আবার যে-কে সেই।

—সেই কামার বুঙ্গা সে-কি এর কারণ জানতে পেরেছিল?

—না, ও গুহাটায় গিয়ে দেখে নি—তবে অনুমান করেছিল। বুঙ্গা বলেছিল—ঐ আলো হীরে থেকে ঠিকরানো আলো না হ'য়েই যায় না। ও নাকি প্রথম জীবনে কিছুদিন এক জহুরীর দোকানে কাজ করেছিল। হীরের গায়ে আলো পড়লে সেই আলো কীভাবে ঠিকরোয়, এই ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। আমি তো বুঙ্গার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—ভেবে দেখ ফ্রান্সিস—অত আলো—মানে, আমি তো পরে সেই আলো আর রঙের খেলা দেখেছিলাম—মানে, ভেবে দেখ—হীরেটা কত বড় হলে অত আলো ঠিকরোয়।

—তারপর?

—তারপর একদিন দড়ি-গাঁইতি এসব নিয়ে পাহাড়টার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যে করেই হোক, সেই গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই পাহাড়টার কাছে পৌঁছে আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেল। নীচ থেকে গুহা পর্যন্ত পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। কিছু ঝোপ-ঝাড়, দু'একটা জঙ্গলী গাছ, আর লম্বা-লম্বা বুনো ঘাস ছাড়া খাড়া পাহাড়ের গায়ে আর কিছুই নেই। নিরেট পাথুরে খাড়া গা। কামার ব্যাটা বেশ ভেবেচিন্তেই এসেছে বুঝলাম। ও বলল—চলুন আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নামব্যো। ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভব। কারণ পাহাড়টার মাথা থেকে শুরু করে গুহার মুখ অবধি আর তার আশে-পাশে বেশ ঘন জঙ্গল। দড়ি ধ'রে নামা যাবে। একটু থেমে মকবুল বলতে লাগল—সন্ধ্যের আগেই পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে রইলাম। ভোরবেলা নামার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলাম। পাহাড়টার মাথায় একটা মস্ত বড় পাথরে দড়ির একটা মুখ বাঁধলাম। তারপর দড়ির অন্য মুখটা ঝুলিয়ে দিলাম। দড়ির মুখটা গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছল কিনা, বুঝলাম না। কপাল ঠুকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম। দড়ির শেষ মুখে পৌঁছে

দেখি, গুহাটা তখনও অনেকটা নীচে। সেখান থেকে বাকি পথটা গাছের ডাল, গুঁড়ি, লতাগাছ এসব ধরে-ধরে শ্যাওলা-ধরা পাথরের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা রেখে একসময় গুহাটার মুখে এসে দাঁড়ালাম। বুঙ্গাও কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে এল। ও যে বুদ্ধিমান, সেটা বুঝলাম ওর এক কাণ্ড দেখে। বুঙ্গা দড়ির মুখটাতে আরও দড়ি বেঁধে নিয়ে পুরোটাই দড়ি ধরে এসেছে। পরিশ্রমও কম হয়েছে ওর।

—তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—দু'জনেই গুহাটায় ঢুকলাম। একটা নিস্তেজ মেটে আলো পড়েছে গুহাটার মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম, কয়েকটা বড়-বড় পাথরের চাঁই—তারপরেই একটা খাদ থেকে উঠে আছে একটা ঢিবি। ঠিক পাথুরে ঢিবি নয়। অমসৃণ এবড়োখেবড়া গা—অনেকটা জমাট আলকাতারার মত। হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ শক্ত। সেই সামান্য আলোয় ঢিবিটার যে কি রঙ, ঠিক বুঝলাম না। তবে দেখলাম ওটা নীচে অনেকটা পর্যন্ত রয়েছে, যেন কেউ পুঁতে রেখে দিয়েছে। বুঙ্গা এতক্ষণ গুহার মুখের কাছে এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটানো বড়-বড় পাথরগুলোর ওপর একটা ছুঁচোলো-মুখ হাতুড়ির ঘা দিয়ে ভাঙা টুকরোগুলো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। তারপর হতাশ হয়ে ফেলে দিচ্ছিল। আমি বুঙ্গাকে ডাকলাম—বুঙ্গা দেখতো এটা কিসের ঢিবি? বুঙ্গা কাছে এল। এক নজরে ঐ এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটার দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। ওর মুখে কথা নেই। ঠিক তখনই সূর্যের আলোটা সরাসরি গুহাটার মধ্যে এসে পড়ল। আমরা ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। সেই এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটায় যেন আগুন লেগে গেল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড যেন। সে কি তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ! সমস্ত গুহাটায় তীব্র চোখ ঝলসানো আলোর বন্যা নামল যেন। ভয়ে-বিস্ময়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম—বুঙ্গা শীগ্গির চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়—নইলে অন্ধ হয়ে যাবে।

দু'জনেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়লাম। কতক্ষণ ধরে সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ চোখ-অন্ধ-করা আলোর বন্যা বয়ে চলল, জানি না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে চোখ খুললাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারদিকে। অসীম নৈঃশব্দ। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিল বুঙ্গার ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। অবাক কাণ্ড! ও কাঁদছে কেন? অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে বুঙ্গার কাছে এলাম। এবার ওর কথাগুলো স্পষ্ট শুনলাম। ও দেশীয় ভাষায় বলছে—অত বড় হীরে—আমার সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে—আমি কত বড়লোক হয়ে যাব। বুঝলাম, প্রচণ্ড আনন্দে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় ও কাঁদতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করলাম। আস্তে-আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। বুঙ্গাকে বললাম—এসো, আগে কিছু খেয়ে নেয়া যাক।

কিন্তু কাকে বলা! বুঙ্গা তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেছে। হঠাৎ ও উঠে গেল ঢিবিটার দিকে। হাতের ছুঁচলো হাতুড়িটা দিয়ে আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে। টুকরো-টুকরো হীরে চারিদিকে ছিট্‌কে পড়তে লাগল। হাতুড়ির ঘা বন্ধ করে বুঙ্গা হীরের টুকরোগুলো পকেটে পুরতে লাগল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতুড়িটা নিয়ে। আবার হীরের টুকরো ছিটকোতে লাগল। আমি কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ও তখন পাগল হয়ে গেছে।

—তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

একবার বুঙ্গা করল এক কাণ্ড ! গুহার মধ্যে পড়ে থাকা একটা বড় পাথর তুলে নিল ; তারপর দু'হাতে পাথরটা ধরে হীরেটার ওপর ঘা মারতে লাগল, যদি একটা বড় টুকরো ভেঙে আসে। কিন্তু হীরে ভাঙা কি অত সোজা ? সে কথা কাকে বোঝাব তখন ? ও পাগলের মত পাথরে ঘা মেরেই চলল। ঠক্—ঠক্ পাথরের ঘায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুহাটায়। হঠাৎ—

—কী হল ?

—সমস্ত পাহাড়টা যেন দুলে উঠল। গুহার ভেতরে শুনলাম, গম্ভীর গুড়গুড় শব্দ। শব্দটা কিছুক্ষণ চলল। তারপর হঠাৎ একটা কানে তালা লাগানো শব্দ। শব্দটা এল পাহাড়ের মাথার দিক থেকে। বিরাট-বিরাট পাথরের চাঁই ভেঙে পড়ছে। বুঝলাম, যে কোন কারণেই হোক পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা পাথরের স্তর নাড়া পেয়েছে, তাই এই বিপত্তি। এখন আর ভাববার সময় নেই, গুহা ছেড়ে পালাতে হবে, অবলম্বন একমাত্র সেই দড়িটা। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরলাম। টান দিতেই দেখি, ওটা আলগা হয়ে গেছে। বুঝলাম, যে পাথরের চাঁইয়ে ওটা বেঁধে এসেছিলাম সেটা নড়ে গেছে। এখন দড়িটা কোন ঝোপে বা গাছের ডালে আটকে আছে। একটু জোরে টান দিলাম। যা ভেবেছি তাই। দড়ির মুখটা ঝুপ্ করে নীচের দিকে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। পায়ের নীচের মাটি দুলতে শুরু করেছে। ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছি না। টলে পড়ে যাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি দড়ির মুখটা একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। এখন দড়ি ধরে নামতে হবে। কিন্তু বুঙ্গা ? ওকি সত্যিই পাগল হয়ে গেল। এত কাণ্ড ঘটছে, বুঙ্গার কোনো হুঁশও নেই। ও পাথরটা ঠুকেই চলেছে। ছুটে গিয়ে ওর দু'হাত চেপে ধরলাম—বুঙ্গা শীগগির চল্—নইলে মরবি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিল। আবার ওকে থামাতে গেলাম। এবার ও হাতের পাথরটা নামিয়ে ছুঁচলো-মুখ হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরল। বুঝলাম, ওকে বেশী টানাটানি করলে ও আমাকেই মেরে বসবে। ওকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই।

আবার একটু থেমে মকবুল বলতে লাগল—

—গুহার মধ্যে তখন পাথরের টুকরো, ধুলো ঝুরঝুর করে পড়তে শুরু করেছে। আর দেরী করলে আমিও জ্যান্ত কবর হয়ে যাবো। পাগলের মত ছুটলাম গুহার মুখের দিকে। তারপর গুহার মুখে এসে দড়িটা ধরে কীভাবে নেমে এসেছিলাম, আজও জানি না। পর-পর পাঁচদিন ধরে শুধু বুনো ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে হাঁটতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলে কতবার পথ হারালাম। বুনো জন্তু-জানোয়ারের পাল্লায় পড়লাম। তারপর যেদিন ওঙ্গালির বাজারে এসে হাজির হলাম, সেদিন আমার চেহারা দেখে অনেকেই ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল।

মকবুলের গল্প শেষ হলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। এক-সময় সে জিজ্ঞেস করল—ওঙ্গালির বাজারে যেতে হলে আমাদের কোন্ বন্দরে নামতে হবে ?

—তেকরুর বন্দরে নামতে হবে।

—এই জাহাজগুলো কি সেই বন্দর হয়ে যাবে।

—না। তেকরুর বন্দর পশ্চিম আফ্রিকায়।

ফ্রান্সিস এবার হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি, একটু বুদ্ধি-টুদ্ধি দাও। হ্যারি হাসল—তোমার বুদ্ধি আমার চেয়ে কিছু কম নয়।

—তবু তুমি কিছু বল।

—কী আর বলব! আমাদের ছোট নৌকোটায় করে জাহাজ থেকে পালাতে হবে।

—কখন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—আর দু-তিন দিনের মধ্যেই জাহাজটা উত্তর আফ্রিকার ধার ঘেঁসে যাবে। তখন নৌকোটায় উঠে পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকায় নামব আমরা।

—তারপর?

—সেখান থেকে তেকরুরগামী জাহাজে করে আমরা তেকরুর যাব।

—বেশ। ফ্রান্সিস আবার পায়চারী করতে লাগল। তারপর থেমে বলল—তাহ'লে পরশু রাতে ঠিক এ সময় মকবুল এখানে আসবে। তারপর পালাব।

মকবুল চলে গেল। হ্যারিও বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই ওর নাক ডাকতে শুরু করল। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। শুয়ে-শুয়ে ফ্রান্সিস হিসেব করতে লাগল—কতটা খাবার-দাবার, খাওয়ার জল, আর কী-কী নিতে হবে।

* * *

পরের দিন। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছিল। তখনই দেখা ভাইকিংদের রাজার সঙ্গে। রাজা হেসে ডাকলেন—ফ্রান্সিস?

—আজ্ঞে বলুন।

—হীরের পাহাড়ের ভূত মাথা থেকে নামল?

ফ্রান্সিস নিরীহ ভঙ্গিতে বলল—ওসব ভেবে আর কী করব? আপনি তো একটা জাহাজ দিলেন না।

—ওসব ভাবনা ছাড়। এখন সোজা বাড়িতে।

—বেশ।

রাজামশাই চলে গেলেন। ফ্রান্সিস আবার নিজের ভাবনায় মগ্ন হল। দু'দিন মাত্র হাতে। এর মধ্যে ফ্রান্সিস অনেক খাবার-দাবার একটা প্যাকিং বাক্সে পুরল। একটা বড় কুঁজো ভরতি খাবার জল, দড়ি, আর দু'টো তরোয়াল সব নিজেদের কেবিন ঘরে জমা করল।

তিন দিনের দিন গভীর রাতে মকবুল এল। অনেক রাত হয়েছে তখন। ধরাধরি করে তিনজনে মিলে খাবারের বাক্সটাকে জাহাজের ডেক-এ তুলল। তারপর ওটাকে নিয়ে এল জাহাজের হালের কাছে। আকাশে চাঁদের আলো। ফ্রান্সিস দেখল, ওদের নৌকোটা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। হালের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধা। ফ্রান্সিস কাছিটা টেনে নৌকো-টাকে কাছে নিয়ে এল। তারপর খাবারের বাক্সটা দড়ি দিয়ে বেঁধে আস্তে-আস্তে নৌকোটার মাঝখানে নামিয়ে দিল। এবার ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ঝুলতে-ঝুলতে নৌকার ওপর নেমে এল। তারপরেই নেমে এল হ্যারি। মকবুল জলের কুঁজোটা দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস কুঁজোটা ধরে নৌকায় নামিয়ে নিল। এবার মকবুল দড়ি ধরে নেমে এল। সবাই তৈরী হল এবার। ফ্রান্সিস কোমরে গোঁজা তরোয়ালটা খুলে জাহাজের সঙ্গে বাঁধা নৌকার কাছিটা কেটে ফেলল। নৌকোটা একবার পাক খেয়ে ঘুরে অনেকটা সরে এল। জাহাজটা আস্তে-আস্তে দূরে সরে যেতে লাগল। চাঁদের আলোয় বেশ কিছুক্ষণ জাহাজটাকে দেখা গেল। তারপর আর দেখা গেল না। জাহাজ থেকে ওরা তখন অনেক দূরে চলে এসেছে। চারদিকে শুধু জল আর জল। জলে ছোট-ছোট ঢেউ। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। হ্যারি আর মকবুল গায়ে কম্বল জড়িয়ে নৌকোর পাটাতনে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। সে নৌকো বাইতে লাগল। ফ্রান্সিস আমদাদ বন্দরে নৌকোটার মেরামতি করিয়েছিল। তখন একটা কাঠের মাস্তুলও লাগিয়ে নিয়েছিল পাল খাটাবার জন্যে।

তিন দিনের দিন গভীর রাতে মকবুল এল।

হাওয়ার জোর নেই তেমন। কাজেই ফ্রান্সিস পাল খাটায় নি। বৈঠা দিয়ে নৌকো বাইতে লাগল। সারা রাত ফ্রান্সিস নৌকো বইতে লাগল। ভোরের দিকে জোর হাওয়া ছুটল। ফ্রান্সিস হাওয়ার দিকটা অনুমান করল। ঠিকই আছে। হাওয়া দক্ষিণমুখো বইছে। ফ্রান্সিস পাল খাটাল। হাওয়ার তোড়ে পাল ফুলে উঠলো। নৌকো তরতর জল কেটে ছুটল। ফ্রান্সিস পালের দড়ি-দড়া হালের সঙ্গে বেঁধে হ্যারির পাশে এসে শুয়ে পড়ল। পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখলো আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর আকাশটা তখনও কালো। তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। আস্তে-আস্তে আকাশের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। সূর্য উঠতে বেশী দেরী নেই। উত্তর আফ্রিকার কোথায় নৌকো ঠেকবে, সেখান থেকে তেকরুর বন্দরেই বা কী করে যাওয়া যাবে, এসব ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

হ্যারির ধাক্কায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচলাতে-কচলাতে ফ্রান্সিস উঠে বসল। দেখল বেশ বেলা হয়েছে। রোদের তেজও বাড়ছে। হ্যারি ডাকল—সকালের খাবার খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস সমুদ্রের জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তারপর খেতে বসল।

হ্যারি বলল—কাল সারারাত বোধহয় ঘুমোও নি।

ফ্রান্সিস হাসল। হ্যারি বললো—হাসির কথা নয় ফ্রান্সিস। এভাবে রাত জাগতে শুরু করলে ওঙ্গালির বাজারে আর ইহজন্মে পৌঁছতে পারবে না।

—কিন্তু আফ্রিকার উপকূলে যেখানে হোক, আমাদের পৌঁছুতে হবে।

—তাই বলে রাত জেগে নৌকা বাইতে হবে? হ্যারি অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস হেসে বললে—কতদিনের খাদ্য আর জল আমাদের সঙ্গে আছে জানো ?

—না।

—মাত্র চার দিনের। এই চার দিনের মধ্যে আমাদের মাটিতে পেঁছোতে হবে।

—চারদিন যথেষ্ট সময়। এর মধ্যে আমরা ঠিক পেঁাছে যাব।

—অত নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নয় হ্যারি। ফ্রান্সিস বলল। সে দেখল, পাল গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। নৌকো একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল—পাল গুটিয়ে ফেললে কেন ?

—দেখছো না, হাওয়া পড়ে গেছে।

—তাহ'লে বৈঠা বাইতে হবে।

—আমরা বাইছি। তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর, পারো একটু ঘুমিয়ে নাও।

—বেশ। ফ্রান্সিস কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস নৌকোর পাঠাতনে শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড রোদ। হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিল। বেশ ঝির-ঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, জলে বৈঠা চালাবার শব্দ উঠছে—ছপ্ ছপ্। হ্যারি আর মকবুল কথা বলছে। সমুদ্রে বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ফ্রান্সিস কাত হয়ে শুলো। রাত জাগা চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে ফ্রান্সিস ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল, বেশ বেলা হয়েছে। মকবুল বৈঠা বাইছে। হ্যারি খাবার-দাবার প্লেটে সাজাচ্ছে।

খেতে-খেতে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি, নিশানা ভুল হয় নি তো ?

— কী করে বলি, তবে দক্ষিণদিক নিশানা করেই তো নৌকা চালাচ্ছি।

—দেখা যাক।

বেলা পড়ে এল। পশ্চিমদিক লাল হয়ে উঠল। আস্তে-আস্তে সূর্য অস্ত গেল। চারদিক অন্ধকার করে রাত্রি নামল। রাত্রিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বৈঠা নিয়ে বসল। আজকেও হয়ত সারারাত বৈঠা বাইতে হবে। হাওয়ার জোর বাড়ে নি এখনও। হ্যারি আর মকবুল পাঠাতনে শুয়ে পড়ল। বেশ কয়েকঘণ্টা কেটে গেল। আস্তে-আস্তে হাওয়ার জোর বাড়তে লাগল। কপাল ভাল—হাওয়াটা দক্ষিণমুখো। ফ্রান্সিস পাল বেঁধে দিল। হাওয়ার জোরে পাল ফুলে উঠল। নৌকো চলল দ্রুতগতিতে। কেমন শীত-শীত করছে। ফ্রান্সিস কম্বল জড়িয়ে পাঠাতনের একপাশে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। নানা চিন্তা মাথায়। তেকরুর বন্দরে কী করে পেঁছানো যাবে। সেখান থেকে ওঙ্গালির বাজারে। তেকরুর বন্দরে পেঁছতে পারলে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়ার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু মাটির তো দেখা নেই। আগে তো আফ্রিকার উপকূলে পেঁছোতে হবে, তারপর তো তেকরুর যাওয়া। হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়ল। বাবার কথা। ওর এইভাবে জাহাজ থেকে পালিয়ে যাওয়ায় বাবা নিশ্চয় ভাল চোখে দেখবেন না। তারায় ভরা কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এক সময় ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। তিনদিন কেটে গেল। নৌকো চলছে তো চলেছেই। মাটির কোন চিহ্নমাত্র নজরে পড়ছে না। চিন্তায় ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। তাহ'লে কি দিক ভুল হয়ে গেল ? নৌকোয় যা খাবার-দাবার মজুত আছে টেনেটুনে আর

দুটো দিন চলতে পারে। তারপর ? খাদ্য নেই জল নেই। দিনে রোদের প্রচণ্ড তেজ। রাত্রে ঠাণ্ডা। উপোসী শরীরে আর কতদূর যেতে পারবে ওরা ? কতক্ষণই বা নৌকো বাইতে পারবে ?

চার দিন কেটে গেল। পাঁচ দিনের দিন রাত্রে অবশিষ্ট খাদ্য আর জল ওরা খেল না। একেবারে উপোস করে রইল। পরের দিনটা তো চালানো যাবে। পরের দিন গেল আধ-পেটা খেয়ে। তারপরের দিন একেবারে উপোস। এক ফোঁটা জল নেই। খাদ্যও না। উপোসী শরীর নেতিয়ে পড়ে। বৈঠা বাইবার শক্তি নেই। পাল বেঁধে দিল। নৌকা যেদিকে খুশী চলল। ওরা নির্জীবের মত পাটাতনে শুয়ে রইল। সূর্য যেন আগুন বর্ষণ করে সারাদিন। ওরা দিনের বেলা জামা খুলে রাখে, শুধু রাত্রে জামা গায়ে দেয়। ওদের গা পোড়া তামার মত হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। কিন্তু এক-ফোঁটা খাবার জল নেই। তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মকবুল সমুদ্রের জলই খেয়ে নিল। কিন্তু খালি পেটে ঐ নোনতা জল—পেটে পাক দিয়ে বমি উঠে আসে। শরীর আরো অবসন্ন করে দেয়।

হঠাৎ আকাশের কোণায় কালো মেঘ দেখা দিল। দেখতে-দেখতে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। একটু পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। ওরা আনন্দে নাচতে লাগল। মুখ হাঁ করে বৃষ্টির জল খেতে লাগল। ওরা বৃষ্টির জলে জামা ভিজিয়ে নিতে লাগল। তারপর সেটাই চিপে-চিপে কুঁজোয় জল ভরতে লাগল। একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। ততক্ষণে কুঁজোতে অনেকটা জল ভরা হয়ে গেছে। জলের সমস্যা যা হোক মিটল। কিন্তু খাদ্য ? ফ্রান্সিস কোন সমস্যার সামনেই চুপ করে বসে থাকার মানুষ নয়। সে ভাবতে লাগল—কী করে খাবার জোগাড় করা যায়। পেয়েও গেল একটা উপায়। মাছ ধরতে হবে। অমনি পাটাতনের নীচে থেকে পেরেক হাতুড়ি বের করল। দড়ি তো ছিলই। একটা লম্বা পেরেক হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে-ঠুকে বঁড়শীর মত বানাল। তারপর খাবারের বাক্সটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে রুটির কয়েকটা টুকরো আর গুঁড়ো পেল। সেগুলোই জল দিয়ে মেখে টোপ তৈরী করল। তারপর দড়ির ডগায় পেরেকের বড়শী বাঁধল। বড়শীর ডগায় টোপ লাগিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে বসে রইল।

ঠিক তখনই ওর হঠাৎ নজরে পড়ল তিন-চারটে হাঙর ঠিক নৌকোর পেছনে-পেছনে আসছে। মৃত্যুদূত ? ফ্রান্সিসের অন্যমনস্ক মনটা নাড়া পেল। তবে কি ঐ সাংঘাতিক প্রাণীগুলো ওদের আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে ? ফ্রান্সিস মকবুলের দিকে তাকাল। দেখল, মকবুল অসাড় হয়ে আছে।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। এই বিপদের কথা তো ওদের জানাতে হয়। হ্যারি ফ্রান্সিসের মুখ দেখেই ব্যাপারটা অনুমান করল। বিষন্ন হাসি হেসে বলল—ফ্রান্সিস, আমি জানি তুমি জলে কী দেখছ।

—হ্যারি, তুমি কি আগেই এগুলো দেখেছ ?

—হ্যাঁ, পরশু বিকেল থেকে ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করছে।

—কই, আমাকে তো বল নি ?

—মকবুল পাছে জানতে পারে, তাই বলি নি।

ফ্রান্সিস বঁড়শীটা জলে ফেলে চুপ করে বসে রইল।

কথাটা বোধ হয় মকবুলের কানে গেল। সে পাশ ফিরে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দুর্বলস্বরে জিজ্ঞেস করল— কী হয়েছে?

– কিছু না, তুমি ঘুমোও।

মকবুল আর কোন কথা না বলে ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলো। ফ্রান্সিস বুঝল, কেন হ্যারি হাঙরগুলোর কথা তাকে বলেনি। মকবুল এমনিতেই প্রচণ্ড রোদে উপবাসে জলকষ্টে নেতিয়ে পড়েছে। হাঙরের কথা জানতে পারলে, সে আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। মনোবল একেবারে হারিয়ে ফেলবে। কাজেই মকবুলকে কিছুতেই হাঙরগুলোর কথা বলা হবে না। ফ্রান্সিস বঁড়শী জলে ফেলে চুপ করে বসে রইল। মাঝে-মাঝে তাকিয়ে হাঙরগুলোকে দেখতে লাগল। ওর মন সংকল্প আরো দৃঢ় হল। যে করেই হোক বাঁচতেই হবে। অনাহারক্লিষ্ট শরীর। বেশীক্ষণ এক ঠাঁয় বসে থাকতে কষ্ট হয়। শিরদাঁড়াটা টনটন করতে থাকে। তবু ফ্রান্সিস দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল। খাদ্য চাই, বাঁচতেই হবে আমাদের। মাথায় শুধু এক চিন্তা—বাঁচতেই হবে।

হঠাৎ দড়িটায় টান লাগল। ফ্রান্সিস দড়িটায় হ্যাঁচকা টান মেরে ঝাঁকিয়ে দেখলে—বেশ ভারী কিছু আটকেছে বঁড়শীটায়। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠল। হ্যারিও উঠে দাঁড়াল—কী ব্যাপার?

ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি শীগ্গির এসো, একটা মাছ পাকড়েছি।

হ্যারিও এক লাফে ওর কাছে এল। দু'জনে মিলে দড়ি ধরে টানতে লাগল। একটু পরেই মাছটাকে টেনে নৌকোর ওপর তুলল। বড় আকারের একটা সামুদ্রিক মাছ। দু'জনের আনন্দ দেখে কে? যা হোক দু'তিন দিনের খাবার জুটল। হ্যারি তার কোমরে গোঁজা ছুরিটা ফ্রান্সিসকে দিল। সে ছুরিটা দিয়ে মাছটা কাটতে লাগল। একটু কাটা হলে দু-তিনটে টুকরো বের করে নিল। হ্যারিকেও এক টুকরো দিল। মহা আনন্দে দু'জনে কাঁচা মাছই চিবিয়ে খেতে লাগল। একটু পরে মকবুলকে ডাকল। তাকেও কয়েক টুকরো মাছ দিল। মকবুল ক্ষিদের জ্বালায় তাই খেতে লাগল। কয়েকদিন উপবাসের পর কাঁচা মাছ ভালোই লাগল। ক্ষিদের জ্বালায় অনেকটা মাছই খেয়ে ফেলল ওরা। বাকীটুকু পাঠাতনের নীচে রেখে দিল, পরের দিনের জন্যে।

দিন যায়, রাত যায়, ডাঙার দেখা নেই। শুধু জল আর জল। আধ খাওয়া মাছটা শেষ হলে ফ্রান্সিস আবার চেষ্টা করলো মাছ ধরবার জন্যে। কিন্তু ওর পেরেক-বঁড়শীতে আর মাছ ধরা পড়ল না। সুতরাং একটানা উপবাস চলল কয়েকদিন। শরীরে যেন আর একফোঁটাও শক্তি নেই। অসাড় শরীর নিয়ে তিনজনে নৌকার পাঠাতনে শুয়ে থাকে। ফ্রান্সিস মাঝে-মাঝে মাথা উঁচু করে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নেয়—যদি মাটির দেখা মেলে। হাঙরগুলোকে দেখে আর ভাবে, বাঁচবার কোন আশা নেই। খাদ্য নেই, বৃষ্টির পরে রাখা জলও শেষ। এবার আস্তে-আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে।

সেদিন বিকেলের দিকে হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল দূরে জাহাজের পাল। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে উঠে দাড়াল। শরীর দুর্বল! পা দু'টো কাঁপছে। তবু ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। হ্যাঁ—জাহাজই। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক দূরে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে! বৈঠার সঙ্গে গায়ের জামাটা বেঁধে নাড়তে

লাগল। যদি জাহাজের লোকদের নজরে পড়ে। কিন্তু, না জাহাজ এদিকে ফিরল না যেমন যাচ্ছিল, তেমনি যেতে লাগল।

ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে সংকেত জানাবার আর কোন উপায় নেই। একমাত্র উপায় জাহাজটার দিকে লক্ষ্য করে নৌকাটা চালানো। যদি কোনরকমে জাহাজটার সঙ্গে দূরত্বটা কমানো যায়। শরীর টলছে। হাঁটু দুটো কাঁপছে। কিন্তু এই শেষ চেষ্টা। নইলে মৃত্যু অবধারিত। হঠাৎ মনে পড়ল হাঙরগুলোর কথা। ফ্রান্সিস জলের দিকে তাকাল। হাঙরের দল মাঝে-মাঝে জল থেকে লেজ তুলে ঝাপটা দিচ্ছে। বোধহয় সংখ্যায় আরো বেড়েছে ওরা। ফ্রান্সিস আর চুপ করে শুয়ে থাকতে পারলে না। শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে বসল, বৈঠাটা হাতে নিল। তারপর প্রাণ-পণে নৌকো বাইতে লাগল জাহাজটাকে লক্ষ্য করে।

সারারাত ধরে নৌকো বাইল ফ্রান্সিস। ক্লান্তিতে-অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু ফ্রান্সিস হার মানে নি। ঐ অবস্থাতেই নৌকো বেয়েছে।

সূর্য উঠল। ভোর হল। ভাল করে তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। তবু তাকাতে হবে—দেখতে হবে জাহাজটা কত দূরে। হঠাৎ দেখল একটা পাতলা কুয়াশার মত আস্তরণের পিছনেই বিরাট জাহাজের পাল। আনন্দে ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু পারল না। গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। ফ্রান্সিস নিজের শরীরটাকে পাঠাতনের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। হ্যারির কাছে এনে হ্যারিকে ধাক্কা দিল। হ্যারি আস্তে-আস্তে তাকাল ওর দিকে। ফ্রান্সিস অবসাদগ্রস্ত ডান হাতখানা তুলে জাহাজের দিকে ইঙ্গিত করল। তারপর ওর চোখের সামনে সব কিছু মুছে গেল। শুধু শোনা গেল, হ্যারি চীৎকার করে কী বলছে। সেই চীৎকারের শব্দটাও দূরবর্তী হতে-হতে এক সময় মিলিয়ে গেল। সব অন্ধকার। কোনও শব্দই আর ওর কানে পৌঁছোল না। ফ্রান্সিসের অবসন্ন দেহটা জ্ঞান-হারিয়ে পাঠাতনের উপর গড়িয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ফ্রান্সিস যখন তাকাল, দেখল, ও একটা কেবিনঘরে শুয়ে আছে। দাড়িওলা একজন বুড়োমত লোক ওর নাড়ী টিপে দেখছে। ফ্রান্সিস বুঝল, ইনি ডাক্তার। ফ্রান্সিসকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে ডাক্তার হাসলেন। বললেন—কী? কেমন লাগছে?

—শরীরটা দুর্বল। ফ্রান্সিস টেনে-টেনে বলল।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার একটু খেয়ে নাও। একেবারে বেশী করে খেতে দেওয়া হবে না। কম-কম করে খাবে।

ফ্রান্সিসের মনে হল, ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধটুকুও যেন আর নেই ওর।

—ক'দিন উপোস করে ছিলে? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

—চার-পাঁচদিন হবে।

—হুঁ—দু'তিন দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল হ্যারি আর মকবুলের কথা। ফ্রান্সিস ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠতে গেল। ডাক্তার হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

—বিছানা ছেড়ে এখন ওঠা চলবে না।

—কিন্তু আমার সঙ্গে যারা ছিল আমার বন্ধুরা—তারা কোথায় ?

—পাশের কেবিনেই আছে—

—আমি ওদের দেখতে চাই।

—উঁহু, আজকে নয়, কালকে।

—কিন্তু—

—কোন কথা নয়—শুধু বিশ্রাম এখন।

একটু পরেই একজন লোক মাংসের ঝোল আর রুটি নিয়ে ঢুকল।

ডাক্তার বললেন—নাও, খেয়ে নাও।

ফ্রান্সিস খেতে বসল। এতদিনের উপবাস অথচ খেতে ইচ্ছে করছে না। আসলে উপবাসে-উপবাসে ওর খিদেই মরে গিয়েছিল। যতটা ভাল লাগল খেল। খাওয়ার-দাওয়ার পর শরীরে যেন একটু বল পেল। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল—অনেক ধন্যবাদ।

—আমাকে নয়—জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। এক্ষুনি আসবেন।

একজন লোক কেবিনঘরে ঢুকল। মুখে ছুঁচোলো গোঁফ-দাড়ি। ক্যাপ্টেনের পোশাক পরে। ফ্রান্সিস বুঝল—ইনিই ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল—এখন কেমন আছে ?

একটু পড়েই একজন লোক মাংসের ঝোল আর রুটি নিয়ে ঢুকল।

—ভালো। জ্ঞান ফিরেছে, তবে শরীরের দুর্বলতা কাটতে কয়েক দিন যাবে।

—হুঁ। এবার ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল—কেমন আছেন ?

ফ্রান্সিস মাথা কাত করে জানালে—ভালো।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল—নৌকো করে কোথায় যাচ্ছিলেন ?

ফ্রান্সিস সাবধান হল। হীরের পাহাড়ের কথা বললেই বিপদ বাড়বে তো কমবে না। কাজেই অন্য ছুতো দেখাতে হল। বলল—আমাদের জাহাজ জলদস্যুরা আক্রমণ করেছিল। অনেক কষ্টে আমরা তিনজন জাহাজ থেকে নৌকা করে পালাতে পেরেছিলাম।

ক্যাপ্টেন আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। ফ্রান্সিসও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাবার সময় ক্যাপ্টেন বলল—কয়েকদিন বিশ্রাম নিন, খাওয়া-দাওয়া করুন, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

পরের দিনটিও ফ্রান্সিস কেবিন ঘরে বিছানায় শুয়েই কাটালো। সন্ধ্যে নাগাদ হ্যারি আর মকবুল এল। হ্যারি খুশীতে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। মকবুলও খুশী।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সিস, তুমি কি শরীরের ঐ অবস্থায় সত্যিই সারারাত নৌকো বেয়েছিলে ?

—উপায় কি ? নইলে এই জাহাজটার কাছে পেঁছানো যেত না।

তিনজনে মিলে কিছুক্ষণ গল্পগুজব চলল। গল্প বেশির ভাগই ওরা কী করে উদ্ধার পেল, তাই নিয়ে হল। কী করে অচৈতন্য ফ্রান্সিসকে জাহাজে তোলা হল, ওরাই বা দড়ি ধরে কী ভাবে জাহাজে উঠল—এসব নিয়ে কথাবার্তা হল। ফ্রান্সিস একসময় জিজ্ঞেস করল—তোমরা খোঁজ নিয়েছো, জাহাজটা কোথায় যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ। আমি খোঁজ নিয়েছি—মকবুল বলল—জাহাজটা পর্তুগীজদের। ওদের একটা বন্দর আছে পশ্চিম আফ্রিকার নিম্বাতে। সেই বন্দরেই যাচ্ছে জাহাজটা।

—ফ্রান্সিস বললে—তাহ'লে তেকরুর বন্দরে যাবার উপায় ?

—নিম্বা থেকেই আর একটা জাহাজ ধরে তেকরুর যেতে হবে—

মকবুল বলল– আর এই জাহাজ দু' একদিনের মধ্যেই নিম্বা পেঁছুবে।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে হ্যারি আর মকবুল চলে গেল। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। শরীরের দুর্বলতা এখনো কাটেনি। বেশ ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। তবু ফ্রান্সিসের চিন্তার যেন শেষ নেই। কী করে তেকরুর বন্দরে পেঁছুবে। সেখান থেকে কী করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস আবার একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

দু'দিন পরে জাহাজটা নিম্বা বন্দরে ঢুকলো। ছোট বন্দর। জনবসতি খুবই কম। কিন্তু উপায় নেই। এই বন্দরেই অপেক্ষা করতে হবে অন্য জাহাজের জন্য। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নামবার আগে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ক্যাপ্টেনকে বারবার ধন্যবাদ জানাল। ক্যাপ্টেনই ওদের হদিশ দিল একটা সরাইখানার। একজন পর্তুগীজ সরাইখানাটা চালায়। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নেমে সেই সরাইখানাটা খুঁজে বের করল। খুবই সস্তা সরাইখানা। খাওয়ার টেবিল, বাসনপত্র নোংরা। তা হোক—এই সরাইখানা এখন স্বর্গ ওদের কাছে। কতদিন অপেক্ষা করতে হয়, কে জানে ? একটা বড়ো দেখে ঘর ওরা ভাড়া নিল। ঘরটার জানালা থেকে সমুদ্র আর নিম্বা বন্দর স্পষ্ট দেখা যায়। কোন নতুন জাহাজ এলে ওদের চোখে পড়বেই।

আগের জাহাজের ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসদের একটা মোহরের ভাঙানি দিয়ে গিয়েছিল পর্তুগীজ মুদ্রায়। মুদ্রাগুলো খুব কাজে লেগে গেল। ফ্রান্সিস খাওয়া থাকার জন্যে দু'দিনের আগাম পাওনা সরাইখানাকে মিটিয়ে দিল। সরাইওলা তাতেই বেজাই খুশী। দু'বেলা ওদের খোঁজপত্তর করতে লাগল। স্নানের জল, আলো আর ভাল খাবার-দাবারের সুবন্দোবস্ত করে দিল। জাহাজের খালাসীদের হাঁকে-ডাকে নিম্বা বন্দরটা মুখরিত হয়ে রইল এ ক'দিন। কিন্তু জাহাজটা চলে যেতেই আবার নিঃসাড় হয়ে গেল নিম্বা বন্দর।

নিম্বা বন্দরের একপাশে সমুদ্র। তা ছাড়া সবদিকেই ঘন জঙ্গল। শুধু জঙ্গল ছাড়া দেখবার কিছুই নেই। ফ্রান্সিসরা দুটো দিন নিজেদের ঘরেই শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল।

তিন দিনের দিন দুপুর নাগাদ একটা মস্ত বড় জাহাজের পাল দেখা গেল সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায়। জানলা থেকেই দেখা গেল জাহাজটা। তিনজনেই ছুটে বেরিয়ে এল সরাই-

খানা থেকে। জাহাজঘাটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল জাহাজটার জন্যে। এক সময় জাহাজটা ঘাটে এসে লাগল। ফ্রান্সিসের আর তর সইল না। পাঠাতন ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজে গিয়ে উঠল। মকবুল আর হ্যারি জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে রইল। নতুন জাহাজের ক্যাপ্টেন বেশ দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। দু'চার মিনিট কথাবার্তা চলতেই ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসদের সঙ্গে পুরনো বন্ধুর মত ব্যবহার করতে লাগল। কথায়-কথায় ক্যাপ্টেন জানাল—পানীয় জলের ঘাটতি পড়েছে বলেই এই বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছে। কাল-কেই আবার জাহাজ সমুদ্রে ভাসবে। তেকরুর বন্দরে মাত্র একবেলার জন্য নোঙর করবে। তারপর আরো কয়েকটা বন্দরে থেমে-থেমে পর্তুগাল যাত্রা করবে।

ফ্রান্সিস খুব খুশী হল। তেকরুর বন্দরে যাওয়ার একটা উপায় হলো। জাহাজ থেকে নেমেই বন্ধুদের এই খবরটা দেবার জন্যে ছুটলো।

সন্ধ্যের সময় কম্বল-টম্বল যা ছিল, তাই নিয়ে ফ্রান্সিসরা জাহাজে এসে উঠল। তেকরুর বন্দরে যাওয়া যাবে, এই উত্তেজনায় ফ্রান্সিসের সারারাত ভালো করে ঘুম হলো না। শুধু তেকরুর বন্দরে পেঁছিনোই নয়, তারপরেও আছে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া। সেখান থেকে হীরের পাহাড়ে যাওয়া। এইসব ভাবনাচিন্তায় রাত কেটে গেল।

ফ্রান্সিস কেবিন-ঘর থেকে বেরিয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়াল। পূর্ব আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরে সূর্য উঠল। নিম্বা বন্দরের জঙ্গলের মাথা আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্যের আলোয় চারদিক ঝলমল করতে লাগল। ঘড়-ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হল। সাড়া পড়ে গেল জাহাজের দাঁড়ি আর লোকজনের মধ্যে। ভালো করে পাল বাঁধা হল। ভোরের হাওয়ায় পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চললো তেকরুর বন্দরের উদ্দেশ্যে।

দু'দিন পরে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে পেঁছিল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে দু'চারটে আলো টিমটিম করে জ্বলছে। অন্ধকারেও ফ্রান্সিস যতটা আন্দাজ করতে পারল, তাতে বুঝল, তেকরুর বন্দর নিম্বার চেয়ে বড়। জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে পারল যে, এই তেকরুর বন্দর থেকে হাতির দাঁতের চালান যায় ইউরোপে। তাই এই বন্দরটা হাতির দাঁতের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। ব্যবসার খাতিরে লোকজনের বাস আছে এখানে। সরাইখানাও আছে।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নেমে এল। একটা মাথা গোঁজার আস্তানা খুঁজতে হয়। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতেই একটা সরাইখানার খোঁজ পেল। এখান-কার অধিবাসী প্রায় সবাই এদেশীয় নিগ্রো। কালো পাথরে কোঁকড়া চুল, থ্যাবড়া ঠোঁট। সরাইখানার মালিক কিন্তু আরবীয়। ব্যবসার ধান্ধায় এখানে এসে সরাইখানা খুলে বসেছে। সে বেশ সাদরেই ওদের গ্রহণ করল। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিল।

দিনকয়েক কাটলো নিশ্চিন্ত বিশ্রামে। এই ক'দিন কতরকম জাহাজ ভিড়ল তেকরুর বন্দরে। কত দেশের লোক যে নামল, তার ঠিক নেই। এর মধ্যেই ঘটলো এক কাণ্ড।

সেদিন দুপুরে ফ্রান্সিসরা খাওয়া-দাওয়া করছে। খাওয়ার ঘরে বেশী লোকজন নেই। এমন সময় দু'জন লোক ঢুকল সরাইখানায়। খাওয়ার ঘরে এসে খাবারের টেবিলে বসল। দু'জনেরই পরনে আরবীয় পোশাক। একজনের একটা চোখের ওপর কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা

কালো কাপড়ের টুকরো। এক চোখ অন্ধ লোকটার। সেই লোকটাই মোটা গলায় ডাক দিল খাবার দিয়ে যাওয়ার জন্যে। ফ্রান্সিস এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি যে, মকবুল খাওয়া ছেড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ফ্রান্সিস মকবুলের দিকে তাকিয়ে আরো আশ্চর্য হলো। মকবুলের মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ও কোনো কথা বলতে পারছে না।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে মকবুল ?

কাঁপা-কাঁপা গলার মকবুল বলল—ঐ লোকটাকে দেখেছো তো ?

—কার কথা বলছো ?

—ঐ যে একচোখ কানা লোকটা ?

—হ্যাঁ দেখছি। তাতে কী হয়েছে ?

—লোকটা এক নম্বরের শয়তান। পরে সব বলবো। আমাকে এখন একটু আড়াল করে বসো।

ফ্রান্সিস ওকে আড়াল দিয়ে বসল। মকবুল ভালো করে খেতে পর্যন্ত পারছে না। ফ্রান্সিস আড়াল করে বসা সত্ত্বেও মকবুল কানা লোকটার দৃষ্টির সামনে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারলে না। সাংঘাতিক দৃষ্টি লোকটার। লোকটা তরোয়ালে হাত রাখল। তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। মকবুল ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝল, লোকটার মতলব ভালো নয়। যে কারণেই হোক মকবুলকে সহজে ছাড়বে না লোকটা। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে হ্যারিকে ডাকল—হ্যারি।

—উঁ।

—ঘর থেকে আমার তরোয়ালটা নিয়ে এসো তো।

হ্যারি এক মুহূর্তও দেরী করল না। ঘরের দিকে ছুটল ফ্রান্সিসের তরোয়ালটা আনতে। কানা লোকটাও ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও টেবিল ছেড়ে উঠে ওর মখোমুখি দাঁড়াল। ঝনাৎ করে শব্দ হলো। লোকটা খাপ থেকে তরোয়াল বের করে ফেলেছে। তরোয়ালের ছুঁচোলো ডগাটা ফ্রান্সিসের বুকে ঠেকিয়ে দাঁতচাপা স্বরে বলল— এই কাফের,তুই সরে যা। ঐ কুত্তাটার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা চেঁচিয়ে বলল—তুই সরে যা।

ফ্রান্সিস বলল—তার আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

লোকটা এ রকম উত্তর আশা করেনি। বেশ অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তরোয়ালটা নামিয়ে বলল—তা তোর সঙ্গে বোঝাপড়াটা কি এখানেই হবে না, বাইরে যাবি ?

হ্যারি ঠিক তখনই তরোয়ালটা এনে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। তরোয়ালটা হাতে পেয়ে ফ্রান্সিসের মনের জোর অনেকটা বেড়ে গেল। বলল—তোর যেখানে খুশী।

লোকটা এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কথাবার্তা শুনে আর ভাবভঙ্গী দেখে বুঝল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। তবু এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষও সে নয়। হঠাৎ লোকটা ফ্রান্সিসের মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস এই হঠাৎ আক্রমণের জন্যে তৈরীই ছিল।

সে তরোয়াল চালিয়ে মারটা ঠেকাল। শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই। কেউ কম যায় না। লোকটা বারবার ফ্রান্সিসকে আঘাত করতে চেষ্টা করে চলল। ফ্রান্সিস শুধু মার ঠেকিয়ে চলল—আক্রমণ করল না। যারা টেবিলে বসে খাচ্ছিল, তারা টেবিল ছেড়ে দেওয়ালের দিকে সরে গেল। তারপর তরোয়াল-যুদ্ধ দেখতে লাগল। হঠাৎ কানা লোকটার একটা মার ফ্রান্সিস ঠিকমত ফেরাতে পারল না। তরোয়ালের ঘায়ে হাতের কাছের জামাটা ফেঁসে গেল! কেটেও গেল। রক্ত পড়তে লাগল। কাণা লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিস মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করল। লোকটা এরকম দ্রুত আক্রমণ আশা করে নি। ফ্রান্সিসের মার ঠেকাতে-ঠেকাতে পিছিয়ে যেতে-যেতে একট টেবিলের ওপর গিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস লাফ দিয়ে টেবিলে উঠে পা দিয়ে লোকটার তরোয়ালসুদ্ধ হাতটা টেবিলের ওপর চেপে ধরল। লোকটা কেমন বিমূঢ় দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—কী, আর বোঝাপড়ার দরকার আছে?

পা দিয়ে লোকটার তরোয়ালশুদ্ধ হাতটা টেবিলের ওপর চেপে ধরল।

লোকটা চোখ-মুখ কুঁচকে তরোয়ালটা মুক্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রান্সিস পা দিয়ে যেভাবে চেপে রেখেছে, তাতে লোকটা হাতের তরোয়াল নাড়াতে পারল না। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। তারপর জুতোশুদ্ধু পা'টা লোকটার তরোয়াল-ধরা হাতের মুঠোতে জোরে চেপে দিল। লোকটা তরোয়াল ফেলে হাতটা চেপে ধরল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা পা দিয়ে ঠেলে দিল কাণা লোকটার সঙ্গীর দিকে। সঙ্গীটি তরোয়ালটা তুলে নিল। কিন্তু কী করবে বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। কানা লোকটা ডান হাতটা চেপে ধরে সঙ্গীটির কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গীটিকে বেরোবার ইঙ্গিত করে নিজেও দরজার দিকে পা বাড়াল। যাবার সময় মকবুলের দিকে তাকিয়ে বলল—যা, খুব জোর বেঁচে গেলি।

ফ্রান্সিস আবার খেতে বসল। খাওয়া চলছে, তখন ফ্রান্সিস মকবুলকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার মকবুল? তোমার ওপর ঐ কানা লোকটার এত রাগ কেন?

মকবুল বলতে লাগল—কী আর বলবো? বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন আমি এই অঞ্চলে কার্পেট বিক্রি করতাম। এই কানা লোকটা হচ্ছে এক দস্যুদলের সর্দার। এই দস্যুদলের কাজই হলো ইউরোপ আমেরিকার ক্রীতদাস কেনাবেচার বাজারে ক্রীতদাস চালান দেওয়া। এরা জাহাজে করে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে এরা এই দেশের শান্ত নিরুপদ্রব গ্রামগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তখন এরা ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রাণ বাঁচাতে সবাই

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তখন তাদের ধরে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় তিন-কোণা গাছের ডোলর এক রকম জিনিস। সেটার মধ্যে দিয়ে দড়ি ভরে দেওয়া হয়। কারো পক্ষে তখন দল ছেড়ে পালানো অসম্ভব। এইভাবে-পঞ্চাশ একশো অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে এরা বেঁধে নিয়ে যায় নিজেদের জাহাজে। তারপর চড়া দামে সেই সব ক্রীতদাসদের বিক্রি করে ইউরোপ-আমেরিকার ক্রীতদাস বেচা কেনার হাটে।

—কিন্তু তোমার ওপরে ওদের রাগের কারণ কী?

—কারণ আছে বৈ কি—মকবুল বলল—আমি যে ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলাম।

—সেটা কী রকম?

—এই সব অঞ্চলে তখন কার্পেট বিক্রি করছিলাম। তখনই হঠাৎ একদিন দেখলাম নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর মর্মান্তিক অত্যাচার। আমি তখন সেই গ্রামটিতে ছিলাম। আমিও বাদ যাই নি। আমাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। অবশ্য কাণা সর্দার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছিল। বারবার সাবধান করে দিয়েছিল, আমি যেন ওদের আসার খবর কাউকে না বলি। আমি অন্য গ্রামে গেলাম। সেখানে এই দস্যুদের আসবার কথা বলে দিলাম। সব লোক গ্রাম ছেড়ে পালাল। দস্যুদল গিয়ে দেখল, গ্রাম-ফাঁকা জনপ্রাণীও নেই। ওরা প্রথমে বুঝতেই পারেনি, গ্রামবাসীরা কার কাছ থেকে দস্যুদলের আসার খবর পেল। একচোখ কাণা দস্যুদলের সর্দার কিন্তু ঠিক বুঝল, এটা আমারই কাজ। গ্রাম-গ্রামান্তরে নানা উপজাতির সর্দারদের কাছে তখন কার্পেট বিক্রী করছি। খবরটা আমার পক্ষে রটানোই সম্ভব। আমি করেছিলামও তাই। গ্রাম-গ্রামান্তরে যেখানে গেছি, দস্যুদলের আসার খবর রটিয়ে দিয়েছি। গ্রাম ফাঁকা করে সবাই বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। দস্যুরা এসে দেখেছে গ্রামকে গ্রাম শূন্য—খাঁ-খাঁ করছে। একটা মানুষও নেই। এইবার কাণা সর্দার হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজতে লাগল। আমিও বিপদ আঁচ করে পালিয়ে এলাম এই তেকরুর বন্দরে। তারপর জাহাজে চড়ে নিজের দেশে পাড়ি জমালাম। এখন বুঝছি—দস্যুসর্দারের চোখে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

—হুঁ—ফ্রান্সিস বলল—তাহলে তো সর্দার ব্যাটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিলে ভালো হতো। যাক্‌গে—ফ্রান্সিস আপনমনে খেতে লাগল।

এখন কি করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যায়, তাই নিয়ে ওরা পরিকল্পনা স্থির করতে বসল। এইসব জায়গা সম্বন্ধে ফ্রান্সিস বা হ্যারি কারোই কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। একমাত্র ভরসা মকবুল। মকবুল বলল—এখান থেকে মাইল পাঁচেক পূর্বদিকে পর্তুগীজ-দের একটা দুর্গ আছে। আগে ওখানে পেঁছুতে হবে আমাদের, তারপর ইতিকর্তব্য স্থির করা যাবে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই মকবুলের প্রস্তাবে রাজী হলো।

* * *

পরের দিন সকালবেলা ওরা যাত্রা শুরু করল পর্তুগীজদের দুর্গটার উদ্দেশ্যে। তেকরুর বন্দর এলাকা ছাড়তেই শুরু হল গভীর বন। এরই মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তামত রয়েছে। তেকরুর বন্দর থেকে দুর্গে মালপত্র নিয়ে যাওয়া-আসার জন্যে ঘোড়ায় টানা গাড়ী ব্যবহার করতে হয়। তাই গাড়ী চলার মত রাস্তা হয়েছে। দুধারে ঘন জঙ্গল। তারই

মাঝখান দিয়ে এই সরু রাস্তা ধরে ওরা হাঁটতে লাগল। এতদিন আফ্রিকার জঙ্গল সম্বন্ধে গল্পই শুনেছে ফ্রান্সিস। এবার চাক্ষুষ দেখল আফ্রিকার জঙ্গল কাকে বলে। বন যে এত নিবিড় হতে পারে, ফ্রান্সিস তা ভাবতেও পারে নি কোনোদিন। দুপুর নাগাদ ওরা দুর্গ-টার সামনে এসে হাজির হল। পাথরের তৈরী দুর্গটা বেশ বড়ই বলতে হবে। সিংহদরজা দিয়ে ওরা দুর্গে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল। দ্বাররক্ষী কিছুতেই ওদের ঢুকতে দেবে না। ফ্রান্সিস ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল—ঠিক আছে—তুমি গিয়ে দুর্গ-রক্ষককে বলো—আমরা ব্যবসার ধান্ধায় এদেশে এসেছি। একটা রাত দুর্গে থাকবো।

দ্বাররক্ষী চলে গেল। একটু পরেই একজন বেশ বলশালী লোক দরজার দিকে এগিয়ে এল। তার পরনে যুদ্ধের পোশাক। তার পেছনে-পেছনে এল দ্বাররক্ষী। ফ্রান্সিস বুঝল—ইনিই দুর্গরক্ষক।

দুর্গরক্ষক বেশ ভারিক্কি গলায় জিজ্ঞেস করল—আপনারা কে ?

—আমরা ব্যবসায়ী। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

—কীসের ব্যবসা আপনাদের ?

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল—কার্পেটের।

—কই—আপনাদের সঙ্গে তো কার্পেট দেখছি না।

—আমরা এই এলাকাটা ভালো করে দেখছি—কার্পেট আনলে বিক্রি-বাট্টা হবে কি না।

—ও !

—আমরা আজ রাত্তিরের মত এখানে থাকতে পারি ? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—নিশ্চয়ই। দুর্গরক্ষক রক্ষীটিকে কি যেন ইঙ্গিত করল। রক্ষীটি ডাকল—আসুন আমার সঙ্গে।

রক্ষীকে অনুসরণ করে ফ্রান্সিসরা একটা ঘরে এসে হাজির হলো।

দুর্গের মধ্যে বেশ পরিচ্ছন্ন একটা ঘর। ফ্রান্সিসদের সেখানে থাকতে দেওয়া হল। যাক্ রাত কাটাবার একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। এবার আহারের ব্যবস্থা কি হবে ? কিন্তু সে চিন্তা তাদের বেশীক্ষণ রইল না। খাবার সময়ে রক্ষী এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেল।

রাত্রে মস্ত লম্বা একটা টেবিলে সবাই একসঙ্গে খেতে বসল ! প্রায় পঞ্চাশজন সৈন্য দুর্গটায় থাকে। তাছাড়া আজকে রয়েছে দুর্গরক্ষকের দু'জন অতিথি আর ফ্রান্সিস ওরা। দেখতে-দেখতে দুর্গরক্ষক তার অতিথি দু'জনকে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। অতিথিদের মধ্যে একজন বয়স্ক। তার নাম জন। অন্যজন যুবক। তার নাম ভিক্টর। ফ্রান্সিস জনের সঙ্গে আলাপ জমাল। হ্যারি আর মকবুল আলাপ করতে লাগল ভিক্টরের সঙ্গে। কথায়-কথায় জন বলল—আমরা এখানে এসেছি হাতী শিকার করতে। দাঁতাল হাতি মেরে দাঁতগুলো নিয়ে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করবো। অবশ্য দাঁতগুলো নিয়ে যাবার সময় এই দুর্গরক্ষককেও কিছু প্রাপ্য অর্থ দিতে হবে।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—আপনারা কি হাতী শিকার করতে ওঙ্গালির বাজারে যাবেন ?

—সেটা আমি তো ঠিক বলতে পারবো না। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে একজন এদেশীয় নিগ্রো। মাসাই উপজাতির লোক। এরা বাধ্য আর খুব ভালো তীরন্দাজ। সেই গাইডই জানে আমরা কোথা দিয়ে কোথায় যাবো।

—সেই গাইড কোথায় ?

—সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে বারান্দায় বসে খাচ্ছে।

—তার সঙ্গী মানে।

—আমরা কুড়ি জন মাসাইকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। মালপত্র বওয়া, রান্না করা, বিষ মাখানো তীর দিয়ে হাতী শিকার করা, হাতীর দাঁতগুলো বয়ে আনা—এইসব ওরাই করবে।

—আপনার গাইডটিকে জিজ্ঞেস করুন তো সে ওঙ্গালির বাজার চেনে কিনা।

—ডাকছি—বলে যারা খাবার পরিবেশন করছিল, তাদের একজনকে ডেকে বলল—গাইডটাকে একবার ডেকে দিতে।

একটু পরেই নেংটি পরা খালি গায়ে একজন নিগ্রো এসে জনের সামনে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে বোঝাতে পারল না। তখন মকবুল মাসাইদের ভাঙা-ভাঙা ভাষায় জিজ্ঞেস করল—ওঙ্গালির বাজার চেনো ?

লোকটা মাথা ঝাঁকাল অর্থাৎ চেনে। মকবুল আবার জিজ্ঞেস করলো—ওখানে আমাদের নিতে যেতে পারবে ?

লোকটা মাথা ঝাঁকাল অর্থাৎ নিয়ে যেতে পারবে।

ফ্রান্সিস তখন জনকে বলল—আপনাদের সঙ্গে আমরাও যাবো।

—বেশ তো। জন খুশী হ'য়ে সম্মত হল। মকবুল তখন গাইডটাকে নিয়ে পড়ল। নানাভাবে বোঝাতে লাগল—ওরা যেখানে হাতি শিকার করতে যাবে, সেখান থেকে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে কিনা! লোকটাও বার-বার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ, যাওয়া যাবে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মকবুলের মধ্যে কথা হতে লাগল। ফ্রান্সিস এই ভেবে খুশী যে, কিছুদিনের মধ্যে ওরা ওঙ্গালির বাজারে পৌঁছুতে পারবে। তারপর হীরের পাহাড়। মকবুল বেশী কথা বলছিল না। খুব গম্ভীরভাবে কিছু ভাবছিল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কি হে মকবুল, তুমি চুপচাপ যে!

—একটা কথা ভাবছি।

—কী ভাবছো ?

—জন সাহেবের গাইড কোন্ এলাকা দিয়ে নিয়ে যাবে জানি না। যদি উত্তর দিক্ দিয়ে আমরা ওঙ্গালির বাজারে যাই, তবে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু দক্ষিণ দিক দিয়ে গেলে সেই অঞ্চলে 'মোরান' নামে একদল উপজাতির পাল্লায় পড়বো। ভীষণ হিংস্র এই মোরান উপ-জাতির লোকেরা। এদের খাদ্য হলো শুধু কাঁচা মাংস, দুধ আর ষাঁড়ের রক্ত।

—কিন্তু আমরা তো আর তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহ'লেও। এরা সহজে কাউকে ছেড়ে দেয় না। এরা সব সময় যুদ্ধের পোশাক পরে থাকে। কোমরে ঝোলানো থাকে লম্বা দা, হাতে বর্শা আর তীর-ধনুক, কোমরের গোঁজে চকমকি পাথর, তারপর জলের থলি। সারা গায়ে-মুখে নানা রঙের উল্কি আঁকা।

—তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ মকবুল—ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—হয় তো তাই। মকবুল পাশ ফিরতে-ফিরতে বলল।

* * *

সকালবেলা লোকজনের ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতে দুর্গের চত্বরটা মুখর হ'য়ে উঠল। মাসাই

কুলীরা সব মালপত্র নিয়ে তৈরী হল। ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মকবুল তৈরী হ'য়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল জন আর ভিক্টরের জন্যে। একটু পরে জন আর ভিক্টর এল। কুলী-দের লাইন করে দাঁড় করানো হল। সামনে রইল সেই গাইড। সঙ্গে জন আর ভিক্টর। লাইনের মাঝামাঝি রইল ফ্রান্সিস আর মকবুল। দলের শেষের দিকে রইল হ্যারি।

যাত্রা শুরু হল। দুর্গের সামনে বেশ বড় একটা মাঠ। তারপরেই শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। গাইডটির হাতে একটা লম্বাটে দা। কোথাও-কোথাও দা দিয়ে জঙ্গল কেটে যাওয়ার পথ করে নিতে হচ্ছে। শুধু বন আর বন। কত রকমের গাছগাছালি, ফল-ফুলই বা কত রকমের। জঙ্গল এত ঘন যে সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢুকতে পারছে না। আন্দাজেই বেলা বুঝে নিতে হচ্ছে। বনে আর কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না—শুধু বানর আর বেবুনের কিচিমিচি ডাক। সেই সঙ্গে বিচিত্র সব পাখির ডাক। দুপুর নাগাদ একটা ঝরণার কাছে এসে দলটি থামল। এবার খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হল। ফ্রান্সিসের ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। প্রাণ ভরে ঝরণার জল খেয়ে নিল। আঃ! কি সুন্দর স্বাদ জলের। ওর দেখাদেখি অনেকেই ঝরণার জল খেল! খাবারের বাক্স খোলা হলো। সবাইকে খেতে দেওয়া হ'ল। আসার সময় ফ্রান্সিস পথে কয়েকটা বনমুরগী দেখেছিল। মনে-মনে ঠিক করল—কালকে কয়েকটা বনমুরগী মেরে মাংস খেতে হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হল যাত্রা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে পথ করে নিতে হচ্ছে। কাজেই তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছিল না। থেমে-থেমে চলতে হচ্ছিল।

সন্ধ্যে হবার আগেই বনের রাস্তা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এবার রাত্তিরের জন্যে বিশ্রাম। ফ্রান্সিসদের একটা আলাদা তাঁবু দেওয়া হ'ল। রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল। তাঁবুর কাছেই একটা চিতাবাঘ কিছুক্ষণ ধ'রে গর্ গর্ ক'রে ডেকেছিল। পরে আর চিতাবাঘের ডাক শোনা যায়নি। শেষ রাত্তিরের দিকে দুটো হায়না তাঁবুর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কুলীরা আগুন জেবলে শুয়েছিল। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারতে সে দুটো পালিয়েছিল।

পরদিন সকালে তাঁবু আর জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে আবার রওনা হল সবাই। সেই জঙ্গল কেটে পথ তৈরী করতে হল। গভীর বন। শুধু বাঁদর, বেবুন আর পাখির কিচিমিচি। সবাই সার দিয়ে চলছে। গতকালকের মত কয়েকটা বনমুরগীর দেখা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস আর লোভ সামলাতে পারল না। গাইড নিগ্রোটির কাছ থেকে তীর-ধনুক চেয়ে নিল। তারপর একটা মুরগীর দিকে নিশানা করে তীর ছুঁড়ল। কিন্তু তীরটা কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল। পরের বার আরো সাবধানতার সঙ্গে তীর চালাতে একটা মুরগী বিদ্ধ হল। এইভাবে সাতটা মুরগী মারা পড়ল। সেদিন দুপুরে মুরগীর মাংস দিয়ে খাওয়াটা ভালোই হল। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল!

সেই একঘেয়ে বন। বাঁদর, বেবুন আর পাখি-পাখালির ডাক। মাঝে সুন্দর ঝরণা। তৃপ্তিভরে ঝরণার জল খেয়ে নিল সবাই। তারপর আবার পথচলা। কুলীদের সর্দার পথ চলতে-চলতে কাঁপা-কাঁপা গলায় কী একটা দুর্বোধ্য গানের সুর ধরল। বাকী কুলীরা সবাই সেই সুরে গাইতে-গাইতে পথ চলল।

* * *

ছ'দিন পরের কথা। দুপুর নাগাদ ওরা একটা বিস্তীর্ণ মাঠের মত জায়গায় এসে উপস্থিত

হল। সেই মাঠে দলবদ্ধভাবে চরে বেড়াচ্ছে অনেক জেব্রা। কুলীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। জেব্রার মাংস ওদের খুব প্রিয়। কুলীদের সর্দার তীর-ধনুক নিয়ে কয়েকটা বুনো ঝোপের আড়ালে-আড়ালে জেব্রাগুলোর অনেক কাছাকাছি চলে গেল। তারপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের বিরতিতে প্রায় একসঙ্গে পাঁচটা তীর ছুঁড়ল। সবগুলো তীরই একটা জেব্রার গলায়, পেটে, কাঁধে গিয়ে বিঁধলো। আহত জেব্রাটা ছুটে চলল। সর্দার কুলীও ছুটল। তার সঙ্গে আরো দুতিনজন জেব্রাটাকে ধাওয়া করল। অন্যান্য জেব্রাগুলো ততক্ষণে পালিয়েছে। আহত জেব্রাটার সাদা-কালো ডোরাকাটা চামড়ায় রক্তের ছোপ লাগল। জেব্রাটা আর দ্রুত ছুটতে পারছিল না। বোঝা গেল, জেব্রাটা বেশ আহত হয়েছে। কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করবার পর জেব্রাটাই ক্লান্তিতে মাটিতে বসে পড়ল। তখন কুলীদের সর্দার আর কয়েকজন নিগ্রো কুলী মিলে জেব্রাটাকে বেঁধে নিয়ে এল। জেব্রাটাকে কাটা হল। তারপর আগুন জেলে জেব্রার মাংস পুড়িয়ে ওরা মহানন্দে খেতে লাগল। সন্ধ্যে হ'য়ে এল। ঐ মাঠেই একটা নিঃসঙ্গী গাছের নীচে তাঁবু ফেললো। রাতটা নিরুপদ্রবেই কাটাল।

কিছু খেয়ে-দেয়ে সকালবেলা আবার যাত্রা শুরু হল। মাঠের এলাকা ছেড়ে আবার নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে দলটি এগিয়ে চলল। সেই গভীর বনের নীচে আধো আলো-অন্ধকারের মেশামেশি! তারই মধ্য দিয়ে পথ ক'রে দলটি এগিয়ে চলল।

হঠাৎ যেন জাদুমন্ত্রবলে কয়েকজন লোক দলটির চলার পথের ওপর এসে দাঁড়াল। মনে হলো, এতক্ষণ যেন ওরা এদের গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিল। কারণ ওরা এদের যাবার পথের ওপরেই দাঁড়াল। অগত্যা দলটি থমকে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসস দেখল, সেই লোকগুলি নেংটি পরে আছে। সারা গায়ে মুখে নানারঙের উলকি আঁকা। হাতে বর্শা তীর-ধনুক, কোমরে ঝোলানো লম্বাটে দা। মকবুল তখন ওর পাশে দাঁড়িয়েছে, ফ্রান্সিসস বুঝতে পারেনি। মকবুল ফ্রান্সিসসের কাঁধে হাত রাখতেই ফ্রান্সিসস ফিরে তাকাল। বলল—কী ব্যাপার?

মকবুল ইশারায় আস্তে কথা বলতে বলল। তারপর চাপাস্বরে বলল—এরাই উপজাতির লোক। এদের কথাই তোমাকে বলেছিলাম।

—কিন্তু এদের মতলবটা কি? ফ্রান্সিসস চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। মকবুল গলা নামিয়ে উত্তর দিল। ফ্রান্সিসসদের দলের সামনে ছিল গাইডটি। তার সঙ্গেই এদের কথা-বার্তা চলল। গাইডটি ফিরে এসে জনকে বলল—এই লোকগুলি কাপড়, আয়না, চিরুনি, পুঁতির মালা এইসব চাইছে।

জন রেগে বলল—ওসব আমরা দেব না। তারপর আগন্তুক দলটির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—ভালো চাও তো রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও।

লোকগুলোর মধ্যে যে দলপতি, তার গালে লম্বা কাটা দাগ। জনের কথা শুনে তার চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্যে। সে চীৎকার করে কী একটা ব'লে উঠল। তারপর যেমন বন ফুঁড়ে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

জন এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না। চেঁচিয়ে হুকুম দিল—চলো সব।

আবার হাঁটা শুরু হল। হাঁটতে-হাঁটতে মকবুল এক সময় ফ্রান্সিসসের কাছে এল। ধীরে-ধীরে বলল—জন সাহেব কাজটা ভালো করল না।

—কেন ? ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা সহজে ছেড়ে দেবে না। আপোসে মিটিয়ে নিলেই ভালো ছিল। কিন্তু তা না করে ওদের রাগিয়ে দেওয়া হল।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মনে-মনে ভাবল—মকবুল মিছিমিছি ভয় পাচ্ছে। কী করবে ওরা ? মকবুল কিন্তু ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিল না। মাথা নীচু করে কী যেন ভাবতে-ভাবতে হাঁটতে লাগল। আবার মাঝে-মাঝে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বনের চারদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে নিতে লাগল। মকবুল যে ভীষণ ভয় পেয়েছে, এটা ওর চোখ-মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝতে পারল।

আরো দু'দিন হাঁটা পথে যাত্রা চলল। তিন দিনের দিন ফ্রান্সিসদের দল একটা ছোট পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হল। এদিকে জঙ্গলটা তত ঘন নয়। একটু ছাড়াছাড়া গাছ-পালা। তারই মধ্যে দেখা গেল ইতস্ততঃ ছড়ানো হাতীর কঙ্কাল। গাইড বুঝিয়ে বলল—মরবার সময় উপস্থিত হলে হাতীরা নাকি বুঝতে পারে। তখন দল ছেড়ে বনের মধ্যে নিরুপদ্রব একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে শুয়ে পড়ে। তারপর হয় মৃত্যু। এসব জায়গাগুলো গাইডরা খুব ভালোভাবেই চেনে। সেই জন্যেই গাইডদের নিয়ে হাতীর দাঁত শিকার করতে আসা সুবিধাজনক ! দেখা গেল, পাহাড়টা একেবারে চাঁছাছোলা পাথরের ঢিবি। একটা গাছও নেই পাহাড়টায়। তবে একটা জলপ্রপাত আছে। আঁজলা ভরে সেই জলপ্রপাতের জল খেল অনেকেই।

হঠাৎ গাইডটিকে দেখা গেল উত্তেজিত ভঙ্গীতে ছুটে আসছে। গাইডটি যে সংবাদ দিল তা অপ্রত্যাশিত। পাহাড়টাতে একটা গুহা রয়েছে। সেখানে নাকি অনেক হাতির দাঁত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ফ্রান্সিস, জন, ভিক্টর সবাই ছুটল গুহাটার দিকে। বাইরের আলো থেকে প্রায় অন্ধকার গুহাটায় ঢুকে প্রথমে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আস্তে-আস্তে গুহার অন্ধকারটা সরে আসতে দেখা গেল অনেকগুলো হাতীর দাঁত ও হাতীর কঙ্কাল ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। জন আর দেরী করল না। কুলীদের হুকুম দিল দাঁতগুলো সব একত্র করে বেঁধে তাঁবুতে নিয়ে রাখতে। ফেরবার সময় প্রত্যেক কুলীকে একটা করে দাঁত বয়ে নিয়ে আসতে হবে।

হাতীর দাঁতগুলো নিয়ে আসার বন্দোবস্ত হচ্ছে, এমন সময় গাইড খবর নিয়ে এল, এক-পাল হাতী পাহাড়ের নীচের জঙ্গল ঝোপঝাড় ভেঙে এই দিকেই আসছে। তাড়াতাড়ি লম্বামত একটা বাক্স থেকে তীব্র বিষমাখা তীর-ধনুক বের করা হল। গাইডটি নিজে তীর-ধনুক নিল। তাছাড়া আরো দু'জনকে তীরধনুক দিল। তিনজন তিন জায়গায় দাঁড়াল। গাইডটি দাঁড়াল পাহাড়ের গায়ে-লাগা একটা বড় পাথরের ওপর। অন্য দু'জনের মধ্যে একজন পাহাড়ের নীচে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইল। আর একজন দাঁড়াল পাথরের আড়ালে।

কিছুক্ষণ পরেই একদল হাতী গাছপালা, ঝোপঝাড় ভাঙতে-ভাঙতে এগিয়ে এল। যে-খানে এসে হাতীগুলো দাঁড়াল, সেখানটায় বন-জঙ্গল ছাড়া-ছাড়া। ওদের ওপর নজর রাখতে কোন অসুবিধে হল না। হাতীগুলোর মধ্যেই দু'টো হাতী দাঁতাল ছিল। বাকীগুলো মা-হাতী আর বাচ্চাহাতী। পাথরের ওপর থেকে গাইডটি চীৎকার করে বলল—'শুধু

দাঁতাল হাতী দু'টোকে মার'।

কথাটা শেষ হতে না হতেই তীর ছুটল। পাঁচ-সাতটা তীর পর-পর গিয়ে বিঁধল হাতী দু'টোর গায়ে। হাতী দু'টো কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। অন্য হাতীগুলো ততক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আবার তীর ছুঁড়ল। হাতী দু'টোর গায়ে বিদ্ধ হল তীরগুলো। হাতী দু'টো আর উঠতে পারল না। আস্তে-আস্তে মাটির ওপরে এলিয়ে পড়ল। তীব্র বিষের প্রতিক্রিয়া শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতী দু'টো জোরে-জোরে শ্বাস ছাড়তে-ছাড়তে মারা গেল। তখন কুলীদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই ছুটে গেল হাতী দু'টোর কাছে। ওদের মধ্যে একজন ধারাল ছুরি দিয়ে হাতীর পেটটা গোল করে কাটল। তারপর ভেতরে ঢুকে হাতীর মস্তবড় মেটেটা কেটে নিয়ে এল। ততক্ষণে আর এক দল কুলী জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা কাঠ এনে আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। ফ্রান্সিস একবার ভাবল, ওদের বারণ করে। কারণ হয়তো হাতীটির রক্তের সঙ্গে-সঙ্গে মেটেটাও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বারণ করতে যাওয়া বৃথা। হয়তো এরকম অবস্থায় হাতীর মেটে এর আগেও ওরা খেয়েছে। ওরা হাতীর মেটে আগুনে ঝলসাতে লাগল। ফ্রান্সিসরা তীর দিয়ে যে বুনো মুরগী মেরেছিল—তাই রান্না চাপাল।

রান্না শেষ হলে ফ্রান্সিসরা কয়েকজন জলপ্রপাতে স্নান করতে গেল। গত বেশ কয়েক-দিন স্নান করা হয় নি। এখন স্নান করার সাধ মনের সুখে মেটাল ওরা। তারপর খেতে বসল। ওদিকে কুলীরা খাচ্ছে, আর এদিকে ফ্রান্সিসদের দল খাওয়া-দাওয়া চলছে। হঠাৎ বনের চারদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। না পাখি-পাখালির ডাক, না বাঁদর, বেবুন, শিপাঞ্জীর কিচিরমিচির ডাক। ফ্রান্সিসের কাছে ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগল। এ সময় মকবুল ফ্রান্সিসের কাছে সরে এলো। তারপর মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস, আমরা বোধহয় বিপদে পড়বো।

—কীসের বিপদ ?

—লক্ষ্য করো নি—এই জায়গাটা কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

—তাতে কী হয়েছে—

—কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবে, মোরান উপজাতির লোকেরা সাংঘাতিক। বনের পশুপাখিও ওদের ভয় করে চলে। মকবুলের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জন চীৎকার করে নিজের খাবারের থালার ওপর ঝুঁকে পড়ল। দেখা গেল জনের পিঠে একটা তীর এসে বিঁধেছে। জন বারকয়েক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। মাটিতে শুয়ে পড়ল। কী হল, সেটা বোঝবার আগেই আর একটা তীর এসে বিঁধলো ভিক্টরের পিঠে। ভিক্টর মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। মকবুল খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠল—ফ্রান্সিস, শীগ্‌গির পালাও। ফ্রান্সিস আর হ্যারি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে দু' একজন কুলীর গায়ে তীর লেগেছে। তাদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই পালাতে চাইছে। এলোপাথাড়ি আরো কয়েকটা তীর ফ্রান্সিসদের আশেপাশে পড়ল।

ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মকবুলকে আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়টা দেখিয়ে চীৎকার করে বলল—পাহাড়ের দিকে চলো। তারপর তিনজনেই ছুটতে শুরু করল। কিন্তু একটু পরেই

ওদের থামতে হল। পাহাড়ের নীচে থেকে শুরু করে সমস্ত জঙ্গল এলাকায় ওদের চারদিক ঘিরে আস্তে-আস্তে জঙ্গলের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াতে লাগল—মোরান উপজাতির যোদ্ধারা। কোমরে ঝোলানো লম্বাটে দা। হাতে তীর-ধনুক আর বর্শা। মুখে খালি গায়ে উল্‌কি আঁকা। প্রায় শ' পাঁচেক হবে। পালাবার কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিসরা আস্তে-আস্তে ওদের তাঁবুর কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগল দেখা যাক্, ভাগ্যে কী আছে?

মোরান যোদ্ধাদের মধ্যে একজন তীব্রস্বরে কু-উ-উ বলে ডাক দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত যোদ্ধারা বর্শা উঁচিয়ে একসঙ্গে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। অর্থাৎ যুদ্ধে জয় হয়েছে। শত্রুরা পরাস্ত। প্রায় সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁবুগুলোর ওপর। জিনিসপত্র সব ছত্রাখান করে দিল। তারপর তাঁবু-গুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেই আগুন ঘিরে চলল উম্মত্ত নৃত্য। ফ্রান্সিসরা অসহায়ভাবে তাই দেখতে লাগল।

মোরান যোদ্ধাদের মধ্যে 'একজন তীব্র-স্বরে কু-উ-উ বলে ডাক দিল।

একটু পরে পাঁচ-ছয় জন মোরান যোদ্ধা এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। ওদের দলের প্রথমেই রয়েছে সেই গাল কাটা সর্দার। খুশীতে ওর চোখ দু'টো চিকচিক করছে। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে লোকটা চীৎকার করে কী যেন বলল। সঙ্গে-সঙ্গে দু'তিনজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। তারা ফ্রান্সিস, মকবুল আর হ্যারির হাত পেছনে দিকে বেঁধে ফেলল। লতাগাছ যে এত শক্ত হয়, ফ্রান্সিসের তা জানা ছিল না। বাঁধনটা যেন চামড়াটা কেটে বসে গেল।

এতক্ষণ বাক্স-প্যাঁটরা ভাঙা চলছিল। হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল গুহা থেকে এনে জড়ো করে রাখা হাতীর দাঁতগুলো ওপর। একজন ছুটে এসে সর্দারকে বোধহয় সেই কথাই জানাল। সর্দার সব হাতীর দাঁতগুলো নিতে হুকুম দিল। এমন কি মরা হাতী দু'টোর দাঁতও ছাড়ানো হল। বোঝা গেল—ওরাও হাতীর দাঁতের মূল্য জানে।

ফ্রান্সিসদের হাত বাঁধবার সঙ্গে-সঙ্গে কুলীদের হাতও বাঁধা হয়েছিল। এটা হ্যারির নজরে পড়ল একবার। হ্যারি মকবুলকে ডাকল—মকবুল।

—কি?

—আমাদের ভাগ্যে যা আছে হবে। তুমি ওদের সর্দারকে বুঝিয়ে বলো যে, কুলীদের ওপর কোন অত্যাচার না করে। ওদের তো কোন দোষ নেই।

মকবুল গালকাটা সর্দারকে মোরানদের ভাঙা ভাষায় কথাটা বলল। সর্দার এক মুহূর্ত হ্যারির দিকে তাকাল। তারপর কী একটা বলে উঠতেই কুলীদের হাতের বাঁধন কেটে দেওয়া হল। এবার গালকাটা সর্দার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে চলতে ইঙ্গিত করল।

পেছন থেকে কয়েকজন ফ্রান্সিসদের ধাক্কা দিল। সর্দার পাঁচ-ছয় জন সঙ্গী নিয়ে আগে-আগে চলল। তাদের পেছনে ফ্রান্সিসদের তিনজন। তাদের পেছনে অন্য সব মোরান যোদ্ধারা। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলা শুধু হল। যতক্ষণ বনজঙ্গলের ছায়ায়-ছায়ায় হেঁটেছে ওরা ততক্ষণ গরম লাগে নি, কিন্তু যখনই বন ছাড়িয়ে ফাঁকা-ফাঁকা মেঠো জায়গা দিয়ে হাঁটতে হয়েছে, তখনই অসহ্য গরমে ঘেমে উঠেছে ফ্রান্সিসরা। পথে দু'জায়গায় মাত্র থেমেছিল ওরা জল খাবার জন্যে। বিকেল নাগাদ ওরা সকলে মোরানদের গ্রামে এসে পেঁছাল। গোল-গোল পাতায় ছাওয়া বাড়ীগুলো। সামনে উঠোন—বেশ নিকোনো —পরিষ্কার। গ্রামের মধ্যস্থলে একটা উন্মুক্ত চত্বরে খুঁটির সঙ্গে ফ্রান্সিসদের তিনজনকে বেঁধে রাখা হল।

* * *

রাত হতেই শুরু হল জয়োল্লাস। ওদের ঘিরে মোরানদের নাচ শুরু হল। একজন তীক্ষ্নস্বরে কী গাইতে লাগল। বাকীরা সবাই নাচতে লাগল। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় জায়গাটা যেন আরো ভয়ানক হয়ে উঠল। সারারাত ধরে ফ্রান্সিসরা কেউ দু' চোখের পাতা এক করতে পারল না। শেষরাতের দিকে মোরানদের উল্লাসে একটু ভাটা পড়ল। একটু পরেই ভোর হল। সারারাতের অতিনিদ্রায় ফ্রান্সিসের একটু তন্দ্রা এসেছিল। সেই তন্দ্রাটুকুও ভেঙে গেল সর্দারের হাঁকডাকে। একটা কিছুর আয়োজন চলছে, এটা ফ্রান্সিস বুঝল। কিন্তু আয়োজনটা কীসের, সেটা তখনও বুঝতে পারল না।

একটু বেলা হতেই দেখা গেল, গাঁয়ের লোকেরা সেই চত্বরে এসে গোল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় একটা হাঁড়িমত বসালো। তার সামনে বালি দিয়ে সীমা টেনে একটা গোলমত করা হল। তার ওপর গাছের শুকনো ডাল বিছিয়ে দেওয়া হল। সেই গোলের একটা দিক শুধু খোলা রইল। এসব দেখে মকবুল আস্তে ডাকল—'ফ্রান্সিস !'

ফ্রান্সিস মুখ ঘুরিয়ে মকবুলের দিকে তাকাল। দেখল—ভয়ে মকবুলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, ওর সারা শরীর কাঁপছে। ফ্রান্সিস বলল··· কী হয়েছে মকবুল ?

মকবুল অগ্ররুদ্ধস্বরে বলল···'ফ্রান্সিস আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

ফ্রান্সিস কথাটা শুনে চমকে উঠল। তবু শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল—কী করে বুঝলে ?

—ঐ যে গোলমত জায়গাটা সাজাচ্ছে—ওখানে শুকনো ডাল গুলোতে ওরা আগুন দেবে। তারপর ঐ গোল জায়গাটায় ছেড়ে দেবে একটা বিষধর সাপ। গোলের যে দিকটা খোলা, সেইদিক দিয়ে সাপটা বেরোতে চেষ্টা করবে। আর সেখানে মাথা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে রাখা হবে আমাদের কাউকে। আগুনের বেড়াজাল থেকে বেরোতে না পেরে সাপটা ক্ষেপে উঠবে। তারপর খোলা দিকটায় শোয়ানো মাথায় ছোবল মারবে।

বিমূঢ় ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারল না। কী সাংঘাতিক ? সত্যিই একটু পরে গোল করে সাজানো-শুকনো ডালগুলোতে ওরা আগুন লাগিয়ে দিল। জোর ঢাক বেজে উঠল। ঝুড়ি থেকে একটা সাপ বের করে ছেড়ে দেওয়া হলো সেই গোল জায়গাটায়। সাপটা যতবার বেরোবার চেষ্টা করলো, ততবারই আগুনের তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ফুঁসতে লাগল।

এবার দু'তিনজন লোক মকবুলের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর মকবুলকে টানতে লাগল। মকবুল বুঝল নিশ্চিত মৃত্যু। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও যেন হঠাৎ মনোবল ফিরে পেল। চীৎকার করে বলে উঠল—ফ্রান্সিস এরা নানাভাবে কষ্ট দিয়ে মানুষ মারে। আমার মৃত্যু অবধারিত। তাই বলছি—তোমরা সুযোগমাত্র পালিও।

—কিন্তু কী করে? হতাশার ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস বলল। লোকগুলো মকবুলকে ধরে টানাহ্যাচঁড়া শুরু করল। মকবুল দ্রুত বলে যেতে লাগল—'এরা বুনো হাতির দঙ্গলে মানুষ ছুঁড়ে দিয়ে মারে, কুমীরভরা নদীতে মানুষকে জোর করে ঠেলে দেয়। আর একটা খেলা খুব প্রিয়। সর্দার একটা তীর ছোঁড়ে। তারপর যাকে মারবে, তাকে বলা হয় ছুটে গিয়ে তীরটা খুঁজে বের করতে। সে ছুটতে শুরু করলেই এদের দলের একজন তাকে ধরতে ছোটে। যদি লোকটা তাকে ধরবার আগেই সে তীরটা খুঁজে পেয়ে যায়, তাহ'লে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়—নইলে মৃত্যু।' মকবুল হাঁপাতে লাগল। লোকগুলো মকবুলকে সজোরে টানতে লাগল। মকবুল গায়ের সমস্ত শক্তিতে ফ্রান্সিসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল—'যদি তীর খোঁজার খেলা হয়—তাহ'লে তীর খোঁজার জন্য দাঁড়িও না। প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যেও। এছাড়া এদের কাছ থেকে বাঁচবার আর কোন পথ নেই। এদের কোনদিন বিশ্বাস করো না।'

মকবুল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাপটির দিকে।

এবার লোকগুলো মকবুলের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতে লাগল। মকবুল আর বাধা দিল না। ওদের নির্দেশমতই চলল গোল জায়গাটার দিকে। গোল জায়গাটার যেদিকটা ফাঁকা সেইখানে মকবুলকে ঠেলে হাঁটু গেড়ে বসানো হল। তারপর জোর করে ওর মাথাটা নুইয়ে দেওয়া হলো। মকবুল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাপটার দিকে। পালাতে গিয়ে বারবার আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে-খেয়ে সাপটা তখন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মকবুলের মাথাটা সামনে রেখে ফুঁসে উঠে ছোবল বসাল। চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো লোকেরা চীৎকার করে উঠল। মকবুল মাটিতে এলিয়ে পড়ল। ওর সারা মুখটা কালচে হয়ে উঠল। দু'একবার এপাশ-ওপাশ করতে-করতে স্থির হয়ে গেল মকবুলের শরীরটা। উল্লাসে মোরানরা চীৎকার করে উঠল। ঢাক বেজে উঠল।

ফ্রান্সিস অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। কত সুখ-দুঃখের সঙ্গী মকবুল। এমনি করে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। চোখ ফেটে জল এল ফ্রান্সিসের। কিন্তু কাঁদতে পারল না। ঘটনার ভয়াবহতা তাকে কিছুক্ষণের মধ্যে বিমূঢ় করে দিল। পরক্ষণেই দৃঢ় হয়ে উঠল ফ্রান্সিস। যেমন করেই হোক এর শোধ তুলতেই হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল —'হ্যারি।'

হ্যারি মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হয়তো যা ঘটে গেল, সেটা আন্দাজেই বোঝবার চেষ্টা করছে। তাকিয়ে দেখতে পারেনি। আস্তে-আস্তে মাথা তুলে হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি আমাদের ভাগ্যে কী আছে, জানি না। যা-ই ভাগ্যে থাকুক এবার হাতদু'টো খোলা পেলে এর প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে—মনে থাকে যেন।

হ্যারি কোন কথা বলল না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আবার মাথা নীচু করে নিজের ভাবনায় ডুবে গেল।

বেলা বাড়তে লাগল। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় ওরা দাঁড়িয়ে রইল। গতকাল দুপুরে আধপেটা খাওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে একটা দানাও পেটে পড়ে নি। তার ওপর সারারাত ঘুম হয় নি। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল—তবু ফ্রান্সিস জল খেতে চাইল না। হ্যারি জল খেতে চেয়েছিল। ফ্রান্সিস রেগে-ফুঁসে উঠেছিল—'হ্যারি- জল না খেতে পেয়ে যদি মরেও যাই, কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এদের কাছ থেকে এক ফোঁটা জলও খেতে চাই না।' ওরা হ্যারির জন্য জল নিয়ে এল। কিন্তু হ্যারি মাথা নেড়ে জল খেতে অস্বীকার করল।

সূর্য তখন মাথার ওপরে—যেন আগুন ছড়াচ্ছে। গালকাটা সর্দার দু'জন সঙ্গী নিয়ে ওদের কাছে এল। সকলেরই পরনে যুদ্ধের সাজ। কোমরে লম্বাটে দা, একহাতে ধনুক, অন্য হাতে বর্শা। কোমরে জলের থলি আর চকমকি পাথর। সর্দার এগিয়ে এসে কী একটা বলল। একজন লোক এসে ফ্রান্সিস আর হ্যারির হাতের বাঁধন খুলে দিল। সর্দার কী একটা চীৎকার করে হুকুম করল। সর্দারের দু'তিন-জন সঙ্গী ফ্রান্সিসের পিঠে ধাক্কা দিয়ে চলতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে চলল। সকলের সামনে গালকাটা সর্দার।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকামত জায়গায় সবাই এসে দাঁড়াল। সর্দারের হাতে তীর-ধনুক ছিল না। সে একজনের হাত থেকে তীর নিয়ে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের বোঝাতে লাগল, কী করতে হবে ওদের। মকবুলের কথা ফ্রান্সিসের মনে পড়ল। এটা সেই তীর খুঁজে বার করার খেলা। এই শেষ সুযোগ—পালাবার একমাত্র উপায়—ফ্রান্সিস নিজের মনকে বোঝাল। খুব মৃদুস্বরে লক্ষ্য করে বলল—আমি যা-যা বলবো, মন দিয়ে শুনে সেই মত কাজ করবে। ফ্রান্সিস সর্দারের দিকে এবার মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল যে, সর্দার যা বলছে, সে তা বুঝতে পেরেছে। তারপরে সর্দারকে ইঙ্গিতে বোঝাল যে, দু'জনকেই একসঙ্গে ছুটতে দেওয়া হোক। সর্দার কী ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সর্দারের হুকুমে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে জামা-জুতো খুলে ফেলতে হল। এবার ধনুকে তীর লাগিয়ে যেদিকে তাক করল, সেদিকে বেশ কিছু দূরে একটা টিলা রয়েছে, দেখা গেল। ওদিকে যেতে হলে কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। খালি পায়ে যে কী অবস্থা হবে, ফ্রান্সিস সেটা সহজেই অনুমান করতে পারল। যাতে কাঁটাগাছ ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বেশী জোরে ছুটতে না পারে, তার জন্যই জুতো খুলতে হুকুম দেওয়া হল। সর্দার আর সঙ্গীদের পায়ে কিন্তু চামড়া জড়ানো লতাপাতা দিয়ে বাঁধা জুতোর মত

জিনিস পরা। ওদের পক্ষে ছুটতে ততো অসুবিধে হবে না।

সর্দার টিলার দিকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা কোথায় পড়বে ফ্রান্সিস মোটামুটি আন্দাজ করে নিল। ফ্রান্সিস ছুটবে কিনা ভাবছে—সর্দার ওর গায়ে ধনুকের খোঁচা দিল। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে হ্যারিকে বলে উঠল—'টিলার তলায়'।

তারপর ছুটতে আরম্ভ করল। হ্যারি বুঝল, টিলার তলায় ফ্রান্সিস অপেক্ষা করবে।

একটু পরে সর্দার একজনকে ইঙ্গিত করতেই সে ফ্রান্সিসকে ধরতে ছুটল। সর্দার আবার তীর ছুঁড়ল। তীরটা বাঁদিক ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। আগের তীরটা গিয়েছিল টিলার দিকে। হ্যারি ছুটতে শুরু করল।

এদিকে ফ্রান্সিস কিছুদূরে ছুটে আসতেই বুঝতে পারল, কাঁটাগাছে ঝোপঝাড়ে ওর দুটো পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কিন্তু জীবন তার চাইতে মূল্যবান। তাই প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল টিলা লক্ষ্য করে। হঠাৎ নজরে পড়ল, তীরটা বুনো ঝোপে আটকে আছে। কিন্তু ফ্রান্সিস মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়ালো না। সমান বেগে ছুটতে লাগল। টিলার তলায় পেঁছে ফ্রান্সিস একটা পাথরে বসে হাঁপাতে লাগল। একটু পরে হ্যারির অস্পষ্ট গলা শুনতে পেল। হ্যারি ডাকছে—'ফ্রান্সিস'।

লোকটা হঠাৎ ফ্রান্সিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—'এই যে আমি এখানে।'

হ্যারি হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বলল—'তুমি দৌড় শুরু করার একটু পরেই একজনকে পাঠানো হয়েছে তোমার সন্ধানে—হয়তো বা আমার পেছনে কাউকে পাঠানো হয়েছে। নষ্ট করার সময় নেই—দৌড়াও।'

ওরা ছুটতে শুরু করবে, এমন সময় পেছনের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সর্দারের ছ'জন সঙ্গীর মধ্যে একজন। সেও হাঁপাচ্ছে, ফ্রান্সিস বলে উঠল—'হ্যারি, বাঁদিকের পাথরের আড়ালে যাও—ওখান দিয়েই বেরুবো আমরা।' লোকটা তখন কোমরে গোঁজা লম্বাটে দা-টা বের করে ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হ্যারি একলাফে পাথরের আড়ালে চলে গেল। তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। এদিকে ফ্রান্সিস এক দৃষ্টিতে লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার দশাসই চেহারা, তার ওপর হাতে দা। ফ্রান্সিস নিরস্ত্র। সে পালাবার ফিকির খুঁজতে লাগল। লোকটা হঠাৎ ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস খুব দ্রুত উবু হয়ে বসে পড়ল, লোকটা তাল সামলাতে পারল না। উবু হয়ে পাথরের উপর গিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস সুযোগ বুঝে ছুটতে লাগালো। লোকটা মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত বুলাতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস অনেক দূরে চলে গেছে। লোকটা ওদের লক্ষ্য করে দা হাতে ছুটতে লাগল।

হ্যারি যেদিকে ছুটে গিয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সিস ছুটতে শুরু করল। হঠাৎ ঝাঁকড়া-পাতা গাছের তলা থেকে হ্যারির চাপাস্বরে ডাক শুনতে পেল। গাছটার তলায় গিয়ে দেখল, হ্যারি ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে দৌড়াবার ইঙ্গিত করল। আবার দু'জনের ছুট শুরু হলো। বেশ কিছুটা দৌড়োবার পর ফ্রান্সিস কান পেতে রইল, যদি পেছনে কোন শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কোন শব্দ তো নেই। শুধু বাঁদর আর পাখির কিচিরমিচির। পেছনের জঙ্গলটা ভাল করে দেখার জন্যে সামনেই যে পাথরের ঢিবিটা ছিল, হ্যারি সেটাতে গিয়ে উঠল। তার-পর পেছনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল—যদি অনুসরণকারী কাউকে নজরে পড়ে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ওদের হাতে তীর-ধনুক আছে। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—'হ্যারি, শীগ্‌গির নেমে এসো।'

হ্যারি নামবার জন্যে মাত্র একটা পা তুলেছে, পেছনের জঙ্গল থেকে একটা তীর এসে হ্যারির পায়ে বিঁধল। হ্যারি একটু দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পাথরের গা ঘেঁসে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস পাগলের মতো ছুটে গিয়ে প্রথমে এক হ্যাঁচকা টানে তীরটা খুলে ফেলল। তারপর মাথাটা কোলে তুলে নিল। হ্যারি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—ফ্রান্সিস, শীগ্‌গি পালাও।

—না, তোমাকে ছেড়ে যাবো না। এবার ফ্রান্সিসের চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

হ্যারি বলে উঠল—পাগলামি করো না ফ্রান্সিস- শীগগির পালাও। তোমার কাছে এখন এক সেকেণ্ডের দামও অনেক। পালাও শীগগির।

ফ্রান্সিস তবুও অনড় হয়ে বসে রইল। হ্যারির তখন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। অনেক কষ্টে বলতে লাগল—আমি বাঁচবো না—আমার জন্যে ভেবো না। তুমি পালাও।

—না। ফ্রান্সিস কাঁদতে-কাঁদতে বলল—আমি তোমাকে না নিয়ে যাবোই না।

হ্যারি শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে আস্তে-আস্তে উঠে ফ্রান্সিসের গালে একটা চড় মারল। উপবাসে অনিদ্রায় তৃষ্ণায় কাতর ফ্রান্সিসের শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল।

—শীগগির পালাও—হ্যারি ক্লান্তস্বরে বলল। হঠাৎ পেছনের জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস আর বসল না। হ্যারির মাথাটা কোল থেকে মাটির ওপর নামিয়ে দিল! তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর পেছনে শুনল একজন লোকের হর্ষোল্লাস। নিশ্চয়ই হ্যারিকে দেখতে পেয়েছে।

ফ্রান্সিস প্রাণপণে ছুটতে লাগল। যতবার হ্যারির কথা মনে পড়েছে, ততবারই চোখে জল এসেছে। দু'গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। বারবার চোখ মুছতে লাগল হাতের উলটো পিঠ দিয়ে। কিন্তু চোখের জল বাধা মানছে না। চোখের দৃষ্টি বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে। চোখ মুছে নিতে হচ্ছে বারবার। ফ্রান্সিস মনে-মনে নিজের ওপরেই দোষারোপ করতে লাগল। কেন সে হ্যারিকে পথের ঢিবিটায় উঠতে বাধা দিল না। অনু-সরণকারীর হাতে তীর ধনুক আছে, এই কথাটা মনে করতে তার এত সময় লাগল কেন?

একটু সাবধান হলে হ্যারিকে এভাবে প্রাণ দিতে হত না। দু'দুজন সঙ্গীকে চিরদিনের জন্যে হারানোর বেদনা তার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করল। তবু ভীত হল না ফ্রান্সিস। বরং প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠল তার মন। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। হ্যারি আর ফিরবে না। মকবুলও নয়। তবু তাদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে। ফ্রান্সিস চোখ মুছল। না, কান্না নয়। বজ্রকঠিন হতে হবে। সংকল্পে দৃঢ় থাকতে হবে।

ফ্রান্সিস ছুটে চলল। এখন ভীষণ সাবধান হতে হবে। সজাগ থাকতে হবে। কোন শব্দই যেন কান এড়িয়ে না যায়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। নাক-চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুনের হালকা বেরোচ্ছে। একটু জল চাই। কপাল ভালো ফ্রান্সিসের। হঠাৎ একটা ঝরণার দেখা পেল। একটু জল খাওয়ার সময় হয়তো পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস জল খেতে হাঁটু গেড়ে বসল। কিন্তু জল খাওয়া হলো না। পেছনে শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল।

এবার সামনেই পড়ল কয়েকটা বড়-বড় পাথরের টিলা। ফ্রান্সিস ছুটতে-ছুটতে টিলার ওপাশে চলে গেলো। পেছনেই একটা পাহাড়ী নদী। বেশী বড় নয়, কিন্তু তীব্র স্রোত। ফ্রান্সিস নদীর কাছে একটা বড় পাথরের আড়ালে বসে হাঁপাতে লাগল। একটু জিরিয়ে নিয়ে আঁজলা ভরে নদীর জল খেলো। তারপরে টিলার পাথরগুলোর আড়ালে-আড়ালে ওপরে উঠল। বেলা পড়ে এসেছে—তবু পাথরগুলো আগুনের মত গরম। একটা পাথরের গায়ে-গায়ে লেগে, আড়াল থেকে আস্তে-আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াল। দেখল, বনজঙ্গলের মধ্যে থেকে অনুসরণকারীদের মধ্যে একজন মাথা নীচু করে কী যেন দেখতে-দেখতে এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস বুঝল, এদের চোখে ধুলো দেওয়া প্রায় অসম্ভব। বনজঙ্গলের নাড়ী-নক্ষত্র ওদের জানা। ছুটে আসার সময় ফ্রান্সিসের পায়ের চাপে যে গাছগুলোর ডালডালা ভেঙেছে, লোকটা তাই দেখে ঠিক ফ্রান্সিসের পালাবার পথ চিনে নিচ্ছে। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল, এই এক মস্ত সুযোগ। একজনের সঙ্গে তবু লড়া যাবে। কিন্তু গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীরা এসে পড়লে ভীষণ বিপদ। মৃত্যু অনিবার্য। ফ্রান্সিস একটা ফন্দী বার করল।

টিলাটার নীচেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বালি রয়েছে। তারই একধারে ফণীমনসা গাছের মত এক ধরনের গাছ। হাতী শিকার করতে যাওয়ার সময় ফ্রান্সিস এ ধরণের গাছ দেখেছে। এই গাছটার মোটা-মোটা পাতা ভেঙে দিলেই টপ্-টপ্ করে ঘন সাদা দুধের মত রস পড়তে থাকে। ফ্রান্সিস কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে একটা গাছের নীচে রাখলে। তারপর গাছটার দু'টো পাতা ভেঙে দিল। টপ্-টপ্ করে শুকনো পাতাগুলোর ওপর রস পড়তে লাগল আর বেশ শব্দ হতে লাগল। শব্দ শুনলেই মনে হবে কেউ যেন শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হাঁটছে। এবার ফ্রান্সিস একটা বড় গোছের পাথর কাঁধের ওপর তুলে ধরে রাখল। ওর এক মাত্র অস্ত্র। তারপর দাঁড়াল এসে সেই গাছটার ঠিক উল্টোদিকে একটা পাথরের আড়ালে। আশঙ্কা উত্তেজনায় ফ্রান্সিসের বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। সময় যেন আর কাটে না।

এক সময় দেখা গেল, সেই লোকটা খুব সন্তর্পণে বালির ওপর পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ লোকটা ফ্রান্সিসের দিকে পেছন ফিরে উল্টোমুখো হয়ে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই শুকনো পাতায় গাছের রস পড়ার শব্দ কানে গেছে ওর। ফ্রান্সিস এই সুযোগের প্রতী-

ক্ষাতেই ছিল। লোকটা চালাকি ধ'রে ফেলার আগেই কাজ সারতে হবে। ফ্রান্সিস আর দেরী করল না। দুই লাফে এগিয়ে এসে পাথরটা দু'হাতে তুলে প্রচণ্ড বেগে ঘা বসাল লোকটার মাথায়। লোকটা এই হঠাৎ আক্রমণে একদিকে যেমন হকচকিয়ে গেল, তেমনি মাথায় জোর ঘা লাগতে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্তও দেরী করল না। ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিল। লোকটাও উঠে ঘুরে বসেছে তখন। ফ্রান্সিসও সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার বুক লক্ষ্য করে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বর্শা চালাল। 'অক্'—করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল লোকটার মুখ থেকে। তার-পরেই লোকটা চিত হয়ে বালির ওপর পড়ে গেল। বার কয়েক ওঠবার চেষ্টা করল। তার-পর স্থির হয়ে গেল। হ্যারি আর মকবুলের মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নিতে পেরেছে, এই ভেবে ফ্রান্সিস উল্লাসে চীৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব বুঝে চুপ করে রইল। হাঁপাতে-হাঁপাতে কপালের ঘাম মুছল। তারপর মৃত লোকটির কোমর থেকে লম্বাটে দা'টা নিল, বুক থেকে টেনে বর্শাটা খুলে নিল। ধনুক নিল—তীরগুলো নিল। জলের থলি আর চকমকি পাথর নিয়ে কোমরে। গুঁজল এবার জুতো। বুনো লতাপাতা দিয়ে বাঁধা চামড়ার জুতোর মত জিনিসটা পায়ে পরে নিল। যখন নীচু হয়ে জুতো পরছে, তখনই বেলা শেষের একটা লম্বাটে ছায়া নড়ে উঠল। চকিতে মুখ তুলে তাকাতেই দেখল—আর একটা লোক। গালকাটা সর্দারের আর একটা সঙ্গী। লোকটা দাঁত বের করে হাসল। বীভৎস সেই হাসি। প্রকাণ্ড লোকটা কোমর থেকে লম্বাটে দা'টা খুলে নিল।

ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে লোকটার পেটে বর্শাটি আমূল বিঁধিয়ে দিল।

শুরু হ'ল দা নিয়ে যুদ্ধ। দা'য়ে-দায়ে যখন ঘা লাগছে, ফ্রান্সিসের হাতটা ঝন্ঝন্ করে উঠছে। হাত অবশ হয়ে আসছে। উপবাসে অনিদ্রায় শরীরের যা অবস্থা, তাতে সামনা-সামনি-লড়াইয়ে এর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব। অন্য পথ নিতে হবে। হঠাৎ ফ্রান্সিস নীচু হয়ে এক মুঠো বালি তুলে নিল। আর লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুঁড়ে মারল লোকটার চোখে। লোকটার মুখের বীভৎস হাসি মিলিয়ে গেল। চোখ-মুখ কুঁচকে লোকটা এলোপাতাড়ি দা ঘোরাতে লাগল। । ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে লোকটার পেটে বর্শাটা আমূল বিঁধিয়ে দিল। লোকটা পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল। টেনে বর্শাটা খোল-বার চেষ্টা করতে লাগল। পারল না। কাৎ হয়ে বালির ওপর শুয়ে শুয়ে গোঙাতে লাগল। লোকটার পেট থেকে বর্শাটা খুলে নিয়ে ফ্রান্সিস এগিয়ে চলল নদীটার দিকে। খুব সাব-ধানে নদীতে নামল। নদীতে জল বেশী নয়, তীব্র স্রোত। তার ওপর পাথরগুলো

শ্যাওলা ধরা। পা টিপে-টিপে সাবধানে নদী পার হলো। তার ওপারে উঠেই দেখতে পেল, বনের নীচে অন্ধকার জমে উঠেছে। অন্ধকারে ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এবার রাত্রির আশ্রয় খুঁজতে হয়। একটু এগিয়েই বনের মধ্যে কয়েকটা বিরাট আকারের গাছ জড়াজড়ি করে আছে দেখা গেল। তারই মধ্যে একটা গাছে ফ্রান্সিস উঠল। অনেকটা ওপরে একটা মোটা ডাল খুঁজে নিয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। শরীর যেন আর চলতে চাইছে না। মাথাটা খালি-খালি লাগছে। একটুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। চোখ খুলতেই নজরে পড়ল গাছটায় বেশ কিছু ফল ঝুলছে। পাকা হলুদ রঙের ফলও রয়েছে। কিন্তু গাছটা কী গাছ—ফলগুলোই বা খাওয়া যায় কি না—এসব কিছুই জানা নেই। খিদের জ্বালায় ফ্রান্সিস ডাল বেয়ে-বেয়ে মগডালে উঠে কয়েকটা পাকা ফল পেড়ে নিয়ে এল। দা' দিয়ে কাটল। মুখ দিয়ে একবার চিবোতেই থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল। কী অসম্ভব তেতো! ফলগুলো ফেলে দিল।

রাত গভীর হ'ল। দুর্বল-ক্ষুধার্ত শরীরে ঘুমও আসতে চায় না। হ্যারি আর মকবুলের কথা মনে পড়ল। ফ্রান্সিসের চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো। কোথায় রইলো বন্ধুরা, ওঙ্গালির বাজার আর হীরের পাহাড়। এই গভীর রাতে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বন্য পরিবেশে ও গাছের ডালে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে।

হঠাৎ নদীর ধার থেকে ভেসে এল কাদের চড়া সুরের কান্না। নিশ্চয়ই গালকাটা সর্দারের দলের লোকদের কান্না। তা'হলে সর্দার তার সঙ্গীদের নিয়ে নদী পর্যন্ত এসে গেছে। তারাই তাদের দুই মৃত সঙ্গীদের জন্যে কাঁদছে। মৃতদেহ দুটো বোধহয় নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। তার আগে এই কান্না। সারারাত চড়া সুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদল ওরা। ফ্রান্সিসের যতবার তন্দ্রা ভেঙে গেছে, ততবারই শুনতে পেয়েছে এই কান্না। হ্যারি আর মকবুলের জন্যে ফ্রান্সিসের মনেও কম বেদনা জমে নেই। ওরা তবু কাঁদছে—মনের ব্যথা-বেদনার ভার কমছে তা'তে। কিন্তু ফ্রান্সিস? কাঁদতেও পর্যন্ত পারছে না।

ফ্রান্সিস চোখ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছিল। ঘুম ভাঙতেই দেখল, ভোর হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এল। তারপর ছুটতে শুরু করল। ছুট-ছুট। সর্দারের দলের সবাই এসে গেছে। কাজেই এবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। ছুট—ছুট। পাগলের মত ছুটতে লাগল ফ্রান্সিস।

ছুটতে-ছুটতে একটা ফাঁকা মাঠের মত জায়গায় এসে পৌঁছল। একটা মাটির ঢিবির ওপর ব'সে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা সাপ ঢিবি থেকে বেরিয়ে এল। এই সাপটাকে মেরে খেলে কেমন হয়? ভাবতেই ফ্রান্সিসের ক্ষিদে আরো বেড়ে গেল। দা'য়ের এককোপে সাপটার গলার কাছ থেকে দু'টুকরো করে ফেলল। তারপর মাথাটা ফেলে দিয়ে দা' দিয়ে বাকীটুকুর চামড়া ছাড়িয়ে নিল। এবার টুকরো-টুকরো করে কেটে মুখে ফেলে চিবোতে লাগল। কাঁচা-কাঁচা স্বাদটুকু বাদ দিলে খেতে মন্দ লাগল না। খাওয়া শেষ হলে একটা ঢেঁকুর তুলল। যা হোক একটা কিছু তো পেটে পড়ল। তিন দিন হ'তে চলল—চান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই—শরীর যেন আর চলতে চাইতে না। ছুটে আসতে-আসতে পথে একটু-একটু ক'রে জল খেয়েছে। জলের থলি খালি। জল

খাওয়া হ'ল না।

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই দেখা গেল,একটা বাচ্চা হরিণ বেড়াচ্ছে। এই হরিণের বাচ্চাটাকেই মারা যাক। ফ্রান্সিস বর্শাটা ভালো ক'রে বাগিয়ে ধ'রে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটু গেড়ে চলতে লাগল। হরিণটার খুব কাছে এসে পড়ল ফ্রান্সিস। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েই বর্শাটা ছুঁড়ল। কিন্তু ক্ষুধার ক্লান্তিতে হাতটা কেঁপে গেল। বর্শাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই। হরিণটা এক ছুটে পালিয়ে গেল।

বর্শাটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হরিণ টাকে খুঁজতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঠিক তখনই নজরে পড়ল একটা ডোবার মতো জলাশয়। ফ্রান্সিস নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দু'তিন বার চোখটা ঘষল। নাঃ—মিথ্যা নয়। সত্যিই একটা জলাশয়। ফ্রান্সিস একটু অস্পষ্ট চীৎকার করে সোজা ছুটল জলাশয়টার দিকে। তারপর সারা গায়ে জল ছিটোতে লাগল। শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। থলিটাতে জল ভরে নিল। হঠাৎ লোকজনের কথাবার্তা কানে যেতেই তাড়াতাড়ি জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল একটা গ্রাম। খড়ে ছাওয়া বাড়ি-ঘর। পরিস্কার তকতক করছে উঠোন। ফ্রান্সিস আরো ভালো ক'রে দেখতে চাইল। তাই নীচু হ'য়ে কিছুটা এগিয়ে এসে একটা বুনো খেজুর গাছের আড়ালে বসে দেখতে লাগল। কোন্ উপজাতি এরা, ফ্রান্সিস বুঝল না। তখন গ্রামের লোকজনের দুপুরের খাওয়া চলছে। ফ্রান্সিসের ক্ষিদে দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সন্ধ্যের মধ্যেই গ্রামবাসীরা রাত্রির খাওয়া খেয়ে নিল। তারপর সবাই গ্রামটার মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে জমায়েত হ'ল। চাঁদের ম্লান আলোর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল সবাই। ঢোলের মত মাটিতে বসানো একটা বাজনা বাজিয়ে নাচ আর গান শুরু হ'ল। একজন মিহি সুরে গান ধরল। সে থামলে যারা নাচছিল, তারা সেই সুরে গান গাইতে লাগল। সেই সঙ্গে চলল নাচ। অনেক রাত অব্দি হল্লা চলল। তারপর তারা কেউ-কেউ ঘুমুতে ঘরে গেল—কেউ-কেউ বা গরমের জন্যে তালপাতার চ্যাটাই পেতে বাইরেই শুলো।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে গাছের আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল। তারপর পায়ে-পায়ে এগোলো সামনেই যে বাড়িটা পড়ল তার দিকে। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। তারপর রান্না করা খাবার-দাবার যা অবশিষ্ট ছিল, সব নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠিক তখনই দেখল, একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে চ্যাটাইয়ের বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। চাঁদের ম্লান আলোয় ছেলেটি অবাক্ চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বুঝলো—ছেলেটি তাকে নিশ্চয়ই খাবার চুরি করতে দেখেছে। কী আর করা যায়। ফ্রান্সিস মুখের ওপর আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল। ছেলেটি কিন্তু এবার ভয় পেল। পাশে শোয়া বাবাকে ডাকতে লাগল। কী যেন বারবার বলতে লাগল। ওর বাবা বিরক্তির ধমক দিতে। পাশ ফিরে শুল। ছেলেটিও আর কোন কথা না বলে শুয়ে পড়ল।

গাছের আড়ালে বসে ফ্রান্সিস গোগ্রাসে খাবার গুলো গিলতে লাগল। সেই খাবারের কীই বা গন্ধ, কীই বা স্বাদ—কিছুই বুঝে ওঠার মত মনের অবস্থা ফ্রান্সিসের ছিল না। শুধু

খাবারটা গোগ্রাসে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে ফ্রান্সিস সেই জলাশয়টার ধারে গেল। পেট ভরে জল খেয়ে বুনো খেজুর গাছের আড়ালে ফিরে এসে বসল। ঘুম পাচ্ছে। ফ্রান্সিস কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এল। সেগুলো পেতে বিছানার মত করল। তারপর সটান শুয়ে পড়ল। অসহ্য ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়ল। সব দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

পাখি-পাখালির ডাকে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল অনুসরণকারী গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীদের কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। তারপর চারিদিকে সাবধানে তাকিয়ে দেখে নিল। না! কেউ নজরে পড়ছে না। ফ্রান্সিস নিশ্চিত হয়ে গাছে ঠেস দিয়ে বসল। গ্রামটার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো! কাল রাত্তিরে কত নাচগান বাজনা চলেছিল। এই সকালবেলাতেই কোথায় গেল সব। এখন গ্রামটাকে পরিত্যক্ত শ্মশানের মত মনে হচ্ছে।

একটু বেলা হতেই দেখা গেল গ্রামের শেষ প্রান্তের দিক থেকে একদল অশ্বারোহী লোক ছুটে আসছে। সকালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে তাদের হাতের তরোয়াল। তাদের পরনে আরবীর পোশাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের আসার কারণটা স্পষ্ট হল। ঘরের দরজা ভেঙে তারা সবাইকে টেনে-টেনে বের করতে লাগল। কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলে তরোয়ালের ঘায়ে তাকে মেরে ফেলতে লাগল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল মকবুলের কথা। মকবুল বলেছিল, কী করে একদল লোক দেশের নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে জাহাজে করে ইউরোপে-আমেরিকায় ক্রীতদাস বেচা-কেনার বাজারে নিয়ে যায়। কী অমানুষিক অত্যাচার! ওরা যাদের ধরেছিল, তাদেরই গলায় তিনকোণা গাছের ডালের একটা বেড়ীর মত পরিয়ে দিচ্ছিল, তারপর বেড়ীগুলো দড়ি দিয়ে পরপর বেঁধে দু'তিনজন অশ্বারোহী টেনে নিয়ে যেতে লাগল। নিশ্চয়ই এখান থেকে হাঁটিয়ে ওদের জাহাজে নিয়ে গিয়ে তোলা হবে। তারপর চালান দেওয়া হবে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজর পড়ল সর্দারের ওপর। আরে! এটাই তো সেই লোক। বাঁ চোখটা কাপড়ের ফালিতে ঢাকা—এক চোখ কাণা লোকটা। তেকরুর বন্দরের সরাইখানায় এই লোকটাই তো মকবুলের দিকে তেড়ে গিয়েছিল। সেদিন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল। আজকে এই সর্দারের দফা-রফা করতেই হবে। রাগে ফ্রান্সিস কাঁপতে লাগল। ইতিমধ্যে অনেক বাড়ীঘরেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকালের আকাশ ভরে উঠেছে ভয়ার্ত মানুষদের কান্না আর চীৎকারে। কী নির্মম এই ক্রীতদাসের ব্যবসায়ীরা। গত রাত্রের সেই ছেলেটা ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। অশ্বারোহী লোকটার ভ্রূক্ষেপ নেই। গলায় বাঁধা দড়িটা টেনে নিয়ে চলেছে।

ফ্রান্সিসের আর সহ্য হল না। গাছের আড়াল থেকে একলাফে বেরিয়ে এসে বর্শা হাতে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল কানা সর্দারের দিকে। কেউ কিছু বোঝবার আগেই ফ্রান্সিস ঘোড়ায় বসা সর্দারের বুকে বর্শাটা বিঁধিয়ে দিল। সর্দার ঘোড়া থেকে উল্টে মাটিতে পড়ে গেল। সর্দারের ধারে-কাছে যারা ছিল, তারা হইচই করে উঠল। তারপর ফ্রান্সিসের পেছনে ছুটল। ফ্রান্সিস প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে একটা জলপ্রপাতের কাছে এল। তারপর এক মুহূর্ত দেরী না করে জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিল। জলের টানে কোথায় ভেসে গেল—অশ্বারোহী দস্যুর দল তার কোনো হদিসই করতে পারল না।

ফ্রান্সিসের মনে হলো জলের টানটা কমেছে। জল থেকে মুখ তুলে জলপ্রপাতটা আর দেখতে পেল না। অনেকটা দূরেই চলে এসেছে। এবার পাহাড়ী নদীটার ধারে এসে পাড়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে পারছে না। হঠাৎ পারের দিক থেকে একটা বাড়িয়ে ধরা হাত দেখে ফ্রান্সিস চমকে উঠল। ও—সেই গত রাত্রিতে দেখা ছেলেটা হাত বাড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস ছেলেটার হাত ধরল। তারপর বেশ কষ্ট করেই নদীর পাড়ে উঠে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

*   *   *

কতক্ষণ শুয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ কে যেন গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। সেই ছেলেটি। সে আস্তে উঠে বসল। দেখল, ছেলেটির হাতে ধরা একটা পাতায় কী সব খাবার। একটা মাছও সেদ্ধও রয়েছে তার মধ্যে। ফ্রান্সিস পাতাটা টেনে নিল। তারপর খেতে লাগল আরাম করে। ছেলেটি মুখ দেখে মনে হলো, ছেলেটি খুব খুশী হয়েছে। কেউ কারো কথা বুঝল না। তাই দু'জনেই তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে।

একটু সুস্থ হয়ে হাঁটতে লাগল। ছেলেটিও তার সঙ্গে-সঙ্গে চলল। কিছুদূরে যাওয়ার পর একটা পাহাড়ী জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। সেখান থেকে অনেক দূরে ছেলে-টির গ্রাম দেখা গেল। গ্রামের কিছু-কিছু ঘরবাড়ি অর্ধদগ্ধ হয়ে পড়ে আছে। ছেলেটি কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে বলল—আমি গ্রামে যাবো। ফ্রান্সিস আপত্তি করল। কে জানে, আরবীয় দস্যুরা এখনও ওৎ পেতে আছে কিনা। কিন্তু ছেলেটি কোন কথাই শুনল না। আস্তে-আস্তে পা বাড়াল নিজের গ্রামের দিকে। কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল ছেলেটার ওপর। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল।

ছেলেটি চলে যেতে ফ্রান্সিস আবার একা হয়ে গেল। কেউ কারো কথা না বুঝলেও ছেলেটি সঙ্গী তো ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ফ্রান্সিসের। হঠাৎ মনে পড়ল—অনুসরণকারী গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীদের কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত পা চালাল।

এদিকে ফ্রান্সিসকে অনুসরণকারী দলের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে গেল। এক-জন আর বেশী দূর যেতে আপত্তি করল। সে বার-বার বলতে লাগল—নিজেদের গ্রাম থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি। একটা লোকের জন্য আমাদের এই ছুটোছুটি করা অর্থ-হীন। সে শুধু আপত্তিই করল না। একেবারে বেঁকে বসল। সর্দার বোঝাবার চেষ্টা করল! কিন্তু লোকটা শুনল না। সে উল্টোমুখে নিজেদের গ্রামের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করল। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারল না। সর্দার ছুটে এসে তার পিঠে বর্শা বসিয়ে দিল। লোকটা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দু' একবার কাতর আর্তনাদ করল। তারপর মারা গেল। রইল সর্দার আর তিনজন। তারা এবার ফ্রান্সিসের যাওয়ার পথের নিশানা খুঁজতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে ছুটতে লাগল। প্রচন্ড গরমে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন। মাথার ওপরে সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। ফ্রান্সিসের মাথা ঘুরতে লাগল। চোখের সামনে সবকিছু যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস এ-সময় যাচ্ছিল হলুদ নুড়ি ছড়ানো একটা পাহাড়ে জায়গা দিয়ে টলতে-

টলতে। নুড়িগুলো ওপর প্রায় পড়ে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল। নুড়িগুলোর গায়ে-গায়ে জড়িয়ে আছে, কত বিচিত্র রঙের কত রকম সাপ। ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে দ্রুত ছুটে পেরিয়ে গেল সাপের জায়গাটা! তারপর একখণ্ড ঘাসের জমির ওপর বসে হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই ফ্রান্সিসের অনুসরণকারী দলটি এই সাপজড়ানো নুড়িগুলোর ওপর এসে দাঁড়াল। তারাও বুঝতে পারে নি যে, এক জায়গায় এত সাপ রয়েছে। একটা সাপ একজনের পায়ে জড়িয়ে ধরল। সে ঝাঁকুনি দিয়ে দূরে ছুড়ে দিল সাপটাকে। কিন্তু আর সবাইকে সাবধান করবার আগেই একজনের পায়ে সাপ কামড়াল। লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। এতক্ষণে সবাই বুঝল, কী সাংঘাতিক জায়গা দিয়ে ওরা যাচ্ছে। তারা সঙ্গীকে রেখেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। গালকাটা সর্দারের সঙ্গী রইল মাত্র দুজন। তবু ছাড়ল না। দুজন সঙ্গী নিয়েই সে ছুটতে লাগল। তাড়াতাড়ি ছোটবার জন্যে ওরা তীর-ধনুক বর্শা ফেলে দিয়েছিল। শুধু লম্বাটে দা'গুলো কোমরে ঝোলানো রইল।

তীরগুলো চারিদিকের শুকনো গাছগুলোর উপর ছুঁড়ে মারতে লাগল।

কী একটা শব্দ হ'তে ফ্রান্সিস পিছনে ফিরে তাকাল। দেখলো দু'জন সঙ্গী নিয়ে গালকাটা সর্দার ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল। ছুট-ছুট— প্রাণপণে ছুটতে লাগল ফ্রান্সিস। ছুটতে-ছুটতে সে একটা মালভূমির মত জায়গায় এসে দাঁড়াল। দেখল, চারপাশের গাছগাছালি কেমন শুকনো। অসহ্য গরমে ঘাসগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে গেছে। দূরে দেখা গেল, ঢালু পাহাড়ে জায়গা ধরে সর্দার সঙ্গী সহ ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস তীরধনুক হাতে নিল। কিছু শুকনো ঘাস ছিঁড়ে কয়েকটা তীরের মাথায় বাঁধল। তারপর চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে তীরগুলো চারিদিকের শুকনো গাছগুলোর ওপর ছুঁড়ে মারতে লাগল। গাছগুলো এত শুকনো এত ছিল যে, তীরগুলো এসে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো। মালভূমির মত জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস দেখল, চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা।

সর্দার আর তার সঙ্গীরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগুনের জাল পেরিয়ে ফ্রান্সিসকে ধরা অসম্ভব। আর ফ্রান্সিস তীর-ধনুক আর বর্শা হাতে আনন্দে নাচতে লাগল। সর্দার শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে ফ্রান্সিসের নাচ দেখতে লাগল। রাগে সর্দারের

মুখটা আরো কুৎসিত হয়ে উঠল। কিন্তু কোন উপায় নেই। প্রায় সারারাত আগুন জ্বলল। ফ্রান্সিস আগুনের মাঝখানে একটু নিশ্চিন্তে রাতটা কাটাল।

ভোর হতেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে-লাফিয়ে গাছের পোড়া কাণ্ড ডাল-পালা পার হয়ে আবার ছুটতে শুরু করল। এক সময় পিছন ফিরে দেখল—সর্দার তার সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে ছুটে আসছে। উপবাসে অনিদ্রায়, উৎকণ্ঠায় ফ্রান্সিসের শরীর আর চলছিল না যেন। তবুও সে পাগলের মত ছুটতে লাগল। কিন্তু দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। সর্দার আর সঙ্গীদের পায়ের চাপে ঝোপ-ঝাড়ের ডালপালা ভাঙার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে লাগল। শরীরে আর একফোঁটা শক্তি নেই। ক্লান্তিতে, অবসাদে ইচ্ছে করছিল মাটিতে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু পেছনেই ওরা যমদূতের মত আসছে। আর দৌড়তে পারছে না ফ্রান্সিস। ওর মাথা ঘুরতে লাগল।

হঠাৎ বনটা শেষ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস দেখলো। সামনেই মাঠ পেরিয়ে পর্তুগীজদের সেই দুর্গটা। ফ্রান্সিস আর ছুটতে পারল না। চোখের সামনে সবকিছু দুলছে যেন। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। ফ্রান্সিস মাঠের মধ্যেই শুয়ে পড়ল।

গালকাটা সর্দার বনের মধ্যে থেকেই দেখতে পেল ফ্রান্সিস মাটিতে শুয়ে পড়েছে। সর্দার সঙ্গী দু'জনকে বনের মধ্যেই অপেক্ষা করতে বলল। তারপর নিজে ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিস দেখল, কী ভয়ংকর হয়ে উঠেছে সর্দারের মুখ। সর্দার কোমর থেকে দা'টা খুলে নিল। তারপর দা'টা উঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস মাটিতে গড়িয়ে-গড়িয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সর্দার দা'টা উঁচু করে কোপ মারতে গেল। ঠিক তখনই একটা তীর এসে সর্দারের ডান কাঁধে বিঁধল। সর্দার দা'টা ফেলে কাঁধে হাত দিয়ে চেপে বসে পড়ল। আরো কয়েকটা তীর এখানে-ওখানে লাগল।

ফ্রান্সিস দেখল দুর্গটা থেকে জন পঞ্চাশেক পর্তুগীজ তীরন্দাজ পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে। গালকাটা সর্দার তীরন্দাজ বাহিনীকে দেখল। হাত দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। একবার ফ্রান্সিসের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে নিয়ে এক ছুটে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বনের আড়াল থেকে সর্দার আর সঙ্গী দু'জন তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিসের দিকে। হাতের শিকার ফসকে গেল। ফ্রান্সিস দেখল, তীরন্দাজ বাহিনী অনেক কাছে এসে পড়েছে। আর কিছু দেখতে পেল না। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

পর্তুগীজ সৈন্যরা অজ্ঞান ফ্রান্সিসকে ধরাধরি করে দুর্গের দিকে নিয়ে চলল। ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। কিছুই করবার নেই। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

*　　*　　*

ফ্রান্সিস যখন জ্ঞান ফিরে পেল, দেখল দুর্গেরই একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে সে শুয়ে আছে। আগেরবারও তাদের এই ঘরটাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে একজন সৈন্য বিছানার দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—কিছু খাবেন?

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে জানাল সে খাবে। ফ্রান্সিসের ক্ষুধার বোধই ছিল না। তবু ভাবল—কিছু খেলে হয়তো শরীরটা ভালো লাগবে। সৈন্যটি চলে যাবার একটু পরেই দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী দু'জন সৈন্য নিয়ে ঢুকে। ফ্রান্সিসকে বললো—কেমন আছেন?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে জানাল, সে ভালো আছে।

হেনরী জিজ্ঞেস করল—আপনার সঙ্গী দু'জন কোথায় ?

হ্যারি আর মকবুলের কথা মনে পড়ল। চোখ ছলছল করে উঠল ফ্রান্সিসের। ভারী গলায় আস্তে-আস্তে বলল—ওরা কেউই বেঁচে নেই।

—আপনারা নিশ্চয়ই মোরান উপজাতিদের পাল্লায় পড়েছিলেন। এই উপজাতির লোকেরা সাংঘাতিক হিংস্র। আবার ধর্মভীরুও খুব। জঙ্গলের নানা গাছ-পাথর পুজো করে। যাক গে, আপনি যে বেঁচে আসতে পেরেছেন—এটাই মহাভাগ্যি আপনার।

এমন সময় একজন সৈন্য খাবার-দাবার নিয়ে ঢুকল। হেনরী বলল—নিন, এখন চারটি খেয়ে নিন—পরে কথা হবে।

দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী চলে গেল। ফ্রান্সিস বিছানায় উঠে বসল। তারপর আস্তে-আস্তে খেতে লাগল। সবকিছুই বিস্বাদ লাগছে। তবু না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল—এখন কী করবো ? ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া, হীরের পাহাড়ের খোঁজ করা, একা-একা সম্ভব নয়। আরো কয়েকজনকে চাই। আর যদি হীরেটা পাওয়াই যায়, সেটা নিয়ে আসার জন্যেও আরও লোকজন চাই, গাড়ি চাই। এখন দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো। গাড়ি-ঘোড়া লোক-জন নিয়ে আবার আসবো। এত সহজে হাল ছেড়ে দেব না। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস দিন-পাঁচেক সেই দুর্গে রইল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রামে শরীরটা ভালো হয়ে উঠল। হেনরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্রান্সিস একদিন তেকরুর বন্দরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

*　　*　　*

সন্ধ্যে নাগাদ তেকরুর বন্দরে পৌঁছল। উঠল সেই পুরনো সরাইখানাতেই।

পরের দিন থেকে ফ্রান্সিস জাহাজঘাটায় গিয়ে খোঁজ করতে লাগল—ওর দেশের দিকে কোন জাহাজই পেল না। এদিকে সঞ্চিত পর্তুগীজ মুদ্রাও ফুরিয়ে আসছে।

অবশেষে একটা জাহাজ পাওয়া গেল। যাবে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরে। ফ্রান্সিস সেই জাহাজেই উঠল। ক্যাপ্টেনকে সব কথাই বলল। শুধু হীরের পাহাড়ের কথাটা বলল না। ক্যাপ্টেন সব শুনে তাকে নিয়ে যেতে রাজী হল।

ফ্রান্সিস বলল—আমাকে কিন্তু খালাসীর কাজ দিতে হবে।

—বেশ, তাই করবেন। ক্যাপ্টেন বলল।

তেকরুর বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ল দুপুরবেলা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিকে কেমন একটা মেটে আলো ছড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তেকরুর বন্দরের দিকে। বার-বার হ্যারি ও মকবুলের কথা মনে পড়তে লাগল। চোখে জল এল ফ্রান্সিসের। দু'জন বন্ধুকে আফ্রিকার মাটিতে রেখে তাকে ফিরতে হচ্ছে দেশে। ফ্রান্সিস অপসৃয়মাণ তেকরুর বন্দরের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বলল—আমি আবার আসবো। যে হীরের সন্ধানে বেরিয়ে আমি আমার প্রিয় বন্ধুদের হারিয়েছি, সেই হীরে আমাকে পেতেই হবে। যতদিন পর্যন্ত না সেই হীরে পাই, ততদিন আমি আসবো।

একটু পরে তেকরুর বন্দরের চারিদিকের বনজঙ্গল সব মুছে গেল। জাহাজ চলে এল মধ্য সমুদ্রে।

দিন যায়, রাত যায়। জাহাজ চলেছে। ইতালীর কয়েকটা বন্দর ছুঁয়ে এবার চলেছে স্পেন-এর দিকে। ফ্রান্সিস জাহাজটার খালাসীর কাজ করে, আর দেশে যাবার জাহাজ ভাড়া জমায়। স্পেন হয়ে জাহাজ চলল এবার ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরের অভিমুখে। ফ্রান্সিস একা-একা থাকতেই ভালোবাসে। জাহাজের কারো সঙ্গে বন্ধুত্বও হয় নি। জাহাজের লোকেরা তাকে 'দাম্ভিক' বলেই ধরে নিয়েছে। ফ্রান্সিস নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত। কাজেই কে কী ভাবল, এই নিয়ে মাথা ঘামায় নি। জাহাজে দেশের কাউকে পায়নি। এজন্যে মনটা যেন আরো খারাপ হয়ে গেছে। কারো সঙ্গেই সে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারল না।

ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তেকরুর বন্দরের দিকে।

একদিন সকালের দিকে ক্যালে বন্দরে এসে জাহাজটা ভিড়ল। ফ্রান্সিস ক্যাপ্টেনকে অনেক ধন্যবাদ দিল। তারপর জাহাজ থেকে জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়াল।

দিনটা সেদিন পরিষ্কার। উজ্জ্বল রোদে চারদিক ঝলমল করছে। ক্যালে বন্দরে অনেক জাহাজের ভীড়। ফ্রান্সিস এক জাহাজ থেকে আর এক জাহাজে খোঁজ করতে লাগল—নরওয়েগামী কোন জাহাজ পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল একটা জাহাজ। জাহাজটা ছোট। জাহাজটার কাজ গরু-ঘোড়া চালান দেওয়া। তাই খড়ে-গোবরে জাহাজটা নোংরা হয়ে আছে। কিন্তু উপায় কি? জাহাজটা জার্মানীর কয়েকটা বন্দরে থেমে-থেমে ভাইকিং রাজ্যের রাজধানী রিবকায় যাবে। সরাসরি রিবকা যাচ্ছে, এমন জাহাজ কবে পাওয়া যাবে, কে জানে? তাই ফ্রান্সিস এই ছোট্ট জাহাজটাতেই মালপত্র নিয়ে এসে উঠল। জমানো টাকা দিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিল। একটা রাত জাহাজেই অপেক্ষা করতে হল। পরের দিন ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ল।

দিন পনেরো পরে জাহাজটা একদিন সন্ধ্যেবেলা রিবকা বন্দরে এসে পেঁছাল। ফ্রান্সিসের আর তর সইছিল না, জাহাজ থেকে পাঠাতন ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে বন্দরে নেমে এল। কতদিন পরে আবার ফিরে এসেছে তার আবাল্য পরিচিত শহরে।

ফ্রান্সিস আনন্দে প্রায় ছুটে এসে দাঁড়াল শহরের রাস্তায়।

একটা গাড়ি ভাড়া করল। গাড়ি চলল শহরের রাস্তা ধরে। ফ্রান্সিস একবার এই জানালা, একবার অন্য জানালা দিয়ে দেখতে লাগল শহরের পরিচিত দৃশ্য—বাড়ি ঘর-দোকানপাট। তখন রাত হয়েছে। এখানে-ওখানে আলো জ্বলে উঠেছে।

একসময় গাড়িটা ওদের বাড়ির গেট-এর কাছে এসে থামল। ফ্রান্সিস সামান্য মালপত্র যা ছিল, তাই নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। ভাড়া মিটিয়ে লতা গাছে ঘেরা গেট-এ এসে দাঁড়াল। গেট-এর লতাগাছটা সারা দেয়াল ঘিরে ফেলেছে। গেট-এ ঝোলানো কড়াটা জোরে-জোরে নাড়ল। বাগানের মালীটা এল। গেট-এর আলোতে সে ফ্রান্সিসকে চিনতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই ?

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—আরে আমি ফ্রান্সিস। দরজা খোল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে মালীটা ফোকলা দাঁতে একবার হাসল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ফ্রান্সিসের মালপত্র হাতে নিল। ফ্রান্সিস ঢুকলে মালপত্র নিয়ে মালীটা তার পিছু-পিছু আসতে লাগল।

মা বাইরের ঘরেই বসেছিল। কোলের ওপর একটা ছিটকাপড়ের টুকরো। বোধহয় কিছু সেলাই-ফোঁড়াই করছিল। মালীটাকে বারণ করবার আগেই ও ডেকে বসল—কর্তা মা। মা সেলাই থেকে মুখ তুলে তাকাল, মা'র মুখটা বড় শীর্ণ দেখাচ্ছে, তাতে বয়সের বলিরেখা। মা একটুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে রইল। ফ্রান্সিসের চোখ দু'টো ছলছল করে উঠল। ফ্রান্সিস গভীর কণ্ঠে ডাকল—মা।

ফ্রান্সিস ফিরে এসেছে। মা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস তার আগেই মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—তুমি বসো মা।

মা ফ্রান্সিসের মুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। ধরা গলায় বলল—হ্যাঁরে পাগল, তুই কবে সুস্থির হবি বলতে পারিস ?

ফ্রান্সিস সে কথার জবাব না দিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল—মা—মাগো—আমার মা।

মা এবার কেঁদে ফেলল। ফ্রান্সিস বলল—আমি তো ফিরে এসেছি মা—তবে আর তুমি কাঁদছো কেন মা ?

একটু পরে মা চোখ মুছতে-মুছতে জিজ্ঞেস করল—তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—না, বাবা কোথায় ?

—লাইব্রেরী ঘরে। আজকে আর দেখা করিস না, তোকে দেখলেই রাগারাগি শুরু করবে। আজকে চুপচাপ খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে। কাল সকালে বলা যাবে'খন।

কিন্তু ফ্রান্সিস ফিরে এসেছে, এমন একটা আনন্দ সংবাদ মালীটা চেপে রাখতে পারল না। ফ্রান্সিসের বাবাকে গিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস সবে খেতে বসেছে, এমন সময় বাবা এসে হাজির। ফ্রান্সিসকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। মাকে বললেন—কুলাঙ্গারটা ফিরে এসেছে, কই আমাকে তো বলোনি !

—ম্—মানে ভাবছিলাম—মা আমতা-আমতা করতে লাগল।

—তোমার আদরেই তো ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল—বাবা বললেন।

—ঠিক আছে, আগে ওকে খেতে দাও—কতোদিন ভালো করে খায়নি, কে জানে !

বাবা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—জাহাজ থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলে ?

—ইয়ে—আফ্রিকা।

—সেখানে আবার কিসের জন্য ?

—জানো বাবা—একটা মস্ত বড় হীরে—

বাবা হাত নাড়লেন—বুঝেছি—বুঝেছি, এইজন্যেই তুমি রাজামশাইয়ের কাছে জাহাজ চেয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা—তোমার একবারও কি আমাদের কথা মনে পড়ে না ?

বাবার গলা বুজে আসে। তাঁর মন কাঁদছে, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করতে রাজী নন। ফ্রান্সিস সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মাথা গুঁজে বসে রইল।

—অনেক হয়েছে—এবার ওকে খেতে দাও—মা বলল।

—হুঁ—বলে বাবা চলে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন—তোমার এখন বাড়ী থেকে বেরুনো বন্ধ !

সত্যি কয়েদখানায় থাকার মত অবস্থা করে তোলা হল। দুজনকে মোতায়েন করা হল। একজন বাড়ীর ভিতরে, অন্যজন গেট-এ। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল—এখন চুপচাপ থাকাই ভালো।

এইভাবেই কাটল কয়েক মাস। বাড়ীর মধ্যেই বন্ধ হয়ে রইল ফ্রান্সিস। রাজামশাই ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই দিনটিতেই শুধু বাইরে যাবার অনুমতি মিলেছিল। অবশ্য সঙ্গে একজন সৈনিক ছিল। আর একটা অনুমতি অনেক কষ্টে আদায় করেছিল ফ্রান্সিস। রাজার সৈন্যদের তাঁবুতে গিয়ে ওদের সঙ্গে তীর ছোঁড়ার অভ্যাস করা। এই তীর ছোঁড়া অভ্যাস করার সময়ও ফ্রান্সিসের সঙ্গে একজন সৈন্য পাহারা থাকত। ফ্রান্সিস প্রতিদিন খুব মনোযোগ দিয়ে তীর ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিস সেরা তীরন্দাজ হয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস গাছটা বেয়ে নামতে লাগল।

মাস কয়েক পরে ছেলের সুমতি হয়েছে দেখে বাবা ভেতর বাড়ির সৈন্যটিকে সরিয়ে নিলেন। এই কাজের ভার পড়ল ছোট্ট ভাইটির ওপর। কিন্তু গেট-এর সৈন্যটি বহাল রইল। এবার ফ্রান্সিস তৎপর হলো। শুরু হলো, একটু রাত হলেই বাড়ি থেকে পালানো। রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগে মা ছেলেকে একবার দেখে যায় ঘুমুলো কিনা। ফ্রান্সিস তখন নিঃসাড় শুয়ে থাকে। মা নিশ্চিত মনে চলে গেলেই জানালার পাশে লতা-গাছটা ধরে নীচে নামে। তারপর দেওয়াল ডিঙিয়ে রাস্তায়।

বন্ধুরা নির্দিষ্ট পোড়ো বাড়িটায় এসে জমায়েত হয়। জোর মতলব চলে। এবারের লক্ষ্য হীরের পাহাড় ! হ্যারির জন্যে সবাই দুঃখ করে। ফ্রান্সিস এই উদাহরণটি তুলেই

বলল—ভাইসব—হ্যারি যেভাবে জীবন দিয়েছে, তেমনি একইভাবে আমাদেরও জীবন যেতে পারে। তাই বলছি—যারা নির্ভীক, যে কোন বিপদের মোকাবিলা করতে রাজী আছে—শুধু তারাই এগিয়ে এসো। অনেক বাছাইয়ের পর প্রায় চল্লিশজনকে পাওয়া গেল। এর মধ্যে দশজনকে ফ্রান্সিস নির্বাচন করল—এরাই যাবে হীরের পাহাড়ে। বাকীরা তেকরুর বন্দরে জাহাজেই থাকবে।

এবার শুরু হলো যাত্রার আয়োজন। প্রথমেই ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে একটা খোলাঘোড়ায় টানা গাড়ি তৈরী করানো শুরু হল। ঘোড়ায় টানা গাড়িটা শেষ হতে প্রায় মাসখানেক লাগল। গাড়িটা চালানোর জন্যে চারটে ঘোড়াও কেনা হল। দলের মধ্যে রিঙ্গোই ছিল ওস্তাদ গাড়িচালক। সে দু'বেলা রিবকার রাজপথে গাড়িটা চালিয়ে অভ্যেস করে নিতে লাগল। ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে বাবার কাছ থেকে রিঙ্গোর সঙ্গে গাড়ি চালানোর শেখার অনুমতি আদায় করল। রাজপথে গাড়ি চালায় দু'জনে। রাস্তার লোকেরা দেখে, কিন্তু এতবড় একটা খোলা ছাদের গাড়ি তৈরি করার কোন কারণ খুঁজে পায় না। গাড়ি আর ঘোড়াগুলো রাখা হয় পোড়ো বাড়িটাতে।

এবার জাহাজের বন্দোবস্ত। রাজামশাইয়ের কাছে চাইলে হয়তো একটা জাহাজ পাওয়া যেত। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ছেলেকে আবার সমুদ্রযাত্রায় বেরুতে দিতে ঘোরতর আপত্তি করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই রাজামশাইয়ের ইচ্ছা থাকলেও উনি জাহাজ দিতে পারবেন না। সুতরাং একমাত্র উপায় জাহাজ চুরি করা। পোড়ো বাড়িতে শেষ জমায়েত-এর রাত্রে জাহাজ চুরি করে চালানোর নির্দিষ্ট দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল।

* * *

সেদিন গভীর রাত। জাহাজঘাটায় রাজার সৈন্যরা জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় অন্ধকার একেবারে দূর হয়নি। জায়গায়-জায়গায় অন্ধকার বেশ গাঢ়। তেমনি এক অন্ধকার কোণা থেকে একদল লোক একটা জাহাজে উঠে এল। তারপর একে-একে পাহারাদার সৈন্যদের কাবু করে ফেলল। হাত-মুখ বেঁধে তাদের কেবিন ঘরে আটকে রাখা হল। লোকগুলো ধরাধরি করে একটা গাড়ি জাহাজে তুলল। তারপর পাঠাতনের ওপর দিয়ে চারটে ঘোড়াকে সন্তর্পণে হাঁটিয়ে এনে জাহাজে তোলা হয়। ঠিক তখন জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দু'টো খড়ের গাদায় আগুন লাগানো হল। বলা বাহুল্য, এই সবই ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের কাজ।' দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের শিখা অনেক উঁচুতে উঠল। জাহাজের খালাসীরা আর পাহারাদার সৈন্যরা ছুটোছুটি করে জল এনে খড়ের গাদায় ঢালতে লাগল। জাহাজ-ঘাটায় অপেক্ষমান জাহাজগুলোতে পাছে আগুন লেগে যায়, এই আশঙ্কায় অনেক জাহাজের নোঙর তুলে দূরে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে জাহাজগুলো অপেক্ষা করতে লাগল, আগুন একেবারে নিভে যাওয়ার জন্যে। শুধু একটি জাহাজ অপেক্ষা করল না। লোকলস্কর নিয়ে জাহাজটা পাল তুলে জল কেটে ছুটে চলল। এটা ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদেরই কাণ্ড। জাহাজঘাটায় আগুন নিভল। গভীর সমুদ্র থেকে জাহাজ-গুলো জাহাজঘাটায় ফিরে এল। হিসেব করে দেখা গেল, ভাইকিং রাজার একটা জাহাজ কম পড়েছে। জাহাজটা যে চুরি করে একদল লোক পালিয়ে গেছে, এ বিষয়ে কোন

সন্দেহ রইল না। রাজার কাছে খবর গেল। কিন্তু রাজামশাই এই নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি বুঝলেন, এ নিশ্চয়ই ফ্রান্সিসেরই কাজ। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ব্যস্ত হলেন। ভোরবেলাই শুনলেন তিনি, ফ্রান্সিসকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে-সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজামশাই সব শুনে বললে—ক'টা দিন যাক—ওরা যদি তার মধ্যে না ফেরে, তবে আমরা ওদের খোঁজে বেরুবো।

ফ্রান্সিসের বাবা অগত্যা রাজার কথাই মেনে নিলেন।

* * *

দিন যায়, রাত যায়। জাহাজ চলছে, ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের নিয়ে। হাওয়ার তোড়ে পালগুলো ফুলে ওঠে। দাঁড়িদের তখন কোন কাজ থাকে না। তারা ডেক-এর ওপর গোল হয়ে বসে ছক্কা-পাঞ্জা খেলে। আর একজন তখন ডেক ধোয়া-মোছা করে পালের দড়িদড়া ঠিক করে। এইভাবে দিনরাত জাহাজটা ভেসে চলে।

দু'বার ভীষণ ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। প্রথম ঝড়টি জাহাজের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় ঝড়টির সময় পাল নামাতে একটু দেরী হয়েছিল। দু'টো পাল ফেঁসে গিয়েছিল। পাল দু'টো আবার সেলাই করা হল। পালের দড়ি-দড়া কাঠ সব পালটানো হলো।

পালে হাওয়া লাগলে সবাই দাঁড় টানার একঘেঁয়ে কাজ থেকে ছুটি পায়। গান গেয়ে, ছক্কাপাঞ্জা খেলে, তাস খেলে সময় কাটায়। শুধু অবসর নেই ফ্রান্সিসের। সে একা-একা ডেকের ওপর পায়চারী করে। মাঝে-মাঝে ছাদখোলা গাড়িটা দেখে। কখনও বা শূন্যদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ভাবনার শেষ নেই। তেকরুর বন্দরে পেঁছিবার পর কী-কী করতে হবে—মোরান উপজাতিদের এলাকা দিয়ে না গিয়ে উত্তর দিক থেকে কী করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে। এতগুলো লোকের নিরাপত্তার চিন্তা তার মাথায়। এটা তাকে পালন করতেই হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন রয়েছে, তেমনি জন্তু-জানোয়ারের দিক থেকেও বিপদ কম নেই। এইসব বিপদের মধ্যে দিয়ে হীরের পাহাড়ে যেতে হবে, আবার ফিরেও আসতে হবে। লোভার্ত মানুষের সংখ্যাও পৃথিবীতে কম নেই। বিপদ সেইদিক থেকেও কিছু কম নয়। কাজেই সব সময় সজাগ থাকতে হবে। নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনও আসেনি।

দীর্ঘদিন মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কেউ-কেউ অসহিষ্ণুস্বরে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে, কবে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে পেঁছোবে। কারো পক্ষেই সঠিক কতদিন লাগবে, বলা শক্ত। তাই অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ফ্রান্সিসের সোনার ঘণ্টা আনতে যাবার সময় জাহাজের বন্ধুদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এবার সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে—অধৈর্য হলে চলবে না! সবেতেই তার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে হবে। কোনোরকম বিশৃংখলা দেখা গেলে, সে যে কোন বন্দরে নেমে যাবে। সেখান থেকে ফিরে আবার নতুন লোকজন নিয়ে আসবে। সোনার ঘণ্টা আনতে যারা তার সঙ্গে গিয়েছিল, তারা অনেকেই এই অভিযানে তার সঙ্গী হয়েছে। তাদের ওপরেই ফ্রান্সিসকে বেশী নির্ভর করতে হচ্ছে। ফ্রান্সিসের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। মুশকিল হয়েছে নতুনদের নিয়ে। তারা বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এ খবর ফ্রান্সিসের কানেও

ওঠে। সে ডেক-এ সবাইকে নিয়ে সভা মতো করে। সেখানে সে বলে—ভাইসব, হীরের পাহাড়ের হীরে ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, সেই আগ বাড়িয়ে হাত তুলে দেবে। দস্তুরমত মরণপণ সংগ্রাম করে, সেটা সংগ্রহ করতে হবে। কাজেই আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। তেকরুর বন্দরে পৌঁছুতে আমাদের আর বেশীদিন লাগবে না। তারপরেও যে কাজ আছে, তা বেশ কঠিন। দেশে ফিরে যাবার কথা, ঘরে নিশ্চিত জীবনের কথা, আমাদের ভুলে যেতে হবে। এখন চাই অটল সাহস, শক্তি আর বুদ্ধি। সবাই শান্ত হয়ে ফ্রান্সিসের কথা শোনে। এই অভিযানের গুরুত্ব মনে করে অসহিষ্ণু বন্ধুরা শান্ত হয়। যে যার নিজে-নিজের কাজে লেগে পড়ে।

একদিন সকালে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে এসে পৌঁছলো। দীর্ঘদিন পরে মাটির দেখা পেয়ে সবাই উল্লাসিত হল। দল বেঁধে নেমে পড়ল জাহাজঘাটায়। চিৎকার করে কথা বলতে লাগল, হৈ-হল্লা করতে লাগল, গান৷ গাইতে লাগল, গাড়িটা আর ঘোড়া চারটেকে জাহাজ থেকে নামালো হলো। রিঙ্গো দ্রুতহাতে গাড়িটায় ঘোড়া জুড়ল। গাড়িটায় তোলা হলো বেশ কয়েকদিনের খাবার-দাবার, জল আর কয়েকটা লম্বা কাছি। যে দশজন সঙ্গে যাবে বলে ফ্রান্সিস আগে স্থির করেছিল, তাদের নিয়ে ফ্রান্সিস গাড়িতে উঠে বসল।

দুপুর নাগাদ ওদের গাড়িটা পর্তুগীজ দুর্গটার সামনে এসে হাজির হলো। দুর্গে তখন খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হবার আয়োজন চলেছে। একজন সৈনিক এসে দুর্গাধ্যক্ষ হেনরীকে ফ্রান্সিসের কথা জানাল। হেনরী দুর্গের ভিতরে আসতে বলে দিল।

সেই রাতটা ফ্রান্সিসরা দুর্গটাতেই রইল। রাত্রে খাবার টেবিলে হেনরীর সঙ্গে দেখা হল। কথায়-কথায় হেনরী একটু বিস্ময়মিশ্রিত সুরে ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল—কার্পেট বিক্রী করতে এত লোকজন নিয়ে এসেছেন কেন?

ফ্রান্সিস কী বলবে, বুঝে উঠতে পারতে না পেরে আমতা-আমতা করে বললো—ইয়ে হয়েছে—মানে কালকে এখান থেকে বেরিয়ে আমরা এক-একজন এক-একদিকে যাবো। কার্পেটের চাহিদা কেমন বুঝে নিতে।

—কিন্তু শুনলাম, আপনাদের সঙ্গে নাকি কার্পেটও নেই!

—কার্পেট আছে তেকরুর বন্দরে—জাহাজে! এখানকার চাহিদা বুঝেই আমরা কার্পেট নিয়ে আসবো।

হেনরী আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। তবে ফ্রান্সিসের উত্তরগুলো তার যে মনমতো হয়নি, এটা বোঝা গেল। তারপর এটা-ওটা নিয়ে কথাবার্তা চলল। ফ্রান্সিস একসময় জিজ্ঞেস করল—আমাদের একজন গাইড দিতে পারেন?

—গতবার আপনাদের যে গাইড ছিল, তাকে পেতে পারেন।

—তাহ'লে তো খুবই ভালো হয়। কিন্তু কালকে ভোরবেলা ওকে খবর দিয়ে আনা কি সম্ভব?

—কিছু ভাববেন না। আমি এই রাত্রেই মাসাইদের গ্রামে লোক পাঠাচ্ছি। কাল সকালেই গাইড পেয়ে যাবেন।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

তখন সবে ভোর হয়েছে, গাইড এসে হাজির। অগত্যা ফ্রান্সিসকে বিছানা ছেড়ে

উঠতে হল। অনেক কষ্টে ফ্রান্সিস গাইডকে বোঝাল যে, ওরা উত্তর দিক দিয়ে ওঙ্গালির বাজারে যেতে চায়। গাইড মাথা ঝাঁকালো, অর্থাৎ সে ফ্রান্সিসের কথা বুঝতে পেরেছে।

সকালবেলা ঘোড়ার ডাকে, গাড়ির চাকার ক্যাচ্ কোঁচ শব্দে লোকজনের কথাবার্তায় দুর্গপ্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠল। সকলে কিছু খেয়ে নিল। তারপর গাড়িতে গোছ-গাছ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদূর বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হল। তারপরেই শুরু হল দিগন্তবিস্তৃত মেঠো জমি। গাইড জানাল—এইসব জায়গায় সিংহ থাকে, কাজেই সাবধান। কপাল ভালো সিংহের সামনা-সামনি পড়তে হলো না। দূরে একটা সিংহীকে দেখা গেল। একটা গাছের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। গাইড বোঝাল, ওখানে সিংহীটার কাচ্চাবাচ্চা আছে। তাই সিংহীটা ঐ জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। গাইডের একটা ব্যবহার ফ্রান্সিসের কাছে রহস্যময় লাগল। যেখান দিয়ে ওরা যাচ্ছিল—ধারে কাছে কোন গাছ থাকলে সেটার ডাল কেটে দিচ্ছিল। গাইডকে কারণটা জিজ্ঞেস করল ফ্রান্সিস। গাইড বোঝাল যে, সিংহের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এসব তুকতাক করছে।

গাড়ি চলছে, চলার বিরাম নেই। ফ্রান্সিসরা চলেছে তো চলেছেই। গাইড বোঝাল—মোরান উপজাতিদের এলাকার বাইরে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাই ঘুর পথ নিতে হচ্ছে—এতে একটা সুবিধে হয়েছে—ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছে না, ঘোড়ার গাড়ি সহজেই যেতে পারছে।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। শুনল—ঘোড়াগুলো অস্বস্তিতে মাটিতে পা ঠুকছে, মাঝে-মাঝে ডেকে উঠছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল, নিশ্চয়ই হায়না এসেছে। তীর-ধনুক নিয়ে ফ্রান্সিস তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়াগুলো যে গাছটায় বাঁধা আছে, সেইদিকে পায়ে-পায়ে এগোলো। কিন্তু গাছটা পর্যন্ত আর যাওয়া হলো না।

ও কি? গাছটার আড়ালে অল্প-অল্প অন্ধকারে দু'টো চোখ জ্বল-জ্বল করছে। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল।

সিংহ! দ্রুতপায়ে তাঁবুতে ফিরে এল। আরো কয়েকজনকে সঙ্গে চাই। ইতিমধ্যে ঘোড়ার ডাকে দু'-একজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ফ্রান্সিসের ধাক্কায় তারা উঠে বসল। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—সিংহ এসেছে, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে এসো। কথা ক'টা বলেই তাঁবুর বাইরে চলে গেল। বাইরে আগুনের যে ধুনি জ্বালানো হয়েছিল, সেটা প্রায় নিভে গেছে, আকাশের চাঁদও ক্ষীণ। একটা খুব ম্লান আলো চারিদিকে ছড়ানো। এতে সিংহটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, শুধু চোখ দু'টো আবছা অন্ধকারে জ্বলে উঠছে।

ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসল। তখনই কয়েকজন তীর-ধনুক নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস ফিসফিস্ করে বলল—সিংহটা সামনের গাছটার পেছনেই রয়েছে। তোমরা দু' দলে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে যাও, আমি প্রথমে ধুনীর পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেই তীর চালাবো। তোমরাও লক্ষ্য স্থির করে তীর চালাবে।

যারা তীর-ধনুক নিয়ে এসেছিল, তারা দু'দলে ভাগ হয়ে দু-পাশে চলে গেল। ঘোড়াগুলো আবার মাটিতে পা ঠুকতে লাগল, আর দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য দড়িতে টান দিতে লাগল। ফ্রান্সিস আর দেরী করল না। ধুনী থেকে একটা আধপোড়া কাঠ

ছুঁড়ে মারল গাছটার দিকে। কাঠটা মাটিতে পড়তেই কতকগুলো স্ফুলিঙ্গ উড়ল। ফ্রান্সিস অন্ধকারে চোখ দুটোর দিকে লক্ষ্য রেখে তীর ছুঁড়ল। তীরটা কোথায় গিয়ে বিঁধল বোঝা গেল না। কিন্তু সিংহটা প্রচণ্ড গর্জন করে লাফিয়ে এসে পড়ল ধুনীটার কাছে। এবার সিংহটার অস্পষ্ট শরীরের রেখা দেখা গেল। সিংহটা আবার গর্জন করে উঠল। বোধহয় ফ্রান্সিসের বন্ধুরা কেউ তীর ছুঁড়েছে।

সিংহটা গর্-গর্ করে উঠেই লাফ দিয়ে পড়ল গাছটার কাছে। ঘোড়াগুলো জোরে ডেকে উঠল, আর দড়ির বাঁধন ছিড়ে ফেলার জন্যে চাপাচাপি শুরু করে দিল। তখনই ফ্রান্সিস তার এক সঙ্গীর ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পেল। সিংহটা কিন্তু আর দাঁড়াল না। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল, সিংহটা ছুটে চলে যাচ্ছে। এই রাত্রিবেলা সিংহের পিছু ধাওয়া করা বোকামি। ফ্রান্সিস ছুটে সঙ্গীটির কাছে গেল। দেখা গেল আঘাতটা মারাত্মক নয়। সিংহের থাবার নখে হাত ছড়ে গেছে। ওরা সঙ্গে যে ওষুধপত্র এনেছিল, তাই দিয়ে হাতটা বেঁধে দিল। সঙ্গীটি প্রাণে বেঁচেছে, এতেই তারা খুশী হল।

সকালে কিছু খাওয়া-দাওয়া করে ফ্রান্সিস দু'জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সিংহটার খোঁজে বেরুলো। গাছের তলাটায় দেখল রক্তের গাঢ় দাগ। বোঝা গেল, সিংহটা বেশ আহত হয়েছে। ঘাসের ওপর পাতার ওপর রক্তের দাগ দেখে-দেখে ফ্রান্সিসরা আহত সিংহটার হদিস খুঁজতে বেরুলো। রক্তের দাগ দেখে-দেখে অনেকটা যাবার পর কয়েকটাপাথরের আড়ালে দাগগুলো শেষ হয়েছে দেখা গেল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে সঙ্গের দু'জনকে দু'পাশ দিয়ে যেতে বলল। নিজে আস্তে-

নিজেও সিংহের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল।

আস্তে খুব সন্তর্পণে পাথরের ওপাশে চলে এল। দেখল ঠিক পাথরের আড়ালেই সিংহটা শুয়ে খুব মৃদুস্বরে গর্ গর্ করছে। অন্য পাথরগুলোর মাথায় দুই সঙ্গীর মুখ দেখতে পেল ফ্রান্সিস। ইশারায় তাদের তীর চালাতে বলে নিজেও সিংহটার বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। সিংহটা গর্জন করে লাফিয়ে উঠল। ততক্ষণে আরো কয়েকটা তীর এসে লাগল। সিংহটা নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর গর্-গর্ ডাকও একসময় বন্ধ হয়ে গেল।

সিংহটা মারা গেছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য ফ্রান্সিস কয়েকটা পাথরের নুড়ি ছুঁড়ে মারল। কিন্তু সিংহটা নড়ল না। এবার ফ্রান্সিস সাহসে ভর করে পাথরের আড়াল থেকে এগিয়ে এসে সিংহটার লেজ ধরে পা ধরে টানল। দেখল, ওর তীরটা সিংহটার হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে। এবার ফ্রান্সিস নিশ্চিত হলো যে, সিংহটা মারা গেছে। ফ্রান্সিস তার সঙ্গীদের ডাকল। দু'জন সঙ্গী মহানন্দে চীৎকার করতে লাগল। সিংহটার চারপাশে

ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগল। তাঁবুতে ফিরে এই সংবাদ দিতে সবাই হই-হই করে উঠল। তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। মাঠের বিস্তৃত জমি ছেড়ে এবার ছাড়া-ছাড়া গাছপালার বন-জঙ্গল শুরু হল।

তিনদিন পর একদিন সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিসরা ওঙ্গালির বাজারে এসে পৌঁছল। নামেই বাজার। কয়েকটা চারদিক খোলা খড়ের চাল দেওয়া ঘর। এখানেই বোধহয় বাজার বসে এখন সন্ধ্যেবেলা দু-চারটে দোকানদার আনাজ-পত্র নিয়ে বসে আছে। কিন্তু লোকজন এখন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাইডটি জানাল, সিংহের ভয়ে সন্ধ্যের পর এখানে কোন লোকজন থাকে না।

একটু রাত হলে হাটের একটা ঘরে তারা আশ্রয় নিল। রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালবেলাই আবার পথ শুরু হল। ফ্রান্সিস গাইডটিকে বোঝাল বোঝাল ওরা কোথায় যেতে চায়। উত্তর দিকটা দেখিয়ে বলল—ঐদিকে একটা পাহাড়, তা আমরা সেখানেই যাবো। তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। গাইডটি রাজী হল।

সেই দিনটি পথেই কাটল। পরদিন দুপরবেলা ফ্রান্সিসরা একটা পাহাড় দেখতে পেল, পাহাড়টার কাছাকাছি এসে দেখল পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। গাছপালাও খুব বেশী নেই। মকবুল ঠিকই বলেছিল—পাহাড়টার একপাশ খাড়া উঠে গেছে। অন্য দিকটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢিবি রয়েছে। এইদিক দিয়েই মকবুল আর বুঙ্গা বোধহয় পাহাড়ে উঠেছিল। ধ্বস নামায় নিশ্চয়ই গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। সেই মুখটা খুঁজে বের করতে হবে।

ফ্রান্সিস কোমরে তরোয়ালটা গুজে কাছি ধরে ঝুলে পড়ল।

ঘুরে-ফিরে পাহাড়টা দেখতে-দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সেই রাতটা ওরা পাহাড়টার নীচে কাটাল। পরদিন সকালবেলা শুরু হলো পাহাড়ে ওঠা। রিঙ্গো রইল, গাড়ি-ঘোড়ার পাহারায়। বাকী সবাই পাহাড়ে উঠতে লাগল এবড়ো-খেবড়ো পাথরে পা রেখে একসময় ওরা পাহাড়ের মাথায় উঠে এল। সেখানে মস্তবড় একটা পাথরের সঙ্গে কাছিটা বেঁধে পাহাড়ের খাড়াই দিকটা ঝুলিয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বন্ধুদের বলল—আমিই প্রথমে নামছি। যদি গুহা খুঁজে পাই আমি, দু'বার কাছিটায় হ্যাঁচ্কা টান দেব। তখন তোমরা বেল্চা-গাঁইতি নিয়ে নেমে আসবে।

ফ্রান্সিস কোমরে তরোয়ালটা গুঁজে কাছিটা ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর খাড়াই পাথরের এখানে-ওখানে পা রেখে-রেখে অনেকটা নেমে এল। তখনই দেখল, কয়েকটা গাছ আর বুনো ঝোপের আড়ালে একটা গুহার মুখ। কিন্তু মুখটা ধুলো-বালি-পাথরে বন্ধ

হয়ে গেছে। মুখটা বন্ধ হয়ে গেলেও দু'তিনজন লোক দাঁড়াবারমত জায়গা সেখানে রয়েছে। ফ্রান্সিস গাছের ডালে পা রেখে গুহার মুখটাতে এসে দাঁড়াল, তারপর কাছিটা ধরে দু'টো হ্যাঁচ্‌কা টান দিল।

একটু পরেই ফ্রান্সিসের দু'জন সঙ্গী কাছি ধরে-ধরে নেমে এল। তাদের হাতে ছিল বেল্‌চা আর গাঁইতি। সংকীর্ণ জায়গাটায় তিনজন দাঁড়াল। তারপর একজন গাঁইতি চালিয়ে ধুলোবালি, পাথর আলগা করে দিতে লাগল। অন্যজন বেল্‌চা দিয়ে ধুলোবালি, পাথর নীচে ফেলে দিতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আট-দশজন দাঁড়াবার মত জায়গা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল, এটাই সেই গুহা। ধুলোবালি পাথরের ধ্বস নেমে মুখটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর আর সকলে নেমে এল। ধুলোবালি, পাথর সরাবার কাজ চলল পুরোদমে। সারাদিন কাজ চলল, তারপর একটু রাত হলে কাজকর্ম বন্ধ করে সবাই খেয়ে ছিল। রাত্রের মত সবাই ওখানেই জায়গা করে শুয়ে পড়ল।

সাপের শরীরটা কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হয়ে গেল।

শেষ রাত্রির দিকে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও চমকে উঠল কী একটা ঠাণ্ডা জিনিস কাছির মত ওর পা'টা জড়িয়ে ধরেছে। ফ্রান্সিস পা সরিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় দেখল, একটা অজগর সাপ ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়ালের দিকে সরে গেল। তারপর কোমর থেকে তরোয়ালটা খুলে অজগরটার দিকে নজর রাখল। মস্ত বড় সাপটা খুব ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। ওর লেজটা তখনও ফ্রান্সিসের দু'জন সঙ্গীর পায়ের ওপর রয়েছে। মুখ তুলে সাপটা আর একটু এগোতেই ফ্রান্সিস প্রচণ্ড বেগে অজগরটার মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। তরোয়ালের আঘাতে সাপটার মাথা কেটে দূরে ছিটকে পড়ল। কাটা শরীরটা থেকে গল্‌-গল্‌ করে রক্ত বেরোতে লাগল। সাপের শরীরটা কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হয়ে হয়ে গেল। ফ্রান্সিস কাউকে আর ডাকল না। সাপের দু-টুকরো শরীর আর মাথাটা তরোয়ালের ডগায় করে গুহার বাইরে ফেলে দিল। তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা ফ্রান্সিসের সঙ্গীরা ঘুম থেকে উঠে ধুলোবালি পাথরের মধ্যের চাপ-চাপ রক্ত এল কোত্থেকে। ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে ডাকল ওরা। ফ্রান্সিস উঠে বসল। ফ্রান্সিস হেসে বললে—'কাল রাত্রিতে একটা অজগর মেরেছি। তারই রক্ত।'

সবাই ধুলোবালি-পাথর সরাবার কাজে লেগে পড়ল। হঠাৎ দেখা গেল, ধুলোবালির

দ্রুতবেগেই দু'জনের তরোয়াল চলতে লাগল।

স্তরটা শেষ হয়ে গেছে। একটা ফোকর পাওয়া গেল। বোঝা গেল, এখানেই ধুলোবালি আর ছোট-ছোট পাথরের স্তর শেষ হয়ে গেছে। সেই স্তরটা খুঁড়ে ফেলতেই গুহাটা স্পষ্ট দেখা গেল। উত্তেজনায় সবাই চেঁচিয়ে উঠল। ফ্রান্সিসও কম উত্তেজিত হয়নি। মদিনা মসজিদের গম্বুজের মত হীরেটা তখন প্রায় হাতের মুঠোয়।

গুহাটার ভিতরটা অন্ধকার। সন্তর্পণে কিছুটা এগোতেই ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, একটা বিরাট গহবর নীচের দিকে নেমে গেছে। ওকে দাঁড়িয়ে পড়তেই দেখে পিছন থেকে একজন জিজ্ঞেস্ করল—কী হল ফ্রান্সিস?

ফ্রান্সিস বলল—আর এগোনো যাবে না—সামনেই একটা গহবর।

সঙ্গীদের একজন জিজ্ঞেস করল—মকবুল কি তোমাকে এই গহবরের কথা বলেছিল?

—না।

—তাহ'লে?

একটু ভেবে ফ্রান্সিস বলল—মনে হচ্ছে, পাহাড়টায় ধ্বস নামার সময় হীরেটা বোধহয় এই গহবরেই পড়ে গেছে।

—এটা তো তোমার অনুমান—একজন সঙ্গী বলল।

—পরীক্ষা করলেই অনুমানটা সত্যি কিনা বোঝা যাবে।

—কী ভাবে পরীক্ষা করবে?

—আমি গহবরের মধ্যে নামব।

ফ্রান্সিসের সঙ্গীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। তারা কেউই ফ্রান্সিসকে একা ছাড়তে রাজী নয়। তারা বলল—তোমার সঙ্গে আমরাও নামবো।

ফ্রান্সিস বলল—সে হয় না। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে বিপদে পড়া চলবে না।

—কিন্তু তোমার একারও তো বিপদ ঘটতে পারে।

—একটা বিপদ তো কাল রাত্তিরে শেষ করেছি। বড় জোর আর একটা অজগর থাকতে পারে। ভয়ের কিছু নেই। তোমার কাছিটার একটা দিক পাথরের সঙ্গে বেঁধে দাও।

কাছিটা বাঁধা হল ফ্রান্সিস কাছিটা ধরে ঝুলে পড়ল। হাতে একটা মশাল জেবলে আস্তে-আস্তে গহবরের মধ্যে নামতে লাগল। চারিদিকে পাথরের চাঁই, তারই মধ্যে দিয়ে গহবরটা সুড়ঙ্গের মত নেমে গেছে।

বেশ কিছুটা নামবার পর পায়ের নীচে একটা পাথরের মতো কি যেন ঠেকল। জিনিসটার গা এবড়োখেবড়ো। ওটার ওপর দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস মশালটা নীচে নামিয়ে আনল। আশ্চর্য! সেই অমসৃণ জিনিসটায় মশালের আলো পড়তে আলো ঠিকরে পড়ল। তাহ'লে এটাই মকবুলের হীরে। ফ্রান্সিস মশালটা এদিক-ওদিক ঘোরালো। ঠিকরে পড়া আলোর দ্যুতিও অন্ধকারে এদিক-ওদিক নড়তে লাগল। ফ্রান্সিস আনন্দে চীৎকার করে উঠল। সমস্ত গহবরটা সেই চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হল। গহবরের মুখে দাঁড়ানো ফ্রান্সিসের বন্ধুরা চীৎকার করে সাড়া দিল।

এবার আসল কাজ। ফ্রান্সিস হীরেটার ওপর বসে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর কাছিটা দিয়ে হীরেটাকে চারদিক থেকে বাঁধল। এই বাঁধার সময় ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল

গহ্বরটা এখানেই শেষ হয়নি। হীরেটা আটকে আছে খাঁজের মত জায়গায়। তার পাশেই গহ্বরটা নেমে গেছে আরো নীচে। মশাল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আন্দাজ করে দেখল মকবুল যত বড় হীরের কথা বলেছিল, এই হীরেটা অতো বড় নয়। তখনই ফ্রান্সিসের মনে হলো পাহাড়ের ধ্বস নামার সময় নিশ্চয়ই হীরেটা দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। একটা টুকরো এখানকার খাঁজে আটকে আছে, অন্যটা এই গহ্বরের আরো নীচে পড়ে আছে। গহ্বরের জমাট অন্ধকারে নীচে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

হীরেটা ভালো করে বেঁধে ফ্রান্সিস কাছি ধরে-ধরে ওপরে উঠতে লাগল। একসময় গহ্বরের মুখে এসে উঠে দাঁড়াল। আনন্দে উত্তেজনায় ফ্রান্সিস তখন কথা বলতে পারছে না। বন্ধুদের সুসংবাদটা দেবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল, তখনই পিঠে কে যেন তরোয়ালের ডগা চেপে দাঁতচাপা স্বরে বলল, চুপ করে দাঁড়ান আপনাদের বন্ধুদের মত।

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। দেখল, ওর পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গাধক্ষ্য হেনরী। তার সঙ্গে একদল সৈন্য। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল। দেখল ওদের বন্ধুদের সব গুহার একপাশে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের তরোয়াল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দু'একজনকে আহতও মনে হল। হেনরী ঠাট্টার সুরে বলল—এখানে নিশ্চয়ই কার্পেট বিক্রী করতে আসেননি?

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—বোধহয় ভাবছেন আমরা এখানে এলাম কি করে? খুবই সোজা উত্তর। আপনারাই পথ দেখিয়ে এনেছেন।

—আমরা? ফ্রান্সিস বিস্ময় সুরে বলল।

—হ্যাঁ—আপনাদের গাইডকে বলাই ছিল, সে যেন পথে চিহ্ন রেখে আসে—ও তাই করেছিল—সুতরাং আপনাদের খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হয় নি।

ফ্রান্সিস এবার বুঝল, কেন গাইডটি গাছের ডাল কেটে রাখত—মাটিতে দা, দিয়ে হিজিবিজি দাগ কাটত। ফ্রান্সিস বেশ কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল—আমাদের পিছু ধাওয়া করার মানে কি?

আপনাদের যাওয়ার কথা ছিল ওঙ্গালির বাজারে—কিন্তু এখানে এলেন কেন?

— আমরা যেখানে খুশী যেতে পারি।

—তা পারবেন। কিন্তু এত কষ্ট করে এখানে আসার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কিছুক্ষণ আগে আপনি গহ্বর থেকে আনন্দে চীৎকার করে উঠেছিলেন। আপনার বন্ধুরাও তাতে সাড়া দিয়েছিল। আমরা তখন গুহার মুখে আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম। আপনার এত আনন্দিত হওয়ার কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেনরী বলল—তাহ'লে কাছিটা তুলে দেখতে হয়, আপনাদের এত আনন্দের কারণটা কি?

—বেশ দেখুন, ফ্রান্সিস বলল।

হেনরী তার সৈন্যদের হুকুম দিল কাছিটা ধরে টেনে তুলতে।

ফ্রান্সিসদের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনারাও একটু সাহায্য করুন। সকলে মিলে কাছিটা টানতে লাগল। আস্তে-আস্তে কাছি-বাঁধা হীরেটা উঠে আসতে লাগল।

যখন গুহার ওপর এনে হীরেটা রাখা হল, তখন হেনরী হেসে বলল—এই পাথরটার জন্যে আপনাদের এত উল্লাস ?

জিনিসটা সামান্য নয়—ফ্রান্সিস শান্ত স্বরে বলল—এটা একটা হীরের খণ্ড।

—বলেন কি ! হেনরীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

ধ্বস নামার আগে এই পাহাড়ের এই গুহার মুখেই আলোর বিচিত্র খেলা দেখা যেত।

—হ্যাঁ, শুনেছি একটা পাহাড় আছে, লোকে বলে মায়াপাহাড়।

—এই পাহাড়ই সেই মায়াপাহাড়। আর গুহার মুখেই আলোর বর্ণচ্ছটা দেখা যেত।

বিস্ময়ে হেনরীর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। সে হীরেটার কাছে ছুটে গেল। হীরের অমসৃণ গায়ে হাত বুলোতে লাগল। কিন্তু তার মানে সন্দেহ থেকেই যায়। সে বলল—আপনি কি করে জানলেন এটা হীরে ?

—মকবুলের কাছ থেকে।

—মকবুল কে ?

—আমার বন্ধু। আগেরবার যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে আর ফিরতে পারে নি। হিংস্র মোরানদের হাতে মারা গেছে।

—ও। কিন্তু এটা কি সত্যিই হীরের খণ্ড ? হেনরীর সন্দেহ তবু যেতে চায় না।

—গুহার মুখে হীরেটা নিয়ে আসুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।

—বেশ। হেনরী তার সৈন্যদের ইঙ্গিত করল। তারা সবাই কাছিটা ধরে টেনে হীরের গুহার মুখের কাছে নিয়ে এল। যেটুকু সূর্যের আলো তেরচা হয়ে পড়ল, তাতেই হীরেটা জ্বলজ্বল করে উঠল। বিচিত্র রঙের ছটা বেরোতে লাগল হীরেটার গা থেকে। হেনরী চোখ দু'টো লোভে চকচক করে উঠল। সে সঙ্গে-সঙ্গে তার সৈন্যদের হুকুম দিল—কাছিটা ধরে আস্তে-আস্তে হীরেটা পাহাড়ের নীচে নামিয়ে দাও।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি হাত তুলে সৈন্যদের ইঙ্গিত করে হেনরীর কাছে এগিয়ে এসে বলল—এই হীরেটা কি আপনি নিয়ে যেতে চান ?

—অবশ্যই—হেনরী হাসল—নইলে এত কষ্ট করে আপনাদের পিছু এলাম কেন ?

ফ্রান্সিস গম্ভীর স্বরে বলল—দেখুন, আপনারা একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই আপনাকে আমি সব কথা বলেছি, কিছুই গোপন করি নি। আমি যদি না বলতাম, তাহ'লে একটা এবড়োখেবড়ো পাথরের খণ্ড ভেবে আপনারা চলে যেতেন।

—তা কি বলা যায়। সমুদ্র পেরিয়ে এতদূরে থেকে আপনারা এসেছেন কার্পেট বিক্রী করতে, তাও সঙ্গে আপনাদের কার্পেট নেই। একটা গাড়ী এনেছেন, তার আবার মাথা খোলা। এই সবকিছুই আমার মনে সন্দেহের উদ্বেগ উঠেছিল। যে পাথরটা আপনারা তোলার আয়োজন করেছিলেন, সেটা দামী কিছু, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেটা যে একটা আস্ত হীরে, এটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল।

—তাহ'লে আর একটা কথা আপনাকে জানাই। এই হীরেটা একটা খণ্ডমাত্র।

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ, এটা আমার অনুমান। পাহাড়ে যখন ধ্বস নেমেছিল, তখন আস্ত হীরেটা

দু'খণ্ড হয়ে যে গহবরর সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে পড়ে যায়। এই খণ্ডটা আমি পেয়েছি গহবরটার একটা খাঁজে। অন্য খণ্ডটা গহবরের তলদেশে কোথাও পড়েছে।

—তাই নাকি। হেনরী খুশীতে লাফিয়ে উঠল।

—আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। ফ্রান্সিস গম্ভীরস্বরে বলল—সেই অন্য হীরের খণ্ডটার জন্যে আমি আবার গহবরে নামব। যদি সেই খণ্ডটা পাই, তাহ'লে আপনারা এটা নিয়ে যাবেন, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

—আপত্তি থাকলেই বা শুনছে কে ?

—তাহ'লে লড়ে নিতে হবে।

হেনরী হো-হো করে হেসে উঠল—একমাত্র আপনার কোমরেই তরোয়াল আছে—ওটা আর নিইনি। আপনার দলের বাদবাকী সকলের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং গুহার মুখ থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এর পরেও লড়তে চান ?

—হ্যাঁ, আমি একাই লড়বো।

—কেন মিছিমিছি বেঘোরে প্রাণটা দেবেন।

ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। হেনরী তাই দেখে বলে উঠল—উঁহু, উঁহু—খুন-খারাপি আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তার চেয়ে আমাদের একজন লোক গহবরে নামুক। খোঁজ করে দেখুক, আর একটা হীরের খণ্ড পায় কিনা।

—আগে বলুন সেটা পেলে কে নেবে ?

—বেশ। আর একটা হীরের খণ্ড পেলে আপনারা নেবেন।

—খুব ভালো কথা।

হেনরীর ইশারায় সৈন্যদল থেকে একজন এগিয়ে এল। আবার গহবরের মধ্যে কাছি ফেলা হল। লোকটি কাছি ধরে নামতে লাগল। এক হাতে মশাল ধরে লোকটি অনেকটা নেমে গেল। একটু পরেই হঠাৎ লোকটির আর্তনাদ শোনা গেল। সেই আর্তনাদ গহবরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সবাই ছুটে গহবরের কাছে গেল। কাছি টেনে দেখা গেল, লোকটা কাছি ছেড়ে গহবরের নীচে পড়ে গেছে। কি কারণে এমনটা হলো, কেউই ভেবে পেল না। হেনরী কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। চোখের সামনে এরকম মৃত্যু দেখে কেউই আর গহবরে নামতে সাহস পেল না।

এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা তাকে নানাভাবে নিবৃত্ত করতে চাইল। কিন্তু পারল না। ফ্রান্সিস বলল, আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না। আমি এখন যা বলি মন দিয়ে শোন। যারা কাছি ধরে ছিল তাদের বলল—আমি কাছি ধরে দুবার ঝাঁকুনি দিলেই কাছি ছাড়তে থাকবে, যতক্ষণ না আমি গহবরের একেবারে শেষে নেমে কাছিটায় আবার দু'টো ঝাঁকুনি না দিই। যদি হীরের খণ্ডটা পাই, তাহ'লে সেটাকে কাছি দিয়ে বেঁধে কাছিটাতে আবার দু'টো ঝাঁকুনি দেব। তখন তোমরা কাছি টেনে তুলবে।

ফ্রান্সিস এক হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে কাছি বেয়ে নীচে নামতে লাগল। কিছুদূর নামতেই সেই গহবরের খাঁজটার কাছে এল। মশালের আলো পড়তে দেখল দু'টো বিষধর সাপ সেই খাঁজটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার ফ্রান্সিস বুঝতে পারল। আগের লোকটা নিশ্চয়ই বিশ্রাম নিতে এখানে দাঁড়িয়েছিল। তখনই সাপ কামড়েছে। আর লোকটাও এই

অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে নীচে পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা সেই খাঁজের ধুলোবালির মধ্যে পুঁতে দিল। এবার সাপ দু'টোকে স্পষ্ট দেখা গেল। ফ্রান্সিস পা দু'টো দিয়ে কাছিটা জড়িয়ে ধরল। কোমরে থেকে তরোয়াল খুলল। তারপর একটা সাপের মাথার দিকে লক্ষ্য রেখে সজোরে তরোয়াল চালাল, সেই সাপের মাথাটা কেটে ছিটকে পড়ল। সাপের শরীরটা বারকয়েক নড়ে উঠল। তারপর আর নড়ল না। এবার আর একটা সাপ। সেই সাপটা কিন্তু বিপদ বুঝে পাহাড়ের ফাটলটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর সাপটাকে দেখা গেল না। ফ্রান্সিস আবার কাছিটাতে দু'বার ঝাঁকুনি দিল, ওপর থেকে যারা কাছি ধরেছিল, তারা কাছি ছাড়তে লাগল। ফ্রান্সিস মশালটা ধুলোবালি থেকে তুলে নিয়ে আবার নামতে লাগল।

সাপের মাথাটা কেটে ছিটকে পড়ল।

বেশ কিছুটা নামবার পর দেখল, নীচে যেখানে গহ্বরটা শেষ হয়ে গেছে, সেখানে লোকটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ওর হাতের মশালটা একপাশে পড়ে গিয়ে তখনও জ্বলছে। সেই মশালের আলো যে এবড়ো-খেবড়ো পাথরটায় পড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আর সেটা যে আর একখণ্ড হীরে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। ফ্রান্সিস নামতে-নামতে হীরেটার ওপর এসে দাঁড়াল। তারপর লোকটার মৃতদেহ একপাশে সরিয়ে কাছি টেনে-টেনে হীরেটা বাঁধল। বাঁধা হলে কাছিটায় ধরে দুটো ঝাঁকুনি দিল। গহ্বরের ওপর থেকে সবাই আস্তে-আস্তে হীরেটা ওপরে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে ফ্রান্সিসও উঠতে লাগল।

গহ্বরের মুখে আসতেই ফ্রান্সিস নেমে এল। তারপর সবাই মিলে টানতে-টানতে হীরেটাকে গুহার মধ্যে নিয়ে এল।

হীরের আর একটা খণ্ড দেখে হেনরীর আনন্দ দেখে কে! সে একবার একখণ্ড হীরের কাছে যায়, আর পরক্ষণেই অন্য হীরেটার কাছে যায়। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে দৃঢ় পদক্ষেপে হেনরীর কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল—তাহ'লে আপনি কি স্থির করলেন?

—কোন ব্যাপারে?

—একটা হীরের খণ্ড আমরা নেব, আর একটা আপনারা নেবেন।

—অসম্ভব!

—তার মানে?

—জানেন, এত বড় দুই খণ্ড হীরে যদি পর্তুগালে নিয়ে গিয়ে রাজাকে দিতে পারি—রাজসভায় আমার সম্মান কত বেড়ে যাবে।

—কিন্তু কথা ছিল—একখণ্ড হীরে আমরা নেব।

—তেমন কোন কথা হয়েছে বলে তো আমার মনে পড়ছে না।

—তাহ'লে আপনি কি রক্তক্ষয় চান?

হেনরী ফ্রান্সিসের কথা কানেই নিল না। নিজের সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—হাঁ করে দেখছ কি। হীরে দু'টো নীচে নামাও।

সৈন্যরা তাড়াতাড়ি কাছি দিয়ে বাঁধা হীরের খণ্ডটা টানতে-টানতে গুহার মুখের কাছে নিয়ে এল। তারপর ধরে-ধরে আস্তে-আস্তে নীচে নামিয়ে দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস শক্ত চোখে একবার হেনরীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর তরোয়া-লের হাতলে হাত রাখল। বন্ধুরা সব ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরল, বললো—ফ্রান্সিস, এমন পাগলামি করো না।

ফ্রান্সিস অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলে উঠল—যে হীরের জন্যে আমার দু'জন বন্ধু প্রাণ দিয়েছে, সেটা আমি এভাবে হাতছাড়া হতে দেব না।

বন্ধুরা কোন কথা শুনল না। বারবার ফ্রান্সিসকে শান্ত হতে অনুরোধ করতে লাগল। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবল। তারপর তরোয়ালের হাতল থেকে হাত সরাল।

দ্বিতীয় হীরের খণ্ডটাও ততক্ষণে নামানো শুরু হয়েছে। আস্তে-আস্তে ওটাও নামানো হল। এবার সকলের নামবার পালা, প্রথমেই নেমে গেল হেনরী, তারপর তার সৈন্যরা।

এবার নামল ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা। নীচে নেমে ফ্রান্সিস দেখল, ওদের গাড়িতে একখণ্ড হীরে তোলা রয়েছে। হেনরীও একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে। সেটাতে হীরের অন্য খণ্ডটা তোলবার তোড়জোড় চলছে। সৈন্যরা সবাই মিলে ধরাধরি করে হীরেটা হেনরীর গাড়িতে তুলল।

বেলা পড়ে এল। সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরী নেই। ফ্রান্সিসদের তো আর কিছু করবার নেই! তারা সে রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাবে স্থির করল। হেনরীও তার সৈন্য-দের নিয়ে রাত্রিবাসের জন্য বন্দোবস্ত করতে লাগল।

* * *

রাত গভীর হল। সারাদিন খাটুনির পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নেই শুধু ফ্রান্সিসের চোখে আর হেনরীর দুই প্রহরারত সৈন্যের চোখে। ওরা দু'জন খোলা তরো-য়াল হাতে হীরে দু'টো পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস শুয়ে ছটফট করতে লাগল। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না এখন কি করবে। শুধু সুযোগের আশায় বসে থাকা ছাড়া কিছুই করবার নেই। অথচ সময় নেই। একবার যদি হীরে দু'টো নিয়ে হেনরী দুর্গে ঢুকতে পারে, তাহ'লে হীরে দু'টো আর ফিরে পাওয়া অসম্ভব। ফ্রান্সিস এক-একবার উঠে মশালের আলো দেখছে হেনরীর সৈন্যরা আর তার বন্ধুরা সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ওর কিন্তু ঘুম আসছে না। চুপচাপ শুয়ে আছে ও।

তখনই·শুনল-ফ্রান্সিস-আমি হ্যারি-

হঠাৎ দেখল, অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে-মেরে কে যেন এদিকেই আসছে। ফ্রান্সিস ঘুমের ভান করে শুয়ে-শুয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল। লোকটা কাছাকাছি আসতে দেখল—লোকটার খালি গা, পরনে শুধু একটা নেংটি। মুখে গায়ে উল্কি আঁকা। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল—মোরান উপজাতির লোক। ফ্রান্সিস শিয়র থেকে তরোয়ালটা টেনে নিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গেল তারপরই ছুটে এসে ফ্রান্সিসের তরোয়ালসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল। ফ্রান্সিস হাতটা ছাড়াবার জন্যে লোকটাকে ধাক্কা দিতে যাবে তখনই শুনল—ফ্রান্সিস—আমি হ্যারি।

ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠল—হ্যারি, তুমি এখনও বেঁচে আছ!

হ্যারি আস্তে বলল—এতটুকু শব্দ করো না। পরে সব বলবো।

ফ্রান্সিসের তরোয়ালসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল।

ফ্রান্সিসের আনন্দে তবু বাধা মানছে না। হ্যারির হাত চেপে ধরল।

হ্যারি চুপিচুপি বলল—এখন আমাদের অনেক কাজ। মন দিয়ে শোন, তোমাকে কি করতে হবে।

—বলো।

—সব বন্ধুদেরও জাগাও। পাহারাদার সৈন্য দু'টোকে কাবু করে সবাই যেন গাড়ি দু'টোয় উঠে বসে। তারপর ঘোড়াগুলোকে এনে গাড়িতে জুড়তে হবে। কোনরকম শব্দ যেন না হয়। কিন্তু সমস্যা হল গাড়ি চলাবে কে?

—রিঙ্গো একটা গাড়ি চালাবে, অন্যটা আমি চালাবো।

—তুমি পারবে তো ?

—হ্যাঁ—আমি অনেকদিন চালিয়ে-চালিয়ে অভ্যেস করেছি।

—বেশ। এবার পরের কাজ। সমস্ত জায়গাটা মোরান উপ-জাতিরা ঘিরে ফেলেছে। আমি একটা সংকেত দিলেই ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে মোরানদের বলা আছে তারা যুদ্ধ করবে না—শুধু এদের আটকে রাখবে।

—বলো কি!

—হ্যাঁ। আমি খড়কুটো তীরের ডগায় আটকে আগুন জ্বালিয়ে চারদিকে ছুঁড়ে মারব। ঠিক তখনই ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে। আগুনের তীর ছুঁড়েই আমি লাফিয়ে তোমার গাড়িতে উঠবো। তারপর আর কিছু করবার নেই। যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালিয়ে আমাদের পালাতে হবে। বুঝেছ?

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল। তারপর গুঁড়ি মেরে তার বন্ধুদের কাছে-কাছে গিয়ে একে-

একে সবাইকে জাগাল। ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে সবাইকে চুপ করে থাকতে নির্দেশ দিল। তারপর রিঙ্গোকে সঙ্গে নিয়ে গুঁড়ি মেরে-মেরে চলল পাহারাদার দু'টির উদ্দেশ্যে। হঠাৎ পিছন থেকে লাফ দিয়ে মুহূর্তে পাহারাদার দু'টিকে কাবু করে ফেলল ওরা। দু'টো পাহারাদারের মুখে রুমাল গুঁজে হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখল। তারপর ঘোড়াগুলোকে আস্তে-আস্তে এনে গাড়ি দু'টোতে জুতল। চাপা-স্বরে সবাইকে ডাকল গাড়িতে ওঠার জন্যে। সবাই দু' ভাগ হয়ে সন্তর্পণে গাড়ি দু'টোতে উঠে বসল।

এবার হ্যারি খড়কুটো বাঁধা তীরগুলো মশাল থেকে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে চারদিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। সবক'টা তীর ছুঁড়েই হ্যারি এক লাফে গাড়িতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস আর রিঙ্গো গাড়ি ছেড়ে দিল। আর ঠিক তখনই শোনা গেল চারদিকে মোরানদের চীৎকার। বনের চারদিকে আগুন ধরে গেছে। তারই মধ্য দিয়ে ফ্রান্সিসরা জোরে-জোরে চালিয়ে গাড়ি দু'টোকে বের করে নিয়ে এল। তারপর গাড়ি দু'টো বেগে ছুটল। ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে দেখল সমস্ত বনটায় আগুন লেগে গেছে। হেনরীর সৈন্যরা যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

সারাদিনে মাত্র একবার দুপুরবেলায় গাড়ি থামিয়ে একটা ঝরণার ধারে বসে খেয়ে নিল সবাই। তারপর আবার গাড়ি ছুটল। হেনরী যে গাড়িটায় এসেছিল, তার মধ্যে হীরের খণ্ডটা আটেনি। তাই কাছি দিয়ে গাড়িটার সঙ্গে বাধা হয়েছিল। গাড়ি চলার ঝাঁকুনিতে কাছিটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। সেটার আবার নতুন করে বাঁধা হলো। আবার ছুটল গাড়ি। সন্ধ্যার সময় গাড়ি থামানো হল। রাতটা কাটল উন্মুক্ত আকাশের নীচে। তাঁবু ফেলে আসতে হয়েছে। ফ্রান্সিস বুদ্ধি করে খাবারের বাক্সটা তুলে নিয়েছিল, তাই যাহোক কিছু খাবার জুটল। রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে আবার ভোর হতেই গাড়ি ছুটল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো—হ্যারি এবার বলতো, তুমি কি করে বাঁচলে?

হ্যারি বলতে লাগল—তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, পায়ে তীর লাগার পর একটা পাথরের ঢিবি থেকে আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—যে পাথরের ঢিবির নীচে আমি পড়ে গিয়েছিলাম, সেই পাথরটাকে মোরানরা দেবতা জ্ঞানে পুজো করত। পাথরটাতে রঙ-বেরঙের দাগ, নীচে পুজোর ফুল এসব ছিল। আমরা কেউ কিন্তু সে-সব লক্ষ্য করি নি। আমাদের অনুসরণকারী যে লোকটা আমাকে দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠেছিল। আমাকে মারবার জন্যে দা উঁচিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু পাথরের ঢিবিটার দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এমনিতেই মোরানরা ধর্মভীরু। তার ওপর যে পাথরটাকে ওরা পুজো করে, তারই নীচে আমি পড়ে আছি—এসব দেখে-শুনে লোকটার মুখ শুকিয়ে গেল। সে দা'টা কোমরে গুঁজে আমার কাছে এল। পা দিয়ে তখন গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। লোকটা আমাকে পাঁজাকোলা করে গালকাটা সর্দারের কাছে নিয়ে এল। সর্দার সব কথা শুনে ওদের এক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করল। সে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরেই কিছু লতাপাতা নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এল। সেই লতাপাতা দিয়ে আমার পা'টা বেঁধে দিল। অনেকটা আরামবোধ

করলাম। তারপর সর্দারের দু'জন সঙ্গী কাঁধ ধরে-ধরে এগোলাম ওদের গ্রামের দিকে। সেখানে একটা বাড়িতে রেখে ওরা চলে এল।

—তারপর?

—আমার চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষা করল। কিছুদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। তবে এখনও একটু খুঁড়িয়ে চলতে হয়। হোক, আমার সঙ্গে মোরানরা ভালো ব্যবহার করতে লাগল। আসলে ওরা ধরে নিয়েছিল, আমি ওদের দেবতা প্রেরিত মানুষ। আস্তে-আস্তে আমি ওদের পরামর্শদাতা হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে মোরান-সর্দার কোন কাজই করত না।

—হ্যারি, তুমি আমাদের খোঁজ পেলে কী করে?

—ওঙ্গালির বাজার থেকে মাইল পনেরো উত্তরে হীরের পাহাড়; এটা আমি জানতাম। আমি সেইজন্যে সেই পাহাড়টার কাছে একজন মোরানকে পাহারায় রেখেছিলাম। আমি জানতাম, তুমি আসবেই। তোমরা যখন এলে তারপর থেকে সমস্ত ঘটনাই আমরা দেখেছি। দুর্গরক্ষক লোকটা যে কিছুতেই হীরে দু'টো হাতছাড়া করবে না, এটা বুঝেছিলাম। আমি তখনই দুর্গরক্ষক আর তার সৈন্যদলকে নিঃশেষ করতে পারতাম। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম বিনা রক্তক্ষয়ে কার্যোদ্ধার করতে। শুধু পালাবার সুযোগ করে নেওয়া। মোরানদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, আমি আগুনের তীর ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা যেন চীৎকার হইহল্লো করে দুর্গরক্ষক আর তার সৈন্যদের ঘাবড়ে দেয়। এই সুযোগটা পেলে গাড়ি নিয়ে আমরা পালাতে পারবো। হলোও তাই।

—কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে পালাবে এটা মোরানরা জানে?

—না, ওরা জানে আমি আবার ওদের কাছে ফিরে আসবো। তাই চারিদিকে আগুন লাগাবার সংকেত দিয়েছিলাম। আগুন নিয়ে ওরা এত ব্যস্ত থাকবে যে, আমার পালানোটা ওরা লক্ষ্য করতে পারবে না।

—হ্যারি তুমি বেঁচে আছো, দেখে এত খুশী হয়েছি যে—কি বলবো আমি। আবেগে ফ্রান্সিসের গলা বুজে এল।

ফ্রান্সিস ওসব আর ভেবো না। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখল। বলল—তোমরা নিশ্চয়ই জাহাজ নিয়ে এসেছো।

—হ্যাঁ, তেকরুর বন্দরে জাহাজ রয়েছে।

—তাহ'লে এখন আমাদের একটা কাজ—যে করেই হোক হীরে দু'টো জাহাজে তোলা।

গাড়ি ছুটে চলল। ফ্রান্সিস আর রিঙ্গো দু'জনেই যথাসাধ্য দ্রুত গাড়ি চালাবার চেষ্টা করছে। দিগন্তবিস্তৃত মেঠো জমিতে পড়ে রাত্তিরেও গাড়ি চালাতে লাগল। গাইডটির নির্দেশে চলে ওরা পথটা আরো সংক্ষিপ্ত করে নিল। এই সংক্ষিপ্ত পথে নাকি সিংহের ভয় আছে। কিন্তু কপাল ভাল বলতে হবে—সামনা-সামনি কোন সিংহ পড়েনি।

* * *

দু'দিন পরে এক সন্ধ্যায় ওরা তেকরুর বন্দরে এসে পেঁছিল। সঙ্গের গাইডটিকে এবার বিদায় দিল ওরা। ওকে পুঁতির মালা, আয়না, চিরুনি দিল, গাইডটা খুশী হল।

ফ্রান্সিসের জাহাজের বন্ধুরা হইহই করে উঠল। অবাক্ চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল হীরের খণ্ড দুটি। তারপরেই আনন্দে কেউ-কেউ হেঁড়ে গলার গান ধরল—নাচতে লাগল কেউ-কেউ। ফ্রান্সিস গাড়িতে দাঁড়িয়ে সবাইকে ডেকে বলল—ভাইসব, এখনও নিশ্চিন্ত হবার সময় আসেনি। আনন্দ করার সময় পরে অনেক পাবে। এখন হীরে দু'টো জাহাজে তোলার জন্যে সবাই হাত লাগাও।

হীরে দু'টো গাড়ি থেকে নামাতে রাত হয়ে গেল। চারদিক মশাল পুঁতে তারই আলোতে কাজ চললো। এবার হীরে দু'টো জাহাজে তোলার জন্য সবাই কাঁধ লাগালো। জাহাজে ওঠার পাটাতনে সাবধানে পা ফেলে একটা হীরের খণ্ড জাহাজে তোলা হল। দুর্ঘটনা কিছু ঘটল না। তবে একজন পা পিছলে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। জাহাজ থেকে দড়ি ফেলা হল। লোকটি নিজেই দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল—আমাদের এক্ষুনি জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে। এখানে এক মুহূর্তও আর দেরী করবো না আমরা।

ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হলো। পাল খাটানো হলো। হাওয়া লাগতেই পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চললো গভীর সমুদ্রের দিকে।

জাহাজে ততক্ষণে মশাল হাতে নাচ শুরু হয়ে গেছে। গান গাওয়া চলল সেই সঙ্গে। সবাই জুটলো সেখানে হীরের খণ্ড দু'টোর চারপাশে ঘুরে-ঘুরে সবাই নাচতে লাগল। শুধু ফ্রান্সিস একা ডেকে-এ দাঁড়িয়ে তেকরুর বন্দরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বারবার মকবুলের কথা মনে পড়তে লাগল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল বারবার। তেকরুর বন্দরের আলো আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। চোখ মুছে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

॥ শেষ ॥

এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়—সোনার ঘণ্টা ১৪৲
এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়—মুক্তোর সমুদ্র ১৩৲ তুষারে গুপ্তধন ১৪৲ রুপোর নদী ১৪৲

‘যদি চিরদিনের জন্য যাও, তবে ‘মুক্তোর সমুদ্রে’ যাও।’

—‘ভাজিম্বা’দের প্রবাদ

মুক্তোর সমুদ্র

অনিল ভৌমিক

নিবেদন

প্রথমেই বলি 'মুক্তোর সমুদ্র' আমার সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। 'মুক্তোর সমুদ্রে'র পূর্ববর্তী দু'টি অধ্যায় যথাক্রমে 'সোনার ঘণ্টা', 'হীরের পাহাড়'। তবে যদিও ফ্রান্সিসই এই কাহিনীর নায়ক, তবুও কাহিনী হিসেবে প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেটুকু যোগ আছে, সেটুকু এই গ্রন্থের প্রথম প্রদত্ত পূর্ববর্তী দু'টি অধ্যায়ের 'কাহিনী সূত্র' পাঠ করলেই তা পরিস্কারভাবে জানা যাবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'মুক্তোর সমুদ্র'-এর আগে কখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

অনিল ভৌমিক

মুক্তোর সমুদ্র

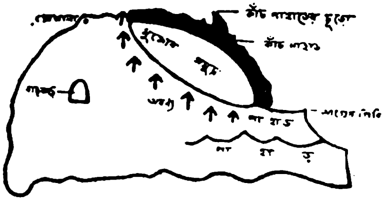

মুক্তোর সমুদ্র

ফ্রান্সিসদের জাহাজ পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলের বন্দর ছেড়ে এসেছে অনেকক্ষণ। জাহাজ এখন মাঝসমুদ্রে। নির্মেঘ আকাশে বাতাসে তেমন জোর নেই। সমুদ্রও তাই শান্ত। জাহাজের ডেক-এর ওপর পায়চারী করছিল ফ্রান্সিস। ভাবছিল, আফ্রিকা থেকে হীরে নিয়ে আসার কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা। সেই সঙ্গে বারবার মনে পড়ছিল মোরান উপজাতিদের হাতে মকবুলের নির্মম মৃত্যুর কথা। বারবার চোখে জল আসছিল এই কথা ভেবে। মকবুলকে ও বাঁচাতে পারল না। নিজের জীবনের বিনিময়ে মকবুলই তাকে বাঁচবার পথ ক'রে দিলো। পায়চারী করতে-করতে ফ্রান্সিস এসে দাঁড়াল ডেক-এ রাখা গাড়ি দু'টোর কাছে। বিরাট হীরের খণ্ড দু'টো গাড়িতে রাখা। কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে জাহাজের সকলেই একবার ক'রে হীরে দু'টো দেখে যাচ্ছে। কী বিরাট হীরের টুকরো দু'টো! তাদের চোখে বিস্ময়ের শেষ নেই। ফ্রান্সিস হীরে দু'টোর কাছে দাঁড়াল। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশে গভীর লাল সূর্যটা জলের ঢেউয়ের মাথায়। পশ্চিম দিগন্ত থেকে প্রায় মাঝ আকাশ পর্যন্ত লাল রঙের শব্দহীন ঢেউ। সেই আলো পড়েছে জাহাজে। হীরে দু'টো লাল রঙের সেই রঙীন আলোয় স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। অনেকেই চারপাশে ভীড় করে সেই অপরূপ রঙের খেলা দেখছে। ঢেউ ছোঁয়া দিগন্তে আস্তে-আস্তে সূর্য অস্ত গেল। তারপরেও পশ্চিমাকাশে লাল আলোর ছাপ রইল অনেকক্ষণ। তারপর অন্ধকার নামতে হীরে দু'টোর গায়েও আলোর খেলা মিলিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস ডেকের ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলো! আকাশে ততক্ষণে তারা ফুটে উঠেছে। নিষ্প্রভ ভাঙা চাঁদটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। একটা নরম জ্যোৎস্না-ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

হ্যারি কাছে এসে ডাকল—'ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস ফিরে তাকিয়ে হ্যারিকে দেখে বলল—'হু।'

তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'—এবার ঘরে ফেরা যাক্, তুমি কি বলো?' হ্যারি বলল।

'—হ্যাঁ'—ফান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—'মনে হচ্ছে, তুমি এতেও খুব খুশী নও?' হ্যারি হেসে বললো।

ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বললো 'সত্যিই আমি খুশী নই। কী হবে ফিরে গিয়ে? আবার-তো সেই সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। উদ্দেশ্যহীন এক-ঘেঁয়ে জীবন, খাও-দাও-ঘুমাও।'

—আবার বেড়িয়ে পড়বে ভাবছো।

—দেখি—

—হ্যারি হাসল—'তুমি আর বেরোতে পারবে ব'লে মনে হয় না'।

—কেন?

—রাজাকে এর আগে 'সোনার ঘণ্টা' এনে দিয়েছো, এবার অতবড় দু'টো হীরে

নিয়ে যাচ্ছো। এবার রাজামশাই তোমাকে নির্ঘাৎ সেনাপতি ক'রে দেবে।

ফ্রান্সিস হাসলো—'ওসব তালপাতার সেপাইগিরির মধ্যে নেই। ঠিক পালাবো আবার।'

দু'জনে আর কোন কথা বললো না। হ্যারি একটু পরেই চ'লে গেল। ফান্সিস দূরে অন্ধকারে সমুদ্র আর তারা ভরা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল।

* * *

দিন যায়। ওদের জাহাজ চলে শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে। ভাইকিংরা সকলেই আনন্দে আছে। কতদিন পরে আবার দেশে ফিরে চলেছে। যখন ডেক ধোয়া, রান্না করা, পাল ঠিক করা, দড়ি-দড়া বাঁধা, দাঁড়-বাওয়া এসব কাজ থাকে না, তখন জাহাজের ডেক-এর এখানে-ওখানে জড়ো হয়; ছোট-ছোট দল বেঁধে ছক্কা-পাঞ্জা খেলে, নয়তো গান নাচের আসর বসায়, নয়তো দেশবাড়ির গল্প করে। এতবড় দু'টো হীরের খণ্ড নিয়ে দেশে যাচ্ছে' ওরা কী সম্বর্ধনাটাই না পাবে, এসব কথাও হয়।

ফ্রান্সিস ডেক-এ একা একা পায়চারী ক'রে বেড়ায় আর ভাবে এখন নিরাপদে দেশে ফিরতে পারবে তো ?

শুধু ফ্রান্সিস অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারে না। ডেক-এ একা-একা পায়চারী ক'রে বেড়ায় আর ভাবে এখন নিরাপদে দেশে ফিরতে পারবে তো ? পথে জলদস্যুদের ভয় আছে, প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজ ডুবি হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে লক্ষণ ভাল। সমুদ্র শান্ত, বাতাসও বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে। দ্রুত গতিতে জাহাজ চলেছে। আর দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। কিছুদিনের মধ্যেই দেশে পৌছানো যাবে। কিন্তু শান্ত আর নিরুপদ্রব সমুদ্রযাত্রা ফ্রান্সিসের ভাগ্যে নেই। এটা ও কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলো।

* * *

সেদিন অমাবস্যার রাত। কালো আকাশ, সমুদ্র সব একাকার। মাথার ওপর শুধু কোটি-কোটি তারার ভীড়। তারাগুলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। পরিষ্কার, নির্মল আকাশ।

তখন মধ্যরাত্রি। এতক্ষণ ডেকে একা-একা পায়চারী করছিল ফ্রান্সিস। কিছুক্ষণ

আগে কেবিনে ফিরে এসেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে একটু পরেই। জাহাজে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু হীরের গাড়ি দু'টো পাহারা দিচ্ছে দু'জন ভাইকিং। তারাও এতক্ষণ গল্পগুজব ক'রে গাড়ির চাকায় ঠেসান দিয়ে এখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন।

অন্ধকার সমুদ্রের মধ্য দিয়ে একটা পর্তুগীজ জলদস্যুর জাহাজ নিঃশব্দে ওদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। সেই ধাক্কায় একজন পাহারাদারের তন্দ্রা ভেঙে গেলেই হাঁই তুলে চোখ তুললো। কেবিনের সামনে একটা কাচে ঢাকা লণ্ঠনের আলো জ্বলছিল। হঠাৎ সেই আলোয় ও দেখলো কারা যেন হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এত রাত্রে এরা আবার কারা? ভুল দেখছে মনে ক'রে ও দু'চোখ কচ্‌লে নিলো। আর সত্যিই তো। মাথায় ফেট্টি বাঁধা, বুকে-হাতে উল্কি আঁকা একটা লোক এগিয়ে আসছে। পেছনে আরো ক'জন। জলদস্যু! আতঙ্কে ও চিৎকার ক'রে উঠতে গেল। কিন্তু পারল না। তরোয়ালের এক আঘাতে ও ডেক-এ লুটিয়ে পড়ল। ওর সঙ্গীটির যখন তন্দ্রা ভাঙল দেখলো, কয়েকটা বলিষ্ঠ হাত ওকে দ্রুত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলছে। চিৎকার ক'রে উঠে কি হচ্ছে সেটা বলবার আগেই ওকে হীরের গাড়ির চাকার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো।

তারপর জলদস্যুরা ছুটলো কেবিনঘরগুলোর দিকে। তার মধ্যে দু'জন অস্ত্রশস্ত্র রাখার ঘরের সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল, যাতে কেউ এখান থেকে অস্ত্র না নিয়ে যেতে পারে। কেবিন ঘরে সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে সবাই একে-একে উঠে বসলো। সামনে তাকিয়ে দেখলো মাথায় ফেট্টি বাঁধা বড়-বড় গোঁফ আর বড়-বড় জুলপীওলা জলদস্যুরা দাঁড়িয়ে।' হাতে খোলা তলোয়ার। যুদ্ধ করা দূরে থাক, কেউ অস্ত্রাগারের দিকে পা বাড়াতে পারল না। ফ্রান্সিস-হ্যারিরও এক অবস্থা। এখন ওদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া মানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে আনা। জলদস্যুদের দলের একজন বেঁটে মত লোক এগিয়ে এসে পর্তুগীজ ভাষায় সবাইকে বললো—'সবাই ডেকে-এ চলো।'

সবাইকে সার বেঁধে ওপরে ডেক-এ আনা হলো। ডেক-এর একপাশে সবাইকে বসতে বলা হলো। ওরা যখন বসলো, তখন বেঁটে জলদস্যুটা চিৎকার ক'রে কী যেন বলে উঠলো। সঙ্গের জলদস্যুরা একসঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল। ওদের ক্যারাভেল জাহাজ থেকেও আর একদলের চিৎকার শোনা গেল। ভাইকিংরাও বুঝলো, এটা ওদের জয়ধ্বনি। বেঁটে জলদস্যুটা এবার চিৎকার ক'রে বলতে লাগল—'তোমাদের এখানেই থাকতে হবে। কাল সকালে আমাদের ক্যাপ্টেন লা ব্রুশ এই জাহাজে আসবেন। তিনি যা বিবেচনা করবেন, তোমাদের ভাগ্যে তাই ঘটবে। এখন চুপচাপ ব'সে থাকো। চাও কি ঘুমোতেও পারো। কিন্তু কেউ যদি বেশী চালাকি দেখাতে যাও, তাহ'লে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো।'

একমাত্র বেঁটে জলদস্যুটার গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি। ও পেটের কাছ থেকে গেঞ্জীটা একটু তুলে মুখ মুছে নিলো। ভাইকিংদের ঘিরে আট-দশ জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল। এদিকে ক্যাপ্টেন লা ব্রুশের নাম শুনে ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। লা ব্রুশের নাম শোনেনি, এমন লোক এই তল্লাটে নেই। লা ব্রুশ জাতিতে ফরাসী, একটা পা কাঠের। ওর মতো নৃশংস-নির্মম জলদস্যুকে সকলেই যমের মত ভয় করে। ও জাহাজ লুঠ ক'রে শুধু ধনরত্নই নেয়

না, জাহাজের লোকেদের ধ'রে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রী করে। ভাইকিংরা বেশ ভীত হলো। ভাগ্যে কী আছে, কে জানে? বেঁটে জলদস্যুর কথাগুলো ফ্রান্সিস, হ্যারি শুনল। হ্যারি-ফ্রান্সিসের কাছে ঘেঁসে এসে বসে চাপাস্বরে ডাকলে—ফ্রান্সিস?

—হুঁ।

—আমরা তাহ'লে কুখ্যাত জলদস্যু লা ব্রুশের পাল্লায় পড়লাম।

—'হুঁ'।

—'এখন কি করবো?' হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

—'কিছু করবার নেই। সময় আর সুযোগের সন্ধানে থাকতে হবে।' একটু থেমে ধরা গলায় ফ্রান্সিস বললো, 'আমার সবচেয়ে দুঃখ কি জানো? এত দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে এক বন্ধুর প্রাণের বিনিময়ে যে হীরে দু'টো আনলাম, সেটা লা ব্রুশের মত একটা জঘন্য জলদস্যুর সম্পত্তি হয়ে যাবে।'

—ফ্রান্সিস জলদস্যুর দল এখনো জানেন ঔ গাড়ি দু'টোয় কী আছে। সূর্য উঠলে ওরা হীরে দু'টো চিনে ফেলবে। সূর্য ওঠার আগেই আমাদের একটা উপায় বার করতে হবে, যাতে ওরা হীরের খণ্ড দু'টোকে না চিনে ফেলে।

—'তুমি কিছু ভেবেছো?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'হ্যাঁ, বুদ্ধি ক'রে হীরে দুটোকে ঢাকা দিতে হবে।' হ্যারি বললো।

—কিন্তু কী ক'রে?

—তুমি ওদের বেঁটে সর্দারটাকে গিয়ে বলো, যে গাড়ি দু'টোয় বারুদ আছে। বৃষ্টি হ'লে বারুদ ভিজে যাবে। কাজেই ছেঁড়া পাল দিয়ে গাড়ি দু'টো ঢাকতে হবে।

ফ্রান্সিস একমুহূর্ত হ্যারির দিকে হেসে কাঁধে এক চাপড় দিলো—'জবর উপায় বের করেছো। বলছি এক্ষুণি, কিন্তু ও ব্যাটা রাজি হবে কি?'

—রাজি হবে। তুমি কিন্তু এরকম ভাব করবে যে ঢাকা দিলেও হয়, না দিলেও হয়। সাবধান বেশি আগ্রহ দেখাবে না। তাহ'লে, ওদের মনে সন্দেহ হ'তে পারে।

—দেখি, ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একজন পাহারাদার তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দু'হাত ওপরে তুলে দিল। পাহারাদার এসে বাজখাঁই গলায় বলল—'কি হলো তোমার'?

—আমাকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চলো, বিশেষ জরুরী কথা আছে।

—ক্যাপ্টেন এখন ঘুমুচ্ছে। যা বলবার কাল সকালে বলবে।

—না, এখুনি দেখা করতে হবে।

পাহারাদারটা মুখ ভেংচে উঠল—'কোথাকার রাজা হে তুমি, যখন খুশী লা ব্রুশের সঙ্গে দেখা করতে চাও—তোমার ভাগ্য ভালো যে এখনো তোমার মাথাটা শরীরের সঙ্গে লেগে আছে, উড়ে যায় নি।'

ফ্রান্সিস একবার ভাবলো, লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উচিত শিক্ষা দেবে কিনা! পরমুহূর্তে ভাবলো, মাথা গরম করলে সব কাজ পণ্ড হ'য়ে যাবে। আগে হীরে দুটোকে ঢাকতে হবে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'ভাই তোমরা হচ্ছো বীরের জাত, আমাদের মত ভীতু-দুর্বল লোকেদের ওপর কি তোমাদের চোখ রাঙানো উচিত।'

পাহারাদারটাও হেসে গোফ মুচড়ে বলল—'তুমি বড় সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে পারো'।

ডোরাকাটা গেঞ্জী গায়ে বেঁটে লোকটাই বড় সর্দার। সে কথা কাটাকাটি শুনে এগিয়ে এসে মোটা গলায় বলল—'কী হ'য়েছে !'

ফ্রান্সিস বড় সর্দারকে হাত তুলে সম্মান দেখাল। তারপর বললো—'দেখুন, একটা সমস্যার কথা বলছিলাম।'

—'কী সমস্যা ?

হীরে রাখা গাড়ি দু'টোর দিকে হাত দেখিয়ে ফ্রান্সিস বললো—'ঐ গাড়ি দু'টোয় প্রচুর বারুদ রাখা আছে। বৃষ্টি হলে সব বারুদ ভিজে যাবে। যদি ছেঁড়া পাল-টাল দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অনুমতি দেন তাহ'লে'—

—'পাগল নাকি ? পরিস্কার আকাশ—বৃষ্টি হবে না'—বড় সর্দার বললো।

—বলছিলাম, আপনি তো আমার চেয়েও অভিজ্ঞ, জানেন তো ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি এসব জায়গায় কখন মেঘ ক'রে, কখন ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়, মা মেরীও তা জানেন না।

বড় সর্দার ভেবে বললো, 'হুঁ।'

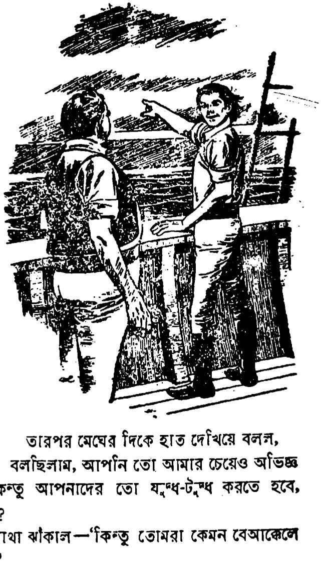

তারপর মেঘের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, বলছিলাম, আপনি তো আমার চেয়েও অভিজ্ঞ

—তাছাড়া ভেবে দেখুন, আমি শুধু আমাদের জন্য বলছি না, আমাদের আর বারুদ দিয়ে কি হবে কিন্তু আপনাদের তো যুদ্ধ-টুদ্ধ করতে হবে, ভেজা বারুদ নিয়ে তখন কী করবেন ?

—'হুঁ, তা ঠিক।' বড় সর্দার মাথা ঝাঁকাল—'কিন্তু তোমরা কেমন বেআক্কেলে হে, যে খোলা ডেকে বারুদ রেখেছো ?'

—ভিজে গিয়েছিল তাই শুকোতে দিয়েছিলাম।

—'অ'। যাও, ঢাকা দিয়ে দাও।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল। হ্যারি কাছে এলে চোখ টিপে বললো—'কেল্লা ফতে ! ক্যাপ্টেন রাজী হয়েছে।'

ও আরো কয়েকজনকে ডাকল। তারপর গুদোম ঘর থেকে দু'টো বড়-বড় ছেঁড়া পালের অংশ এনে ঢাকা দিতে শুরু করলো। বড় সর্দার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। প্রায় অন্ধকারে ও কিছুই বুঝতে পারছিল না। পাল ঢাকা দিয়ে

ফ্রান্সিসরা দড়ি-দড়া দিয়ে শক্ত করে হীরেটাকে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দিলো। ওদের কাজ সারতেই ভোর হয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে যারা জেগে ছিল, তারা হীরের গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আর আলোর খেলা দেখা গেল না। পাল দিয়ে ঢাকা হীরে থেকে দ্যুতি বেরোবে কি ক'রে? জলদস্যুরাও গাড়ি দু'টো বারুদের গাড়ি ভেবে তাকিয়ে দেখলো না। ফ্রান্সিস আর হ্যারির মুখে সাফল্যের হাসি ফুটে উঠলো। যাক্—হীরে দু'টোকে জলদস্যুদের হাত থেকে এখন আপাততঃ বাঁচানো গেছে।

সকাল হলো। এবার জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজটা দেখা গেল! পালের গায়ে ক্রশ চিহ্ন। মাস্তুলের মাথায় পতাকা উড়ছে। কালো কাপড়ের মাঝখানে মানুষের কঙ্কাল আঁকা। ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

একটু বেলা হ'তেই পাহারাদার জলদস্যুদের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা গেল। বড় সর্দার একবার দ্রুত ওদের জাহাজে গেল। তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে এলো। জলদস্যুদের মধ্যে বেশ একটা সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। একটু পরেই কাঠের পায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে একটু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এই জাহাজে এলো লা ব্রুশ। মাথায় বাঁকানো টুপী। গালপাট্টা দাড়ি গোঁফ। কালো জোববা পরনে, তাতে সোনালী জরির কাজ করা, গলায় ঝুলছে একটা হাঁসের ডিমের মত মুক্তোর লকেট। কোমরে মোটা বেল্ট। তাতে হাতীর দাঁতে বাঁধানো বাঁটের তরোয়াল ঝোলানো। পায়ে হাঁটু অবধি ঢাকা বুট, অন্য পা-টা কাঠের। ডানহাতে ধরা একটা শেকল। শেকলে বাঁধা একটা বাচ্চা চিতাবাঘ। লা ব্রুশ খুব ধীর পায়ে এসে এই জাহাজের ডেক-এ দাঁড়াল। জলদস্যুরা সব চুপ করে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো। লা ব্রুশ একবার চোখ পিট্-পিট্ করে চারদিকে তাকিয়ে নিলো। তারপর ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে বলল—'তোমরা ভাইকিং, ভালো জাহাজ চালাও, ভালো যুদ্ধ করো, কিন্তু তোমরা বড় দরিদ্র, তোমাদের এই জাহাজে মূল্যবান কিস্সু পাবো না।'

ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষার সঙ্গে ফরাসী ভাষা মিশিয়ে লা ব্রুশ বলতে লাগলো—'তবে কেন আশী মাইল সমুদ্র পথ তোমাদের পেছনে ধাওয়া করে এলাম?'

খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল লা ব্রুশ। তারপর হাসি থামিয়ে বলল—'সেটা এই জন্যে।' কথাটা বলেই লা ব্রুশ খাপ থেকে তরোয়াল খুললো। তারপর বেশ দ্রুত ছুটে গিয়ে হীরের গাড়ির ওপর বাঁধা দড়িগুলো কাটতে লাগলো। অত্যন্ত ধারালো তরোয়ালের এক-এক কোপে দড়ি কেটে যেতে লাগল। তারপর ওখান থেকে সরে এসে ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে খুক-খুক করে হেসে উঠলো। ফ্রান্সিস ও হ্যারি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। তবে কী লা ব্রুশ হীরের কথা জানে? লা ব্রুশ হঠাৎ চিৎকার করলো—'ওপরের ঢাকনা সরাও।'

তিন-চারজন জলদস্যু ছুটে গিয়ে ছেঁড়া পাল দুটো খুলে ফেলল। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল হীরে দু'টো। নীল্চে-হলুদ কত রকমের আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল। ভাইকিংরা কেউ অবাক হলো না। কারণ, এসব রঙের খেলা ওরা অনেকদিন দেখেছে। অবাক হল জলদস্যুরা। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। চোখে পলক পড়ে না। লা ব্রুশও কম অবাক হয় নি। এত বড় হীরে? ওর কল্পনারও বাইরে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে হীরে দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলো লা

ব্রুশ। তারপর ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে লা ব্রুশ বলতে লাগল—'তেকরুর বন্দরের কাছে যে দুর্গ আছে, সেখান থেকে হেনরী সময় মতই আমার কাছে লোক পাঠিয়ে ছিল। তোমরা ওকে ভাঁওতা দিয়ে হীরে নিয়ে পালাচ্ছো, এই সংবাদ পেতেই তোমাদের পিছু নিলাম। আমাদের 'ক্যারাভেল' জাহাজ যে অনেক দ্রুত গতিসম্পন্ন, সেটা আর একবার প্রমাণিত হলো।' খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল লা ব্রুশ।

ফ্রান্সিসের আর সহ্য হ'ল না। ও আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। হ্যারি ওকে বারণ করতে গেল। কিন্তু ফ্রান্সিস শুনল না। ও উঠে দাঁড়িয়ে বললো—'ক্যাপ্টেন লা ব্রুশ আমার কিছু বলবার আছে।'

দু'তিন জন পাহারাদার তরোয়াল হাতে ছুটে এলো। লা ব্রুশ হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিল। . বললে—'বলো'।

—দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী মিথ্যে অভিযোগ করেছেন। আমরা তাঁকে ভাওতা দিতে চাই নি। তিনি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাকে এক খণ্ড হীরে দিয়েছিলাম। কিন্তু লোভের বশে তিনি দু'টো খণ্ডই জোর ক'রে নিতে গিয়েছিলেন আমরা সেটা হ'তে দিই নি। কারণ হীরের দু'টো খণ্ডই আমাদের প্রাপ্য। আমরাই হীরের পাহাড়ের খোঁজ জানতাম। আমার এক বন্ধু এই জন্য প্রাণ দিয়েছে। কাজেই এই হীরের নায্য দাবীদার আমরা। হেনরীকে এই হীরে পেতে বিন্দুমাত্র কণ্টও স্বীকার করতে হয় নি। তবে কি করে উনি বলেন, যে আমরা ওকে ভাঁওতা দিয়েছি।

লা ব্রুশ কী ভাবল। তরোয়ালের হাতলে হাত বুলোল দু'একবার। দাড়িতে হাত বুলিয়ে, তারপর কেশে নিয়ে বললো—'ওসব তোমাদের ব্যাপার। হীরে দু'টো আমি পেয়েছি, ব্যস।' বলে ব্রুশ চোখ পিট্-পিট্ করে হাসল।

—আমাদের কি হবে?

—তোমাদের আমার জাহাজে কয়েদ ঘরে থাকতে হবে।

—কেন?

লা ব্রুশ খুক্-খুক্ ক'রে হাসল—'তোমরা যে বেঁচে আছো, এই জন্য মা মেরীকে ধন্যবাদ দাও। তোমাদের যে প্রাণে মারতে বলিনি, তার কারণ এই হীরে দু'টো। তোমাদের নিয়ে আমরা প্রথমে যাবো ডাইনীর দ্বীপে। সেখানে লুঠের মাল রেখে যাবো চাঁদের দ্বীপে। তারপর ইউরোপের দিকে। ক্রীতদাস বিক্রীর হাটে তোমাদের বিক্রী করবো। এরমধ্যে অবশ্য ভালো খদ্দের পেলে হীরে দু'টোও বিক্রী করে দেব'।

—আমাদের বিক্রী-করা হবে কেন?

লা ব্রুশ ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠল—'তুমি যে এখনো আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছো, জেনো সেটা আমার দয়া।'

হ্যারি ফ্রান্সিসের হাত ধরে টানল—'ফ্রান্সিস মাথা গরম করো না। ব'সে পড়ো।'

ফ্রান্সিস বসে পড়ল। লা ব্রুশ বড় সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল—'এদের সব কয়েদ ঘরে ঢোকাও। তারপর এই জাহাজটাকে আমাদের ক্যারাভেলের পেছনে বেঁধে নাও।'

লা ব্রুশ আর কোনদিকে না তাকিয়ে কাঠের পা ঠক্-ঠক্ করতে করতে নিজের

ক্যারাভেলে-এ ফিরে গেল।

বড় সর্দার চেঁচিয়ে হুকুম দিলো—'সব ক'টাকে কয়েদ ঘরে ঢোকাও। পাহারাদার জলদস্যুরা সব এগিয়ে এলো। ভাইকিংদের সারি বাঁধা হলো। ক্যারাভেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল ওদের। ডেক থেকে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে। ওরা নামতে লাগল। অনেক ক'টা ধাপের পর ক্যারাভেলের সবচেয়ে নীচের অংশে একটা লম্বা ঘর। লোহার মোটা-মোটা শিক লাগানো। ঘরটার জানালা বলে কিছুই নেই। ঐ শিকল লাগানো দরজা থেকেই যেটুকু আলো আসে। স্যাৎসেঁতে অন্ধকার। বাইরের আলো থেকে এসে কিছুই নজরে পড়ে না। অন্ধকার স'য়ে আসতে ওরা দেখল লম্বা ঘরটার ধার বরাবর একটা মোটা শেকল। শেকলের দুটো দিক। একদিকে জাহাজের কাঠের খোলের সঙ্গে গাঁথা। অন্য দিকটা একটা বড় কড়ার সঙ্গে আটকানো। বড় সর্দার সেই দিকে শেকলটার মুখ একটা আংটা থেকে খুলে নিলো। এদিকে কোণের দিকে একজন জলদস্যু দাঁড়িয়ে। সে প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে এক-এক ক'রে চাবি দিয়ে হাতকড়া আটকে দিতে লাগল। বড় সর্দার এক একজনের হাত কড়ার মধ্যে দিয়ে শেকলের মুখটা ঢুকিয়ে দিতে লাগল। হাতকড়ার মধ্যে দিয়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় ওরা পরপর বসতে লাগল। যখন সবাইকে এ ভাবে বসানো হলো, তখন বড় সর্দার শেকলটা একটা আংটার মধ্যে আটকে দিয়ে যে হাতকড়া পরাচ্ছিল, তাকে ডাকল। সে এসে শেকলটা চাবি দিয়ে এঁটে দিল। বোঝা গেল, এই লোকটাই কয়েদ ঘরের পাহারাদার। ও-ই বন্দীদের সব দেখাশুনা করে। অদ্ভুত দেখতে লোকটা। যেমন কালো চেহারা, তেমনি মুখটা। মুখটা যেন আগুনে পোড়া তামাটে কালো। এমন ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন কিছুই দেখছে না, শুনছে না। মুখ দেখলে মনে হয় যেন জীবনে কোনদিন হাসে নি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। একেবারে নরকের প্রহরী। এতক্ষণে হাতকড়া শেকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ হলো। তবু ভাইকিংদের মধ্যে কেউ উঠে দাঁড়ালে শেকলে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠেছে। এতক্ষণে চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যে ভাবে শেকল বাঁধা হাতকড়ি পরানো হোল তা'তে এসব ভেঙে পালানো অসম্ভব, দু'দিকে নিরেট কাঠের খোল। দরজায় মোটা গরাদ। ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। শেষে ক্রীতদাসত্বকে মেনে নিয়ে জীবন শেষ করতে হবে? ও এই সব ভাবছে, তখনই শুনল প্রায় অন্ধকার কোন থেকে কে ফ্যাস্‌ফেসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'উ,—উ গেলাম—পা মাড়িয়ে দিয়েছে—ও হোহো—।'

ফ্রান্সিস ভালো করে তাকিয়ে দেখলো—কোণার দিকে একটা লোক পায়ে হাতে বুলোচ্ছে আর চ্যাঁচাচ্ছে। এই লোকটা তো আমাদের দলের নয়, ফ্রান্সিস ভাবলো। তাহ'লে এই লোকটা আগে থেকেই শেকল বাঁধা ছিল। পুরানো কয়েদী। হাতে শেকল আটকানো; ও এগিয়ে যেতে পারল না। ঐ লোকটার পাশেই ছিল হ্যারি। লোকটার পায়ে হাঁটুতে হাত বুলোতে-বুলোতে বললো—'খুব লেগেছে? অন্ধকারে দেখতে পাইনি'।

লোকটা এতক্ষণে শান্ত হলো। দু'একবার উ—হু—হু করে চুপ করলো।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল—'তুমি ভাই কদ্দিন এখানে আছো?'

লোকটা বলল—এখানে কি দিন-রাত বোঝা যায়, যে দিন-মাস-বছর গুণবো?

এবার ফ্রান্সিস লোকটির দিকে ভালো করে তাকাল। দেখলো, লোকটার মাথা-ভর্তি লম্বা লম্বা কাঁচাপাকা চুল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। গায়ে শতচ্ছিন্ন একটা জামা। পরণে ছেঁড়া পায়জামা। প্রায় বুড়ো এই মানুষটা ক্রীতদাসের হাটে হয়তো ভালো দামে বিকোবে না। তাই হয়তো একে এখনও কয়েদঘরে রেখে দিয়েছে, মরে গেলে সমুদ্রে ফেলে দেবে।

লোকটার জন্যে ফ্রান্সিসের সহানুভূতি হলো। কে জানে কতদিন এই পশুর জীবন কাটাচ্ছে লোকটা? ও হ্যারিকে বলল—'হ্যারি, জিজ্ঞেস করতো—ওর নাম কি'?

হ্যারি জিজ্ঞেস করতে, লোকটা ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বলল—'ফ্রেদারিকো।'

—'তুমি কি পর্তুগীজ?' হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

—'না স্প্যানিশ, তবে পর্তুগীজদের সঙ্গে থেকে-থেকে ওদের ভাষাতেই কথা বলা অভ্যেস হ'য়ে গেছে'।

কথাটা ব'লে ফ্রেদারিকো কোমর থেকে কী বের ক'রে মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—'কি চিবুচ্ছো?'

—তামাকপাতা।

—এখানে তামাকপাতা পেলে কি ক'রে?

ফ্রেদারিকো খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হেসে উঠল। মাথায় আঙুল ঠুকে বললো—বুদ্ধি-টুদ্ধি খরচ করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে'।

তারপর আস্তে-আস্তে বললো—'ঐ যে পাহারাদারটাকে দেখছো পাথরের মত মুখ, মনে হয় দয়া-মায়া ব'লে কোন জিনিস ওর মনে নেই।'

—ওর মুখ দেখে তো তাই মনে হয়।

—ঠিক। কিন্তু ওরও বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। ওর মনেও স্নেহ-ভালোবাসা আছে। ওর নাম বেনজামিন। ও মাঝে-মাঝে হাত দেখায়। একবার একদল জিপসীদের সঙ্গে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম। ভালই হাত দেখতে শিখেছিলাম। বেন্‌জামিন হাত দেখায়, আর আমি ওকে ওর বৌ-ছেলেমেয়েরা খবরাখবর ব'লে দিই। ব্যস, বেনজামিন এতেই খুশি।'

ফ্রেদারিকো একটু থেমে বললো একবার লিবসনের কাছে দিয়ে এই ক্যারাভেলটা যাচ্ছিল, আমি ওর হাত দেখে বললাম—'তুমি শিগগীর বাড়ি যাও, তোমার ছেলের মরণাপন্ন অসুখ।'

ও লা ব্রুশের কাছে ছুটি নিয়ে লিবসনে ওর বাড়িতে ছুটে গেল। দেখল, সত্যিই ছেলেটি মারা-যায় যায়। চিকিৎসা-টিকিৎসার পর ছেলেটি সুস্থ হ'ল। বেনজামিন আবার ফিরে এল। ব্যস্। তারপর ওর কাছে আমার কদর বেড়ে গেল। যা চাই, তাই এনে দেয়। লুকিয়ে আমার জন্য মাংস-টাংস নিয়ে আসে'।

—তাহ'লে তো ওর সাহায্যে তুমি পালাতেও পারো।

—তা' পারি। কিন্তু লা ব্রুশ মাঝে-মাঝেই আমার কাছে আসে। প্রতিদিন আমার খোঁজ করে। যদি কোনদিন এসে দেখে আমি পালিয়েছি, প্রথমেই বেন্‌জামিনের গর্দান যাবে। অন্য পাহারাদার যে দু'জন আছে, তাদের হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

—'লা ব্রুশ তোমার কাছে আসে কেন ?' হ্যারি জানতে চাইলো।

—'সে অনেক ব্যাপার !'

ফ্রেদারিকো আর কোন কথা বলল না। চোখ বন্ধ করে তামাকপাতা চিবুতে লাগল।

এক সময় হ্যারি লক্ষ্য করল ফ্রেদারিকো গলায় লকেটের মত ঝোলানো একটা কী যেন বের করল। তারপর মুখের কাছে ধ'রে দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগল। হ্যারি দেখলো, ওটা একটা আয়নার ভাঙ্গা টুকরো। গলার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। একদিকের ভাঙা মুখটা ছুঁচলো। ফ্রেদারিকো আয়নাটার মুখ দেখছে আর ভেংচি কাটছে। ওর কাণ্ড দেখে হ্যারির হাসি পেলো। বললো—'এই অন্ধকারে মুখ দেখতে পাচ্ছো ?'

—'পারছি বৈ কি'। ফ্রেদারিকো হাসলো—'কিছুদিন থাকো, বেড়ালের মত অন্ধকারে তুমিও দেখতে পাবে। তখন আর আলো সহ্য হবে না। আলোর সামনে চোখ জ্বালা করবে। চোখ জলে ভরে যাবে।'

হ্যারি ভাবল, সত্যিই দীর্ঘদিন এভাবে অন্ধকার কয়েদ ঘরে পড়ে থাকলে বাইরের আকাশ-মাটি-জলের কথা ভুলেই যেতে হবে।

ফ্রান্সিসদের কয়েদ ঘরের বন্দীজীবন কাটলো কয়েকদিন। দু'বেলা খাওয়া জুটল পোড়া পাঁউরুটি, আর আলু-মুলো এবং আনাজ মেশানো ঝোল। বেনজামিনই ওদের খাবার-দাবার জল দেয়। বেনজামিনকে আরো দু'জন পাহারাদার সাহায্য করে। ফ্রেদারিকো কিন্তু মাংস, সামুদ্রিক মাছের ঝোল, এসব খেতে পায়। ওর বেলা বেশ ভালো ফুলকো রুটি। হ্যারি বুঝল, ফ্রেদারিকো বেন্‌জামিনের হাত দেখেই বেশ সুবিধে করে নিয়েছে।

ফ্রান্সিসদের কয়েদ ঘরের জীবন এভাবেই কাটতে লাগল। দিন যায়, রাত যায়। দিনরাতের পার্থক্যও ওরা ভালোভাবে বুঝতে পারে না। দরজার পেছনে অন্ধকার না থাকলে বোঝে দিন, আর ওদিকটা অন্ধকার হ'লে বোঝে রাত্রি। ফ্রেদারিকোর সঙ্গে হ্যারির আর কোন কথাবার্তা হয়নি, ফ্রেদারিকো শুধু তামাক পাতা চিবোয় আর ঝিমোয়। আর মাঝে-মাঝে আয়নার ভাঙা টুকরোটা বের করে মুখ দেখে। মুখ ভ্যাংচায়। আপন মনেই বিড়-বিড় ক'রে কী বলে আর ঝিমোয়।

* * *

একদিন। তখন দিনই হবে। কারণ গরাদ দেওয়া দরজার ওপাশে আলোর আভাস ছিল। হঠাৎ বেন্‌জামিন আর দু'জন পাহারাদারকে খুব সন্ত্রস্ত মনে হ'লে। বেন্‌জামিন এক সময় ফ্রেদারিকোর কানের কাছে মুখ নিয়ে কী কী সব ফিস্‌ফিস্ করে ব'লে গেল।

একটু পরেই গারদ দেওয়া দরজার কাছে খট্ খট্ শব্দ উঠল। লা ব্রুশ আসছে বোঝা গেল। দরজা খুলে পাহারাদারেরা স'রে দাঁড়াল। লা ব্রুশ কাঠের পাঠাতনে ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে এগিয়ে এল। ওর হাতে একটা শঙ্কর মাছের চাবুক। আর কারো দিকে না তাকিয়ে লা ব্রুশ ফ্রেদারিকোর সামনে এসে দাঁড়াল। গম্ভীরগলায় ডাকল 'ফ্রেদারিকো।'

—'আজ্ঞে—' ফ্রেদারিকো আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ও যেন কাঁপছে। কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত ওর ভাবভঙ্গী।

—'তাহ'লে কি ঠিক করলে। পনেরো দিন সময় চেয়েছিলে। সে সময় পেরিয়ে গেছে।'

ফ্রেদারিকো ফ্যাসফেসে গলায় বলল—'আমি সত্যিই কিছু জানি না।'

—'তুমি সব জানো। মুক্তোর সমুদ্র থেকে অক্ষত দেহে বেরোবার উপায় একমাত্র তুমিই জানো'।

—'আমি যা জানি 'সবই আপনাকে বলেছি।'

ফরাসী ভাষায় গালাগাল দিয়ে লা ব্রুশ চাবুক চালাল। চাবুকের ঘায়ে ফ্রেদারিকো পড়ে যেতে-যেতে কোন রকমে দাঁড়িয়ে রইল। লা ব্রুশ ওর গলায় ঝোলানো লকেটের হাঁসের ডিমের মতো মুক্তোটা দেখিয়ে বলল, 'বল ; এটা তুই কী ক'রে আনলি' ?

ফ্রেদারিকো পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল—'ভাজিম্বাদের রাজার ভাণ্ডার থেকে চুরি করে এনেছি'।

'মিথ্যে বলছিস্।' লা ব্রুশ বাঘের মতো গর্জন করে উঠল। আবার চাবুক পড়ল ফ্রেদারিকোর গায়ে। একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ উঠল ওর গলায়। একে বয়েসের ভারে জীর্ণ-শীর্ণ শরীর ; তার ওপর এই চাবুকের মার। ফ্রেদারিকোর শরীর কাঁপছে তখন। ফ্রান্সিসের আর সহ্য হল না। ও দ্রুত উঠে দাঁড়াল হাতকড়া বাঁধা হাতটা তুলে বলল—'ওকে আর চাবুক মারবেন না।'

লা ব্রুশ তীব্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর দাঁত চাপাস্বরে বলল—'তাহ'লে ওর মারটা তুমিই খাও।'

প্রচণ্ড জোর চাবুক চালিয়ে চলল ফ্রান্সিসের শরীরের উপর। চাবুকের আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রান্সিসের শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু ওর মুখ থেকে একটা কাতর ধ্বনিও বেরোল না। দাঁতে-দাঁত কামড়ে মুখ বুঁজে চাবুকের মার সহ্য করতে লাগল। লা ব্রুশ এক সময় চাবুক মারা থামিয়ে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস শরীরের অসহ্য ব্যথায় ভেঙে পড়ল না। সোজাসুজি লা ব্রুশের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের ওপর এই অত্যাচার দেখে ভাইকিংদের রক্ত গরম হয়ে উঠল। শেকলে প্রচণ্ড শব্দ তুলে সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে কয়েকজন ঘিরে দাঁড়াল। হ্যারি চেঁচিয়ে বলল—'এবার আমাদের মারুন।'

লা ব্রুশ একবার ওদের দিকে তাকাল। তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর হাতের চাবুকটা কাঠের মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ফ্রেদারিকোর দিকে তাকিয়ে বলল—'এই শেষবার বলছি আর পনেরো দিন সময় দিলাম। এই শেষ। এর মধ্যেই আমরা চাঁদের দ্বীপে পেঁছিব। যদি অক্ষত দেহে মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনার উপায় না বলিস্, তাহ'লে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলবো তোকে।'

বলে লা ব্রুশ কাঠের পায়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ তুলে চ'লে গেল।

চাবুক কুড়িয়ে নিয়ে বেন্‌জামিন ক্যাপ্টেনের পেছনে-পেছনে চ'লে গেল।

ফ্রান্সিস বসে পড়ল। কিন্তু পেছনে হেলান দিয়ে বসতে পারল না। পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। হ্যারি ওর জামাটা তুলে ধরল। চাবুকটা পিঠের মাংস কেটে ব'সে গেছে। সারা পিঠে কালসিটে দাগ। কিন্তু ও চোখ বুঁজে চুপ করে বসে রইল। দাঁতে-দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল।

রাত্রে খাবার সময় ফ্রান্সিস বুঝলো, জ্বর এসেছে। কিছুই খেতে পারল না। কুণ্ডলী পাকিয়ে কাঠের পাঠাতনের উপর শুয়ে রইলো। অসম্ভব শীত করছে। মাথাটা ভীষণ দপ্ দপ্ করছে। পিঠের জ্বালাটা আরো বেড়েছে। ওর শরীরটা কুঁকড়ে যেতে লাগল। কিন্তু ও মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলো না। তাই কেউ ওর শরীরের অবস্থাটা বুঝতে পারলো না। যখন ও খেতেও উঠলো না, তখন হ্যারির মনে সন্দেহ হ'ল। ও হাতকড়ি বাঁধা দু'টো হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের কপালে রাখলো। জ্বরে কপাল পুড়ে যাচ্ছে। হ্যারি ওর গালে-গলায় হাত দিল। ভীষণ জ্বর উঠেছে। হ্যারি তাড়াতাড়ি ডাকল, 'ফ্রান্সিস'।

প্রথম ডাকে সাড়া পেলো না। আবার ডাকল 'বন্ধু'—

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে সাড়া দিতে হ্যারি বললো—'শরীর খুব খারাপ লাগছে?'

—'জ্বর এসেছে। সেরে যাবে।' স্পষ্ট বোঝা গেল যে ওর গলা কাঁপছে।

কিন্তু হ্যারি বুঝলো, জ্বর এত বেশি যে ফ্রান্সিসের বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। হ্যারি দ্রুত ভাবতে লাগল, ওষুধ কী ক'রে পাওয়া যায়। জ্বরটা কমাতেই হবে। ও ফ্রান্সিসের শরীরের অবস্থা অন্য কয়েকজন ভাইকিংকে বললো, কিন্তু কেউ কোন উপায় বলতে পারলো না। ওরা অসহায়ভাবে ফ্রান্সিসের কুণ্ডলী পাকানো শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ ওর নজর পড়লো ফ্রেদারিকোর ওপর। ফ্রেদারিকোও তখন থেকে একটানা গোঙাচ্ছে। শরীরের এই অবস্থায় ওর পক্ষে চাবুকের মার সহ্য করা সম্ভব হয়নি।

হ্যারি ভেবে দেখলো, একমাত্র ফ্রেদারিকোই পারে ফ্রান্সিসের জন্য ওষুধ আনতে। ও যদি বেন্‌জামিনকে বলে তা'হলেই একটা উপায় হ'তে পারে। হ্যারি ঝুঁকে পড়ে ফ্রেদারিকোকে ডাকল, 'ফ্রেদারিকো—ফ্রেদারিকো—'।

ফ্রেদারিকোর মাথাটা বুকের ওপর ঝুকে পড়েছিল। এই অবস্থাতেই ও গোঙাচ্ছিল। আরো কয়েকবার ডাকতে ফ্রেদারিকো জলে ভেজা চোখ মেলে হ্যারির দিকে তাকাল।

হ্যারি বললো, 'ফ্রেদারিকো শোন। খুব বিপদ—ফ্রান্সিসের ভীষণ জ্বর এসেছে। আর কিছুক্ষণ এই জ্বর থাকলে ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। শীগগির একটা উপায় বের করো।'

—'কার জ্বর এসেছে?'

—'যে ছেলেটি তোমার হয়ে চাবুক খেলো।'

—'এ্যা বলো কি!'

হ্যারি তখন আঙুল দিয়ে ফ্রান্সিসের কুণ্ডলী পাকানো শরীরটা দেখালো। ফ্রেদারিকো কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল—'আমাকে বাঁচাতে গিয়ে—ঈস্! আমি কী করি এখন?'

ফ্রেদারিকো নিজের কষ্টের কথাও ভুলে গেল।

—বেন্‌জামিন তো তোমার কথা শোনে, ওকে একবার ব'লে দেখো।

—'ভালো বলেছো, কিন্তু ও কী অতটা করবে?'

রাতের খাওয়া হ'য়ে গেছে। এঁটো থালা, গ্লাস নিতে প্রহরী দু'জন এসেছে। বেনজামিন ওদের পেছনে এসে দাঁড়াল। ওরা থালা নিয়ে বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ

করবে। প্রহরী দু'জন থালা-প্লাস নিয়ে চলে গেল। চকিতে ওদের যাওয়ার পথের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বেন্‌জামিন দ্রুতপায়ে ফ্রেদারিকোর কাছে এলো। নীচু হয়ে বসে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে জিজ্ঞেস করলো—'ফ্রেদারিকো—কেমন আছো?,

ফ্রেদারিকো মাথা নেড়ে বলল, 'আমার কথা বাদ দাও, ঐ ছেলেটাকে একটু দেখো তো, ভীষণ জ্বর এসেছে ওর।'

বেন্‌জামিন একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর কোন কথা না ব'লে উঠে চ'লে গেল।

ফ্রান্সিস তখন জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ। ও যেন স্বপ্নের মত স্পষ্ট দেখতে পেলো, ওদের বাড়ির বাগানটা সূর্যালোকে ঝলমল্‌ করছে। গাছপালা, ফুল কী, হাওয়া। উজ্জ্বল আলোয় ভরা মধ্য বসন্তের আকাশ। ও বাগানের দোলনায় দোল খাচ্ছে। হাস্যোজ্জ্বল মা'র মুখ। ওর দোলনা ঠেলে দিচ্ছে। ও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে নেমে আসছে। ছোটবেলার একটা আলোকোজ্জ্বল দিন্‌ ও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একজন পরিচারিকা কী নাম যেন, ওর মাকে এসে ডাকলো। ওর মা চ'লে গেল। পরিচারিকাটি দোলনা ঠেলে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস চ্যাঁচাচ্ছে 'আরো উঁচুতে ঠেল, আরো উঁচুতে'। পরিচারিকাটি ভীতস্বরে বলছে 'না, কর্তামা বকবে। তবু সে বেশ জোরেই ঠেলতে লাগল। ফ্রান্সিসের চোখের সামনে আকাশ, সাদাটে মেঘ, ঘরবাড়ি, গাছ-বাগান সব দুলছে। গায়ে হাওয়া লাগছে। ও খুশীতে চিৎকার করছে। হঠাৎ ছবিটার উজ্জ্বলতা কমতে লাগল। আস্তে-আস্তে অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে।

কয়েদ ঘরের লোহার দরজা খোলার শব্দ হলো। বেন্‌জামিন কী যেন একটা জিনিস লুকিয়ে নিয়ে আসছে। ও চুপিচুপি এসে ফ্রেদারিকোর হাতে একটা চিনে-মাটির ছোট বোয়াম দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো—'এটা ওর পিঠে আস্তে-আস্তে লাগিয়ে দাও, তুমিও লাগাও, সব সেরে যাবে। পরে ওটা নিয়ে যাবো। সাবধান, কেউ যেন না দেখে ফ্যালে।' বলে কাঠের পাটাতনে কোন শব্দ না তুলে বেন্‌জামিন চ'লে গেলো।

হ্যারি বোয়ামটা ফ্রেদারিকোর হাত থেকে নিলো। তারপর আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের পিঠে লাগিয়ে দিতে লাগলো। লাল আঠা-আঠা ওষুধটা। ওটা লাগাতেই ফ্রান্সিসের শরীর কেঁপে উঠলো। হ্যারি সাবধানে আলতো হাতে লাগাতে লাগলো। কেটে যাওয়া কালসিটে পড়া জায়গায় লাগানো শেষ হলো। কে জানে এটা কী ওষুধ? সারবে কিনা? এবার ফ্রেদারিকোর দিকে ফিরলো। ওর শতচ্ছিন্ন জামাটা সরিয়ে ওষুধটা লাগিয়ে দিল আস্তে-আস্তে। ফ্রেদারিকো অস্পষ্ট স্বরে গোঙাতে-গোঙাতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়লো। রাত বাড়তে লাগলো। আস্তে-আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়তে লাগলো। শুধু হ্যারির চোখে ঘুম নেই। হাতকড়া বাঁধা হাতটা দিয়ে মাঝে-মাঝেই ফ্রান্সিসের কপালের উত্তাপটা দেখছে।

রাত গভীর হতে বেনজামিন পা টিপে-টিপে এলো। ওষুধের বোয়ামটা নিয়ে চ'লে গেল খুব সাবধানে। দু'জন প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে।

সেই রাত্রির দিকে হ্যারির একটু তন্দ্রামত এসেছিল। ফ্রান্সিস বোধহয় পাশ ফিরে শুলো, তাই শেকলে শব্দ উঠলো। হ্যারির তন্দ্রা ভেঙে গেল। ও তাড়াতাড়ি

ওর কড়া লাগানো হাতটা ফ্রান্সিসের কপালে রাখল। দেখলো, কপাল ঠাণ্ডা। বোধহয় জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে হ্যারিকে ডাকতেই হ্যারি মুখ নীচু ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে বলল—"কি ?"

ফ্রান্সিস বললো—'শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে।'

'ও কিছু না—কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হ'য়ে যাবে'—হ্যারি বলল।

তারপর কড়া লাগানো হাতটা দিয়ে ফ্রান্সিসের কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস আবার ঘুমিয়ে পড়লো। হ্যারি আর ঘুমোল না। ফ্রান্সিসের কপালে-মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

সকাল হ'য়ে গেছে। সকলেই উঠে বসেছে। শুধু ফ্রান্সিস আধশোয়া হ'য়ে। শরীরের দুর্বলতাটা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। ওদের সকালের বরাদ্দ খাবার আলুসেদ্ধ আর কফিপাতা মেশানো সুপ। সকলেই খাচ্ছে। ফ্রেদারিকো তখন হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বন্ধু কেমন আছে ?'

—মনে হচ্ছে জ্বরটা ছেড়েছে। তবে শরীরটা এখনও দুর্বল আছে।

—বন্ধুর নাম কি ?

—ফ্রান্সিস।

ঠিক এই সময়ে বেনজামিন খাবারের থালা নিয়ে এলো। ফ্রেদারিকো ইশারায় ওকে ডাকলো। কাছে আসতে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস ক'রে বললো 'ঐ যে ছেলেটি ফ্রান্সিস, ওকে আমার সঙ্গে রাখো।' বেন্‌জামিন সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। তখন আর দু'জন প্রহরী খেতে গেছে। বেন্‌জামিন চাবি বের করে ফ্রান্সিসের কাছে এসে ওর হাতের কড়া খুলে দিল। তারপর বললো—'তুমি ফ্রেদারিকোর পাশে থাকবে। এসো।'

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে উঠে ফ্রেদারিকোর পাশে বসলো। ওখানে ওর হাতকড়া আটকে দিয়ে বেনজামিন চলে গেল। এবার হ্যারি আর ফ্রান্সিস ফ্রেদারিকোর পাশেই জায়গা পেল। ফ্রান্সিসও এটাই চাইছিল। কিন্তু বেন্‌জামিন তো কথা শুনবে না তাই ও কোনকথা বলেনি। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল কারণ, ফ্রেদারিকোকে লা ব্রুশ মুক্তোর সমুদ্রের কথা জিজ্ঞেস করেছে। মুক্তোর সমুদ্র কী ? কোথায় আছে এই মুক্তোর সমুদ্র ? কথাটা শুনে পর্যন্ত ফ্রান্সিসের মনে তোলপাড় চলছে। ফ্রেদারিকোর পাশে বসতেই ফ্রেদারিকো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল—'তুমি আমাকে চাবুকের মার থেকে বাঁচিয়েছো ফ্রান্সিস, তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না।'

—'পারবে !' ফ্রান্সিস ক্লান্ত হাসি হেসে বলল।

—কি ক'রে।

—যদি বলো মুক্তোর সমুদ্র ব্যাপারটা কি ?

কথাটা শুনে ফ্রেদারিকোর মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। ভীতমুখে ও বললো; না-না—মুক্তোর সমুদ্রের কথা ভুলে যাও—ওখানে গেলে কেউ ফেরে না।

ফ্রান্সিস হাসল। 'তুমি বলো তো মুক্তোর সমুদ্র ব্যাপারটা কি ?'

—'তুমি ওখানে যেতে চাও' ? ফ্রেদারিকো অবাক চোখে তাকাল।

—আগে শুনি তো।

—গেলেও ফিরে আসতে পারবে না।

—ঠিক আছে, ধ'রে নাও না আমার কৌতূহল হ'য়েছে।

ফ্রেদারিকো মুখ নীচু করে কী ভাবলো। তারপর বলল—'দেখো লা ব্রুশকে আমি সবই বলেছি, কিন্তু মুক্তোর সমুদ্র থেকে অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসবার ব্যাপারটা আজও আমার কাছে রহস্য থেকে গেল। কিন্তু লা ব্রুশের বিশ্বাস যে আমি সেটাও জানি। অথচ ঐ রহস্যটা যে ভেদ করা অসম্ভব, সেটা আমি ওকে বোঝাতে পারি নি।'

'ঠিক আছে'—ফ্রান্সিস উঠে বসে বলল—'তুমি যা জানো, বলো।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগলো—'কত বছর আগেকার কথা আমি বলতে পারবো না। কারণ এখানকার এই নরকে দিন রাত্রির কোন পার্থক্য নেই। আমি প্রথম-প্রথম দিনরাত্রের হিসাবের বহু চেষ্টা করেছি। পরে হাল ছেড়ে দিয়েছি।

ফ্রেদারিকো থেমে তার কোমরের গাঁট থেকে তামাকপাতা বের ক'রে মুখে ফেলে চিবুতে-চিবুতে বলতে লাগল—'একবার চাঁদের দ্বীপের কাছাকাছি আমাদের জাহাজ এসেছিল। আমাদের জাহাজটা ছিল মালবাহী জাহাজ। গায়েরও জোর ছিল, খাটতেও পারতাম খুব। ক্যাপ্টেন আমাকে খুব ভালোবাসতো। সেই প্রথম আমরা চাঁদের দ্বীপে যাচ্ছি।'

—চাঁদের দ্বীপ কোথায় ?

—আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ডাইনী দ্বীপ, তারও দক্ষিণে।

—লা ব্রুশ যে সেদিন বলেছিল এই ক্যারাভাল ডাইনী দ্বীপে যাবে।

—তা-তো যাবেই। লা ব্রুশ সমস্ত লুঠের সম্পদ ঐ দ্বীপেই রাখে। তারপরেই ও যাবে চাঁদের দ্বীপে।

—ও। তারপর ?

—চাঁদের দ্বীপের বন্দরটার নাম 'সোফালা'। এই দ্বীপের অধিবাসীদের বলা হয় 'ভাজিম্বা'। হলুদে চামড়া, বেঁটেখাটো মানুষ এরা। সোকালা বন্দর থেকে প্রচুর তামাক আর মধু রপ্তানি হয়। আমাদের জাহাজ থেকে চিনি, ময়দা, কাপড়-চোপড় এসবের বদলে তামাক পাতা, মধু নেওয়া হলো। এসব বাণিজ্যের জন্য ভাজিম্বাদের রাজার অনুমতি নিতে হয়। রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজসভায় রাজার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়—এই রীতি। কিন্তু এই চাঁদের দ্বীপের খ্যাতি অন্য কারণে। সেটা হলো এখানকার 'মুক্তোর সমুদ্র'। এই অঞ্চল দিয়ে যে সব জাহাজ যায়, সেইসব জাহাজের লোকরা সকলেই এই মুক্তোর সমুদ্রের গল্প শোনে। কিন্তু কেউ জানে না সেই মুক্তোর সমুদ্র কোথায়। তবে এটা সবাই জানতে পারে, যে সেখানে গেলে কেউ ফিরে আসে না। পরে সেই মুক্তোর সমুদ্র আমি দেখেছিলাম। আসলে ওটা একটা ল্যাগুন। ভাজিম্বরাও বলে মুক্তোর সমুদ্র। মস্তবড় ঝিনুক-এর তলায় বড়-বড় মুক্তো। হাঁসের ডিম থেকে শুরু ক'রে উটপাখির ডিমের মতো বড় সেই মুক্তো।'

—'বলো কি ?' ফ্রান্সিস আশ্চর্য হ'য়ে বললো। হ্যারিও কম অবাক হয় নি। বলে কি ? এত বড়ো মুক্তো।

—সেই মুক্তোর সমুদ্র কী ঐ দ্বীপের মধ্যেই ?

—'হ্যাঁ' বলে ফ্রেদারিকো চুপ ক'রে গেল। আর কোনো কথা না বলে চোখ বুজে

তামাক পাতা চিবুতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই অধীর হ'য়ে উঠলো। ফ্রান্সিস ব'লে উঠলো—'তারপর'?

ফ্রেদারিকো সেই চোখ বুঁজে তামাকপাতা চিবুতে লাগল। হ্যারি ওকে মৃদু ঝাঁকুনি দিল—'ফ্রেদারিকো, কি হ'লো'?

ফ্রেদারিকো পাতা চিবুনো বন্ধ ক'রে চোখ মেলে সেই ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বললো—'এই জোয়ান বয়েসে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাক, এটা আমি চাই না।'

'—সেটা আমরা বুঝবো। তুমি বলো।' ফ্রান্সিস অধৈর্য হ'য়ে বলল। কিন্তু ফ্রেদারিকো সেই যে চুপ করলো আর একটি কথাও বললো না। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অনেক ভাবে কথা বলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ফ্রেদারিকো মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে দিল! সেই চোখ বুঁজে তামাক পাতা চিবুতে লাগল। শেষে ফ্রান্সিস আর হ্যারি হাল ছাড়লো।

এর মধ্যে ফ্রান্সিস সুস্থ হলো। বেনজামিনের ওষুধে খুব উপকার হতে কয়েক-দিনের মধ্যেই আবার ও আগের মতো গায়ে শক্তি ফিরে পেল।

* * *

দিন যায়। ক্যারাভেলও চলেছে। কোনদিকে কোথায় যাচ্ছে, ফ্রান্সিসরা কেউ জানে না। ওদের একঘেঁয়ে বন্দীজীবন কাটাতে লাগল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পালাবার কত ফন্দী বার করে, কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা যাবে বলে মনে হয় না। ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

এদিকে ফ্রেদারিকোও আর মুক্তোর সমুদ্রের গল্প করে না। ঐ প্রসঙ্গ তুললেই ও চুপ ক'রে যায়। চোখ বুঁজে তামাকপাতা চিবোয়। কখনও বা গলায় লকেটের মতো ঝোলানো ভাঙা আয়নাটায় মুখ দেখে, চোখ বড়-বড় ক'রে নাক কুঁচকে ভেংচি কাটে। অন্য অনেক কথা বলে—ওর অতীত জীবনে জিপসিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার গল্প বা জাহাজী জীবনের গল্প সব বলে। কিন্তু মুক্তোর সমুদ্রের কথা উঠলেই চুপ করে থাকে।

এক দিন। সকালই হবে তখন। হঠাৎ ক্যারাভেলটা যেন থেমে আছে মনে হলো। জলদস্যুদের হাঁক-ডাক শোনা গেল। নোঙর ফেলবার ঘড়্-ঘড়্ শব্দ ভেসে এলো। সেই সঙ্গে পাখির কিচির-মিচির ডাক। নিশ্চয়ই কোন স্থলভূমিতে ক্যারাভেল লেগেছে; ফ্রান্সিসের মনটা খারাপ হ'য়ে গেল—আঃ কতদিন মাটি দেখিনা গাছপালা দেখিনা—পাখি-পাখালির ডাক শুনি না, আকাশ দেখি না। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাড়ির কথা মনে পড়লো। মা'র কথা। সবার কথা। ছোট ভাইটা এখন না জানি কত বড় হয়েছে। আর কি ওদের দেখতে পাবো? কোনদিন কি আর মাটি-আকাশ দেখতে পাবো? ফ্রান্সিস হঠাৎ মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসলো। এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাহলে শরীর মন ভেঙে যাবে। তা কখনই হতে দেওয়া চলবে না। এই বন্দী জীবন থেকে যে ক'রে হোক পালাতে হবে। এবার যেতে হবে মুক্তোর সমুদ্রে। উট পাখীর ডিমের মত মুক্তো। আঃ কল্পনাই করা যায় না। এখন শুধু ফ্রেদারিকোর কাছ থেকে মুক্তোর সমুদ্রের খোঁজটা নেওয়া। তারপর এখান থেকে পালানো! পালাতেই হবে। যে ক'রে হোক।

একটু পরেই বেনজামিন আর দু'জন প্রহরী সকালের খাবার নিয়ে এল। সকলে

খাচ্ছে, তখনই বেনজামিন বলল—'খাওয়ার পরে তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন এসো। ক্যাপ্টেন লা ব্রুশ তলব করেছে। সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো কি ব্যাপার। হঠাৎ জরুরী তলব। খাওয়া শেষ ক'রে কয়েকজন ফ্রান্সিসের দিকে স'রে এলো। ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না, কী বলবে ? যখন ডেকেছে, যেতেই হবে। না গেলে অগ্নিমূর্তি ধারণ করবে লা ব্রুশ। বলা যায় না হয়ত চাবুক হাতে ছুটে আসবে। তখন মুখ বুঁজে মার খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফ্রান্সিস বেনজামিনকে জিজ্ঞাসা করলো 'কেন ডাকছে ?'

'—আমি জানি না। আমি হুকুমের চাকর।' বেনজামিন বললো। ওর পাথরের মত মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। ফ্রান্সিস ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে বললো,—'ঠিক আছে যে কেউ চারজন যাও।' ভাইকিংরা উঠে দাঁড়ালো। বেনজামিন ওর কোমরে ঝোলানো চাবির গোছা থেকে চাবি নিয়ে চারজনের হাতকড়া খুলে দিলো। চারজন হাতের কব্জিতে হাত বুলোতে-বুলোতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তবু মুক্তি তো। বাইরের মাটি-আলো-বাতাসে যেতে পারবে। বহুদূর, বিস্তৃত আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। কতদিন পর ছাড়া পেল, তা মা মেরীই জানে।'

বেনজামিন চারজনকে নিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ ফ্রেদারিকো ঘুমিয়ে ছিল। আজকাল রাত্রে ওর ভালো ঘুম হয় না। ঘুম তাই ওর চোখে লেগেই থাকে। বেশ বেলা অব্দি ঘুমোয়। বেনজামিন ওর জন্যে বেলাতেই খাবার আনে। অন্যদের যে খাবার দেওয়া হয়, সে খাবারও দেয় না। কোনদিন কলা আধখানা, ডিম নয়তো বিস্কুট-পাঁউরুটির টুকরো। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বেনজামিন এসব খাবার এনে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে বেনজামিন লুকিয়ে খাবার নিয়ে এল। ধাক্কা দিতে ফ্রেদারিকোর ঘুম ভাঙল। খাবার এগিয়ে দিল। চারজন ভাইকিংকে লা ব্রুশ ডেকে নিয়ে গেছে, এ খবর ও জানতো না। কথায়-কথায় হ্যারি সেকথা ওকে বলল। ফ্রেদারিকো ভীষণভাবে চমকে উঠল। ফ্যাস্‌ফেসে গলায় যতটা জোর দেওয়া সম্ভব, ততোটা জোর দিয়ে বলল—'করেছো কি ? ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে ?'

—'তার মানে ?' হ্যারি তো অবাক। ফ্রান্সিসও এদের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এল। ফ্রেদারিকো বলল—'জানো, ওদের কেন নিয়ে গেল লা ব্রুশ ?'

—'তা কি ক'রে বলবো।' হ্যারি বলল।

—'এই ক্যারাভেল জাহাজ ডাইনীর দ্বীপে এসে লেগেছে। লা ব্রুশ ওর লুট করা সম্পত্তি ধন ডাইনীর দ্বীপে কোথায় কোন গহ্বরে কোন গুহায় লুকিয়ে রাখবে। অত লুটের মাল ব'য়ে নিয়ে যেতে লোক দরকার, তাই ওদের নিয়ে গেছে।'

—তবে আর ভয়ের কি আছে ?' ফ্রান্সিস বলল ;

—'হুঁ'—ফ্রেদারিকো খানিকক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—'লা ব্রুশ ওদের দিয়ে লুটের মাল রেখে আসবে। ওরাও জায়গাটা দেখবে। এর পরেও কি লা ব্রুশ ওদের বাঁচিয়ে রাখবে ?'

সত্যিই তো ! এ কথাটা তো ওরা ভাবে নি। লা ব্রুশ তো ওদের ওখানেই মেরে

ফেলবে। গুপ্তধন ভান্ডারের খোঁজ জানে, এমন কাউকেই বেঁচে থাকতে দেবে, এ অসম্ভব। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। ওদের ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু কি ক'রে ফিরিয়ে আনব ? ওরা চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। এতক্ষণে বোধহয় ডাইনীর দ্বীপে পৌঁছেও গেছে।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল—'বেনজামিন—বেনজামিন।'

বেনজামিন দরজার কাছে গারদ ধ'রে দাঁড়াল।

—লা ব্রুশ কোথায় ?

—বলা বারণ।

—আমাদের চারজন লোক ?

—বলা বারণ।

—লা ব্রুশকে বলো আমরা তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—এখন দেখা হবে না।

—'এক্ষুনি ক্যাপ্টেনকে ডাকো।' ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য ভাইকিংরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওদের চারজন বন্ধুর বিপদের আশংকা ওদেরও ভীষণভাবে বিচলিত করল ! লোহার শেকলে হাতকড়ায় ঝনঝন শব্দ উঠল।

বেনজামিন ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে দেখে তারপর চ'লে গেল। ফ্রান্সিস চিৎকার ক'রে ডাকল—'বেনজামিন।'

কিন্তু বেনজামিন ফিরল না। অন্য দু'জন পাহারাদার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে দরজায় পাহারা দিতে লাগল।

রাগে-দুঃখে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। ও যদি বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারতো, যে ওর বন্ধুদের সাংঘাতিক বিপদ হ'তে পারে, তা'হলে নিশ্চয়ই রুখে দাঁড়াত। কিন্তু এমন আর কিছু করার নেই। সর্বনাশ যা হবার হ'য়ে গেছে। ওই বন্ধু চারজন আর কোনদিন ফিরবে না। ওর ক্রুদ্ধ চোখ-মুখ থেকে আগুন ঝরতে লাগল। পাগলের মত হাতের কড়াটা কাঠের মেঝেয় ঠুকতে লাগল। কব্জীর চামড়া ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। হ্যারি ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। বারবার বলতে লাগল—'ফ্রান্সিস শান্ত হও। মাথা ঠিক রাখো।'

ফ্রান্সিস তবুও মাথা ঝাঁকিয়ে মেঝেতে হাতের কড়াটা জোরে-জোরে ঠুকে চললো। তারপর একসময় ক্লান্ত হ'য়ে রক্তাক্ত হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে ফোঁপাতে লাগল।

* * *

ওদিকে সেই চারজন ভাইকিং কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে যখন ডেক-এ উঠলো—সকালের ঝকঝকে উজ্জ্বল রোদে ভালো করে তাকাতেই পারল না। চোখে হাত চাপা দিয়ে চলল। ক্যারাভেল-এর মাথার কাছে এসে দেখল একটা মোটা কাছি ঝুলছে। নীচে জলের ওপর একটা ছোট নৌকা। নৌকার মাঝখানে একটা পেতলের কারুকাজ করা লোহার বড় সিন্দুকের মত বাক্স। একটু দূরেই ডাইনির দ্বীপ, দূরবিস্তৃত বালিয়াড়ি। নারকোল গাছের সারি। তারপর সবুজ গাছ-গাছালি ঢাকা পাহাড়। কতদিন পরে মাটি-গাছপালা-আকাশ দেখছে। ওদের আনন্দ ধরে না। বেনজামিনের নির্দেশে ওরা কাছি-বেয়ে নেমে এল। একটু পরেই ডেক-এর ওপর খট্ খট্ শব্দ তুলে লা ব্রুশ এল। জলদস্যুরা সবাই সন্ত্রস্ত। জাহাজের মাথার কাছে একটা দড়ির

জালমতো ঝুলছিল। লা ব্রুশকে সকলে ধরাধরি করে সেই জালের মধ্যে বসিয়ে দিল। আস্তে-আস্তে জালটা দড়ি দিয়ে নামাতে লাগল. লা ব্রুশ নৌকোর ওপর আসতেই জাল নামানো বন্ধ হলো। লা ব্রুশ কাঠের পা বের করে জাল থেকে ঠক্ ক'রে নৌকোর ওপর নামল। ভাইকিং চারজন দেখল লা ব্রুশের কোমরে তরোয়ালের সঙ্গে নক্সা আঁকা মিনে করা একটা লম্বা নল ওলা পিস্তল গোঁজা। লা ব্রুশ নৌকায় বসেই দ্বীপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হুকুম দিল—চল।

চারজনে দাঁড় বাইতে লাগল। এতক্ষণে ওদের চোখে আলো সহ্য হ'য়ে গেছে। ওরা বেশ জোরে-জোরেই দাঁড় বাইতে লাগল। এখানে সমুদ্র শান্ত। ঢেউয়ের খুব ধাক্কা নেই। ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীপে পৌঁছল। দ্বীপের বালিয়াড়িতে প্রথম নামল লা ব্রুশ। পেছন ফিরে বলল—'ঐ সিন্দুকটা নিয়ে আমার পেছনে-পেছনে তোরা আয়।'

—'কোথায়'? একজন ভাইকিং জিজ্ঞাসা করল।

—'চল না সব দেখবি'—লা ব্রুশ খুক-খুক্ ক'রে হেসে বললো।

ওরা ধরাধরি করে সিন্দুকটা নামাল। তারপর ধরে-ধরে বয়ে নিয়ে চলল লা-ব্রুশের-পেছনে।

একটু পরেই শুরু হলে পাহাড় এলাকা, রাস্তা বলে কিছুই নেই, এবড়ো-খেবড়ো পাথর-নুড়ি, বুনো ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে এগোতে হচ্ছে। লা ব্রুশ আগে-আগে চলেছে। তরোয়াল চালিয়ে ঝোপ-জঙ্গল কেটে এগোচ্ছে। পেছনে ওরা চারজন! অসম্ভব ভারী বাক্স। তারপর ওরকম উঁচু-নীচু রাস্তা। ওরা ঘেমে উঠল। লা ব্রুশ এক একবার থামছে, আর পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে। এতক্ষণে ওরা লক্ষ্য করলো যে মাথার ওপর গাছের ডালপালা থেকে কী যেন ওদের গায়ে পড়ছে। মাটিতে খালি পা কিসে লেগে খড়-খড় করছে। একজন ভালো করে দেখল—জোঁক পা কামড়ে ধরছে।৷ গাছের ডাল থেকে গায়ে পড়ছে জোঁক লা ব্রুশের পরনে লম্বা কোট, এক পায়ে বুটজুতো আর এক পা তো কাঠের। ওর কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ভাইকিংরা ভীত হয়ে পড়ল। এত জোঁক?

ওরা তাড়াতাড়ি বাক্স নামিয়ে জোঁক ছাড়াতে লাগল। লা ব্রুশ ঘুরে দাঁড়িয়ে তরোয়াল ওঁচাল—'জলদি চল্'।

ওরা আর কি করে! তবু একজন ভাইকিং বলে উঠল, 'জোঁকে খেয়ে ফেলছে—হাঁটবো কি করে! লা ব্রুশ খুক্ খুক্ করে হাসল—'অনেকদিন মানুষের রক্ত খায় নি তো। চল্। গুহায় পৌঁছে নুন দিয়ে দেবো। চল্ জলদি।'

আবার চলা শুরু হলো তখন ওদের গায়ে হাতে-পায়ে জোঁক আছে। একটা খাড়াইয়ের ওপর এসে পৌঁছল ওরা। ওপর থেকে ঝর্ণার জল পড়ছে। জায়গাটা ভেজা-ভেজা। অনেক ফার্ণ গাছ। পাথরে সবজে শ্যাওলার আস্তরণ।

লা ব্রুশ হাত তুলে ওদের থামতে ইঙ্গিত করল। ওরা বাক্সটা নামিয়ে হাঁপাতে লাগল। গায়ে লেগে থাকা জোঁক্ টেনে তুলতে লাগল। একজন লা ব্রুশকে বলল—'কই নুন দিন'?

লা ব্রুশ কোমরে বেল্টের মধ্যে থেকে একটা পুটুলি বের করল। পুটুলি থেকে ওদের হাতে নুন ঢেলে দিলে। নুন লাগাতেই জোঁকগুলো টুপটুপ করে খসে পড়ল।

লা ব্রুশ ও নিজের গায়ের দু' এক জায়গায় নুন লাগাল। জোঁকগুলো খসে পড়ল। লা ব্রুশ এবার শ্যাওলার আস্তরণে ঢাকা একটা মস্তবড় পাথরের চাঁই ধ'রে টানল। পাথরটা বেশ কিছুটা সরে গেল। ফাটল দেখা গেল। লা ব্রুশ ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে সরে এসে বলল—'এই চাঁইটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দে।'

ওরা চারজনে মিলে পাথরটা টান দিয়ে সরাতে ফাঁকটা আরো বড় হল।

'আরো খুলতে হবে'—লা ব্রুশ বলল।

আবার ওরা ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। একজন মানুষ ঢোকাবার মত ফাঁক হল। আবার কয়েকটা ধাক্কায় বাক্স গলে যাবার মতো ফাঁক হলো লা ব্রুশ বলল—'এবার শুধু দু'জনকে বাক্সটা ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে।' ভাইকিংদের মধ্যে দু'জন এগিয়ে এল। বেশ কষ্ট করে দু'জন ফাটলটার মধ্যে দিয়ে বাক্সটা নিয়ে ভেতরে ঢুকল। দেখল, ভেতরটা একটা গুহা, অন্ধকার। শুধু পাথরের চাঁইয়ের ফাটলটার মধ্যে দিয়ে একটু আলো আসছে। চোখে অন্ধকার সয়ে যেতে ওরা দেখল, ভেতর বেশ কয়েকটা একইরকম লোহার বাক্স। পেতল দিয়ে নক্সা করা। ওরা বুঝল, এটাই হচ্ছে লা ব্রুশের গুপ্ত ধনভাণ্ডার হঠাৎ ওরা পায়ে হোঁচট খেল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল কয়েকটা নরকঙ্কাল। হয়তো আরো নরকঙ্কাল আছে, কিন্তু এই আলোতে দেখা যাচ্ছে না। এইবার ওরা ভীত হলো, পরস্পরের হাত ধরল। লা ব্রুশের এই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ জানার পর লা ব্রুশ কি ওদের বেঁচে থাকতে দেবে? একজন চেঁচিয়ে উঠল—শীগগির পালাও। দু'জনে পাথরের ফাটলের দিকে ছুটল। ঠিক তখনই সেই ফাটলের মুখে এসে দাঁড়াল লা ব্রুশ। হাতে উদ্যত রিভলবার, ওরা কিছু বোঝবার আগেই লা ব্রুশ গুলি চালাল। নিখুঁত নিশানা। দু'টো গুলিই ওদের হৃৎপিণ্ড ভেদ করল। একজন তবু মাটিতে পড়ে আঁ-আঁ করে দু' একবার কাতরাল। অন্যজন মাটিতে পড়ে আর নাড়ল না।

বাইরে যে দু'জন 'ভাইকিং' দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজনের নাম 'বিস্কো'। লা ব্রুশ পিস্তল হাতে ওদের দু'জনের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই বিস্কো চেঁচিয়ে উঠল 'পালাও।' বিস্কো চিৎকার করে উঠেই খাড়াই থেকে একটা গাছ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। গাছটার মগডাল ধরে ঝুলে পড়ল। ডালটা ভেঙে গেল কিন্তু খুলে এলো না। ও প্রথম ধাক্কাটা সামলালো। তারপর ডাল বেয়ে নেমে আসতে লাগল। এত দ্রুত বিস্কো ঝাঁপ দিয়েছিল, যে লা ব্রুশ পিস্তল নিশালা করবার অবকাশ পেল না, অন্যজনও সঙ্গে-সঙ্গে নীচের দিকে ছুটল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। লা ব্রুশের নিখুঁত নিশানার গুলি ওর পিঠ ভেদ করে ঢুকে পড়ল। ও খাড়াই পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা পাক খেয়ে নীচে গাছ-গাছালির আর ঝোপের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। যে গাছটায় বিস্কো লাফিয়ে পড়েছিল—সেই গাছটা লক্ষ্য করে লা ব্রুশ পিস্তল থেকে দু'টো গুলি ছুঁড়লো। কিন্তু কোনটাই বিস্কোর গায়ে লাগল না। কারণ, বিস্কো ততক্ষণে অন্য একটা ঝোপে আত্মগোপন করেছে।

লা ব্রুশ পিস্তলটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে আপনমনেই খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল। তারপর ঠক্-ঠক্ করে এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে ফাটলের পাথরটায় ধাক্কা দিল। প্রাণপণে বার-কয়েক ধাক্কা দিতেই পাথরটা আগের মত লেগে গেল। সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা পাথরের গায়ে ফাটলটা কোথায়, সেটা আর বোঝবার উপায় রইল

না।

একবার লা ব্রুশ কাঠের পায়ে ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে আসতে লাগল। ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে আসতে লাগল। গাছের পাতা থেকে বেশ কয়েকটা জোঁক্ পড়ল। গায়ে-পায়ে লেগেও রইল কয়েকটা। সমুদ্রের তীরে এসে নুন ছিটিয়ে জোঁকগুলো ফেলে দিল। তারপর কাঠের পায়ে ভর দিয়ে নৌকোয় উঠে বসল। নৌকা ছেড়ে দিয়ে দাঁড় বাইতে লাগল।

* * *

এদিকে ফ্রান্সিসরা প্রথম দু'টো গুলির শব্দ অস্পষ্ট শুনেছিল। কিন্তু পরের গুলির শব্দগুলো স্পষ্টই শুনলো। ওদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। দু'একজন ফ্রান্সিসকে ডেকে বলল, 'ফ্রান্সিস—নিশ্চয়ই বিস্কোরা কোন বিপদে পড়েছে। তুমি কিছু একটা করো।'

ফ্রান্সিস মুখ নীচু করে গভীর বিষাদে মাথা নাড়ল—'কিছুই করার নেই। এই অন্ধকূপ থেকে বেরোতে না পারলে আমরা অসহায়। এখন সবরকম অন্যায়-অবিচার মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে। কোন উপায় নেই।'

কথা বলতে-বলতে ফ্রান্সিসের মুখ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। দুচোখ জ্বালা করে জলে ভরে উঠল। ভাইকিং বন্ধুরা কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠল। পরস্পর এই নিয়ে বলতে-বলতে সবাই উঠে দাঁড়াতেই হাতের কড়ায় শেকলে শব্দ উঠল। ওরা একসঙ্গে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল—'হো—হো—ও—ও।'

বেনজামিন ছুটে এসে দরজার গরাদের ওপাশে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে দু'-একজন চীৎকার করে বলল—'আমাদের বন্ধুরা কোথায়?'

—'আমি কিছু জানি না।' বেনজামিন নির্বিকার মনে জবাব দিল।

—'তুমি ওদের নিয়ে গেলে কেন'? একজন জিজ্ঞেস করল।

—ক্যাপ্টেনের হুকুমে।

—ক্যাপ্টেন ওদের কোথায় নিয়ে গেছে?

—'বলা বারণ'। বেনজামিনের মুখ পাথরের মত শক্ত-ভাবলেশহীন।

—'তোকে খুন করবো—একজন চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সকলে চিৎকার করে উঠল—'হো—ও—ও'। সবাই শেকল ধরে টানতে লাগল। কিন্তু অত্যন্ত শক্ত ভাবে কাঠের কাঠামোতে গাঁথা শেকলের ঝন্-ঝন্ শব্দই শুধু হলো। ঐ শেকল ছেঁড়া অসম্ভব। ওরা আবার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—'হো—ও—ও'। ঠিক তখনই ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে ফ্রান্সিস অস্পষ্ট ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। কড়ায় বাধা দু'হাত তুলে বলল—'ভাইসব—শান্ত হও, খুব সম্ভব লা ব্রুশ আসছে'।

একটু পরেই পাহারাদার দু'জন সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াল। বেন্জামিন এগিয়ে এসে দরজা খুলতে লাগল। দরজা খোলা হল। লা ব্রুশ ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে এগিয়ে এসে ভাইকিংদের জটলার দিকে তাকিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল—'এত চেঁচামেচি কিসের?'

ফ্রান্সিস এতক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ বসেছিল। এইবার উঠে দাঁড়াল। তখন গোলমাল থেমে গেল। ফ্রান্সিস বলল—'আমাদের বন্ধুরা কোথায়?'

লা ব্রুশ ওর দিকে ঘুরে তাকিয়ে খুব সহজ ভঙ্গীতে বলল—'দু'জন আমার গুপ্ত-ভাণ্ডারে পাহারা দিচ্ছে। একজন পালাতে গিয়ে মারা গেছে।'

—অতগুলো গুলীর শব্দ পেলাম কেন?

লা ব্রুশের ক্রুদ্ধ চোখ-মুখ নরম হ'য়ে এল। খুক্-খুক্ করে হেসে উঠল। বলল—'ও এই ব্যাপার? আরো দু'টো তোতা পাখি মেরেছি—রাত্তিরে রোস্ট খাবো। তোফা মাংস'।

—আপনার গুপ্তভাণ্ডার কোথায়?

'—বলবো না'—লা ব্রুশ ক্রুদ্ধভঙ্গীতে চীৎকার করে উঠল।

—'আমাকে বলতেই হবে'। ফ্রান্সিস দাঁত চাপাস্বরে বলে উঠল—'বলতে হবে আপনাকে ওদের দু'জনকে কোথায় রেখে এসেছেন'?

একটু থেমে লা ব্রুশ বলল—'ডাইনির দ্বীপে যাও, খুঁজে বের কর গে।'

'—আপনার গুপ্তভাণ্ডারের ওপর আমাদের বিন্দুমাত্র লোভ নেই, কিন্তু ঐ দু'জনকে এক্ষুনি ফিরিয়ে আনতে হবে—' ফ্রান্সিস বলল।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে লা ব্রুশ বলে উঠল—'অনেক সহ্য করেছি, আর একটা কথা বলবে তো—' বলে লা ব্রুশ কোমরের বেলটে গোঁজা পিস্তলটা বার করে ফ্রান্সিসের বুকের দিকে নিশানা করে স্থির দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস তিক্ত হাসি হাসল। বলল, 'লা ব্রুশ তুমি একটা জঘন্য নরঘাতক খুনে। কিন্তু তোমার কুবুদ্ধি কিছু কম না। তুমি কিছুতেই এখন আমাদের মারবে না। বাঁচিয়ে রাখবে। য়ুরোপের ক্রীতদাসের বাজারে আমাদের জন্যে ভালো দাম পাবে এই আশায়'। লা ব্রুশ এক মুহূর্ত কি ভাবল। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখতে-রাখতে সহজভঙ্গীতে বলল—'নাম কি তোমার'?

—'ফ্রান্সিস আমার নাম'—একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল 'লা ব্রুশ—সোনার ঘণ্টার গল্প শুনেছো?'

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—ওটা একটা ছেলে ভুলানো আজগুবি গপ্পো।

—না-ওটা গল্প নয়। সেই সোনার ঘণ্টা এখন আমাদের দেশে।

—'বলো কি'। লা ব্রুশ বেশ অবাক হয়ে বলল।

—'হ্যাঁ। বহু দুঃখকষ্ট স্বীকার করে আমি আর আমার বীর বন্ধুরা সেই সোনার ঘণ্টা এনেছি। অতবড় হীরে এনেছি, যার জন্যেও কম কষ্ট করিনি'। ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল, 'তাই বলছিলাম গুলির ভয় দেখিও না—ফ্রান্সিস মৃত্যুকে ভয় পায় না। কিন্তু এই বলে রাখছি যদি আমাদের বন্ধুদের কাউকে তুমি হত্যা করে থাকো তো তোমাব মুক্তি নেই, আমি প্রতিশোধ নেবই'।

লা ব্রুশ খুক্-খুক্ করে হেসে উঠে বলল—'হাতে হাতকড়া, তাও শেকলে বাধা। প্রতিশোধের কথা ভাবতে-ভাবতেই জীবন শেষ হয়ে যাবে'।

—'বেশ থাক না আমার জীবন। আমার বীর বন্ধুরা রয়েছে, তারা প্রতিশোধ নেবে—আমার ভাই রয়েছে, সে তোমাকে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নেবে। আমরা ভাইকিং'।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল ও—ও—হো-হো—ও। চীৎকার থামলে ফ্রান্সিস বলতে লাগল, 'লা-ব্রুশ আমার বন্ধুদের

জিজ্ঞেস করে দেখ, তোমার চাইতে অনেক সুখে, অনেক স্বাচ্ছ্যন্দের মধ্যে আমি জীবন কাটাতে পারতাম। কিন্তু আমি সেই সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের নিশ্চিন্ত জীবন ঘৃণা করি। আমি ভালোবাসি ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবিপদ, দুঃখ-কষ্টের জীবন। মানুষের জীবনের এখানেই সার্থকতা। এই শেষকথা জেনে যাও লা ব্রুশ, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। তোমার মত একটা জলদস্যুকে তো নয়ই'। আবার একটু থেমে বলল, 'তোমরা তো কাপুরুষ। নিরস্ত্র অবস্থায় আমাদের বন্দী করেছ। আমাদের হাত খুলে দাও, আর একটা করে তরোয়াল দাও—ধুলোর মত উড়ে যাবে তোমরা।'

সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল ও—হো—হো—ও।

লা ব্রুশ আর কোন কথা না ব'লে কাঠের পা ঠক্-ঠক্ করতে করতে চ'লে গেল। তারপর বেনজামিন দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ব'সে পড়ল। তখন ও রাগে ফুঁসছে। রক্তাক্ত কব্জির দিকে তাকিয়ে ও চুপ ক'রে ব'সে রইল। ওর পাশে হ্যারিও চুপ ক'রে বসে রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হ্যারি ডাকল—'ফ্রান্সিস—'

—বলো।

—লা ব্রুশের কথা থেকে কিছুই বোঝা গেল না। দু'জনকে পাহারায় রেখে এসেছে মানেটা কি? পালালোই বা কে?

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফ্রেদারিকো আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। দু'জনে ওর দিকে তাকাল। ফ্রেদারিকো ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বলল—'ফ্রান্সিস, বুঝলে কিছু।'

ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। ফ্রেদারিকো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'বোধহয় ওদের চারজনের কেউ বেঁচে নেই।'

—বলো কি?

—জলদস্যুদের রীতিনীতি আমি ভালো ক'রেই জানি। ওরা ওদের গুপ্তধন ভাণ্ডারের মধ্যে লুটের মাল রাখতে যাদের নিয়ে যায়, তাদেরই হত্যা করে রেখে আসে। এতে কারো পক্ষে গুপ্তধন ভাণ্ডারে খোঁজ পাওয়ার উপায় থাকে না। তার উপর ওদের একটা কুসংস্কারও আছে। যাকে বা যাদের মেরে রাখা হয়, তারা নাকি জিন হয়ে সেই গুপ্তধন পাহারা দেয়।

ফ্রান্সিস অস্পষ্টস্বরে বলল—'তাহ'লে ওরা কেউ বেঁচে নেই।'

—'একজন পালিয়েছে বলল—হয়তো সেই বেঁচে আছে।'

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল! কিন্তু কদ্দিন বাঁচবে। ডাইনীর দ্বীপ নাম। বুঝতেই তো পারছো কী ভয়াবহ জায়গা। তারপর বললো—'আচ্ছা ফ্রেদারিকো, তুমি কখনো ডাইনীর দ্বীপে গেছো?'

—একবার-তাও দিনের বেলা। ইয়া বড়-বড় কত যে জোঁক ঐ দ্বীপে। আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমরা পালিয়ে এসেছিলাম। তোমাদের যে বন্ধু পালিয়েছে, সে যদি জোঁক'র হাত থেকে বাঁচবার উপায় বার করতে পারে, তাহলে হয়তো বেঁচে যেতে পারে। কারণ, এখানে প্রচুর পাখী আছে আর মিঠে জলের ঝরনা আর হ্রদ আছে।

—'তুমি তাহলে এইদিকে কয়েকবার এসেছো'? হ্যারি বলল।

—'হ্যাঁ বেশ কয়েকবার। এরই দক্ষিণে কয়েকশো মাইল দূরে চাঁদের দ্বীপ।'

ফ্রান্সিস আধশোয়া হয়ে এতক্ষণ হারানো বন্ধুদের কথা, কি উপায়ে এখান থেকে পালানো যায়, এসব নানা কথা ভাবছিল। হঠাৎ চাঁদের দ্বীপ কথাটা কানে যেতে ও সজাগ হয়ে উঠে বসে বলল—'ফ্রেদারিকো তুমি কিন্তু চাঁদের দ্বীপ মুক্তোর সমুদ্র এসবের কথা আর কিছুই বললে না।'

ফ্রেদারিকো কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'ফ্রান্সিস, তোমাকে আমি বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করলাম।' একটু চুপ ক'রে থেকে বলল—'দেখলাম, তুমিই উপযুক্ত। তোমাকেই সব বলছি। কিন্তু যদি মুক্তোর সমুদ্রে গিয়ে প্রাণহানি হয়, তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবে না।'

—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। সমস্ত ঘটনাটা আমাকে বলো। তারপর আমি ভেবে দেখবো, আমরা যাবো কি যাবো না।

—'শোন তাহলে।' ফ্রেদারিকো কোমর থেকে তামাকপাতা বের ক'রে মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতে-চিবুতে বলতে লাগল—'তোমাকে আগে কিছু ঘটনা ব'লেছি। আবার বলি শোন। একটা মালবাহী জাহাজে কাজ করতাম তখন। জাহাজটা ফিরছিল আফ্রিকার এক বন্দর থেকে। প্রচণ্ড ঝড়ের পাল্লায় পড়ে জাহাজটা অনেক দক্ষিণদিকে চলে গিয়েছিল। ফিরে আসছি, তখনই, আমাদের ফেরার পথে পড়ল চাঁদের দ্বীপ। আমার জাহাজ জীবনে অনেকের মুখেই চাঁদের দ্বীপের শুনেছি। এবার চোখে দেখলাম। দূর থেকে দেখা গেল কাঁচের পাহাড়।'

—'কাঁচের পাহাড় মানে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'দ্বীপের উত্তরদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে এই কাঁচের পাহাড়। যেন কাদার তাল শুকিয়ে নিরেট পাথর হ'য়ে গেছে। এমন এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো মাটি-পাহাড় গড়া প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল। সেই এবড়ো-খেবড়ো পাথরগুলো এমন ছুঁচালো আর ধারালো যেন ভাঙা কাঁচের মত। সেখানে পা রাখার উপায় নেই। পা ফালা-ফালা হয়ে যাবে। পা পিছ্‌লে পড়লে তো সমস্ত শরীর টুকরো-টুকরো হ'য়ে কেটে যাবে। কথাটা শুনে বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু জাহাজটা যখন কাঁচ পাহাড়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখলাম সত্যিই তাই। এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-উঁচু পাথরের ছুঁচালো ডগা। সেই পাহাড়ে ওঠা তো দূরের কথা, পা রাখার উপায় নেই।' একটু থেমে তামাকপাতা চিবোতে-চিবোতে ফ্রেদারিকো আবার বলতে লাগল—'ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়ে-দিয়ে আমরা সোফালা বন্দরে এলাম। চাঁদের দ্বীপের ওটাই একমাত্র বন্দর, ঐ যে কাঁচপাহাড় বললাম, তার ও'পাশেই মুক্তোর সমুদ্র।'

—'ও' পাশেই'? ফ্রান্সিস আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ, কিন্তু কাঁচের পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া শুধু অসম্ভব নয়, অকল্পনীয়।

—তারপর?

—জাহাজটা সোফালা বন্দরে নোঙর ক'রে রইল। আমরা দ্বীপটা ঘুরে-ঘুরে দেখলাম। কিন্তু সব জায়গায় আমাদের যাওয়ার হুকুম ছিল না। লম্বা-লম্বা বর্শা হাতে সব পাহারাদাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ ক'রে উত্তর-পূর্বমুখো যেদিকে যেদিকে মুক্তোর সমুদ্র, সেদিকে যাওয়ার উপায় ছিল না।

ফ্রেদারিকো একটু থামল। তারপর গলায় ঝুলোনো ভাঙা আয়নার অংশটা গলা থেকে খুলল। আয়নাটা উল্টোপিঠে যেখানে পারা লাগানো থাকে, সেইদিকে কি

যেন খুঁটতে লাগলো, কালচে চামড়ার মত কি যেন একটা খুঁটে-খুঁটে তুলছে। যখন খুঁটতে-খুঁটতে সবটা তুলে ফেলল, তখন দেখা গেল এক টুকরো সাদাটে চামড়া। ওটা ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে ফ্রেদারিকো বললো—'এই দেখ চাঁদের দ্বীপের আর মুক্তোর সমুদ্রের নক্সা।'

নক্সাটা দেখতে ছিল এই রকম—

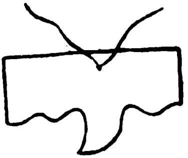

ফ্রান্সিস হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দ্বীপটা দেখতে ঠিকই আধখানা চাঁদের মত। নক্সাটা সোজা করলে একরকম কালো কালি দিয়ে আঁকা নক্সা। দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কিছু লেখাও নেই।

ফ্রেদারিকো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে-দেখিয়ে সব বোঝাল। ফ্রান্সিস মনে মনে সেগুলোর নাম ভেবে নিয়ে তারপর ম্যাপটাকে উল্টো করে ধরতেই একটা স্পষ্ট নক্সা ফ্রান্সিসের চিন্তায় ধরা দিল। সেটা দাঁড়াল ঠিক এই রকম—

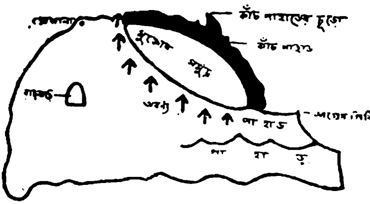

ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—'একদিন রাজবাড়ি দেখতে গেলাম। নামেই রাজবাড়ি। দেখতে ট্রাভেলার্সট্রীট পাতা দিয়ে ছাওয়া বাড়ি। ঐ গাছের মূল শিরা থেকে দরজা তৈরি করা হ'য়েছে। এই ট্রাভেলার্সট্রী যে এদের কত কাজে লাগে, তা বলবার নয়। এই গাছের পাতার গোড়ায় জল জমা থাকে। নাড়ালেই প্রচুর মিষ্টি জল পড়ে। পাতার গোড়া ফুটো করলেও জমা জল পড়ে'। ফ্রেদারিকো একটু ভেবে বলতে লাগলো—'রাজবাড়ির প্রবেশপথের মাথায় মরা মানুষের মাথার খুলি সারি-সারি সাজানো। ভেতরে ঢুকে রাজসভা দেখলাম, বৃদ্ধ রাজা কাঠের তৈরি সিংহাসনে ব'সে আছে। আশ্চর্য! রাজার মাথা ন্যাড়া। একটিও চুল নেই। পরে শুনলাম, কাঁচ পাহাড়ের পাথর দিয়ে ঘষে-ঘষে চুল তুলে ফেলা হয়। রাজার গলায় হাঁসের ডিমের মত আকারের মুক্তোর মালা। রাজার সিংহাসনেও মুক্তো বসানো। পরনে সর্বাঙ্গ ঢাকা সার্টিনের কাপড়। রাজপুরোহিত, সেনাপতি মন্ত্রী

সকলের গলাতেই মুক্তোর মালা। রাজসভার জাকজমক নেই। কিন্তু রাজাকে সবাই মান্য ক'রে চলে। চারদিকে বর্শা হাতে ভাজিম্বা সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে।

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—'রাজসভার কাজ চলছে। তখনই রাজপুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে রাজাকে কি বলল। রাজা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে রাজপুরোহিতের দিকে তাকিয়ে কী ব'লে উঠল। তখনই লক্ষ্য করলাম রাজ-পুরোহিতের গলায় একটা ভাঙা আয়না লকেটের মত ঝুলছে। পরে ঐ ভাঙা আয়না আমি পেয়েছি। আসলে ওটা ছিল জোড়া দেওয়া দু'টো আয়না। তারই একটা আমার গলায় ঝুলছে।'

—অন্য ভাঙা আয়নাটা ?

—'সেই কথাটাই এবার বলবো।' ফ্রেদারিকো কিছুক্ষণ তামাক-পাতা চিবুলো। তারপর বলতে লাগল—'পরের দিন আমাদের জাহাজ সোফালা বন্দর ছেড়ে ইউরোপের দিকে পাড়ি দেবে। আগের দিন রাত্রিবেলা। অসহ্য গরম। সমুদ্রেও বাতাস পড়ে গেছে, আমাদের কয়েকজন ডেক-এ ব'সে গল্পগুজব করছি, হঠাৎ দেখি ডেকের ওপর দিয়ে একটা লোক টলতে-টলতে আসছে। একটু লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম লোকটা ভাজিম্বা, তবে সাধারণ ভাজিম্বারা যা পরে, ওর পরনে তা নয়। ওর রনে সার্টিনের কাপড়। কোমরে সিল্কের কাপড়ের ফেট্টি। একটু চাঁদের মেটে আলোতে এসব লক্ষ্য করলাম। আমি ছুটে গিয়ে ওকে ধরলাম। দেখি কাঁধের দিকে কাপড় রক্তে ভিজে উঠেছে। কাপড়টা সরাতেই লক্ষ্য করলাম কাঁধে বর্শার আঘাতের গভীর ক্ষত। দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে। আমি দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধ'রে আমার কেবিনও ঘরে নিয়ে এলাম। ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। উবু হ'য়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি ছেঁড়া কম্বলের টুকরো দিয়ে ক্ষত জায়গাটা চাপা দিলাম। রক্তপড়া যখন কমলো, তখন আমার ছেঁড়া জামার টুকরো দিয়ে একটা পট্টি বেঁধে দিলাম। এতক্ষণ ভাজিম্বাটি গোঙাচ্ছিল, কথা বলতে পারছিল না। এবার ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় জল খেতে চাইল। আমি ওকে জল খেতে দিয়ে বিশ্রাম করতে ব'লে ছুটলাম জাহাজের বৈদ্যির কাছে। বৈদ্যিকে নিয়ে যখন এলাম, দেখলাম রক্তপড়া অনেক কমেছে। বৈদ্যি ওর চোঙের পাত্র থেকে মাখনের মত একরকম ওষুধ বের করল। পট্টি খুলে ছেঁড়া কম্বলের টুকরো খুলে ফেলে আস্তে-আস্তে মাখনের মত ঐ ওষুধটা দিয়ে পট্টি বেঁধে দিল। একটু পরেই রক্তপড়া বন্ধ হল। ওর ব্যথারও বোধহয় উপশম হ'ল। ও ঘুমিয়ে পড়ল। দেখলাম, আহত লোকটি ঘুমিয়ে আছে। আমি আর কি করি ? কাঠের মেঝেতে একটা কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম'।

ঘুম ভাঙলো একটু বেলাতে। উঠেই আহত লোকটির দিকে তাকালাম। দেখি সেও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কেমন আছো ?' এবার লক্ষ্য করলাম লোকটির বয়স খুবই কম। ছেলে-মানুষই বলা যায়। ও মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল। বুঝলাম এখন একটু ভালো বোধ করছে। ওকে রেখে রসুই-ঘ'রে গেলাম। সকালের খাবার খেতে। খেয়েদেয়ে ওর জন্যেও কিছু খাবার লুকিয়ে নিয়ে এলাম। ও খাচ্ছে যখন, তখনই জাহাজের ডেক থেকে জোর-জোর কথা ভেসে এল। অস্পষ্ট হ'লেও ক্যাপ্টেনের গলা শুনলাম। বলছে—'এই জাহাজে কেউ

আসেনি'। বুঝলাম, ছেলেটির খোঁজে নিশ্চয়ই ভাজিম্বারা এসেছে। ধরা পড়লে ছেলেটির মৃত্যু সুনিশ্চিত। যে কারণেই হোক ছেলেটিকে ওরা মেরে ফেলতে চায়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। ছুটে গিয়ে ছেলেটির ডান হাত ধ'রে আস্তে টানলাম—'শিগগির আসো।' ছেলেটি তখনও খাওয়া শেষ করে নি। ও একটুক্ষণ আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। আমি তাড়া দিলাম 'চলো'। ও খাওয়া ফেলে আমার পিছনে-পিছনে চললো। ছুটে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকলাম। চারিদিকে তাকিয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজলাম। পেলাম। বড়-বড় ময়দার বস্তার পেছনে যে ফাঁক পেলাম, তাই দেখিয়ে বললাম—'শীগগির লুকাও এখানে। কোনরকম শব্দ করবে না। ভয় নেই, আমি ডেকে নিয়ে যাবো।' ওকে লুকিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি কেবিন ঘরগুলোর দিকে এলাম। যে দুই বন্ধু গত রাত্রে আহত ছেলেটিকে দেখেছে, তাদের একজনকে পেলাম। একপাশে ডেকে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললাম—'কাল রাত্তিরে যে আহত ভাজিম্বাকে দেখেছো, তার কথা কাউকে বলো না। সে মাথা নেড়ে সম্মত হলো। ওদের ডেক-এ উঠে এলাম। দেখলাম, কয়েকজন ভাজিম্বা সৈন্য বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে ওদের সেনাপতি। তার গা খোলা। গলায় ঝুলছে একটা মুক্তোর লকেট। পরনে সাটিনের কাপড়। কোমরে সিল্কের পট্টি বাঁধা। মুখটা পাথরের মত কঠিন। তার হাতে খোলা তলোয়ার। আমাদের ক্যাপ্টেন তখন বলছে—'যদি কেউ আসতো, তা'হলে নিশ্চয়ই আমাদের নজরে পড়তো।'

কিন্তু সেনাপতির মুখ কঠিন। কথাটা সে বিশ্বাস করেছে ব'লে মনে হলো না। তখনই দেখি গতরাত্রে আমার সঙ্গী অন্য বন্ধুটি ক্যাপ্টেনের কাছে যাচ্ছে। ঐ বন্ধুটি জাতিতে স্প্যানিশ। আমি স্প্যানিশ ভাষায় ব'লে উঠলাম 'সাবধান গত-রাত্রির কথা ব'লো না।' বন্ধুটি বুদ্ধিমান। মাথাটা একবার নেড়ে সহজ ভঙ্গীতে ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বললো—'কাল বাতাস পড়ে গিয়েছিল। গরমের জন্যে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত ডেকে ছিলাম। কাউকে দেখিনি।' ক্যাপ্টেন সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললো—'দেখলেন তো ও বলছে, ওরা কাউকে দেখে নি।' কিন্তু সেনাপতির মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল—'ছেলেটি ভীষণ আহত ছিল।' এই কথা বলে সেনাপতি মাথা নীচু ক'রে ডেক-এর ওপর নজর রাখতে-রাখতে জাহাজের পেছনের দিকে যেতে লাগল। সৈন্যরাও সঙ্গে-সঙ্গে চলল। হঠাৎ পেছনদিককার ডেক-এর দিকে একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। বলে উঠল—'রক্ত।' ক্যাপ্টেনও সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলো সত্যই ডেক-এ ফোঁটা-ফোটা রক্তের দাগ। সেনাপতি আপন মনে বিড়-বিড় ক'রে বলল—'মাহাবো।

আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। বুঝলাম, ছেলেটির নাম মাহাবো। সেনাপতি মুখ তুলে ক্যাপ্টেনকে বলল—'জাহাজ দেখবো।'

ক্যাপ্টেন ব'লে উঠল 'বেশ তল্লাশী করুন।'

সেনাপতির সঙ্গের সৈন্যদের নিয়ে জাহাজ তল্লাশী শুরু করল। প্রত্যেকটি কেবিন ঘরে, দাঁড়টার ঘরে, রসুই-ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে দেখল, কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু মাহাবোকে কোথাও পেল না। সেনাপতিটি অপ্রসন্নমুখে ডেক-এ রক্তের দাগ-দাগ

জায়গাটার কাছে কয়েকবার পায়চারি করলো। তারপর ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো—'জাহাজ কবে ছাড়ছেন ?'

ক্যাপ্টেন বললো—'আমাদের তো লেনদেনের কাজ মিটে গেছে। আমরা আজকেই জাহাজ ছাড়বো।'

সেনাপতি মাথা ঝাঁকাল—'না আজ জাহাজ যাবে না।'

—'কেন!' ক্যাপ্টেন 'বেশ অবাক হলো।

সেনাপতি কাল্‌চে ছোপ লাগা দাঁত বের ক'রে হাসল। মনে হ'লো মুখ ভ্যাংচাল। তারপর পর্তুগীজ ভাষায় বলল 'আমি কামেরোকে আনতে যাচ্ছি। ওকে নিয়ে আসা পর্যন্ত ভাজিম্বা সৈন্যরা এখানেই থাকবে।' তারপর চোখ পিট্‌-পিট্‌ করে বলল 'ক্যামেরোকে জানেন ? রক্তের গন্ধ শুঁকে ও আহত শিকার ধ'রে আনে গভীর জঙ্গল থেকে। ওর নাকটা ছোট, কিন্তু ওর নাককে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।

সেনাপতি আর কোন কথা না ব'লে জাহাজ থেকে নোঙরের দড়ি ধ'রে ধ'রে নৌকায় নেমে গেল। একাই বেয়ে চললো সোফালা বন্দরের দিকে। সৈন্যরা জাহাজেই রইল।

ফ্রেদারিকো এতক্ষণে থামল। ফ্রান্সিস তাড়া দিল—'মন্তোর-সমুদ্রের ব্যাপারটা বলো।'

—বলছি-বলছি—সব বলবো। তার আগে একটু জল খাবো। খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

হ্যারি একটু স'রে গিয়ে জলের জালা থেকে নারকেলের মালা দিয়ে জল ভরে নিয়ে এল। ফ্রেদারিকো ঢক-ঢক ক'রে জল খেল। তলানি যে জলটুকু ছিল, তাই দিয়ে চামড়ায় আঁকা নক্সাটা ভেজাল। তারপর আবার ভাঙা আয়নাটার পেছনে সেঁটে দিল। আবার কোমরের গাঁট থেকে তামাকপাতা বের করলো। মুখে ফেলে চিবুতে-চিবুতে বলল—'আমি বিপদ আঁচ করলাম। এরকম জংলী মানুষের কথা আমি শুনেছিলাম। শিকারীরা এদের নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে যায়। আহত জানোয়ারের রক্তের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে, যেখানেই জানোয়োরটা থাকুক না কেন ঠিক বের করে। কামেরো সেই রকম জংলী মানুষ। জাহাজী বন্ধুদের আমার কেবিনঘরে জড়ো করলাম। সব বললাম। জংলী কামেরো এলে ভাজিম্বা ছেলেটিকে ও খুঁজে বের করবেই। তবে একটা বাঁচোয়া। রক্তটা বাসি হ'য়ে গেছে ধরতে পারবে না মনে হচ্ছে। কিন্তু সাবধানের মার নেই। যদি 'মাহাবো' অর্থাৎ ছেলেটি ধরা পড়ে, তবে আমাদের কাজ হবে সেনাপতি-শুদ্ধ সব ক'টা সৈন্যকে জলে ফেলে দেওয়া আর এক মুহূর্ত দেরী না করে জাহাজ ছেড়ে দেওয়া।

'কিন্তু ক্যাপ্টেন কি রাজি হবে ?' একজন জাহাজী বন্ধু বলল।

'ক্যাপ্টেনকে বোঝাবার দায়িত্ব আমি নিলাম।' ওদের বললাম, 'তোমরা শুধু সেনাপতি আর সৈন্যদের জলে ফেলে দিতে সাহায্য ক'রো। ওরা রাজি হলো।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—'আমি সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করলাম। গতরাত্রের সব ঘটনা বললাম। ক্যাপ্টেন কয়েকবার মাথা নেড়ে বললে—'উহুঁ মাহারোকে ওদের হাতে তুলে দিতেই হ'বে।'

আমি বললাম—'তাহ'লে ওরা ওকে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলবে।'

—'ওসব ওদের ব্যাপার—আমরা ওসবের মধ্যে নেই।' ক্যাপ্টেন বলল।

—তাই ব'লে জেনেশুনে একটা এত অল্পবয়সী ছেলেকে খুনীদের হাতে তুলে দেবেন?

—'উপায় কি?' ক্যাপ্টেন হতাশার ভঙ্গী করল।

—'উপায় আমরা বের করেছি। কিন্তু আপনি আপনার ঘর থেকে বেরোবেন না।'

—কেন?

—'তাহ'লে আপনার দায়িত্ব থাকবে না। যা করবার আমরাই করবো।'

ক্যাপ্টেন কিছুতেই রাজি হবে না। আমিও নাছোড়বান্দা। আমি আশ্বাস দিলাম 'এই চাঁদের দ্বীপে আবার কবে আসবো—তার ঠিক কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি শুধু ঘর থেকে বেরোবেন না, তাহ'লেই হলো। ক্যাপ্টেন বারকয়েক —আপত্তি ক'রে অবশেষে রাজি হলো।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—'দুপুরের দিকে সেনাপতি নৌকায় চড়ে এল। সঙ্গে সেই জংলী মানুষ কামেরো। জাহাজে উঠেই সেনাপতি ক্যাপ্টেনের খোঁজ করলো। আমরা বললাম, উনি অসুস্থ। নিজের কেবিনে শুয়ে আছেন। সেনাপতি কামেরোকে রক্তের দাগ পড়েছে ডেক-এর যে জায়গায়, সেদিকে নিয়ে চললো। কামেরো উচ্চতায় তিনফুটও হবে না। মাথায় বড়-বড় চুল ওর চোখ-মুখ ঢেকে দিয়েছে। পরনে একটা নেংটি। সারা গায়ে নানারকম নানারঙের উল্কি আঁকা। কামেরো রক্তের শুকিয়ে যাওয়া ফোঁটাগুলোর ওপর উবু হ'য়ে বোধহয় গন্ধই শুঁকলো। মুখ তুলে সেনাপতিকে কি বললো। বোধহয় বাসি হ'য়ে গেছে ব'লে রক্তের গন্ধ পাচ্ছে না, সে কথাই বলল। কামেরো আবার বার কয়েক গন্ধ শুঁকলো। তারপর ঐ অবস্থাতেই চললো নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে। আমরা আগে লক্ষ্য করি নি। এবার লক্ষ্য করলাম, সিঁড়ির কোণের দিকে বেশ কিছুটা রক্ত লেগে আছে। মনে পড়লো, মাহাব্যো এই জায়গাটায় টাল নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আমি ধ'রে ফেলেছিলাম। এই জায়গায় তাই ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তাই ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত জ'মে বেশকিছুটা রক্তের দাগ এখানে রয়েছে। কামেরো মুখ উবু অবস্থায় কুকুরের মত একটা লাফ দিল বুঝলাম, আর উপায় নেই। মাহাবো ধরা পড়বেই। আমি চাপা গলায় বন্ধুদের সে কথা বললাম—সব তৈরি থেকো। একজনকে পাঠালাম নোঙরের জায়গায়। আমরা ইসারা করতেই ও যেন নোঙর তুলে ফেলে। অন্যরা সব তৈরি হ'য়ে গেলাম। এবার কামেরো চলল আমার কেবিনঘরের দিকে। সেখানে রক্তমাখা কম্বলের টুকরো ছেঁড়া কাপড় পেল। কামেরো লাফাতে লাগল। তারপর চললো ভাঁড়ার ঘরের দিকে। কপাল মন্দ। ভাঁড়ার ঘরের মধ্যেই পড়ে ছিল রক্তভেজা আর একটা কম্বলের টুকরো। তাড়াতাড়িতে অসাবধানে ওটা পড়ে গিয়ে থাকবে। কামেরো এবার ভাঁড়ার ঘরের চারিদিকে তাকাতে-তাকাতে ঘুরতে লাগল। যে ময়দার বস্তার আড়ালে মাহাবো লুকিয়ে ছিল, কামেরো হঠাৎ সেইদিকে ছুটে গেল। সেনাপতি আর সৈন্যরাও ছুটলো।

মাহাবো ধরা পড়ে গেল। আমরা গিয়ে মাহাবোকে ঘিরে দাঁড়ালাম। আমার বন্ধুদের কয়েকজনের হাতে তরোয়াল দেখে সেনাপতি একবার থমকাল। সৈন্যরাও কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না। আমিও সেনাপতিকে বললাম—'ওপরে ডেক-এ চলুন।'

—আগে মহাবোকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।

—'ঠিক আছে আপনারা ডেক-এ চলুন। আমরা মাহাবোকে নিয়ে যাচ্ছি।'

সেনাপতি কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর—সৈন্যদের অনুসরণ করবার ইঙ্গিত ক'রে ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে চলল। মাহাবোকে আমার কেবিন ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমরাও ওপরের ডেক-এ উঠে এলাম। মাহাবোকে আমাদের সঙ্গে না দেখে সেনাপতি তাদের ভাষায় চীৎকার ক'রে কি ব'লে উঠলো। সৈন্যরা বর্শা উঁচিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরাও ভাঙা হালের টুকরো, বড়-বড় পেরেক, আর নোঙরের ভাঙা টুকরো নিয়ে সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। লড়াই শুরু হলো। আমাদের বন্ধুদের কয়েকজন তরোয়াল ভালোই চালাত। প্রথমেই সেনাপতি ঘায়েল হলো। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে পড়লো। আমরা সেনাপতিকে ধরাধরি ক'রে তুলে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলাম। সেনাপতির এই অবস্থা দেখে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়লে। দু'জন বর্শা ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাকিগুলোকে আমরাই ধরে জলে ফেলে দিলাম। কামেরোকেও জলে ছুঁড়ে ফেলা হলো। ওরা সাঁতরে ওদের নৌকোর দিকে চললো। ততক্ষণে জাহাজের নোঙর তুলে ফেলা হ'য়েছে। দ্রুত হাতে দাঁড় দড়া ঠিক ক'রে পাল তুলে দিলাম। দাঁড়িরাও দাঁড় বাইতে লাগল! মুহূর্তের মধ্যে জাহাজে বাইরের সমুদ্রে চ'লে এলো। সোফালা বন্দর, চাঁদের দ্বীপ চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। আমরা মহাসমুদ্রে এসে পড়লাম। জাহাজ বেগে চললো উত্তরের দিকে।'

ফ্রেদারিকো থামল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে ওর গল্প শুনতে লাগল। একটু থেমে ফ্রেদারিকো আবার বলতে শুরু করলো—'মাহাবোকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। ওষুধ-পত্র সেবাশুশ্রূষা সবই চললো। কিন্তু মাহাবো সুস্থ হলো না। বরং ঘা পেকে ফুলে ওর অবস্থা দিন-দিন খারাপ হ'তে লাগল। আমাদের বৈদ্যি বললো, যে বর্শা দিয়ে ওকে আঘাত করা হ'য়েছিল। তা'তে নাকি বিষ মাখানো ছিল। বিষক্রিয়ার জন্যই ওই ঘা শুকোবে না, বরং শরীরের অন্য জায়গায়ও বিষ ছড়িয়ে যাবে। মাহাবোকে বাঁচানো যাবে না। কয়েকদিন পরেই মাহাবোর ভীষণ জ্বর এল। ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। ওর আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলো। সেদিন গভীর রাত্রি। আমি মাহাবোর বিছানার পাশে ব'সে ওর মাথায় জলে ভেজা ন্যাকড়া বুলোচ্ছি আর হাওয়া করছি। ও হঠাৎ চোখ খুললো। দেখলাম চোখ—দু'টো লাল টক্‌টক্ করছে। ও কিন্তু সুস্থ মানষের মতোই ব্যবহার করতে লাগল। আমার হাতটা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলতে লাগল—'বন্ধু তোমার নাম জানিনা, কিন্তু তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার পরিচয় তুমি জানো না। আমি চাঁদের দ্বীপের রাজসভা দেখেছো নিশ্চয়ই। কত বড়-বড় মুক্তো দিয়ে রাজসভা

সাজানো। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি সকলের গলায় মুক্তো সমুদ্র থেকে সংগ্রহ ক'রে আনতো এসব আমার বাবা।

—তোমার বাবা ছাড়া আর কেউ মুক্তো সংগ্রহ করতে পারে না কেন? আমি জানতে চাইলাম।

মাহাবো বলল, 'কারণ মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী লাফ্ মাছ। এই মাছেরা যে কি সাংঘাতিক, কল্পনাও করতে পারবে না। এদের চোখের দৃষ্টি স্থির আর হিংস্র। সমুদ্রের নীচের শ্যাওলা আগাছা এসবের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তীক্ষ্ন ধারালো দাঁত দিয়ে এরা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার জন্যে এদের পিঠের শিরদাঁড়ায় সারি-সার ফাঁপা ছুঁচের মত কাঁটা থাকে। এই কাঁটাগুলো ওরা শিকারের গায়ে বসিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে ফাঁপা কাঁটাগুলোর মধ্যে দিয়ে আঠা-আঠা বিষ ঢেলে দেয়। যার গায়ে ঐ বিষ ঢোকে, সে অসহ্য ব্যথায় অজ্ঞান হ'য়ে যায়। তারপরেই সে মরে যায়। এই হিংস্র লাফ্ মাছ ঐ মুক্তোর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। ওদের হাত থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই।'

—'তাহ'লে তোমার বাবা মুক্তো সংগ্রহ ক'রে অক্ষত দেহে ফিরে আসতো কি করে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—সেটাই রহস্যময়। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম। বাবা মুক্তোর সমুদ্র থেকে ফিরে এলে বাবার গলায় ঝোলানো ভাঙা আয়নাটা থাকতো না। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—'সাঁতরাবার সময় খুলে পড়ে গেছে।' বাবা তাব কিছুদিন পরেই ভিনদেশী কোন জাহাজে চড়ে মরিটাস দ্বীপে চ'লে যেতেন। আমি জানি না মরিটাস দ্বীপ কোথায়। কিছুদিন পরে ফিরে আসতেন। গলায় ঝোলানো থাকতো ঠিক অমনি আকারের একটা ভাঙা আয়না। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, বাসর আয়নাঅলার কাছ থেকে আয়নাটা তৈরি ক'রে এনেছেন। আমি শুধু এইটুকুই জানতাম।

—তারপর?

—কয়েকদিন আগের কথা চাঁদের দ্বীপের রাজা বাবাকে ডেকে বললেন—'এই মুক্তো ভিনদেশী লোকেরা মোহরের বিনিময়ে কিনে নিতে চায়। মুক্তোর সমুদ্রে তো অঢেল মুক্তো আছে। এবার আমরা কিছু মুক্তো তুলে বিক্রি করবো।' বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'এই মুক্তো চাঁদের দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতার দান। এমনি দিতে পারেন, কিন্তু দেবতার এই দান নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন না।' কিন্তু রাজারও এক গোঁ। বিক্রী করার জন্যে আরো মুক্তো তোলাবেন। রাজা দু'জন ভাজিম্বাকে পাঠালেন মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো তুলে আনতে। তারা সেই যে জলে নামলো, আর ওপরে উঠতে পারল না। আমাদের একটা প্রবাদই আছে—'যদি চিরদিনের জন্যে কোথাও যেতে চাও, তাহ'লে মুক্তোর সমুদ্রে যাও।' রাজার যত রাগ গিয়ে পড়লো বাবার ওপর। রাজা বুঝলেন বাবা ছাড়া কেউ অক্ষত শরীরে মুক্তো নিয়ে আসতে পারবেন না। শুরু হলো এর উপায় ব'লে দেবার জন্যে বাবার ওপর দৈহিক অত্যাচার। যখন চরমে উঠলো, বাবা তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শাস্তিঘরে দেখলাম, বাবা প্রায় অজ্ঞানের মত পড়ে আছেন। ঐ অবস্থাতেই আমাকে কাছে ডাকলেন। বাবার হাত-বুনো লতা দিয়ে বাঁধা। আমার কানের কাছে মুখ

ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন—'আমার গলা থেকে আয়নাটা খুলে নে। এটা জোড়-লাগানো দু'টো আয়না। বসির আয়নাওলার আয়না সঙ্গে থাকলে মুক্তোর সমুদ্রে কোন ভয় নেই।' বাবা আর কিছু বলতে পারলেন না। চোখ বন্ধ ক'রে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। আমি বাবার গলা থেকে জোড়া-লাগানো আয়নাটা খুলে কোমরে গুঁজে রাখলাম। ব্যাপারটা কিন্তু সেনাপতির তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সেনাপতি আমাকে বলল, 'দেখি তোমার বাবা তোমাকে কি দিলো।' আমি কোমরে গোঁজা আয়নাটা বের করবার ভান করলাম। চারদিক এই ফাঁকে দেখে নিলাম। এখানে ওখানে মশাল জ্বল্‌ছে। তখন রাত গভীর। একজন সৈন্য শুধু বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্য কয়েকজন গুটিসুটি মেরে ঘরের বারান্দায় ব'সে আছে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে এক লাফে আলোর এলাকা ছাড়িয়ে অন্ধকারে পড়লাম। সেনাপতি চেঁচিয়ে উঠল—'মাহাবোকে ধর্‌—।' ঐ সৈন্যটা সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারেই আমাকে লক্ষ্য ক'রে বর্শা ছুঁড়ল। ওরা অন্ধকারেও দেখতে পায়। আমি ব'সে পড়্‌তে-পড়্‌তে বর্শাটা ছুটে এসে কাঁধে বিঁধল। আমি বর্শাটা টেনে খুলে ফেললাম। রক্ত ছুটল। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটলাম। একবার ভাবলাম বনের দিকে যাই। কিন্তু জানতাম কামেরোকে লেলিয়ে দেবে সেনাপতি। ও ঠিক আমাকে খুঁজে বের করবে। তার চেয়ে ভিনদেশী জাহাজে চড়ে পালিয়ে যাওয়া ভালো। তাই অন্ধকারে ছুটতে-ছুটতে এসে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর তোমাদের জাহাজের এসে উঠলাম।' মাহাবো সমস্ত ঘটনাটা এইভাবে থেমে-থেমে বললো। বুঝতে পারছিলাম ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মুক্তোর সমুদ্রের রহস্যের টানে ওকে আর থামতে বলিনি। মাহাবো দুর্বল হাতে ওর কোমরের জোড়া আয়নাটা বের ক'রে আমার হাতে দিল। ম্লান হেসে বলল—'যে জন্যে আমার বাবা মারা গেল, যে জন্যে আমিও বাঁচবে না, সেই অমূল্য জিনিসটি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। অযত্ন ক'রোনা। পারো তো মুক্তো এনো। কিন্তু সেই মুক্তো নিয়ে ব্যবসা ক'রো না। তাহ'লে চাঁদের দ্বীপের অধীশ্বরের অভিশাপ লাগবে।' এই ছিল মাহাবোর শেষ কথা। শেষরাত্রের দিকে আমার কোলে মাথা রেখে মাহাবো মারা গেল। এই কয়দিনেই ছেলেটির ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল। ওর মৃতদেহটা কোলে নিয়ে আমি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদলাম।'

ফ্রেদারিকো থামল। ওর গল্পের এই ভাজিম্বা ছেলেটির জন্য ফ্রান্সিস ও হ্যারি দু'জনেই গভীর সহানুভূতি অনুভব করল। দু'জনেই চুপ ক'রে রইলো। ফ্রেদারিকো চুপ ক'রে তামাক চিবোচ্ছে। কিন্তু ওরা দু'জন আর ওকে বলবার জন্যে অনুরোধ করতে পারল না। ফ্রেদারিকো নিজে-নিজেই বলতে শুরু করল—'ফ্রান্সিস তোমাকে সব ঘটনাটাই বলবো। শোন—তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। আয়নাটা পরে থাকি। লোকে দেখলে হাসে। আমিও আয়নাটায় মুখ দেখি, ভেংচি কাটি। দিন কাটতে লাগল এ জাহাজে, ও জাহাজে ঘুরে-ঘুরে। কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে যাবে এমন জাহাজ অনেকদিন চেষ্টা করেও পেলাম না হঠাৎ একটা জাহাজ পেলাম। শুনলাম, জাহাজটা চাঁদের দ্বীপের সোফালা বন্দরে যাবে। তবে অনেক ক'টা বন্দরে ঘুরে যাবে। আমি সেই জাহাজে খালাসীর কাজ নিলাম। এ বন্দর সে বন্দর ঘুরতে-ঘুরতে জাহাজটা একদিন সোফালা বন্দরে এসে ভিড়ল। মাহাবো

বলেছিল, আয়নাটা যেন কোন ভাজিম্বার চোখে না পড়ে। রাজপুরোহিতের আয়না আমার গলায় দেখলে ওরা আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলবে। কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে আয়নাটা মন্ত্রপূত। রাজপুরোহিত ছাড়া আর কারো ওটা পরার অধিকার নেই। একটা কথা বলা হয়নি, আয়নাটা একদিন গলা থেকে খুলে পরিষ্কার করছি। হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল। আয়নার জোড়াটা খুলে গেল। তখনই ভেতরে সাঁঠা চামড়ায় আঁকা নক্সাটা পেলাম। যা হোক—আমি আয়না দু'টো কোমরে গুঁজে সোফালা বন্দরে নামলাম। তখন রাত হ'য়েছে। ঘন বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চললাম মুক্তোর সমুদ্রের দিকে। কিন্তু জানতাম না যে কেউ যাতে মুক্তোর সমুদ্রে নেমে মুক্তো চুরি করতে না পারে, তার জন্য ভাজিম্বারা মুক্তোর সমুদ্রের এপাশে বনের মধ্যে অনেক ফাঁদ পেতে রেখেছে। কারোর উপায় নেই সেই ফাঁদ এড়িয়ে যায়। আমিও পারলাম না। বুনো লতায় তৈরি সেই ফাঁদে হঠাৎ পড়ে গেলাম। খোঁড়া গর্তের মধ্যে পড়ে রইলাম। হয়তো একটু তন্দ্রামত এসেছিল। তন্দ্রা ভেঙে গেল পাখির ডাকে। ভোর হয়েছে। কত বিচিত্র রকম পাখি। কিন্তু এ সব দেখার অবকাশ কোথায়। ভাজিম্বাদের হাতে ধরা পড়লাম। ভাগ্যে কি আছে কে জানে। একটা বিচিত্র বর্ণের লেমুর তার আঙুলগুলো মানুষের সমান। গর্তটার কাছ দিয়ে কয়েকবার ঘুরে গেল। ভাবলাম, ভাজিম্বাদের হাতে ধরা পড়ার আগে বুনো শুয়োরের দাঁতের ঘায়ে প্রাণটা না যায়।

একটু বেলা হ'তে দূরে কাদের কথাবার্তা শুনলাম। একটু পরেই একদল ভাজিম্বা শিকারী ওখানে এল। ওরা ভেবেছিল, কোন বুনো জানোয়ার বোধহয় ফাঁদে পড়েছে। আমাকে দেখে ওরা খুব অবাক হলো না। হয়তো মুক্তো চুরি করতে এসে অনেকেই এইরকম ফাঁদে ধরা পড়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। ওরা আমাকে টেনে তুললো। তারপর বুনো লতায় হাত বেঁধে আমাকে নিয়ে চললো। ওদের লক্ষ্য ছিল যে রাজবাড়ি, সেটা বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না। কারণ দুটো আয়নার মাঝখানে সাঁঠা চাঁদের দ্বীপের নক্সাটা দেখে-দেখে আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। রাজবাড়িতে যখন পৌঁছলাম, তখন বেশ বেলা হ'য়েছে। বোধহয় রাজাকে আমার ধ'রে আনার খবর দেওয়া হয়েছিল। রাজসভায় রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি একটু পরেই এলেন! সেনাপতি আমাকে ঠিক চিনল। কাল্‌চে ছোপ ধরা দাঁত বের ক'রে দাঁত খিঁচুনি দেওয়ার মত হাসলো। আমার বিচার শুরু হ'ল। সেনাপতি আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বার-বার রাজাকে কি সব গড় গড় ক'রে ব'লে গেল। ন্যাড়ামাথা রাজা ডান হাতটা ওপরের দিকে তুলে তর্জনীটা উঁচিয়ে ধরলেন, তারপর বেশ জোরে কি যেন বললেন। তারপর মুক্তো বসানো কাঠের সিংহাসন থেকে নেমে চ'লে গেলেন। মন্ত্রী আর উপস্থিত অন্যান্য দু'চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তি রাজার পিছু-পিছু চলে গেলেন। সেনাপতি এগিয়ে এসে ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল—'মুক্তো চুরি করতে এসেছিলি। সেই মুক্তোর সমুদ্রেই তোকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। যত পারিস, মুক্তো তুলে নিস্।' কথাটা ব'লে দাঁত খিঁচিয়ে হাসলো। সৈন্যদের কি হুকুম দিল। ওরা আমাকে টেনে নিয়ে চললো। সৈন্যরা একটা ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিল। ঘরটা দেখেই বুঝলাম, এটাই শাস্তিঘর। মাহাবোর মুখে এই শাস্তিঘরের কথাই শুনেছিলাম। ঘরটার চারদিকে কাঁটাগাছের

বেড়া। রেনট্রির পাতায় ছাওয়া ঘর। মেঝেটা মাটির। এবড়ো-খেবড়ো। একপাশে একটা মাটির পাত্রে জল রাখা। মাঝখানে একটা জ্বলন্ত উনুন। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করতে লাগল। গরমে দর্ দর্ ক'রে ঘামতে লাগলাম। কাল রাত্রে সেই জাহাজ থেকে খেয়ে বেরিয়েছিলাম। এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো—কিছু খাই নি। ওরা খেতে দেবে ব'লেও মনে হলো না। চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। ভাবতে লাগলাম একমাত্র ভরসা কোমরে গোঁজা দু'টো আয়নার টুকরো। আয়নার ধারালো কোণা দিয়ে যদি কোনভাবে পাতার বাঁধন কাটতে পারে। কিন্তু বাঁধন কাটলেই কি পালাতে পারবো? বাইরে ভাজিম্বা যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে। মাহাবো বলেছিল, 'ওরা নাকি অন্ধকারেও দেখতে পায়।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল—এসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিছুই খেতে দিলো না। মাটির পাত্রটায় মুখ চুবিয়ে পেট ভ'রে জল খেলাম। রাত হলো। শাস্তিঘরের সামনের উঠোনে মশাল জ্বালিয়ে দিলো। পাহারা ঠিকই চললো।

একটু রাত হ'তে হঠাৎ পাহারাদার সৈন্যদের মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করলাম। একটু পরেই সেনাপতি এল। সৈন্যদের কি হুকুম করল। ওরা আমাকে ঘর থেকে টেনে বের করল। তারপর সেনাপতির পেছনে-পেছনে আমাকে নিয়ে চলল। চাঁদের দ্বীপের নক্সাটা অনেকবার দেখে আমার সবই জানা হ'য়ে গিয়েছিল। উত্তর-পূর্ব মুখে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝলাম তার মানে গভীর বন এলাকা পার হয়ে মুক্তোর সমুদ্র। কিন্তু ওরা আমাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে কেন, বুঝলাম না। সবার আগে যে যোদ্ধাটি চলছে, তার হাতে মশাল। তারপরেই সেনাপতি। তারপর আমাকে মাঝখানে রেখে সৈন্যরা চলেছে গভীর বনের মধ্য দিয়ে। আমরা চলেছি। বন্য পশুর ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। রাতজাগা পাখিগুলো তীক্ষ্নস্বরে ডেকে অন্য গাছে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একটানা গান শোনা যাচ্ছে। এক সময় গভীর বন শেষ হ'য়ে গেল। ছাড়া-ছাড়া গাছপালা শুরু হ'ল। তারপর আগুনে-প্রবালের একটা ঢিবি লম্বা চলে গেছে। সেটা দৌড়ে পার হ'তে হলো। ঢিবিটায় পা রাখা যায় না। এত গরম। তারপরই একটা ল্যাগুন। আকাশে ভাঙ্গা চাঁদ। তারই নিস্তেজ আলোয় দেখলাম ল্যাগুনটার জল স্থির, ঢেউ নেই। ওপারে কাঁচ পাহাড় আর তার বাঁকানো চূড়া! বুঝলাম, এটাই মুক্তোর সমুদ্র। এই মুক্তোর সমুদ্র নিয়েই কত কল্পনা ছিল আমার। কত কথা শুনেছি এর সম্বন্ধে। আজকে সেটা আমার চোখের সম্মুখে। আমি বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে মুক্তোর সমুদ্র দেখতে লাগলাম।'

একটু থেমে ফ্রেদারিকো বলতে লাগল, সেনাপতি আমার কাছে এলো। ভেংচি-কাটার মত হেসে বলল—'এই দ্যাখ্ মুক্তোর সমুদ্র। তোকে ভাসিয়ে দেব। যত পারিস্ মুক্তো তুলিস।'

তারপর চড়া সুরে কি হুকুম দিলো। সৈন্যরা ছুটে এসে আমাকে ধরলো। টানতে টানতে জলের ধারে নিয়ে গেল। দেখলাম, জলের ধারে একটা নৌকার মতো বাঁধা। গাছের গুঁড়ি কুড়ে ভাজিম্বারা একরকমের নৌকো তৈরি করে। এটা সেই রকম নৌকো। আমাকে ওরা নৌকোয় তুললো। তারপর বুনোলতা দিয়ে নৌকোর

সঙ্গে হাত-পা বেঁধে দিল। ওরা নৌকোটা জোরে ঠেলে দিতে আমি মুক্তোর সমুদ্রের মাঝ বরাবর ভেসে এলাম। বুঝে উঠতে পারলাম না আমাকে না মেরে এভাবে জলে ভাসিয়ে দিল কেন। অবশ্য একটু পরেই এর কারণ বুঝলাম। নৌকাটার তলায় ফুটো, ফুটো দিয়ে নৌকায় ততোক্ষণে জল উঠতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকোসুন্ধ আস্তে-আস্তে ডুবে যাবো। মাহাবো হিংস্র লাফ্ মাছের কথা বলেছিল। এরাই নাকি মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী। একবার জলে পড়লে ওরা সুতীক্ষ্ন দাঁত দিয়ে আমার শরীর ফালা-ফালা ক'রে ফেলবে। ভয়াল মেরুদণ্ডে ফাঁপা কাটা বিঁধিয়ে দেবে। আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ওপরে আকাশে ভাঙা চাঁদ। তারা জ্বলছে। এই সব কিছু মুছে যাবে। মৃত্যু এসে সব রং আলো মুছে দেবে। চোখের কোণ জলে ভিজে উঠলো। আমি চোখ বুঁজলাম। হঠাৎ মনটা বিদ্রোহ করল। কেন মরবো? মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করবো না? হাত-পা বাঁধা এই অবস্থায় মৃত্যুকে মেনে নেব? আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। পারের দিকে তাকালাম। দেখি তিন-চারটে মশাল জ্বলছে। বুঝলাম, ওরা পাহারা দিচ্ছে এখনো। সারা তীরটা জুড়েই পাহারা দিচ্ছে। ওরা নিশ্চিত জানে মুক্তোর সমুদ্র থেকে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসে না। তবু আমার মৃত্যু সম্বন্ধে ওরা নিশ্চিত হ'তে চায়। আমি তাড়াতাড়ি বাঁধা হাত দু'টো নিয়ে কোমরের গোঁজা খুঁজলাম। আয়না দুটো রয়েছে। অনেক কষ্টে একটা আয়না বের করলাম। তারপর আয়নাটার বাঁকা ছুঁচোলো মুখটা হাতের তলাটায় ঘষতে লাগলাম। ভাগ্যি ভাল লতাটা শুকনো ছিল না। কাঁচা লতা-গাছটা ঘষতে-ঘষতে লতাটা কাটতে লাগলাম। হাতটা অবশ্য অক্ষত রইল না। কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। হাত ধরে একটু বিশ্রাম করি। আবার ঘষি। কিছুটা ছিঁড়ে আসতে আবার হ্যাঁচ্‌কা টান দিলাম। লতাটা ছিঁড়ে গেল। ততক্ষণে নৌকার অর্দ্ধেকটা ডুবে গেছে। বাঁধা পা দু'টো জলের নিচে। এবার পায়ের তলাটা কাটতে লাগলাম। পা'টাও আয়নার কোণার খোঁচা লেগে কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ এক টানা ঘষার পর পা'য়ের বন্ধনটা কেটে গেল। ভাবলাম, নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ি। কিন্তু তাতে শব্দ হবে। শব্দ শুনলে সেনাপতির, ভাজিম্বা সৈন্যদের সন্দেহ হ'তে পারে। তাই আমি নৌকোর সঙ্গে-সঙ্গে আস্তে-আস্তে জলের নীচে তলিয়ে গেলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছি লাফ্ মাছগুলো ছুটে আসবে। ছুঁচোলো ধারালো দাঁত নিয়ে আমার শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফালা-ফালা ক'রে দেবে। নয়তো পিঠের ফাঁপা কাঁটা ফুটিয়ে দেবে। হঠাৎ জলের নীচে দেখি এক আলোর আভাস। তাহ'লে এইখানেই কি মুক্তো আছে? আমি ভুলে গেলাম মৃত্যুদূত লাফ্ মাছের কথা। আমি তাড়াতাড়ি সেই আলো ধ'রে নীচে নেমে এলাম। সে এক অপরূপ দৃশ্য। ওখানের তলাটা একটু এবড়ো খেবড়ো হলেও সমান। তার ওপর বড়-বড় মুক্তো ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটা তীব্র নীলচে আলো বেরোচ্ছে মুক্তোগুলো থেকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মুক্তোগুলোকে। মুক্তোগুলো পড়ে আছে মেঝের মত জায়গাটায়। আর চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বড়-ষড় আকারে ঝিনুক কল্পনাই করা যায়না। কোন-কোন ঝিনুকের মুখ খোলা। তার মধ্যে মুক্তো। সেই আলোকিত জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ ডানহাতে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমার হাত থেকে আয়নাটা

মেঝের মত জায়গাটায় পড়ে গেল। সেই আয়নাটা থেকে তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো। দেখলাম, একটা ছাইরঙা মাছ ঐ আয়নার মধ্যে প্রচণ্ড জোরে ঢুঁ মারল, ওটা নিশ্চয় মৃত্যুদূত লাফ্ মাছ। আরো লাফ্ মাছ ছুটে আসছে দেখলাম। আমার দম ফুরিয়ে এসেছিল। আমি দ্রুত ওপরে উঠতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি জলের ওপর পৌঁছলাম। দেখলাম, এখানে জলের গভীরতা বেশী নয়। এবার আয়নার রহস্যটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আয়নাটার একটা বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করছিলাম যে, এর আলো প্রতিবিম্বিত করার ক্ষমতা সাধারণ আয়নার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এই আয়না মাছেদের আকৃষ্ট করে। মাছগুলো তখন পাগলের মত আয়নাটায় ঢুঁ মারতে থাকে। ভুলে যায়, ধারে-কাছে কোন শিকার আ[illegible]ি না। লক্ষ্যই করে না কিছু। রাজ পুরোহিত তাই এই আয়না নিয়ে মুক্তো তুলতে আসতেন। যখন লাফ্ মাছেরা ঢুঁ দিতে ব্যস্ত, তখন উনি মুক্তো সংগ্রহ ক'রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জলের ওপরে উঠে আসতেন। তারপর সাঁতরে পারে উঠতেন। আমি এইসব ভাবতে-ভাবতে জলের ওপর ভেসে থেকে অনেকটা দম নিলাম। তারপর একডুবে নীচে নেমে গেলাম। হাতের কাছে যে মুক্তোটা পেলাম, সেটা নিয়ে উঠে আসছি, দেখি আয়নাটার কাছে অনেকগুলো লাফ্ মাছ জড়ো হয়ে ক্রমাগত ঢুঁ দিচ্ছে জায়গাটার জল রক্তে লাল হ'য়ে উঠেছে। হয়তো মাছগুলোর মুখ থেঁতলে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। দূরের পারের দিকে তাকালাম। পারে দূরে-দূরে তিন জায়গায় তিনটে মশাল জ্বলছে। ওদিক দিয়ে পালানো অসম্ভব। মুক্তোটা কোমরে গুঁজে আমি কাঁচ পাহাড়ের দিকে সাঁতরাতে লাগলাম। ঐ কাঁচপাহাড়টাই পেরোতে হবে। যেদিকে আগ্নেয়গিরি সেদিকটায় দেখলাম, জল থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। আবার পারের ওদিকে ভাজিম্বা সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতি ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই কাঁচপাহাড় ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে পালাবার উপায় নেই। কাঁচপাহাড়ের কাছাকাছি এসেছিলাম বোধহয়, তখনই হঠাৎ নিচের দিকে একটা টান অনুভব করলাম। আমি আর একটু সাঁতরে এসেছি, হঠাৎ এক প্রচণ্ড জলের টানে আমি তলিয়ে গেলাম। সেই টানে আমি কোথায় ভেসে চললাম জানি না। প্রায় অজ্ঞানের মতো হ'য়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি আমি কাঁচপাহাড় পেরিয়ে এসেছি। সামনে মহাসমুদ্রে চলে আসাটা আজও আমার কাছে রহস্যময় থেকে গেল।'

ফ্রেদারিকো থেমে থুঃ-থুঃ ক'রে চিবোনো তামাকপাতা ফেললো। আবার কোমরে গোঁজা তামাকপাতা নিয়ে মুখে ফেলে চিবুতে লাগল।

—আচ্ছা জলের টানটা কি নীচু থেকে এসেছিল? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ।

—তুমি কি তলিয়ে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। সে কি টান!

—হুঁ। তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর সাঁতরেই সোফালা বন্দর চ'লে এলাম। নিজের জাহাজে উঠলাম। মুক্তোটা বেশ কিছুদিন সকলের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখে-ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না। জাহাজের সবাই মুক্তোটার কথা জেনে গেল। বাধ্য হ'য়ে সবাইকে মুক্তোটা দেখালাম। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল। এতবড়

মুক্তো ? মানুষের কল্পনার বাইরে। জাহাজী বন্ধুদের কাছে আমার কদর বেড়ে গেল। ক্যাপটেনও আমাকে সমীহ করতো ?

—তারপর ?

—ওটাই আমার বিপদের কারণ হলো। লা ব্রুশ আমাদের জাহাজ অধিকার করলো। সবাইকে এই কয়েদঘরে বন্দী করে। জাহাজ লুঠ করলো। তখনই নিজে বাঁচবার জন্যে আমাদের ক্যাপটেন এক চাল চাললো। ক্যাপটেন বলল—'যদি আমাদের সবাইকে ছেড়ে দাও, তা'হলে তোমাকে হাঁসের ডিমের মত একটা মুক্তো দিতে পারি।' লা ব্রুশের চোখ লোভে চক্-চক্ করে উঠল। ও রাজী হলো। আমার কাছ থেকে ও মুক্তোটা ছিনিয়ে নিলো! আর সব বন্ধুরা মুক্তি পেলো। জাহাজে ক'রে চ'লে গেলো। আমি কিন্তু মুক্তি পেলাম না। সেই থেকে এই কয়েদঘরে আছি। কতদিন, কতবছর জানি না। লা ব্রুশ এখানে এসে কখনো ধমকায়, চাবুক মারে। কখনো ওর ঘরে নিয়ে আমার কাছ থেকে জানতে চায় মুক্তোর সমুদ্র থেকে কি ক'রে মুক্তো নিয়ে অক্ষত দেহে ফিরে আসা যায়। মারের মুখে আমি সবই বলেছি। কিন্তু বলি নি এই আয়নার কথা, চাঁদের দ্বীপের নক্সার কথা। কাঁচ পাহাড় কি ক'রে পেরোলাম, সেই রহস্য তো আমি নিজেও আজ পর্যন্ত ভেদ করতে পারি নি।

ফ্রেদারিকো থামলো। তারপর আস্তে-আস্তে বললো—"ফ্রান্সিস তোমাকে সবটাই বললাম। কিন্তু তুমি না গেলেই ভালো। ভাজিম্বাদের একটা প্রবাদই আছে—যদি চিরদিনের জন্যে কোথাও যেতে চাও, তা'হলে মুক্তোর সমুদ্রে যাও।"

ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। পেছনের কাঠে ঠেসান দিয়ে চুপ ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে রইল। গম্ভীর ভাবে ভাবতে লাগল ফ্রেদারিকোর বলা সমস্ত ঘটনাগুলো। মুক্তোর সমুদ্রে পৌঁছানোর সমস্যার সমাধান সহজ না হ'লেও খুব কঠিন নয়। অরণ্য অঞ্চলে ভাজিম্বাদের পাতা ফাঁদগুলো সম্পর্কে সাবধান হ'লেই নিরাপদে মুক্তোর সমুদ্রে পৌঁছোনো যাবে। কিন্তু তারপর ? লাফ্ মাছের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানো গেলেও মুক্তোর সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসবে কী ক'রে ? ফ্রেদারিকো যখন অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তখন সুড়ঙ্গ বা গভীর খাদ একটা কিছু আছে। কিন্তু সেটা কোথায় আছে ? ফ্রেদারিকোর কথা থেকে সঠিক কোন উপায় বের করা যাচ্ছে না। তবে কি আয়নাটার মধ্যেই কোন রহস্য আছে ? আয়নাটা ভালভাবে পরীক্ষা করলেই হয়তো সমাধানেই ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সিসস গভীর ভাবে এই সমস্যার নানা সমাধানের কথা ভাবতে লাগল। কিন্তু ভেবে-ভেবে কোন কুল-কিনারা পেল না। ফ্রেদারিকো জলের টানে বেরিয়ে এসেছিল। এটা কোন গর্ত বা সুড়ঙ্গ বা খাদের অস্তিত্বের কথা বোঝাচ্ছে। কিন্তু সেটা সঠিক কোথায়, ফ্রেদারিকো তাও বলতে পারছে না। সমুদ্রের-জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা কে জানে। ফ্রান্সিস এবার চোখ খুলল। বললো—ফ্রেদারিকো তোমার আয়নাটা একবার দাও তো।

—কেন ?

—দেখি, ওটা থেকে এর রহস্য ভেদ করা যায় কিনা।

ফ্রেদারিকো গলা থেকে দড়িতে বাঁধা আয়নাটা ওকে দিল। ফ্রান্সিস খুব

মনোযোগ দিয়ে ভাঙা আয়নাটা দেখতে লাগল। আয়নাটা দেখতে এই রকম—

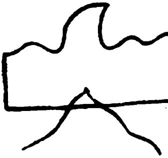

ফ্রান্সিস আয়নাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ও একটা জিনিস বুঝল, যে আয়নাটা ওভাবে ভাঙেনি। ঐ রকম আঁকাবাঁকা ছুঁচোলো মুখ ক'রে ওটা কাটা হ'য়েছে। আয়নাটার পেছনে পারার পলেস্তারা বেশ মোটা। তাই আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা এই আয়নাটার অনেক বেশি। আয়নাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে দেখেও ফ্রান্সিস কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। আর পাঁচটা সাধারণ আয়না থেকে এর কাঁচটা মোটা। এইটুকুই বুঝল শুধু। আয়নাটা বিশেষ যত্নে তৈরী, এটা বুঝতে অসুবিধা হল না। আয়নাটার নীচের দিকে একটা ফুটো। ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে দড়ি গলিয়ে লকেটের মত গলায় ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা। এই জন্যে কি ফুটোটা করা হ'য়েছে, না ফুটোটার অন্য কোন তাৎপর্য আছে। গলায় ঝুলিয়ে রাখার সুবিধের জন্যেই ফুটোটা করা হয়েছে। এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে ? ও আয়নাটা ফ্রেদারিকোকে দিল।

দিন যায়, রাত যায়। ক্যারাভেল চলেছে। হঠাৎ একদিন রাত্রে ফ্রেদারিকো ভীষণ অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। ওর ভীষণ জ্বর এলো। প্রায় অজ্ঞানের মত অসাড় পড়ে রইলো ? বেনজামিন লুকিয়ে ওষুধ এনে দিলো। ফ্রান্সিস ওষুধ খাওয়ালো। দু'তিনবার ওষুধ পড়তে একটু সাড় এলো শরীরে। ওরা মনে করলো বিপদ কাটলো। ফ্রেদারিকো অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে শুনে লা ব্রুশ কাঠের পা দিয়ে ঠক্ ঠক্ করতে-করতে এল। ফ্রেদারিকোর সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল—'এই ফ্রেদারিকো —আর ঢঙ্ দেখিও না।'

'—ও সত্যিই অসুস্থ' ফ্রান্সিস বলল—ওর হাত খুলে দিতে বলুন।'

লা ব্রুশ খুক্ খুক্ ক'রে হেসে উঠল—'কিস্সু হয়নি—দু' ঘা চাবুক পড়লেই উঠে দাঁড়াবে।'

ফ্রান্সিস চুপ করে রইলো। কোন কথা বললো না। লা ব্রুশ বেনজামিনকে ডেকে বলল—'বৈদ্যিকে ডেকে নিয়ে আয় তো।'

একটু পরেই জাহাজের বৈদ্যি এলো। লা ব্রুশ ওকে বলল—'দ্যাখ তো ও সত্যিই অসুস্থ, না ঢঙ করছে।'

বৈদ্যি ফ্রেদারিকোকে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল। তারপর বলল—ও ভীষণ অসুস্থ। বোধহয় আর বাঁচবে না।

—'সে কি ?' লা ব্রুশ চেঁচিয়ে উঠল—'আর দু'একদিনের মধ্যেই আমরা চাঁদের দ্বীপে পেঁছিবো। ফ্রেদারিকোকে তখন খুবই প্রয়োজন। ওকে তুমি যে ক'রেই হোক আর ক'টা দিন বাঁচিয়ে রাখো।

—'চেষ্টা করবো ক্যাপটেন।' বৈদ্য বলল। লা ব্রুশ বেনজামিনকে ডাকল—'ফ্রেদারিকোর শুশ্রূষা দেখাশুনার ভার তার ওপর রইলো। দেখিস্ যেন পট্ ক'রে ম'রে না যায়।' বলে ব্রুশ চ'লে গেল।

বেনজামিনও বেরিয়ে গেল। একটু পরেও ছেঁড়া পালের টুকরো আর একগাদা খড় নিয়ে এলো। ফ্রেদারিকো যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানে খড় ছড়িয়ে দিলো তার ওপর ছেঁড়া পালের কাপড় পেতে দিলো। বেশ একটা বিছানার মত হলো। ফ্রেদারিকোর হাতের কড়া খুলে ওকে আস্তে-আস্তে ঐ বিছানায় শুইয়ে দিলো। বৈদ্য আবার কিছুক্ষণ ফ্রেদারিকোকে পরীক্ষা করে তারপর ওষুধ খাওয়ালো। একটু রাত হ'তে বৈদ্য চ'লে গেল। বেনজামিন এক ঠায় ফ্রেদারিকোর মাথার কাছে ব'সে রইল। ও রাত্রে একবারের জন্যে উঠলো না। নিজে গেলও না।

ভোরের দিকে ফ্রেদারিকো বোধহয় একটু সুস্থ বোধ করল। এ'পাশ থেকে ওপাশ ফিরল। তখন জ্বরটাও বোধ হয় কমের দিকে। বেনজামিন ওর কপালে হাত দিলো। ওকে একটা সুস্থ দেখে নিজের কাজে চলে গেল।

তখনই ফ্রেদারিকো ইসারায় ফ্রান্সিসকে কাছে ডাকল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এলে ফ্রেদারিকো দুর্বল হাতে গলা থেকে আয়নাটা খুলে ওর হাতে দিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—'ফ্রান্সিস, তোমাকে আমি উপযুক্ত মানুষ ব'লে মনে করি। সব কথা তোমাকে বলেছি। কিছুই গোপন করি নি। সাহস থাকলে তবেই মুক্তো এনো। কিন্তু সেইসব মুক্তো নিয়ে কোনোদিন ব্যবসা ক'রো না।'

ফ্রান্সিস মাথা নীচু ক'রে রইলো। কোন কথা বলল না। আয়নাটা দু-একবার উল্টে-পাল্টে দেখে কোমরে গুঁজে রাখলো।

একটু বেলা হ'তে লা ব্রুশ কাঠের পা ঠক্-ঠক্ করতে করতে এলো। খুক্-খুক্ ক'রে হেসে ফ্রেদারিকোর কাছে এসে দাঁড়াল। বললো—শুনলাম, ভালো আছো। তা'হলে এবার মুক্তোর সমুদ্রে রহস্যটা বলো।

—আমি যা জানি বলেছি, আর কিছু জানি না।

লা ব্রুশ চীৎকার ক'রে উঠল—'মিথ্যাবাদী ফেরেববাজ! তুই আমার কাছে সব কথা বলিস্ নি।' একটু থেমে বলল 'সেরে ওঠ্, তারপর চাবুকে তোর পিঠের চামড়া তুলবো।' লা ব্রুশ চ'লে গেল। বেনজামিন ফিরে এসে ফ্রেদারিকোর কাছে বসলো। ওকে একটা ওষুধ খাইয়ে বেনজামিন বলল—'ক্যাপ্টেন কি জানতে চায় ব'লে দিলেই তো পারো। কতদিন আর চাবুকের মার খাবে?'

—'তুই পাগল হ'য়েছিস্ বেনজামিন—ঐ রকম একটা নরঘাতক শয়তানকে মুক্তোর সমুদ্রের রহস্য বলে দেব? অসম্ভব।' দুর্বল শরীরে যতটা গলার জোর দিয়ে বলা সম্ভব ফ্রেদারিকো বললো। বেনজামিন আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে চলে গেলো।

দুপুরের দিকে ফ্রেদারিকো ফ্রান্সিসকে ডেকে বলল—'কপালে হাত দিয়ে দেখো তো, মনে হচ্ছে আবার জ্বরটা বাড়ছে।

ফ্রান্সিস কড়ায় বাঁধা হাত দু'টো ফ্রেদারিকোর কপালে রাখলো। দেখল বেশ গরম। বুঝল বেশ জ্বর এসেছে। মিথ্যে ক'রে বলল—'জ্বরটা সামান্য বেড়েছে, ও কিছু না সেরে যাবে।'

ফ্রেদারিকো কোন কথা বলল না। চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে রইল।

তখন সন্ধ্যে হ'বে। ফ্রেদারিকো মাথা এপাশ-ওপাশ ক'রে গোঙাতে লাগল। ভীষণ জ্বরে ওর গা পুড়ে যাচ্ছে। একটু পরেই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বেন্‌জামিনকে ডাকতে লাগলো। বেন্‌জামিন কয়েদ ঘরে ঢুকেই ফ্রেদারিকোর কাছে দৌড়ে এলো। কপালে হাত দিয়েই বুঝলো অবস্থা ভালো নয়। ও ছুটলো বৈদ্যিকে ডাকতে। বৈদ্যি সব দেখে শুনে ওর চিবুকের ছুঁচালো দাড়িতে হাত বুলোলো কয়েকবার। তারপর ঝোলা থেকে একটা ওষুধ বের ক'রে বেন্‌জামিনকে দিলো খাইয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু ফ্রেদারিকোকে ওষুধ খাওয়ানো গেলো না। দাঁতে-দাঁত লেগে আছে। মুখে ঢেলে দিতে ওষুধটা মুখের কষ বেয়ে পড়ে গেলো। বৈদ্যি একটু মাথা নেড়ে হতাশার ভঙ্গি করল। তারপর ওর ঝোলাটা নিয়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে কয়েকটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্রেদারিকোর দেহটা স্থির হ'য়ে গেল। ওর শরীরটা আস্তে-আস্তে একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। ফ্রান্সিস ওর গায়ে হাত দিলো। দেখলো বরফের মত ঠাণ্ডা। বুকে কান পাতলো, কোন শব্দ নেই। নাকের কাছে হাত রাখলো। নিঃশ্বাস পড়ছে না। বেনজামিন তখনও একটা কাঁচের পাত্রে জল ঢেলে ওষুধ গুলছিল। ফ্রান্সিস ডাকলো—'বেন্‌জামিন।'

বেন্‌জামিন কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'ফ্রেদারিকো মারা গেছে।'

বেন্‌জামিন বিশ্বাস করলো না। ও ফ্রেদারিকোর কপালে হাত রাখলো। বুকে হাত রাখল। তারপর মাথাটা নাড়তে লাগল। ফ্রেদারিকোর শরীরে কোন সাড় নেই। বেন্‌জামিনের গোল মুখ কুঁচকে উঠল। ও দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিসরা সকলেই অবাক চোখে বেন্‌জামিনের দিকে তাকিয়ে রইল। এই পাথরের মত কালচে কঠিন মুখের মানুষটার মধ্যে তা'হলে স্নেহ-ভালোবাসার অস্তিত্ব আছে। অন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাহ'লে ওর কোন পার্থক্য নেই। আশ্চর্য! বেন্‌জামিনের কঠিন ভাবলেশহীন মুখে কোন কিছু বোঝার উপায় ছিল না।

সারারাত ফ্রেদারিকোর মৃতদেহটা ঘরের বিছানাতেই পড়ে রইল। পরদিন সকালবেলা একজন জলদস্যু এল। মাথা ঢাকা রুমাল, গলায় একটা ভাঁজকরা সিল্কের চাদরের মত। বোঝা গেল, কেউ মারা গেলে এই লোকটাই পাদ্রীর কাজ করে। পাদ্রীর হাতে একটা শতচ্ছিন্ন বাইবেল। বাইবেলটা একবার ফ্রেদারিকোর কপালে ছোঁয়ালো। তারপর বাইবেল থেকে কিছুটা পড়ল। 'আমেন' ব'লে কপালে, বুকে, কাঁধে, হাতে ছুঁইয়ে ক্রুশের চিহ্ন আঁকল। তারপর চলে গেল। বেন্‌জামিন আর দু'জন পাহারাদার ফ্রেদারিকোর মৃতদেহটা ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল সমুদ্রে ফেলে দেবার জন্যে।

ফ্রেদারিকোর মৃত্যুসংবাদ শুনে লা ব্রুশের মুখের ভাব কেমন হলো, সেটা আর ফ্রান্সিসদের সঙ্গে দেখা হ'ল না। তবে সংবাদটা শুনে লা ব্রুশ যে খুব মুষড়ে পড়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফ্রান্সিস ভাবল, এর পরে লা ব্রুশ বোধহয় চাঁদের দ্বীপে আর যাবে না। ওর এই অনুমানটা হ্যারিকে বললো। হ্যারি কিন্তু মাথা নেড়ে বলল—উঁহু—দেখো—ও চাঁদের দ্বীপে যাবেই। মুক্তোগুলো ও

হাতছাড়া করবে না কিছুতেই।

হ্যারির অনুমানই ঠিক হলো দু'দিন পরেই লা ব্রুশের ক্যারাভেল 'সোফালা' বন্দরে ভিড়ল। পেছনে বাঁধা ফ্রান্সিসদের জাহাজটা।

তখন সবে ভোর হ'য়েছে। 'সোফালা' নামেই একটা বন্দর। এমন কিছু বড় বন্দর নয়। জাহাজঘাটা বলে কিছুই নেই। জাহাজ থেকে নৌকো ক'রে পারে যেতে হয়। সেদিন বন্দরটায় আর কোন জাহাজ ছিল না।

বেলা হ'লে দু' চারজন ভাজিম্বা বন্দরে এসে দাঁড়াল। ওরা বোধহয় মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া আসা করে। পণ্য বিনিময়ে প্রথায় সেই সময়ে চললেও লা ব্রুশ তো জলদস্যু ওর জাহাজে বিনিময় যোগ্য পণ্য থাকার কথা নয়। ছিলও না। তবু বড় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে লা ব্রুশ নৌকোয় চড়ে সমুদ্র দিকে চলল। লা ব্রুশ বেশ জমকালো পোষাক পরেছে। কোমরের বেল্ট-এর ওপর জড়ির কাজকরা সিল্কের কাপড়ের কোমরবন্ধ। তাতে হাতির দাঁতের বাটঅলা তলোয়ার গোঁজা। পিস্তলটা নেয়নি। মাথার টুপিটা পরিষ্কার। পায়ের পোষাকটার সোনালী জড়িগুলো চক্-চক করছে। পায়ের একটা বুট ঘষে-ঘষে বেশ পরিষ্কার করা হ'য়েছে। গোঁফ মোম দিয়ে পাকিয়ে ছুঁচালো করা হ'য়েছে। বড় সর্দার কিন্তু সেই মার্কামারা গেঞ্জী গায়ে। পায়ে বুট জুতো। লা ব্রুশ কিন্তু হাঁসের ডিমের মতো মুক্তো বসানো গলার হারটা পরে নি। ওর যে মুক্তোর সমুদ্রের একটা মুক্তো আছে, এটা ও প্রকাশ করলো না। এটা তার বুদ্ধির পরিচয় দিল। সমুদ্রের তীরে নেমে তারা দু'জন বালিয়ারির ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। লক্ষ্য রাজবাড়ি। যে দু'চারজন ভাজিম্বা এসে বালিয়ারিতে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বেশ অবাক হ'য়ে লা ব্রুশের পোষাক, তরবারি এসব দেখতে লাগল। বড় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে লা ব্রুশ চললো রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে।

তীরভূমির বালি ছাড়াতেই দেখা গেল দু-তিনটে বড়-বড় ঘর। সেই রেনট্রির পাতা বাকল দিয়ে তৈরি। এগুলো গুদাম ঘর। তামাকপাতা মধু, এসব এই ঘরগুলোতে রাখে। বিদেশী জাহাজ আসে। কাপড়, চিনি এসব জিনিসের সঙ্গে ভাজিম্বা ব্যবসাদারেরা পণ্য বিনিময় করে, এই জন্যেই এখানে গুদামঘর করা হ'য়েছে।

গুদামঘরগুলো ছাড়িয়ে লা ব্রুশ আর বড় সর্দার হেঁটে চললো। এই জায়গাটায় বাজার মত ব'সেছে। বুনো ফল, আনারস, নানা রকম সামুদ্রিক মাছের পসরা নিয়ে ভাজিম্বা ব্যবসাদারেরা বসেছে। এখানে ভাজিম্বাদের ভিড় হ'য়েছে। লা ব্রুশ আর বড় সর্দার চলেছে। অনেকেই চেয়ে-চেয়ে ওদের দেখেছে।

লা ব্রুশ যখন রাজবাড়ি পৌঁছল, তখন একটু বেলা হ'য়েছে। রাজদরবার তখনও শুরু হয় নি। শুধু সেনাপতি আর কিছু দ্বাররক্ষী দরবারঘরে রয়েছে সেনাপতি একটা কাঠের আসনে বসে আছে। লা ব্রুশ সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করলো—'রাজা কখন আসবে ?'

'—আসার সময় হ'য়ে এসেছে।' সেনাপতি ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল। একমাত্র সেনাপতিই পর্তুগীজ ভাষা একটু বোঝে। ভাঙা-ভাঙা বলতেও পারে।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন লাল সার্টিনের কাপড় পরা কয়েকজন রক্ষী খোলা

তরোয়াল হাতে দরবার ঘরে ঢুকলো। তাদের পেছনে-পেছনে ন্যাড়া মাথা রাজা ঢুকলো। তার সঙ্গে মন্ত্রী আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কয়েকজন ঢুকলো। যে যার কাঠের আসনে বসলো। রাজা মুক্তো বসানো কাঠের সিংহাসনে বসলো।

একপাশে একটি ভাজিম্বা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিল। সেনাপতি তাকে গিয়ে কি বললো। স্ত্রীলোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর রাজার দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে কি বলতে লাগলো। ওর বলা শেষ হ'লে রাজা ডানহাত ওপরের দিকে তুলে তর্জনী উঁচু ক'রে কি বলল। স্ত্রীলোকটি চোখ মুছে—সেনাপতির দিকে তাকিয়ে রইলো। সেনাপতি কি যেন বললো। স্ত্রীলোকটি তখন হাসতে-হাসতে চ'লে গেলো।

তখন সেনাপতি লা ব্রুশের কাছে এসে বললো—'আপনার নাম কি ?'

—বলুন যে লা ব্রুশ এসেছে। কিছু সওদা করতে চায়।

সেনাপতি তখন রাজার কাছে গেল। আস্তে-আস্তে কি বললো। রাজা লা ব্রুশকে কাছে আসার ইঙ্গিত করল। লা ব্রুশ এগিয়ে রাজার কাছে এলে রাজা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। লা ব্রুশ রাজার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল চুম্বন ক'রে শ্রদ্ধা জানাল। শ্রদ্ধা জানাবার এই রীতিটা লা ব্রুশ আগে থেকে জানতো। তারপর রাজা কি জিজ্ঞেস করলেন। সেনাপতি কাছে এগিয়ে এলো। পর্তুগীজ ভাষায় রাজার প্রশ্নটা বললো—তুমি কি সওদা করতে চাও ? লা ব্রুশ বললো—'আমার সঙ্গে দু'টো মস্ত বড় হীরের খণ্ড আছে। তার একটা আপনাকে দিতে চাই। বদলে আমাকে দেড়'শ মুক্তো দিতে হবে।'

সেনাপতি কথাটা ভাজিম্বা ভাষায় রাজাকে বলল। রাজা দু' একবার ন্যাড়া মাথাটা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন—'আগে হীরের খণ্ডটা দেখবো, তারপর কথা হবে।'

'—বেশ—কখন দেখতে আসবেন বলুন'—লা ব্রুশ বললো।

'—বিকেলে যাবো'—রাজা বললেন।

কথাবার্তা এখানেই শেষ হলো। ততক্ষণে দু'জন-একজন ক'রে আরো কয়েকজন বিচারপ্রার্থী এসে জড়ো হ'য়েছে। লা ব্রুশ বড় সর্দারের সঙ্গে ফিরে এলো।

বিকেল নাগাদ লা ব্রুশ ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে রাজার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সঙ্গে বড় সর্দার।

একটু পরেই চাঁদের দ্বীপ থেকে অনেকগুলো নৌকো এই জাহাজের দিকে আসছে দেখা গেল। নৌকাগুলো যখন এগিয়ে এলো, দেখা গেল, মাঝখানের নৌকোটায় রাজা ব'সে আছেন। অন্য নৌকোগুলোতে সেনাপতি, মন্ত্রী ও নানা অমাত্যরা।

রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি আর অন্যান্য ব্যক্তিরা জাহাজটায় উঠে এল। হীরে রাখা গাড়ি দু'টোর কাছে তাদের নিয়ে গেল লা ব্রুশ। রাজা, সেনাপতি, মন্ত্রী আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘুরে-ঘুরে হীরে দু'টো দেখলো। ওদের চোখে গভীর বিস্ময়। হীরে দু'টোর ওপর অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ল। বিচিত্র রঙের খেলা চলল হীরে দু'টোর গায়ে। রাজা খুব খুশী। কয়েকবার নিজের ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'আমরা দু'টো খণ্ডই নেবো।' সেনাপতি সে কথা লা ব্রুশকে বললো। লা ব্রুশ মাথা নেড়ে বলল—'না—একটা খণ্ডই আমরা

বিক্রী করব।'

কথাটা সেনাপতি রাজাকে বলতেই ক্রোধে রাজার মুখ আরক্ত হলো। রাজা চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন—'দু'টো খণ্ডই আমার চাই।' রাজা আর দাঁড়ালেন না। জাহাজ থেকে সবাই নৌকোয় নেমে গেল। নৌকোয় চড়ে সবাই ফিরে গেল চাঁদের দ্বীপে।

লা ব্রুশ এবার বুঝল, সাবধান হবার সময় এসেছে। ভাজিম্বারা যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে হীরে দু'টোর লোভে। তাই লা ব্রুশ গোলন্দাজ জলদস্যুদের ডাকলো। হুকুম দিল—'কামান, গোলা সব তৈরি রাখো। তৈরি হও সব?'

জলদস্যুরা অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে ডেক-এ জড়ো করল। সবাই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত হ'তে লাগল। জলদস্যুরা জাহাজের ডেক-এ সারিবন্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। লা ব্রুশ অধীর হ'য়ে কাঠের পা ঠক্ ঠক্ ক'রে ডেক-এ পায়চারি করতে লাগল। সময় বয়ে চললো। রাত গভীর হ'তে লাগল।

হঠাৎ দেখা গেল সোফালার সমুদ্র তীরে মশাল হাতে ভাজিম্বা যোদ্ধারা জড়ো হ'তে লাগল। হাজার-হাজার মশালের আলোয় সমুদ্রতীর ভরে গেল। ওরা নৌকায় চড়ে লা ব্রুশের ক্যারাভেল-এর দিকে আসতে লাগল।

লা ব্রুশ একদৃষ্টিতে এতক্ষণ তাকিয়েছিল মশালের আলোয় উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের দিকে। এবার লা ব্রুশ কোমর থেকে তরোয়াল বের করল। শূন্যে তরোয়ালের কোপ দেবার মন চালিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল 'গোলা ছোঁড়ো।' দু'টো কামান সঙ্গে-সঙ্গে গর্জে উঠল। কামানের গোলা দু'টো অন্ধকার দিয়ে জ্বলন্ত উল্কার মতো গিয়ে পড়লো সমুদ্রতীরে। আর্ত চীৎকার উঠল ভাজিম্বা সৈন্যদের মধ্যে। একটুক্ষন বিরতির পর আবার আগুনের গোলা ছুটল। পড়ল গিয়ে মশাল হাতে ভাজিম্বা সৈন্যদের মধ্যে। আবার আর্ত চীৎকার উঠল। এবার দেখা গেল, মশালগুলো ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেছে। এরমধ্যে বেশ কিছু ভাজিম্বা সৈন্য নৌকা বেয়ে ক্যারাভেলের গায়ে লাগল। ক্যারাভেল থেকে ঝোলানো দড়ি-দড়া নোঙরের দড়ি এসব বেয়ে ভাজিম্বা সৈন্যরা অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে ক্যারাভেলের ডেক-এ উঠে আসতে লাগল। শুরু হলো সম্মুখ যুদ্ধ। জলদস্যুদের হাতে তরোয়াল। ভাজিম্বা সৈন্যদের হাতে লম্বা বর্শা। ওরা বর্শা ছুঁড়ে দু'জন জলদস্যুকে ঘায়েল করলো। কিন্তু বর্শা হাতছাড়া হওয়াতে নিরস্ত্র অবস্থায় ওদের মৃত্যুবরণ করতে হলো। আস্তে-আস্তে ভাজিম্বা সৈন্যদের অনেকেই মারা পড়ল। যে দু'একজন বেঁচে ছিল, তারা বর্শা ফেলে দিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল। ওদিকে তখনও কামানের গোলা ছুটছে। সমুদ্র-তীরে বহু ভাজিম্বা সৈন্য মারা পড়ল। যারা নৌকায় চড়ে এসেছিল, তাদের অনেকে জলদস্যুদের হাতে মারা পড়ল। ভাজিম্বারা হেরে যেতে জলদস্যুরা চীৎকার ক'রে উঠলো।

কামানের গোলার শব্দ যুদ্ধের হৈ-হল্লা ফ্রান্সিসরা কয়েকঘরে ব'সে শুনতে পাচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর যখন জলদস্যুরা এক সঙ্গে মিলে জয়ধ্বনি দিলো তখন ওরা বুঝল, যুদ্ধ শেষ। ভাজিম্বারা পরাজয় বরণ করেছে। ফ্রান্সিস

ডাকল—'হ্যারি ?'

হ্যারি চিন্তিতস্বরে বলল—'হুঁ, লা ব্রুশ যুদ্ধে জিতে গেল।'

—ভাজিম্বারা জিতলে তবু মুক্তির আশা ছিল কিন্তু এখন। ফ্রান্সিস আর কথাটা শেষ করলো না।

—হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। একটা উপায় বার করতেই হবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে কাঠে ঠেসান দিয়ে চোখ বুঁজে আধশোয়া হ'য়ে রইল।

লা ব্রুশ খুব খুশি। ও এটাই চাইছিল। ওর পরিকল্পনাই ছিল চাঁদের দ্বীপ অধিকার করা। তা'হলেই মুক্তোর সমুদ্র হাতের মুঠোয়, যত খুশি মুক্তো তোলা যাবে। মুক্তো বিক্রী করে, হীরে বিক্রী ক'রে ও কোটি-কোটি গিনির মালিক হবে। তখন জলদস্যুদের ছেড়ে নিজের দেশে চলে যাবে। প্রচুর জায়গা জমি কিনে রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি তৈরি ক'রে রাজার হালে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

ভোর হলো। লা ব্রুশের কয়েকজন জলদস্যু জলে নামল। যে সব নৌকাগুলো চড়ে ভাজিম্বারা এসেছিল, সেগুলো সমুদ্রের এখানে-ওখানে ভাসছিল। জলদস্যুরা সে-সব নৌকাগুলো ক্যারাভেল-এর কাছে নিয়ে এল। সে সব নৌকাগুলোতে জলদস্যুরা উঠল। ক্যারাভেল-এর সঙ্গে যে নৌকাটা থাকে, সেটাতেই জালে ক'রে লা ব্রুশকে নামিয়ে দেওয়া হলো। লা ব্রুশ আর অন্য জলদস্যুরা নৌকায় চড়ে চললো সোফালা বন্দরের দিকে। আজ কিন্তু লা ব্রুশের গলায় ঝুলছে মুক্তোর লকেট বসানো মালাটা।

ওরা সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেখলো, কামানের গলায় এখানে-ওখানে নানা জায়গায় গর্ত হ'য়ে গেছে। বহু ভাজিম্বা সৈন্যদের মৃতদেহ সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। সবার সামনে লা ব্রুশ। হাতে খোলা তরোয়াল। কোমরে গোঁজা পিস্তল। ওর পেছনেই বড় সর্দার। তারপর অন্য জলদস্যুরা। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল।

ওরা রাজবাড়ি পৌঁছে দেখলো রাজবাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। জলপ্রাণী-এর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। লা ব্রুশ আস্তে-আস্তে গিয়ে কাঠের সিংহাসনে বসলো। খুশিতে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল। জলদস্যুরাও ক্যাপ্টেনর হাসির সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু মুক্তোর খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল, একটা মুক্তোও রাজদরবারে নেই। শুধু সিংহাসনে যে ক'টা মুক্তো গাঁথা ছিল, সে ক'টাই আছে শুধু। লা ব্রুশ রেগে আগুন হ'য়ে গেল। ক্রুদ্ধস্বরে বড় সর্দারকে হুকুম দিল—'রাজা-সেনাপতি এরা সব কোথায় লুকিয়ে খুঁজে বের কর। কোন দয়া-মায়া দেখাবে না। যাকে পাবে কচুকাটা করবে।

হৈ-হৈ করতে জলদস্যুরা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে পড়লো। সব ঘর বাড়ি খুঁজতে লাগল। স্ত্রীলোক, শিশুদের অবাধে হত্যা করতে লাগল। পুরুষ যাদের পেল, কিছু মেরে ফেলল—কিছুকে ধ'রে এনে শাস্তিঘরে পুরল। কিন্তু কেউ রাজা বা সেনাপতির কোন হদিশ দিতে পারল না।

রাজবাড়িতে গিয়ে জলদস্যুরা লা ব্রুশকে এই সংবাদ দিল। লা ব্রুশ চীৎকার ক'রে বলল—'নিশ্চয়ই জঙ্গলে লুকিয়েছে। সব কটাকে খুঁজে বের কর।'

সর্দার কয়েকজন বড় সর্দার কয়েকজন জলদস্যুকে রাজা সেনাপতি আর অন্যদের খুঁজে বের করবার ভার দিল। তারা বনের দিকে চলে গেলো।

লা ব্রুশ কাঠের সিংহাসন থেকে সব ক'টা মুক্তো বের ক'রে নেবার হুকুম দিল। জাহাজে মেরামতে কাজ করে, কাঠের কাজ জানা এক জলদস্যু মুক্তোগুলো বের করবার জন্যে ছেনি-বাটালি-হাতুড়ি নিয়ে এল। লা ব্রুশ বড় সর্দারকে বলল 'যে কটা ভাজিম্বাকে ধরেছো, আমার কাছে নিয়ে এসো।'

শাস্তিঘর থেকে আট-দশজন ভাজিম্বাকে লা ব্রুশের সামনে আনা হ'ল। লা ব্রুশ ওদের দিকে তাকিয়ে বললো—'তোমাদের মধ্যে যে আমাদের মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো এনে দিতে পারবে, তাকেই আমি ছেড়ে দেব।'

বন্দী ভাজিম্বারা লা ব্রুশের কথা এক বর্ণও বুঝলো না। ওরা নির্বাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। ব্রুশ তখন গলায় ঝোলানো মুক্তোর লকেটটা দেখাল। নানা-ভাবে ওদের বোঝাল' এবার ওরা বুঝলো। ভয়ে ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। ওরা মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

লা ব্রুশ বড় সর্দারকে ডেকে বললো—'এদের মধ্যে চারজনকে বেছে রাখো। কাল সকালে এদের নিয়ে মুক্তোর সমুদ্রে যাবো।'

বড় সর্দার ভাজিম্বাদের শাস্তিঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। চারজনকে বেছে নিয়ে আলাদা ঘরে রাখল। যারা রাজা সেনাপতির খোঁজে জঙ্গলে গিয়েছিল, তারা সন্ধ্যেবেলা ফিরে এল। ওরা কারো খোঁজ পায় নি। গভীর অরণ্য ভাজিম্বাদের নখদর্পণে। জঙ্গলের লুকোনো জায়গা থেকে ওদের বের করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। একথা বড় সর্দারই লা ব্রুশকে বোঝাল। কোন কথা না ব'লে গুম হ'য়ে ব'সে রইল লা ব্রুশ। শুধু দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল।

সন্ধ্যের পর থেকেই লা ব্রুশ ভাজিম্বাদের প্রিয় তোয়কো মদ খেতে লাগল। জলদস্যুরা তোয়কো খেয়ে রাস্তায় কোন বাড়ির উঠানে, নয়তো গাছের নীচে ফুর্তির চোটে গড়াগড়ি খেতে লাগল। লা ব্রুশ তোয়কোর নেশায় বুঁদ হয়ে কাঠের সিংহাসনের ওপরেই গুটি-শুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ল। নিজেকে ভাবতে পাগল সম্রাট নেপোলিয়ন।

পরের দিন একটু বেলায় লা ব্রুশের ঘুম ভাঙল। বড় সর্দারকে ডেকে বলল 'চারজনকে বেছে রেখেছো ?'

বড় সদার মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'চলো সব, মুক্তোর সমুদ্রে যাবো। এক্ষুণি।'

মুক্তোর সমুদ্রে যাবার পথ ব'লে কিছু নেই। ঘন গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাছের ডাল, ঝোপ কেটে-কেটে পথ ক'রে নিতে হচ্ছে। কত বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের পাখি এই বনে। কত রকমের গাছ-পাখি এই বনে। প্রচুর রেন-ট্রী, র‍্যাফিয়া-রাফা গাছ, পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু। মাথায় পাতাগুলো সুন্দরভাবে ছড়ানো। বিচিত্র রকমের লেমুর, ফোসা, তন্দ্রাকাস প্রাণী। বনের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে-ক'রে ওরা যখন মুক্তোর সমুদ্রের ধারে পৌঁছল, তখন বেশ বেলা হ'য়ে গেছে। মুক্তোর সমুদ্রের জল নীল, নিস্তরঙ্গ। দূরে কাঁচপাহাড় দেখা দেখা যাচ্ছে।

যে চারজন ভাজিম্বাকে লা ব্রুশ ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, এবার তাদের জলে নামাবার তোড়জোড় চলল। বড় সর্দার ওদের জলে ঠেলে-ঠেলে শাসাচ্ছে আর ওরা,

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে আসছে। লা ব্রুশ বলল—'দু'জন-দু'জন করে নামাও। উঠে আসতে চাইলে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে দাও, তাহ'লেই আর উঠে আসতে সাহস পাবে না।'

তাই করা হলো। লা ব্রুশ চেঁচিয়ে বললো—'ডুব দিয়ে নিচে থেকে মুক্তো এনে দাও, তাহ'লেই তোমাদের ছেড়ে দেবো।' ভাজিম্বারা এতক্ষণে ভালোভাবেই বুঝে ফেলেছে লা ব্রুশ কি চায়। দু'জন ভাজিম্বাকে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। একজন উঠে আসতে-আসতে পারের দিকে এলে বড় সর্দার বর্শার খোঁচা দিতে লাগল। তারপর কেউ তরোয়ালের খোঁচা, কেউ ভাঙা ডাল দিয়ে মাথায় মারতে লাগল। এবার ভাজিম্বা যুবকটি জলে ডুব দিল। অন্যজন যে ডুব দিয়েছিল, সে আর উঠল না। এই যুবকটি মাত্র একবার জলের ওপর মাথা তুলেছিল। তারপর ডুবে গেল। আর উঠলো না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আর দু'জনকে নামানো হ'ল একইভাবে। তরোয়াল বর্শা, আর গাছের ডাল উঁচিয়ে রইল জলদস্যুরা। ওরাও উঠে আসতে সাহস পেল না। একজন ডুব দিলো। ওর দেখাদেখি অন্য মধ্যবয়স্ক ভাজিম্বাটিও ডুব দিল। যে প্রথম ডুব দিয়েছিল সে আর উঠল না। কিন্তু মধ্যবয়স্ক ভাজিম্বাটি উঠল। তাড়াতাড়ি পারের দিকে সাঁতরে আসতে লাগল। জলদস্যুরা চীৎকার ক'রে উৎসাহ দিতে লাগল। মধ্যবয়স্কটি এসে পারে উঠল। দেখা গেল ওর ডান হাতের মুঠোয় একটা মুক্তো। লোকটা হাঁপাতে লাগল। দেখা গেল ওর-সারা গায়ে যেন ছুঁচ বিঁধিয়ে ফুটো ক'রে দেওয়া হয়েছে। রক্ত বেরুচ্ছে ফুটো-গুলো দিয়ে। লোকটা বারকয়েক মাথা এপাশ করল। তারপর আস্তে-আস্তে চোখ বন্ধ ক'রে যেন ঘুমিয়ে পড়ল। ওর দিকে তখন কারো খেয়াল নেই। সবাই লা ব্রুশের চারপাশে জড়ো হ'য়ে মুক্তোটা দেখছে। লা ব্রুশের লকেটের চেয়ে এই মুক্তোটা বড়। লা ব্রুশ হাসছে ঘিরে দাঁড়ানো জলদস্যুরাও আনন্দে অধীর হ'য়ে চীৎকার করতে লাগল। কেউ কেউ নাচতে লাগল। মুক্তো এনেছিল যে মধ্যবয়স্ক ভাজিম্বাটি, সে তখন মারা গেছে।

কয়েকদিন কাটলো। লা ব্রুশের মনে শান্তি নেই। সমস্ত চাঁদের দ্বীপের রাজ্য এখন ওর। মুক্তোর সমুদ্র হাতের কাছে—ওরই অধিকারে। অথচ মুক্তো তোলা যাচ্ছে না। মুক্তোর সমুদ্রে যত মুক্তো আছে, সব চাই ওর। কিন্তু এনে দেবে কে? যে ক'জন ভাজিম্বাকে শাস্তিঘরে রাখা হয়েছে, সব ক'জনই বুদ্ধ-অথর্ব। তারা মুক্তো আনতে পারবেনা। জলদস্যুরা ওর হুকুমে শক্ত সামর্থ্য ভাজিম্বাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাউকে ধরতে পারছে না। বনের মধ্যে সব যেন হাওয়ায় মিলে গেছে।

ক্রুদ্ধ লা ব্রুশ কখনও কাঠের সিংহাসনে উঠে কাঠের পা নিয়ে লাফাচ্ছে, কখনও বিনা কারণে বড় সর্দারকে যাচ্ছেতাই বলছে, তরোয়াল খুলে জলদস্যুদের তাড়া দিচ্ছে—'যে ক'রে হোক, শক্ত সমর্থদের ভাজিম্বাদের ধ'রে আনো।'

বড় সর্দার, জলদস্যুরা লা ব্রুশের ভয়ে সন্ত্রস্ত।

এদিকে কয়েদ ঘরে ফ্রান্সিসদের একঘেঁয়ে দিন কাটছে। বেনজামিনের কাছে ওরা শুনেছে চাঁদের দ্বীপ এখন লা ব্রুশের কবজায়। রাজা, সেনাপতি সব পালিয়েছে।

সেদিন সকালে খাবার নিতে এলে বেনজামিনকে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—'লা ব্রুশ কবে ক্যারাভেল-এ ফিরবে?'

—সব মুক্তো না নিয়ে ফিরবে না ক্যাপ্টেন।

—সে কি এখনও মুক্তো পায় নি?

—চারজন ভাজিম্বাকে নামিয়েছিল। তিনজন জল থেকে উঠতেই পারে নি। একজন মাত্র একটা মুক্তো এনে দিয়েই ম'রে গেছে। লোকটার সারা গা ফুটো-ফুটো হ'য়ে গিয়েছিল।

ফ্রান্সিস ম্লান হাসল। বললো—'হবেই তো—মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী লাফ্ মাছ বড় সাংঘাতিক জীব।'

খাবার দিতে-দিতে বেন্‌জামিন অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললো—'তুমি জানলে কি ক'রে?'

'—আমি জানি। ক্যাপ্টেনকে ব'লো আমি মুক্তো এনে দিতে পারি।'

হ্যারি চম্‌কে উঠল। চাপাস্বরে বলল—'কী বলছো যা-তা।'

ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকালো। বললে—'হ্যারি আমাদের মুক্তির এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

—কিন্তু খুনী লা ব্রুশের কি লোভের শেষ আছে?

—দেখা যাক না। এটাই আমাদের মুক্তির শেষ চেষ্টা। বেন্‌জামিন যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—'কথাটা ক্যাপ্টেনকে ব'লো।'

একঘণ্টা সময় কাটে নি। বেন্‌জামিন হাঁপাতে-হাঁপাতে কয়েদ ঘরে এসে ঢুকলো। ফ্রান্সিসের কাছে এলো। ওর হাতকড়া খুলতে-খুলতে বলল—'চলো, তোমাকে ক্যাপ্টেন ডেকেছে।'

ফ্রান্সিস উঠতে গেল। হ্যারি ওর হাত চেপে ধরল—'তুমি পাগল হ'য়েছো?'

ফ্রান্সিস হ্যারির হাতে চাপা দিয়ে ম্লান হাসলো—'যদি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার এতগুলো বন্ধু মুক্তি পায়, তাহ'লে ক্ষতি কি?'

—'না, তোমাকে যেতে দেব না।' হ্যারির চোখে জল এসে গেল।

'—ছিঃ, হ্যারি, কাঁদছো? আমরা না ভাইকিং?' ফ্রান্সিস বলে উঠল। হ্যারি আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের হাত ছেড়ে দিলো। ফ্রান্সিস বেন্‌জামিনের অলক্ষ্যে একবার কোমরে গোঁজা আয়নাটায় হাত বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোহার দরজার কাছে একবার ঘুরে দাঁড়াল। বললো 'ভাইসব—যদি আমি না ফিরি, তবে হ্যারিকে তোমরা দলনেতা ব'লে মেনে নিও। ও যা বলবে তাই ক'রো।'

কথাটা ব'লে ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সবাই হ্যারির মুখে ঘটনাটা শুনল। ওদের মুক্তির বিনিময়ে ফ্রান্সিস তার নিজের জীবনটা বাজি ধ'রেছে। সকলেই হৈ-হৈ ক'রে উঠল—'ফ্রান্সিসকে ফিরিয়ে আনো। ওর জীবনের বিনিময়ে আমরা মুক্তি পেতে চাই না।'

কিন্তু ফ্রান্সিস তখন অনেক দূরে। ও নৌকায় বসে আছে তখন। বেন্‌জামিন নৌকাটা বেয়ে চলেছে সোফালা বন্দরের দিকে। হ্যারি ভাইকিংদের লক্ষ্য করে বললো—'ভাইসব—তোমরা শান্ত হও। শোন—ফ্রান্সিস মুক্তোর সমুদ্রের ভয়াবহ বিপদের কথা সবই জানে। সেই বিপদ থেকে বাঁচবার উপায় ও জানে। শুধু মুক্তোর সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসার রহস্যটা ওর অজানা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন এই রহস্যটাও ভেদ করতে পারে। তাহ'লেই ওর জীবনের কোন আশঙ্কা

থাকবে না। সকলেই চুপ ক'রে হ্যারির কথা শুনল। কেউ আর কোন কথা বলল না।

বেন্জামিনের পেছনে-পেছনে যখন ফ্রান্সিস কয়েদঘরের বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, তখন চোখে আলো লাগাতে ওর অস্বস্তি হ'তে লাগল। ডেক-এ উঠেই বাইরের উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকাতে পারল না। চোখ জ্বালা করে বুজে এল। ও দুহাতে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেন্জামিন ওর দিকে তাকিয়ে বলল—হঠাৎ বাইরে এলে ও-রকম হয়। একটু পরেই সয়ে যাবে। তাই হলো। আস্তে-আস্তে আলো সহ্যনীয় হয়ে উঠল। ও এবার চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। বেন্জামিনের পেছনে-পেছনে হাঁটতে লাগল।

দু'জনে জাহাজ থেকে নৌকায় নামল। বেনজামিন 'সোফালা বন্দর লক্ষ্য ক'রে নৌকো চালাতে লাগল।

সমুদ্রতীরে পোঁছে ফ্রান্সিস দেখল, এখানে-ওখানে তখন ভাজিম্বাদের মৃতদেহ পড়ে আছে। কামানের গোলায় সমুদ্রতীরে কোথাও-কোথাও বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কামানের মুখে ভাজিম্বারা দাঁড়াতে পারে নি। শুধু বর্শা নিয়ে কি কামানের বিরুদ্ধে লড়া যায়।

সোফালা বন্দরের একটা গুদোমঘরও বিধ্বস্ত হ'য়েছে। নির্জন চারদিক। একজন ভাজিম্বাকেও ওরা দেখতে পেল না। বাজারের মত জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে। যে বাড়িগুলো চোখে পড়লো, সেগুলোর দরজা খোলা। কোন-কোন জনপ্রাণী নেই। ফ্রান্সিস যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব করল। লা ব্রুশের ভয়ে নিশ্চয়ই যারা বেঁচেছিল, তারা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এক শ্মশানের রাজা হ'য়ে বসেছে লা ব্রুশ।

ফ্রান্সিসকে নিয়ে বেনজামিন যখন রাজবাড়িতে গিয়ে পোঁছল, তখন একটু বেলা হ'য়েছে। লা ব্রুশ কাঠের সিংহাসন হাত পা ছড়িয়ে বসেছিল। ফ্রান্সিসকে ঢুকতে দেখেই ও লাফিয়ে উঠল। খুক্-খুক্ ক'রে হাসলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—'এসো-এসো, ফ্রান্সিস এসো। সত্যি তোমরা বীরের জাত। মুক্তোর সমুদ্রে নামার কথা শুনে সকলের যখন ভয়ে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, তখন তুমি নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে রাজি হ'য়েছো। এ সোজা কথা ? এ্যা ? সত্যিই তুমি বীর।'

ফ্রান্সিস এসব কথা ভুলল না। ও প্রথমেই শক্ত ভঙ্গিতে শর্তের কথা তুলল—আমি মুক্তো এনে দেবো কিন্তু একশর্তে।'

—কি শর্ত ?

—আমাকে আর আমার বন্দী বন্ধুদের সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি দিতে হবে। আমাদের জাহাজ ফিরিয়ে দিতে হবে।

—'বেশ তো ভালো কথা। কিন্তু হীরে দু'টো আমায় ক্যারাভেল-এ রেখে যেতে হবে।'

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। ভেবে দেখল, এ ছাড়া উপায় নেই। হীরে উদ্ধারের কথা পরে ভাববো। বলল—বেশ। এবার আর একটা শর্ত।

—বলো।

—আমি একবার ডুব দেবো। আমার ডান হাতের মুঠোয় যে ক'টা মুক্তো আঁটে, সে ক'টাই পাবেন।

লা ব্রুশ একটু হতাশার ভঙ্গিতে বলল—সে আর ক'টা। বড় জোর তিনটে।

—ঐ তিনটে পেয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

লা ব্রুশ একটুক্ষণ ভেবে দাড়িতে হাত বুলিয়ে তারপর বললো—'বেশ, তাই হবে।'

ফ্রান্সিস একটু হেসে বললো—'অবশ্য আপনার মত খুনে নরঘাতক যে কতটা শর্ত অনুযায়ী চলবেন, তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

তাহাতে বড় সর্দার খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এলো। লা ব্রুশ হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে খুক্-খুক্ ক'রে হেসে বললো—'যাও খেয়ে নাও গে, আমরা এক্ষুণি বেরুবো।'

পাশের ঘরটাকে রসুইখানা করা হ'য়েছে। বড়সর্দারই ফ্রান্সিসকে ওখানে এনে বসালো। লম্বা-লম্বা সুস্বাদু রুটি, প্রচুর মাংস, মাছ এসব খেতে দিল। কয়েদ ঘরে জঘন্য খাদ্য খেয়ে-খেয়ে খিদেটাই যেন ম'রে গেছে। এটাও একটা কারণ, আর একটা কারণ বন্ধুদের শুকনো ক্ষুধার্ত মুখগুলো ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ফ্রান্সিস আর খেতে পারলো না। একপাশে খাবার সরিয়ে রেখে উঠে পড়লো। বড় সর্দার হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল—'করো কি—করো কি, পেট পুরে খেয়ে নাও। অনেকক্ষণ জলে থাকতে হবে।'

—'আমি আর খাবো না।' ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বললো।

* * *

বনের মধ্যে দিয়ে মুক্তোর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হ'ল ' প্রায় সব ক'জন জলদস্যুকেই সঙ্গে নেওয়া হ'য়েছে। এটা দেখে ফ্রান্সিস লা ব্রুশকে জিজ্ঞেস করল—'এত লোক কি হবে? আমরা তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না।'

লা ব্রুশ খুক্-খুক্ ক'রে হাসলো। বললো—'বিপদ-আপদের কথা কি বলা যায়।'

মুক্তোর সমুদ্রের কাছাকাছি পড়ল অগ্নি-প্রবালের স্তর। সেটা দ্রুতপায়ে পেরোল সবাই। ঠিক দুপুরবেলা ওরা মুক্তোর সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছল। ফ্রান্সিস দেখলো জল শান্ত। হাওয়ায় শিরশির ঢেউ উঠছে। দূরে ঢাকা কাঁচ পাহাড়ের কালো প্রাচীর। ডানদিকে খাড়া উঠে গেছে। প্রকৃতি যেন সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে এই মুক্তোর সমুদ্রকে। অবশেষে মুক্তোর সমুদ্র আজ ফ্রান্সিসের চোখের সামনে। কিন্তু বন্ধুরা কেউ দেখতে পেলো না। ফ্রান্সিস মুক্তোর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এসব সাতপাঁচ ভাবছে, লা ব্রুশ তাড়া দিল—'কই! নামো শিগ্গির।'

ফ্রান্সিস জলে নামল। তারপর সাঁতরাতে-সাঁতরাতে মাঝখানটায় এসে চারদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে ডুব দিল। একটু নামতেই দেখল, আলোর উৎসে সেই অপূর্ব সুন্দর মুক্তোগুলো। ফ্রেদারিকো ঠিকই বলেছিল, তলাটা অমসৃণ। তাতে বড়-বড় আকারের ঝিনুক। কোনটার মুখ খোলা, কোনটা বন্ধ। কোনো-কোনো ঝিনুকের খোলা মুখের মধ্যে মুক্তো রয়েছে। জায়গাটার অপরূপ সৌন্দর্য, মানুষের কল্পনাতেও বোধহয় আসবে না, এমনি অপার্থিব সেই সৌন্দর্য। একটা গভীর বেগুনে নীল আলো জায়গাটাকে আলোকিত ক'রে রেখেছে। হঠাৎ গা ঘেঁষে কি একটা চলে যেতেই ফ্রান্সিস সম্বিত ফিরে পেলো। দেখল, মুক্তোর সমুদ্রের বিভীষিকা, লাফ্

মাছ। পিঠের ছুঁচলো কাঁটাগুলো উঁচিয়ে আছে। বেগুনে নীল আলো লেগে গায়ের আঁশগুলো চক-চক ক'রে উঠলো। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি কোমরে গোঁজা আয়নাটা বের ক'রে অমসৃণ তলাটায় রেখে দিলো। বেশ জোরালো আলো প্রতি-বিম্বিত হ'ল। লাফ্ মাছটাকে ওদিকে দ্রুত যেতে দেখলো। দম ফুরিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস জল ঠেলে উপরে ভেসে উঠলো। ওদিকে ভেসে উঠতে দেখে জলদস্যুরা হৈ-হৈ করে উঠলো। লা ব্রুশের মুখেও হাসি।

ফ্রান্সিস আবার ডুব দিলো। এক ডুবে সোজা নীচে নেমে এলো। ছড়িয়ে থাকা মুক্তো থেকে তিনটে মুক্তো তুললো। তখনই লক্ষ্য করলো অনেক ক'টা লাফ্ মাছ আয়নাটার কাছে জড়ো হয়েছে। কয়েকটা মাছ আয়নাটায় ঢুঁ দিয়ে যাচ্ছে। ঐ জায়গায় জলটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। মাছগুলোর মুখ নিশ্চয়ই ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ফ্রান্সিস পায়ে জলের ধাক্কা দিয়ে ওপরে উঠে এল। জলদস্যুরা ওকে জীবিত দেখে আবার চীৎকার ক'রে উঠল। ফ্রান্সিস সাঁতরাতে-সাঁতরাতে তীরে এসে উঠল। লা ব্রুশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এলো। ফ্রান্সিস জল থেকে উঠতে যাবে, লা ব্রুশ ছুটে এসে বললো—'উঠো না—উঠো না—আর তিনটে দাও।'

ফ্রান্সিস কঠোর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। বললো—'এক মুঠোয় যে ক'টা আঁটে তাই এনেছি, দু'বার নামবার তো কথা ছিল না।'

লা ব্রুশ খুক্-খুক্ ক'রে হাসলো—'আর তিনটে ব্যাস্।'

ফ্রান্সিস বুঝল, যুক্তি শোনার মানুষ নয় লা ব্রুশ। আর তিনটে মুক্তো পেলে যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহ'লে সেটা এখনই দেওয়া সম্ভব। কারণ লাফ্ মাছগুলো এখন আয়নাটায় ঢুঁ দিতে ব্যস্ত।

ফ্রান্সিস আবার সাঁতরে মাঝখানের দিকে চলল। লা ব্রুশ বড় সর্দারকে ইশারায় ডাকল। ফিস-ফিস করে বললো—সবাইকে তীর বরাবর ছড়িয়ে দাঁড়াতে বলো। ও যেন কিছুতেই উঠে না আসতে পারে। যত মুক্তো আছে, সবই আমার চাই।'

বড় সর্দার ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে তাই বললো। তীর বরাবর সবাই তরোয়াল আর বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সিসের আর তীরে উঠে আসার উপায় রইলো না।

ফ্রান্সিস মাঝখানটায় এসে ডুব দিল। ফ্রেদারিকো ঠিকই বলে ছিল। গভীরতা বেশি নয়। খুব তাড়াতাড়ি তলায় পৌঁছে গেল। আর তিনটে মুক্তো তুলতে পারলেই মুক্তি আমাদের সকলের। কিন্তু এ কি? ফ্রান্সিসের মাথাটা ঘুরে উঠলো। আয়নায় আলোর প্রতিফলন তো দেখা যাচ্ছে না! কোথায় গেল আয়নাটা? হয়তো উল্টে গেছে। আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে হাতে-পায়ে জল ঠেলে, জলে কয়েকটা ধাক্কা দিয়ে ওপরে ভেসে উঠলো। তীরের দিকে সাঁতরাতে যাবে, তখনি দেখলো সারা তীর জুড়ে জলদস্যুরা তরোয়াল, বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। ওকে ভেসে উঠতে দেখে সবাই অস্ত্র উঁচিয়ে হৈ-হৈ ক'রে উঠল। শয়তান লা ব্রুশ! তোমার মতলব আমার কাছে পরিষ্কার! ফ্রান্সিস মনে-মনে বলল। তারপর এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে প্রাণপণে কাঁচ পাহাড়ের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। ফ্রেদারিকো একটা সুড়ঙ্গমত পথ পেয়েছিল সেটা কোথায়? এই রহস্যটুকু ভেদ করার মধ্যে ওর জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। ও কাঁচপাহাড়ের দিকে তাকিয়ে-

তাকিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। হঠাৎ বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত একটা চিন্তা ওকে নাড়া দিয়ে গেল। ঐ যে কাঁচ পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু মাথাটা, ওটা বাঁদিকে কাত হ'য়ে ভাঙা কাঁচের মত উঁচিয়ে ছুঁচোলো হ'য়ে আছে না? ফ্রেদারিকোর আয়নাটাও সোজা করে ধরলে ঠিক এমনি—বাঁকা ছুঁচলো একটা দিক ছিল। গলায় ঝোলাবার দড়ি পরাবার জন্যে ঠিক ছুঁচলো মাথার নীচে বরাবর ছিল ফুটোটা কি শুধু দড়ি পরাবার জন্যে ছিল? না—না—ভীষণ ভাবে চমকে উঠে ফ্রান্সিস প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো—ওটাই সুড়ঙ্গপথের ইঙ্গিত। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। শেষ রহস্যের সমাধান হ'য়ে গেছে!

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ফ্রান্সিস কাঁচপাহাড়ের চূড়ো লক্ষ্য ক'রে সাঁতার কাটতে লাগল। একটু পরেই নীচে একটা জলের টান অনুভব করল। আর একটু এগোতেই প্রচণ্ড জলের টানে ও তলিয়ে গেল। কিছু স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। শুধু দেখলো একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে দিয়ে ও প্রচন্ড বেগে ছুটে চলেছে জলের টানের সঙ্গে-সঙ্গে। হঠাৎ অন্ধকার কেটে গেল। এখানে আলো আছে। জলের টান আর নেই। হাতে-পায়ে জল ঠেলে ফ্রান্সিস ওপরে ভেসে উঠলো। পেছনে তাকিয়ে দেখলো, কাঁচপাহাড় টানা চলেছে সোফালা বন্দরের দিকে। সামনে অসীম সমুদ্র। আঃ—মুক্তির উল্লাসে ও জলের মধ্যে দুটো পাক খেল।

ফ্রান্সিস গা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ দম নিলো। তারপর আস্তে-আস্তে সাঁতার কেটে চলল সোফালা বন্দরের দিকে।

সোফালা বন্দরের কাছাকাছি এসে একটা পাথরের আড়ালে ও হাঁপাতে লাগল। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখল সূর্য অস্ত যেতে দেরি আছে। দূরে লা ব্রুশের ক্যারাভেল আর ওদের জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ, সমুদ্রতীরের দিকে সামুদ্রিক পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে, আর তীক্ষ্ণস্বরে ডাকছে। ও বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে মুক্ত প্রকৃতির রূপ দেখতে লাগল। কতদিন এই আকাশ, মাটি, পাখি, সমুদ্র দেখিনি। কতদিন? হঠাৎ হ্যারি আর অন্য বন্ধুদের বন্দী জীবনের কথা মনে পড়তে ওর মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

পশ্চিমদিকের আকাশে আর সমুদ্রে গভীর লাল রং ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু তখনই অন্ধকার নেমে এল না। চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসার জন্যে ফ্রান্সিসকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

রাত্রি নেমে আসতেই ফ্রান্সিস ওদের জাহাজটার দিকে সাঁতরে চলল। জাহাজের কাছে পৌঁছে ও নোঙর বাঁধা মোটা কাছিটা বেয়ে-বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। লা ব্রুশ এই জাহাজে কোন পাহারাদার রাখে নি। ওকে আর লুকিয়ে কেবিনঘরে আসতে হলো না। কেবিনঘরে আসার সময় ও আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, ক্যারাভেল-এ দু'জন পাহারাদার জলদস্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও ভেবে নিশ্চিন্ত হলো যে ওদের জাহাজটা অন্ততঃ নিরাপদ। এখানে নির্বিবাদে আশ্রয় নেয়া চলবে।

নিজের কেবিনে ঢুকে ফ্রান্সিস ভেজা জামাকাপড় ছাড়ল। ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে হয়। রসুইঘরে গিয়ে ঢুকল। উনুন ধরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে গরম-গরম রুটি আর সুপ তৈরি করল। পেট ভ'রে খেয়ে কেবিনঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। অনেক চিন্তা মাথায়। কি ক'রে বন্ধুদের মুক্তি করা যাবে? কি ক'রে

হীরেসুদ্ধু জাহাজটা নিয়ে পালানো যাবে? ও যে মুক্তি পেয়েছে, এটা বন্ধুদের জানানো প্রয়োজন। কিন্তু কি ক'রে জানাবে?

দু'তিনদিন কেটে গেল। ফ্রান্সিস ওদের জাহাজেই লুকিয়েই রয়েছে। খায়-দায় আর ভাবে, কি ক'রে বন্ধুদের মুক্তো করা যায়। ওদিকে লা ব্রুশ-এর ক্যারাভেল-এ যথেষ্ট সংখ্যক জলদস্যুরা রয়েছে, ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে বন্ধুদের মুক্ত করা অসম্ভব। ফ্রান্সিস সুযোগের প্রতীক্ষায় রইল।

ওদিকে বড় সর্দার কয়েকজন জলদস্যুকে নিয়ে পলাতক ভাজিম্বাদের খোঁজে বন-জঙ্গল তোলপাড় করছিল। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি তো দূরের কথা কোনো সাধারণ ভাজিম্বা যোদ্ধাকেও ওরা খুঁজে বের করতে পারল না।

একদিন বিকেলের দিকে পাহাড়ী এলাকায় বড় সর্দার দলবল নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ একটা পাথরের আড়াল থেকে একটা বর্শা ছুটে এসে বড় সর্দারের পিঠে বিঁধে গেল। বড় সর্দার উবু হ'য়ে পাথরের পড়ে গেল। বর্শাটা পিঠ ভেদ ক'রে বুকে পর্যন্ত চলে এসেছে। বড় সর্দার মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। দু'তিনজন জলদস্যু মিলে বর্শাটা খুলে ফেলল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। আহত বড় সর্দারকে কাঁধে নিয়ে ওরা রাজবাড়িতে নিয়ে আসার পথে বড় সর্দার মারা গেল। বড় সর্দারের সঙ্গীরা অবশ্য যে পাথরের আড়াল থেকে বর্শাটা ছুটে এসেছিল, সেখানে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজল, কিন্তু কারোর দেখা পেল না। ওদের মনে বেশ ভয়ও ঢুকেছিল। আবার কখন কোন পাথরের আড়াল থেকে বর্শা ছুটে আসে। ওরা সন্ধ্যে হবার আগেই ঐ তল্লাট ছেড়ে চলে এল।

লা ব্রুশ মৃত সর্দারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর চেঁচিয়ে হুকুম দিল—'ক্যারাভেল'-এ যত লোক আছে, সবাইকে এখানে জড়ো কর। ক্যারাভেল-এ শুধু বেনজামিন থাকবে, পাহারা দেবে। আর গোলাঘর পাহারা দেবার জন্য দু'জন থাকবে। আর কাল সকালেই পাহাড়ী এলাকার দিকে তল্লাসীতে বেরুবে। কোন ভাজিম্বাকে দেখলেই হত্যা করবে।

লা ব্রুশ ছোট সর্দারকে বড় সর্দারের দায়িত্ব দিল। এই সর্দার ছিল একটু রোগা-ঢ্যাঙা। সে পরদিন সকালেই নৌকো চড়ে ক্যারাভেল-এ এলো। ভাজিম্বাদের নৌকো ক'রে সবাইকে দ্বীপে নিয়ে এল। তারপর রাজবাড়িতে এনে জড়ো করল। ক্যারাভেল-এ রইল শুধু বেনজামিন। আর দু'জন গোলাঘর পাহারাদার।

সব জলদস্যু বড় সর্দারের নেতৃত্বে খোলা তলোয়াল হাতে বন-জঙ্গল চষে ফেলল। কোন ভাজিম্বাকেই ধরতে পারল না। দুপুরের পরে শুরু করল, পাহাড়ী এলাকায় তল্লাসী; একজন ভাজিম্বা পাথরের আড়াল থেকে পালাতে গিয়ে ওদের নজরে পড়ে গেল। বড় সর্দার সবার আগে তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটল ভাজিম্বা যুবকটিকে ধরতে। কিন্তু বেগতিক বুঝে ভাজিম্বা যুবকটি উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে মুক্তোর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে চললো পারের দিকে। কিছুদূর সাঁতরাবার পর যুবকটি হঠাৎ হাত-পা ছেড়ে আস্তে-আস্তে জলে ডুবে গেল, আর উঠল না।

খাড়া পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে জলদস্যুরা এসব দেখছে। তখনই পেছনে পাথর আর একটা বর্শা তীব্র বেগে ছুটে এল। লাগল একটি জলদস্যুর মাথায়। সে তাল

সামলাতে না পেরে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে নীচে মুক্তোর সমুদ্রে এসে পড়ল। বারকয়েক সাঁতরাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে সেও জলের নীচে তলিয়ে গেল।

সন্ধ্যে হবার আগেই জলদস্যুর দল রাজবাড়িতে ফিরে এল।

লা ব্রুশ হাত-পা ছড়িয়ে কাঠের সিংহাসনে বসেছিল। পাশেই শেকলে বাঁধা চিতাবাঘের বাচ্চাটা। ঢ্যাঙা সর্দারের মুখে সব শুনে লা ব্রুশের গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হলো। সে হাতীর দাঁতে বাঁধানো তরোয়ালের হাতলটায় অস্থিরভাবে হাত বুলোতে লাগল।

নিজের জাহাজের মাস্তুলের আড়ালে লুকিয়ে ফ্রান্সিস সবই দেখলো। জলদস্যুরা সব দল বেঁধে চাঁদের দ্বীপে চ'লে গেল কেন, বুঝল না। তবে এটা বুঝল যে, ওখানে নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল হ'য়েছে, যে জন্যে সবাইকে তলব করা হ'য়েছে। তা'হলে বোধহয় শুধু বেন্‌জামিন ক্যারাভেল-এর পাহারায় রইল। কারণ ঐ দলে ও বেন্‌জামিনকে দেখে নি।

সেদিন সন্ধ্যে হ'তেই বাতাস পড়ে গেল। আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোন্ থেকে মেঘ উঠে আসছে, এটা ফ্রান্সিস লক্ষ্য করে নি। ও কেবিন ঘরে পায়চারি করছিল আর ভাবছিল, এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। বন্ধুদের মুক্ত করতে হ'লে এই সুযোগ। বেন্‌জামিন একা। ও হয়তো বাধা নাও দিতে পারে। ও ফ্রেদারিকোকে ভালবাসত। ওর কথা শুনত। সেই সূত্রে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে ও ভালো ব্যবহার করত। মাঝে-মাঝে যে দুর্ব্যবহার না ক'রেছে তা নয়, তবে তার জন্যে ওকে দোষ দেওয়া যায় না। লা ব্রুশের হুকুমেই এ'রকম ব্যবহার করতে বাধ্য হ'য়েছে। বেন্‌জামিন বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে না। তাই যদি হয়, তা'হলে বন্ধুদের মুক্ত করতে কোনো অসুবিধেই নেই।

একটু রাত বাড়তেই হঠাৎ হাওয়ার প্রবল ঝাপটায় জাহাজটা যেন কেঁপে উঠল। শুরু হ'ল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। অন্ধকার সমুদ্র ভয়াবহ রূপ নিল। আকাশে মুহু-র্মুহু বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সঙ্গে বাজপড়ার গম্ভীর শব্দ। ফ্রান্সিস খুশির চোটে দু'বার বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে নিল। সে সুযোগের আশায় ও দিন গুনেছে, সেই সুযোগ আজ উপস্থিত। ও তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নেয়। পোষাক পাল্টাল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। তারপর ওপরে ডেকে উঠে এল। জাহাজটা ভীষণ দুলছে। সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা আর বৃষ্টির অবিরল ধারা। ও টাল সামলাতে-সামলাতে চললো জাহাজের মাথার দিকে। এই মাথার দিকেই ক্যারাভেলের সঙ্গে জাহাজটাকে বাঁধা হয়েছে। ফ্রান্সিস জাহাজের মাথায় পা ঝুলিয়ে ধরল। তারপর কাছিটার হাত দিয়ে ধ'রে-ধ'রে ক্যারাভেল-এর ওপর উঠে এল। ডেক-এ কেউ নেই! নিচে কেবিনটায় নামবার সিঁড়ির মুখে একটা কাঁচঢাকা আলো ঝড়ো ঝাপটায় দোল খাচ্ছে। ও পায়ে টাল সামলে ডেক পেরোল। নিচে নামবার সিঁড়ির কাছে এলো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললো। কয়েকটা আলো ঝুলছে বটে, কিন্তু তাতে অন্ধকার কাটে নি। সারা গা জলে ভিজে গেছে, যেন স্নান ক'রে উঠেছে। নামতে-নামতে ও কয়েদঘরের কাছে চ'লে এল। কয়েদঘরের সামনে মাথার কাছে যে আলো জ্বলছে, সেই আলোয় দেখলো, খোলা তলোয়ার হাতে

বেন্‌জামিন দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে। বাতিটা ও ক্যারাভেল দুলচে, সেই সঙ্গে কাঠে ক্যাঁচ্‌-ক্যাঁচ্‌ শব্দ উঠছে। ও দেখলো, বেন্‌জামিন একা। অন্য কোন পাহারাদার নেই।

ফ্রান্সিস কয়েক পা এগিয়ে ডাকল—'বেন্‌জামিন।'

বেন্‌জামিন প্রথমে ডাকটা শুনতে পেল না। ফ্রান্সিস আর একটু গলা চড়িয়ে ডাকল—'বেন্‌জামিন।'

এবারের ডাকটা কানে গেল। বেন্‌জামিন দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। ঐ স্বল্প আলোয় ও ফ্রান্সিসকে চিনতে পারল না। ফ্রান্সিস আলোর দিকে এগিয়ে এলো, এবার ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে ও বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল। ফ্রান্সিস! মুক্তোর সমুদ্র থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। কিন্তু এক মুহূর্তমাত্র, তারপরই বেন্‌জামিন সতর্ক-দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল—'এখানে কি চাও?'

ফ্রান্সিস হাসল। বললো—'আমার বন্ধুদের মুক্তি।'

—আমার হাতে তরোয়াল থাকতে সেটি হবে না।

ফ্রান্সিস ওর কাছ থেকে এই ব্যবহার আশা করে নি। বললো—'বেন্‌জামিন, তুমি আমাদের শত্রু। তবু বিশেষ ক'রে তোমাকে শত্রু ব'লে কখনও ভাবি নি। আমি তোমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছি।'

কথাটা ব'লে ফ্রান্সিস হাত বাড়াল। বললো—'তুমি সাহায্য করো।'

—'না।' বেনজামিন রুখে দাঁড়াল—'লা ব্রুশের নুন খেয়ে আমি বেইমানি করতে পারবো না।'

ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না কি করবে। বেন্‌জামিন এভাবে রুখে দাঁড়াবে ও স্বপ্নেও ভাবে নি। বললো—কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে লড়বো না।

—'কাপুরুষ।' বেন্‌জামিন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করল।

ফ্রান্সিসের চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই ও শান্তস্বরে বললো—'বেন্‌জামিন আমি মিনতি করছি, আমার কাজ আমাকে করতে দাও।'

—'না।' কথাটা শেষ করেই বেন্‌জামিন তরোয়াল উঁচিয়ে এগিয়ে এল। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফ্রান্সিস বললো—'তুমি আমাকে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করলে।'

বেন্‌জামিন তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসের ওপর। ফ্রান্সিস খুব সহজে মার ঠেকাল, বেন্‌জামিন দ্রুতহাতে তরোয়াল চালাতে লাগলো। ফ্রান্সিস শুধু তরোয়ালের ঘা ঠেকাতে লাগলো আর আত্মরক্ষা করতে লাগলো।

তরোয়াল যুদ্ধ চললো। জাহাজের দুলুনির মধ্যে দু'জনের পক্ষেই পা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তবু ঐ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই লড়াই চললো। দু'জনেই হাঁপাতে লাগলো। এটা ঠিক যে ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মারের মোকাবিলা বেন্‌জামিনকে করতে হচ্ছে না। ফ্রান্সিস শুধু আত্মরক্ষাই করে চলেছে। বেন্‌জামিনের মার ঠেকাচ্ছে, কিন্তু ফিরে আক্রমণ করছে না। এতে বেন্‌জামিনেরই পরিশ্রম হচ্ছিল বেশি। ফ্রান্সিস সে তুলনায় কম ক্লান্ত হলো। এক সময় তরোয়াল চালানো বন্ধ ক'রে বেন্‌জামিন দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগলো। ফ্রান্সিস বললো—'বেন্‌জামিন তোমাকে আমরা বন্ধু ব'লেই জানি। তুমি ওষুধ এনে দিয়ে

আমাকে সুস্থ করেছিলে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিনীতভাবে বলছি, 'তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমাকে চাবির গোছাটা দাও।'

বেনজামিন তার উত্তরে কোন কথা না ব'লে ফ্রান্সিসের ওপর নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মার ঠেকাতে-ঠেকাতে পিছিয়ে যেতে লাগলো। পিছোতে-পিছোতে সিঁড়ির গোড়ায় এসে গেল! বেনজামিন তরোয়াল চালাতে-চালাতে ওপরে উঠতে লাগলো। আসলে ফ্রান্সিস চাইছিল ডেক-এ উঠে আসতে। তাহ'লে নড়াচড়া করবার পিছু হটবার অনেকটা জায়গা পাওয়া যাবে।

দু'জনেই আস্তে-আস্তে ডেক-এ উঠে এল। বাইরে বৃষ্টি কমেছে তখন। কিন্তু ঝড়ো হাওয়ার দাপট সমানে চলেছে। ফ্রান্সিস ভাবল—এ ভাবে ও কতক্ষণ আত্মরক্ষা করবে? বোঝা যাচ্ছে, সুযোগ পেলেই বেনজামিন ওকে আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করবে না। বেনজামিনকে রোখবার একটাই রাস্তা ওকে আহত করা। এ ছাড়া উপায় নেই কোন।

এবার ফ্রান্সিস আর পিছু না হটে রুখে দাঁড়াল। বেনজামিনকে আক্রমণ করল। ফ্রান্সিসের আক্রমণের নিপুণ ভঙ্গী দেখে বেনজামিন বুঝল, শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে ও। এবার সত্যিকারের লড়াই শুরু হলো। কেউই কম যায় না। দু'জনেরই ঘন-ঘন শ্বাস পড়েছে। এগিয়ে-পিছিয়ে লড়াই চলল। ফ্রান্সিস সুযোগ খুঁজতে লাগল কি ক'রে বেনজামিনকে আহত করা যায়। ওর ডান হাতটাকে অকেজো ক'রে দিতে হবে। ফ্রান্সিস হঠাৎ আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে দিল। বেনজামিন পিছু হটতে লাগল। ফ্রান্সিস আক্রমণের চাপ সমান রাখল যাতে বেনজামিন বুঝে না পারে, কোথায় যাচ্ছে, কিসে পা পড়ছে ওর। ঠিক এ সময়ই বেনজামিন সিঁড়ির মুখে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস এত দ্রুত তরোয়াল চালাচ্ছিল, যে বেনজামিন বুঝতেও পারে নি, আর এক পা পিছোলেই সিঁড়ি। নিচে নামবার সিঁড়ি। পিছোতে গিয়ে বেনজামিনের পা নিচে সিঁড়ির খাঁজে পড়ে গেল। ও টাল সামলাল, কিন্তু ফ্রান্সিস ততক্ষণে বিদ্যুৎবেগে ওর ডান হাত লক্ষ্য করে তরোয়াল চালিয়েছে। একটা গভীর ক্ষত হ'য়ে গেল হাতে! ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। বেনজামিন তরোয়াল ফেলে দিয়ে আহত হাতটা বাঁ হাতে চেপে ব'সে পড়ল। ফ্রান্সিস ওকে জোরে ধাক্কা দিল। বেনজামিন উলটে ডেকের ওপর চিত হয়ে পড়ে গেল। একটা গোঙানির শব্দ বেরুলো ওর গলা থেকে। ও তখন মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে ওর কোমরের বেল্ট-এ এর কড়ার সঙ্গে আটকানো চাবির গোছাটা খুলে নিল। তারপর ছুটল সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে। কয়েদঘরের সামনে এসে যখন দাঁড়াল, তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছে ও। তাড়াতাড়ি বড় আকারের তালাটা খুলে ফেলল। ভেতরে-ফ্রান্সিসের বন্ধুরা অনেকেই জেগে ছিল। কারণ তখনও রাতের খাওয়া হয়নি। বাকিরা শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে ছিল। যারা জেগেছিল, তারা দরজা খুলতে দেখে ভাবল, রাতের খাবার আসছে। সেই প্রায় অন্ধকারে ওরা ফ্রান্সিসকে চিনতে পারল না। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—'হ্যারি।'

হ্যারি জেগেই ছিল। ও চমকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। এ কি! ফ্রান্সিস। হ্যারি প্রায় চিৎকার করে উঠলো—'ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস ছুটে এসে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে হ্যারির চোখে জল এসে

গেল। হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বললো—'ভাইসব, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। আমাদের এক্ষুণি পালাতে হবে। কিন্তু কোন শব্দ নয়। আনন্দ-উল্লাসের সময় পরে পাওয়া যাবে।' যারা জেগেছিল, তারা ঘুমন্ত আর তন্দ্রাচ্ছন্নদের ঠেলা দিয়ে বলল, 'এই ওঠ, ফ্রান্সিস এসেছে।'

সকলেই উঠে বসল, কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস গোছা থেকে চাবি বের ক'রে সবাইকে একে-একে মুক্ত করল। বললো—'আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবাই কাছি বেয়ে-বেয়ে আমাদের জাহাজে চলে যাও। কোনরকম শব্দ ক'রো না।'

সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল। হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস সবার শেষে ডেক-এ এল। দেখলো, বেন্‌জামিন তখনও শুয়ে আছে। তবে গোঙাচ্ছে না। হ্যারি বলে উঠল—'এ যে বেন্‌জামিন। এত রক্ত, ও কি মারা গেছে?'

'—না।' ফ্রান্সিস বলল বলল—ওর গায়ে তরোয়াল না চালিয়ে উপায় ছিল না। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে বসল। বললো—'হ্যারি—দু'একজনকে ডাকোতো। বেন্‌জামিনকে আমার কাঁধে তুলে দাও।'

দু'চারজন তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আহত বেন্‌জামিনকে দেখছিল। দু'জন এগিয়ে এল। হ্যারিও এসে হাত লাগাল। ওরা বেনজামিনকে ধরাধরি করে ফ্রান্সিসের কাঁধে চাপিয়ে দিল। বেন্‌জামিন আবার গোঙাতে শুরু করল। অত ভারী শরীরটা বয়ে নিয়ে যেতে ফ্রান্সিসের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ও দাঁত চেপে শরীরটাকে বয়ে নিয়ে চলল। কাছিটার কাছে এসে পা বাড়িয়ে আস্তে-আস্তে কাছিটায় ঝুলে পড়বার সময় বলল—'বেন্‌জামিন, বাঁ হাতে শক্ত করে আমাকে ধরে থাকো।'

বেন্‌জামিন তাই করল। ঝড়ো বাতাসে দু'টো জাহাজই দুলছে। ওরই মধ্যে দড়ি বেয়ে-বেয়ে ফ্রান্সিস ওকে ওদের জাহাজের মুখের কাছে নিয়ে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো—'বেন্‌জামিনকে ধরো। ওকে নিয়ে গিয়ে ওষুধ-টষুধ দাও। আমি আস্‌ছি।'

দু'চারজন ভাইকিং বেনজামিনকে ধ'রে তুলে নিল। ফ্রান্সিস দড়ি ধ'রে-ধ'রে আবার ক্যারাভেল-এ ফিরে এল। দেখল—হ্যারি আর আরো কয়েকজন ভাইকিং দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি, শিগ্‌গির আমাদের জাহাজে চ'লে যাও। আমি একটু পরেই আসছি।'

ওরা চলে গেল। ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটলো গোলাঘরের দিকে। গোলাঘরের সামনে পৌঁছে দেখলো দু'জন পাহারাদার গোলাঘর পাহারা দিচ্ছে। এত যে ব্যাপার ঘটে গেছে, তা ওরা কিছুই জানে না। ফ্রান্সিস বুঝল, ঝড়বৃষ্টির শব্দের জন্যেই ওরা কোন শব্দ পায় নি।

ও চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল গোলাঘরে ঢোকার দরজার ডানদিকে অনেকগুলো কাঠের পাটাতন সাজিয়ে রাখা। ওগুলোর পেছনটা ফাঁকা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ওখানে। ফ্রান্সিস পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা কাঠের টুকরো ঐ অন্ধকার জায়গাটা লক্ষ্য ক'রে ছুড়ল। কাঠের টুকরোটা সশব্দে ঐ জায়গাটায় পড়লো। দু'জন পাহারাদারই দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মধ্যে একজন তরোয়াল

উঁচিয়ে পা টিপে-টিপে ঐ অন্ধকার জায়গাটায় গিয়ে ঢুকল। কাঠের জড়োকরা পাটাতনের আড়ালে পড়ে গেল ও। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটে এসে অন্য পাহারাদারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটা কিছু বোঝবার আগেই ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। লোকটা চিত্ হ'য়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে ওর বুকে তরোয়ালটা ঢুকিয়ে দিল। মনে-মনে বলল—অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছ তোমরা। তোমাদের ওপর দয়া দেখানো অর্থহীন। ও দ্রুতহাতে লোকটার কোমরের বেল্ট থেকে চাবিটা খুলে নিল। গোলাঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। দেখলো, অনেকগুলি কাঠের বাক্সে ডাঁই করা কামানের গোলা। একটা বন্ধ বাক্স, সেটায় বোধহয় পিস্তলের গুলি। দেয়ালে সারি-সারি টাঙানো তরোয়াল, কুঠার বর্শা। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে দেখলো অন্য পাহারাদারটা ছুটে আসছে। ও এক হ্যাঁচ্‌কা টানে কেরোসিন তেলের কাচের আলোটা খুলে কামানের গোলাগুলোর ওপর ছুঁড়ে মারল। কাচটা ভেঙে চারিদিকে ছিটিয়ে পড়লো। কাঠের বাক্সগুলোয় কেরোসিনের আগুন ছিট্‌কে পড়ে আগুন লেগে গেল।

আলো নিভে যাওয়াতে দরজার কাছটা অন্ধকার হয়ে গেছে তখন? পাহারাদারটা অন্ধকারেই তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল ও মারটা ফিরিয়ে তরোয়াল দিয়ে ঐ লোকটার তরোয়াল চাপ দিয়ে ওকে প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা দিল। লোকটা প্রায় ছিটকে পড়ে গেল। সেই ফাঁকে ফ্রান্সিস সিঁড়িটার দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুটল। পাহারাদারও উঠে ওর পিছু নিল। ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। পাহারাদারটাও উঠতে লাগল। দু'জনকেই প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হচ্ছিল। কাজেই কেউই কাউকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিল না। ফ্রান্সিস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়াল। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে তরোয়াল তুলল। ফ্রান্সিস ঠিক তখনই লোকটার চোয়াল লক্ষ্য ক'রে একটা ঘুঁষি মারলো। লোকটা ছিট্‌কে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠতে লাগল।

ডেক-এ উঠেই ও ছুটলো ক্যারাভেল-এর পেছন দিকে। ও যখন ওদের জাহাজের সঙ্গে বাঁধা কাছিটায় ঝুলে পড়ল, তখনই প্রচণ্ড শব্দে গোলাঘরে প্রথম গোলাটা ফাটলো। সমস্ত ক্যারাভেলটা কেঁপে উঠল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি দড়ি বেয়ে নিজেদের জাহাজে চ'লে এল। তারপর কাছিটার ওপর তরোয়াল চালাতে লাগল। তরোয়ালের কয়েকটা কোপ পড়তেই কাছিটা কেটে গেল। ক্যারাভেলটা আস্তে-আস্তে কিছুদূরে স'রে গেল। ওদিকে ক্যারাভেল-এর গোলাঘরে তখন একটার পর একটা গোলা ফাটছে।

ফ্রান্সিস হাঁপাতে-হাঁপাতে কেবিনঘরগুলোর দিকে ছুটলো। তখনই হ্যারির সঙ্গে দেখা। ফ্রান্সিস বললো—শিগ্‌গির, আমাকে বেন্‌জামিনের কাছে নিয়ে চলো।

একটা কেবিন ঘরে হ্যারি ওকে নিয়ে এল। দেখল বেন্‌জামিন শুয়ে আছে। ছেঁড়া কম্বল দিয়ে ওর ডানহাতে একটা ব্যাণ্ডেজমত বাঁধা। ফ্রান্সিস ওর পাশে ব'সে হাঁপাতে লাগল। একটু দম নিয়ে ডাকল—'বেন্‌জামিন'।

বেন্‌জামিন চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল।

—'তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'না।' বেন্‌জামিন স্পষ্টস্বরে বলল—'আমি আমাদের জাহাজে ফিরে যাবো'।

'—আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের জাহাজের চিহ্নমাত্রও থাকবে না।'

—'তার মানে ?' বেন্‌জামিন অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল।

—'তোমাদের ক্যারাভেল-এর গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। শুনতে পাচ্ছো না গোলা ফাটার আওয়াজ' ?

বেন্‌জামিন আর কোন কথা বলল না।

—'বেন্‌জামিন'—ফ্রান্সিস বলল—'অনেক নিরীহ, নিরপরাধ মানুষের চোখের জলে, বুকের রক্তে ভিজে গেছে তোমাদের ঐ ক্যারাভেল-এর ডেক, কয়েদঘর। অনেক অভিশাপ বর্ষিত হ'য়েছে ঐ অভিশপ্ত ক্যারাভেল-এর ওপর। ওটাকে পোড়াতে পেরে আমার আজ আনন্দের সীমা নেই। ঐ ক্যারাভেল-এর সঙ্গে লা ব্রুশকে পোড়াতে পারলে, আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম। কিন্তু এবার সেটা হ'ল না।' একটু থেমে ও বলল—'আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার আসবো। লা ব্রুশের সঙ্গে আমার শেষ বোঝাপড়া এখনো বাকি।'

বেন্‌জামিন একইভাবে ওপরে তাকিয়ে থেকে বলল—'আমি হুকুমের চাকর।'

'সেটা আমি বুঝি বেন্‌জামিন। তাই বলছি তুমি আমাদের সঙ্গে দেশে চলো।'

বেন্‌জামিন আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল।

—তা'হলে কি করবে এখন ? আমরা এক্ষুণি জাহাজের নোঙর তুলবো। তাড়াতাড়ি বলো।

বেন্‌জামিন ধীরস্বরে বলল—'আমাকে ভাজিম্বাদের একটা নৌকায় তুলে দাও। আমি চাঁদের দ্বীপে যাবো।'

'—লা ব্রুশ যা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পশু, ও তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'—তবু—' বেন্‌জামিন মাথা নাড়ল—'আমাকে ওর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

'—বেন্‌জামিন—তুমি কেন নিজেকে ঐ নরঘাতকটার কাছে নিয়ে যেতে চাইছো ?'

বেন্‌জামিন একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল—'লা ব্রুশের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষকে তোমরা চেনো না। আমি যদি পালিয়ে যাই, ও কখনো না কখনো দেশের দিকে ফেরার পথে লিসবনের কাছাকাছি কোন জায়গায় আড্ডা গড়বে। তারপর ওর কোন বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়ে আমার বৌ-ছেলেমেয়েকে খুন করাবে।'

'—বলো কি ?' ফ্রান্সিস আর ওখানে যারা উপস্থিত ছিল, সকলেই লা ব্রুশ যে কি সাংঘাতিক মানুষ, সেটা বুঝল।

'তার চেয়ে এই ভালো—আমার যা হবার হোক—আমার বৌ-ছেলেমেয়ে বেঁচে থাক।'

ফ্রান্সিস বা হ্যারি কেউ কোন কথা বলল না। দু'জনেই চুপ ক'রে রইল। তারপর ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকলো—'চলো ওপরে ডেক-এ যাই।'

যাবার সময় দু'জন ভাইকিংকে বললো 'তোমরা বেন্‌জামিনকে ওপরে নিয়ে এসো।'

ওরা ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল। দেখলো—ক্যারাভেলটা দাউ-দাউ ক'রে

জ্বলছে। আগুনের আভায় ধারে-কাছে সমস্ত এলাকাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু'-একটা গোলা ফাটছে। আগুনের ফুলকি ছিটকে উঠছে অনেকদূর পর্যন্ত।

বেন্‌জামিনকে তখন ওপরে আনা হ'য়েছে। ও শূন্যদৃষ্টিতে জ্বলন্ত জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ ফেরাল।

ঝড়-বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। বাতাসের সেই উন্মত্ত বেগ আর নেই।

ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে একটা ভাজিম্বাদের গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী করা নৌকা ঢেউয়ের মাথায় ওঠা-নামা করছিল। ফ্রান্সিস একজন ভাইকিংকে বলল ঐ নৌকাটা জাহাজের কাছে নিয়ে আসতে। ভাইকিংটা জাহাজের দড়ি বেয়ে-বেয়ে জলে নামল। সাঁতরে গিয়ে নৌকোটা জাহাজের কাছে নিয়ে এল। একটা কাছিতে ফাঁস-মত পরানো হ'ল। তার মধ্যে বেন্‌জামিনকে বসিয়ে সেই নৌকাটায় ধ'রে-ধরে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। একটা দাঁড়ও দেওয়া হ'ল। ভাইকিংটা নৌকোটাকে সজোরে চাঁদের দ্বীপের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে দড়ি বেয়ে-বেয়ে আবার জাহাজে উঠে এল।

জ্বলন্ত ক্যারাভেলটার আলোয় চাঁদের দ্বীপের তীর পর্যন্ত অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ওরা দেখল—সেই নৌকাটা আস্তে-আস্তে, চাঁদের দ্বীপের দিকে চলেছে। বেন্‌জামিন দাঁড় টানছে বাঁহাতে। কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকাল। বললো—'নোঙর তোলো। দাঁড় ঘরে যাও—পাল খুলে দাও। এক্ষুণি জাহাজ ছাড়ো।'

ভাইকিংদের মধ্যে উৎসাহের ঢেউ ব'য়ে গেল। বন্দীজীবনের শেষ। এবার মুক্ত জীবন। স্বদেশে ফিরছে সবাই। উৎসাহের সঙ্গে যে যার কাজে লেগে পড়ল। জাহাজ চলল উত্তর মুখে। ভাইকিংদের দেশের উদ্দেশ্যে। বেগবান বাতাস। মেঘমুক্ত আকাশ শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ চলল।

পরদিন দুপুরের দিকে চোখে পড়ল ডাইনীর দ্বীপের তটরেখা, সবুজ পাহাড়, গাছ-গাছালি। সকলেই ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিস তখন নিজের কেবিনঘরে শুয়ে ছিল। নির্বিবাদে হীরে দু'টো নিয়ে দেশে না ফেরা পর্যন্ত ওর মনে স্বস্তি নেই। সবাই এসে বলল—'ডাইনীর দ্বীপে এসে গেছে। বিস্কোকে খুঁজে দেখবো আমরা।'

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বললো 'জাহাজ তীরে ভেড়াও। জানি না বিস্কো বেঁচে আছে কিনা, তবু আমাদের খুঁজে তো দেখতে হবে।'

সমুদ্রতীরের যত কাছে সম্ভব, জাহাজ ভেড়ানো হ'ল। কিন্তু ভাইকিংদের আর দ্বীপে যেতে হ'ল না। ওরা ডেক থেকে দেখলো সমুদ্রতীরে কে একজন লোক হাতে একটা ছেঁড়া জামা নিয়ে ঘোরাচ্ছে। দূর থেকে চিনতে কষ্ট হ'লেও বুঝলো, ঐ লোকটাই বিস্কো।

জাহাজ থেকে একটা ছোটো নৌকো নামানো হ'ল। কয়েকজন যাবে বিস্কোকে আনতে। ফ্রান্সিস ওদের বলল 'লা ব্রুশের গুপ্ত ভাণ্ডারের সব কিছু আমরা নিয়ে আসবো। আগে বিস্কোকে সঙ্গে নিয়ে সে সব আনতে হবে।'

চারজন নৌকো করে চলল ডাইনীর দ্বীপের দিকে। ওরা যখন দ্বীপে গিয়ে নামল, বিস্কো ছুটে এসে ওদের জড়িয়ে ধরল। বিস্কোর শরীর খুব খারাপ হ'য়ে

গেছে। জামা কাপড় শতচ্ছিন্ন। তবু ও বেঁচে আছে, তাতেই সকলে খুশি হ'ল। ওরা বলল—'ফ্রান্সিস বলেছে লা ব্রুশের সব গুপ্তধন নিয়ে যেতে। আমাদের ওখানে নিয়ে চলো।'

বিস্কো বলল—'তার আগে আমার আস্তানায় চলো। গায়ে নুন মেখে নিতে হবে।'

সমুদ্রতীরের কাছেই যেখানে থেকে পাহাড়-জঙ্গল শুরু হ'য়েছে সেখানে রেন ট্রি গাছের পাতা, বাকল, এসব দিয়ে একটা ঘরমত তৈরি করা হ'য়েছে। বিস্কো বলল—'এই আমার আস্তানা।' ও গাছের পাতার একটা বড় ঠোঙায় ক'রে তেল মেশানো নুন নিয়ে এল।

—তুমি এসব পেলে কোথায়?

'—সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরী করেছি—'বিস্কো বলল—'আর ঐ পূর্ব-কোণায় একটা ঝর্ণার জলের সঙ্গে মেশানো এই তেল পেয়েছি। এই দু'টো মিশিয়ে গায়ে মাখলে, জোঁক কামড়ে ধরলে সঙ্গে-সঙ্গে মরে যায়। এই জিনিসটা ব্যবহার করতাম বলেই আমি এখনো বেঁচে আছি।

সকলেই সেই তেল-নুন গায়ে মেখে নিল। তারপর বিস্কো ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। গাছগাছালি ঘেরা হাজার-হাজার জোঁকের জায়গাটা ওরা পেরোলো। ওদের জোঁকে কামড়ে ধরলো বটে, কিন্তু মুহূর্তেই মরে খসে পড়লো।

ওরা লা ব্রুশের গুপ্তধন রাখার গুহাটার কাছে এল। বিস্কো ব'লে দিলো কিভাবে পাথরের মুখটা সরাতে হবে। সবাই ধাক্কাধাক্কি ক'রে নিরেট পাথরটা কিছুটা সরাল। তারপর সবাই ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার গুহা। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকারটা সরে আসতে ওরা দেখলো বেশ কয়েকটা নরকঙ্কাল পড়ে আছে। তার মধ্যে ওদের দু'জন বন্ধুর কঙ্কালও রয়েছে। বিস্কো আসবার সময় পথে সব ঘটনা ওদের বলেছে। গুহাটার শেষের দিকে বেশ কয়েকটা বাক্স রয়েছে। ওপরে পেতলের কাজ করা। ওরা ঐ দুটো বাক্স নিয়ে জোঁকের জায়গাটা পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে চ'লে এল। বাক্স দুটো নৌকায় তোলা হ'ল। বিস্কো আর একজন ভাইকিং নৌকায় চড়ে বাক্স দু'টো জাহাজে নিয়ে এলো। সবাই ছুটে এসে বিস্কোকে জড়িয়ে ধরলো। বিস্কোকে নতুন কাপড়-জামা দেওয়া হ'ল। তারপর খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল ওকে। এতদিন পরে বন্ধুদের দেখে ওর যেন কথা আর ফুরোতে চায় না। ফ্রান্সিস বলল—'বিস্কো পরে সব শুনবো, এখন পেট পুরে খেয়ে নাও।'

নৌকাটা একজন ভাইকিং চালিয়ে নিয়ে গেল ডাইনীর দ্বীপে, আবার গুপ্তধনের কাছে। গুহা থেকে দুটো ভারি বাক্স জাহাজে নিয়ে আসা হ'ল। সন্ধ্যের আগেই লা ব্রুশের অত সাধের গুপ্ত ধনভাণ্ডার শূন্য হ'য়ে গেল। সব জাহাজে তুলে নিয়ে আসা হলো।

বাক্সের তালাগুলো ভাঙা হলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বাক্সগুলো খুলে-খুলে দেখলো। কত মোহর, কত জড়োয়ার গয়না। হীরে-মুক্তো বসানো ছোরা, ছোট আকারের তরবারি। কত বিচিত্র আকারের গয়না-গাঁটি। সকলেই এসে জড়ো হ'ল সেখানে। সকলের চোখেই বিস্ময়। এসব জিনিসের গল্পই শুনেছে ওরা। জীবনে

কোনদিন দেখেনি।

সন্ধ্যের পরেই জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হ'ল। শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ উত্তরমুখে যাত্রা শুরু করলো। ভাইকিংদের আজ খুব আনন্দের দিন। অত বড় দু'টো হীরে, মোহর, মণিমাণিক্য ভরা লা ব্রুশের লুটের সম্পদ সব আজ ওদের হাতে।

রাত্রিবেলা জাহাজের ডেক-এর ওপর নাচগানের আসর বসলো। সবাই নাচ-গানের তালে-তালে হাততালি দিতে লাগলো। জমে উঠলো আসর।

ফ্রান্সিসও ঐ আসরে কিছুক্ষণ বসেছিল। তারপর একটু রাত হ'তেই নিজের কেবিনে ফিরে এল। রাত্রে জাহাজ পাহারা দেবার জন্যে পাহারাদারের সংখ্যা বাড়াল ফ্রান্সিস। লা ব্রুশের মতো আবার কোন জলদস্যু যাতে অনায়াসে রাত্রির অন্ধকারে এসে জাহাজ খালি না করতে পারে। সকলেই ফ্রান্সিসের কথা মেনে নিল। দিনরাত সমানে জাহাজ পাহারা দিতে লাগল ওরা।

জাহাজ চললো। ফ্রান্সিসের ইচ্ছে মরিটাস দ্বীপের খোঁজটা নিয়ে যাওয়া। কথাটা ও হ্যারি আর অন্যান্য ভাইকিংদের বলল। অনেকেই জানতে চাইল, দ্বীপটা কোথায়? ফ্রান্সিস বলল—'আমি সঠিক জানি না। তবে পশ্চিম আফ্রিকার কাছাকাছি কোথাও হবে। চাঁদের দ্বীপ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। রাজপুরোহিত মরিটাস দ্বীপে এসে বসির আয়নাওলার কাছ থেকে আয়না তৈরী করিয়ে নিয়ে যেতো। কাজেই মরিটাস বেশি দূরে হবে বলে মনে হয় না। আমাদের পূর্বদিকে যেতে হবে।'

বেশির ভাগ ভাইকিং বন্ধুরা কিন্তু আপত্তি করল। বললো—'আমরা অনেক-দিন দেশ ছেড়ে এসেছি। সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান হীরে আর লা ব্রুশের গুপ্তধন রয়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে। পথে দেরি করলে কে জানে আবার কোনো বিপদে পড়বো কিনা। ফ্রান্সিস একটু ভাবল। তারপর ওদের কথাতেই রাজি হল। হ্যারিও ওকে তাই বোঝাল। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে দেশে ফিরতে হবে।

জাহাজ আর পূর্বদিকে ফেরানো হ'ল না। সবাই প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে জাহাজের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গতি আরো দ্রুত হলো। দাঁড়িরা দাঁড় বাইতে লাগল, আরো দু'টো বাড়তি পাল লাগানো হ'লো। জাহাজ চলল পূর্ণ বেগে।

সমুদ্রপথে বার দুই-তিনেক ঝড়ের কবলে পড়তে হলো। তবে ঝড় খুব সাংঘাতিক কোন ক্ষতি করতে পারলো না। ভাইকিংরা প্রাণপণে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করলো। যে ক'রেই হোক জাহাজটাকে অক্ষত রাখতে হবে। দু'একটা পাল ফেঁসেও গেল। এর চেয়ে বেশি কোন ক্ষতি হ'ল না।

বেশ অল্পদিনের মধ্যেই জাহাজটা ইউরোপের কাছাকাছি এসে গেলো। তারপর দিন দশেকের মাথায় ভাইকিংদের রাজধানীর 'ডক'-এ এসে লাগল। তখন ভোর হয়েছে সবে। বন্দরে লোকজন বেশি ছিল না। এরকম কত জাহাজ তো আসে। ওরা সেইভাবেই এক নজর তাকিয়ে জাহাজটাকে দেখলো শুধু।

ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুদের আর তর সইল না। জাহাজ 'ডক'-এ লাগাবার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা লাফিয়ে নেমে পড়ল। যে যার বাড়িতে চলে গেল। ওদের মুখেই

শহরবাসীরা প্রথম জানতে পারল ফ্রান্সিস দুটো বিরাট হীরের খণ্ড আর জলদস্যু ক্যাপ্টেন লা ব্রুশের ধনসম্পদ বোঝাই ক'রে ফিরেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে জাহাজে হীরে দু'টো আর লা ব্রুশের ধনসম্পদ পাহারা দেবার লোকের অভাব পড়ে গেল। অনেকেই বাড়ি চ'লে গেছে, বাকি যারা রইল, তারাও বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল। ফ্রান্সিসকে তারা তাদের ছেড়ে দেবার জন্যে বারবার অনুরোধ করতে লাগল! ফ্রান্সিস আর কি করে? ও তখন একজনকে রাজার কাছে পাঠাল। সংবাদ দিল রাজাকে যে আমরা অত্যন্ত মূল্যবান কিছু জিনিস এনেছি, আপনি জাহাজ পাহারা দেবার জন্যে কিছু সৈন্য পাঠান।

কিছুদিনের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ে একদল সৈন্য এল। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হ'ল। এবার ওদের হাতে পাহারার ভার দিয়ে ও আর হ্যারি বাড়ি যেতে পারবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের আর বাড়ি যাওয়া হ'ল না। সৈন্যদের মধ্যে যে নেতা ছিল, সে ফ্রান্সিসের হাতে একটা চিঠি দিল। রাজা লিখেছেন—'তোমার কথামত সৈন্য পাঠালাম। তুমি আর হ্যারি জাহাজ থেকে নামবে না। তোমাদের উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করছি।'

ফ্রান্সিস হ্যারিকে চিঠিটা দেখাল। হ্যারি হেসে বললো—'সোনার ঘণ্টা আনার সময় তো আমরা ছিলাম না। তাই এবার আমাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে সেটা পুষিয়ে দেবে।'

কাজেই ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে জাহাজেই থাকতে হ'ল। ওদের আর বাড়ি যাওয়া হ'ল না। অন্য সব ভাইকিং বন্ধুদের ওরা বাড়ি চলে যেতে বললো।

এর মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। জাহাজঘাটায় মানুষের ভিড় বাড়তে লাগল। সবাই নির্বাক বিস্ময়ে হীরে দু'টো দেখছে। আস্তে-আস্তে ভিড় বাড়তে লাগল। ঘণ্টাখানেক না যেতেই বিরাট জনারণ্যের সৃষ্টি হ'ল। 'ডক'-এর সামনে রাস্তাঘাট লোকে ভ'রে গেলো। সবাই ফ্রান্সিসকে দেখতে চায়। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে আসুক, জোর গলায় লোকেরা এসব বলতে লাগলো। হ্যারি বললো—ফ্রান্সিস একবার ডেক-এ উঠে ওদের সামনে দাঁড়াও। ওরা তোমাকে দেখতে চাইছে। ফ্রান্সিস বিরক্তির সঙ্গে বললো—'এ সব আমার ভালো লাগে না।'

'—তবু ওরা চাইছে, তোমারই তো স্বদেশবাসী। যাও।' হ্যারি বললো।

ফ্রান্সিস ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—'তাহলে তুমিও চলো।'

'—বেশ—'

দু'জনের কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই জাহাজঘাটার জনারণ্য আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। সে কি বিপুল হর্ষধ্বনি দিতে লাগল।

হঠাৎ জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগলো। রব উঠল—'রাজা আসছেন—রাজা আসছেন।' জনতা সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিলো। সামনে সুন্দর পোষাক সুসজ্জিত রাজার দেহরক্ষীদল ঘোড়ায় চ'ড়ে আসছে। পেছনে রাজার গাড়ি। কালো দামী কাঠের গাড়ি। ধবধবে সাদা চারটে ঘোড়া টেনে আসছে। গাড়ির গায়ে সোনালি-রূপালী রঙের কত কারুকাজ। মাথাটা খোলা। সামনে কোচম্যান বসে আছে। লাল-সাদা কি সুন্দর পোষাক তার পরনে। মাথার টুপিতে সোনালি ঝালর।

ঘোড়াগুলোর পিঠে ও সোনালি ঝালর দেওয়া সাজ। গাড়ির ভেতরে মুখোমুখি দু'টো বসার গদি। তাতেও নানা কারুকাজ। একদিকের আসনে ব'সে আছেন রাজা আর রাণী। বিশেষ উৎসবের দিনে তাঁরা যেমন পোষাক পরনে, আজকেও পরণে তেমনি পোষাক। রাণীর পরণে ধব্‌ধবে সাদা পোষাক, তাতে সোনালী জরির সুক্ষ্ম কাজ করা। রাজার পরণে সবুজ রঙের পোষাক। তবে বোতামগুলো সোনার। মাথায় হীরে বসানো সোনার মুকুট।

রাজা-রাণীকে দেখে সেই বিরাট জনারণ্যে হর্ষধ্বনি উঠল। রাজার দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে ধ্বনি উঠল। রাজা-রাণী হাসিমুখে সকলের দিকে হাত নাড়াতে লাগলেন। রাজার গাড়ির পেছনে আরো কয়েকটা সুসজ্জিত গাড়ি? তাতে আসছেন মন্ত্রী অর্থাৎ ফ্রান্সিসের বাবা ও গণ্যমান্য অমাত্যরা।

রাজার গাড়ি এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজটার কাছে থামল। বাঁধানো ডক থেকে জাহাজ পর্যন্ত একটা কাঠের তক্তা আগে থেকেই ফেলা ছিল। রাজা-রানী নামলেন। তারপর তক্তাটার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজটায় উঠলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে এল রাজা ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হ্যারিকে। ফ্রান্সিস রাজাকে হীরের গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। একজন সৈন্য ছেঁড়া পালের ঢাকাটা খুলে দিলো। তখন সূর্যের আলো পড়ল হীরে দু'টোর ওপর। কি অপূর্ব তেজালো দ্যুতি বেরোতে লাগলো হীরে দু'টো থেকে। হাজার-হাজার বিস্ময়াবিষ্ট মানুষগুলোর মুখে কোন কথা নেই? রাজাও বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঘুরে-ঘুরে হীরে দু'টো দেখতে লাগলেন। এত বড় হীরে? এতো অবিশ্বাস্য! রাজার চোখ-মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি এবার পেছন ফিরে জাহাজঘাটার জনারণ্যের দিকে তাকিয়ে হাত তুললেন। সব গোলমাল, গুঞ্জন থেমে গেল। রাজা গা চড়িয়ে বলতে লাগলেন 'দেশবাসীগণ, ফ্র্যান্সিস, হ্যারি আর তাদের বীর সহগামীরা যে দুঃখ-কষ্ট স্বীকার ক'রে এই হীরে দ'টো এনেছে, তার জন্যে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাদের সম্মানার্থে আমি সারা দেশে আজ থেকে তিনদিন উৎসবের দিন ব'লে ঘোষণা করলাম। দেশবাসীগণ,—আপনারা তাদের দীর্ঘজীবন কামনা করুন!'

রাজার কথা শেষ হ'তেই হাজার কণ্ঠে ফ্রান্সিস ও হ্যারির জয়ধ্বনি উঠল। রাজা দু'হাত তুলে আবার সবাইকে থামালেন। বলতে লাগলেন—'আমার প্রিয় দেশবাসীগণ। আজকে আমার কি আনন্দ হচ্ছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। যেদিন সোনার ঘণ্টা নিয়ে এসেছিলাম, সেদিনও আমরা আনন্দোৎসব করেছিলাম। কিন্তু সেদিনের আনন্দোৎসবে দুই বীর ভাইকিং ফ্রান্সিস আর হ্যারি অনুপস্থিত ছিল। তাই আজকে আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে।'

আবার একটু থেমে রাজা বলতে লাগলেন—'হীরে দু'টো আজকে এই জাহাজেই থাকবে। কালকে হীরে দুটো নিয়ে মিছিল বেরোবে এবং সারা রাজধানী ঘুরবে। তারপর হীরে দু'টোকে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে।'

রাজা থামলেন। আবার জনতা হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। হ্যারি রাজার কাছে এগিয়ে এল। বললো—'আপনি নিশ্চয়ই কুখ্যাত জলদস্যু লা ব্রুশের নাম

শুনেছেন' ?

—হুঁ—ও জাতে ফরাসী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর গুপ্ত ধনভাণ্ডারও আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি।

—'বলো কি !' রাজা অবাক হলেন।

—চলুন, আপনি দেখবেন আসুন।

রাজাকে মালখানাঘরে নিয়ে গেল হ্যারি আর ফ্রান্সিস। সেই পেতলের কাজ-করা বাক্সগুলো খুলে রাজাকে দেখালো ওরা। রাজা এত দামী গয়নাগাঁটি, মোহর দেখে অবাক। রাজা কিছুক্ষণ ঐ গয়নাগাঁটি হীরে-জহরতের দিকে তাকিয়ে বললেন 'এসব পাপের ধন সব বিক্রী করে সেই অর্থ কোন সৎকাজে লাগাতে হবে।'

রাজা ডেক-এ উঠে এলেন। তারপর কাঠের তক্তার উপর দিয়ে ডেকে এলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকেও সঙ্গে আসতে বললেন। ওরা দু'জনে পরপর নেমে এল। রাজা বললেন—'তোমরা আমাদের গাড়িতে চড়ে আমাদের সঙ্গে প্রাসাদে যাবে।'

রাজা ও রাণীর সঙ্গে এক গাড়িতে চড়া! ফ্রান্সিস আর হ্যারি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। রাজা গাড়িতে উঠে ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ওরা দু'জনে রাজা-রাণীর সামনের দিকে লাল গদি মোড়া জায়গায় গিয়ে বসলো। আবার উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। সামনে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়া দেহরক্ষীরা, পেছনে গণ্যমান্য অমাত্য ও মন্ত্রীর গাড়ী। যাত্রা শুরু হ'লো রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

পথেও শহরবাসীদের উপ্‌চে পড়া ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্য দিয়ে যেতে বেশ দেরিও হ'ল। উপস্থিত সবাই রাজা-রাণী আর ফ্রান্সিস ও হ্যারির জয়ধ্বনি করল।

রাজপ্রাসাদের বিরাট চত্বরে পৌঁছে রাজা-রাণীর গাড়ি থেকে নেমে এলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও নামল। রাজা-রাণীর সামনে ফ্রান্সিস এসে দাঁড়ালো। বললে—'আমরা অনেকদিন বাড়ী ছাড়া। বুঝতেই পারছেন মানে—'

'—নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। তোমরা এখন বাড়ি যাও।' রাজা বললেন।

রাণী একটু হেসে বললেন—'এখন ছাড়া পেলে। কিন্তু আজ রাতে প্রাসাদে তোমাদের নিমন্ত্রণ। রাতের খাবারটা আমাদের সঙ্গে খাবে।'

কথাটা ব'লে রাণী ডানহাতের দস্তানাটা খুলে হাতটা এগিয়ে দিলেন। ওরা দু'জন সসম্ভমে রাণীর হাত চুম্বন করল। রাজা-রাণী প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

'—বাড়ি চলো।' পেছনে বাবার কণ্ঠস্বর শুনে ফ্রান্সিস ফিরে তাকালো। ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে বাবার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল। আর একজন অমাত্য হ্যারিকে তাঁর গাড়িতে ডেকে নিলেন। গাড়ি চললো। মন্ত্রীমশাই কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাস্তার জড়ো হওয়া লোকজন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। কেউ-কেউ ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে হাত বাড়িয়ে দিলো। গাড়ি খুব দ্রুত চলছে না। ফ্রান্সিস হেসে সকলের সঙ্গেই করমর্দন করল। ওর বাবা এবার কোচ্‌ম্যানকে লক্ষ্য করে বললেন—'গাড়ি জোরসে্‌ চালাও।' এবার দ্রুত ছুটল। রাস্তার লোকেরা কেউ-কেউ ফ্রান্সিসকে দেখে হাত নাড়ল। ফ্রান্সিসও হাত নাড়ল। এবার ওর বাবা বললেন—'আবার কবে পালাবে ?'

ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল—'বাবা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, কি বড়-বড় মুক্তো।'

'তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে দু'জন সৈন্য বাড়িতে মোতায়েন করবো।' ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কেমন একটু ধরা গলায় বাবা বললেন—'হ্যাঁরে, তুই তোর কি মা'র কথাও ভাবিস্ না'?

ফ্রান্সিস মাথা নীচু করলো।

—'তোর মা তোর জন্যে ভেবে-ভেবে অকালে মরে যাক্, এটাই কি চাস্ তুই?'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারলো না। মা'র কথা ওর বড় বেশি ক'রে মনে পড়তে লাগল। আস্তে-আস্তে বলল—'মা কেমন আছেন?'

—'মনে শান্তি থাকলে তো ভালো থাকবে?' বাবা চড়া গলায় বললেন।

গাড়িতে আর কোন কথা হ'ল না। বাড়ির কাছে আসতে ফ্রান্সিস দেখলো দেয়ালে-দেয়ালে জড়ানো সেই লতাগাছটা আরো বেড়েছে। সমস্ত দেওয়ালটাতেই ছড়িয়ে পড়েছে আর অজস্র নীলফুল ফুটে আছে সমস্ত দেওয়াল জুড়ে। ও দেখলো গেট-এর কাছে মা দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে একজন পরিচারিকা। মা'র মুখ-শরীর আরো শীর্ণ হয়েছে। মুখে সুস্পষ্ট বলিরেখা। একটা বুক শূন্যভরা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর। একসঙ্গে আনন্দের, আবার দুঃখেরও।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরলো। মা ওর কপালে চুমু খেল। বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো, 'চিরকালের পাগল তুই—কবে তোর এ পাগলামি যাবে, এ্যাঁ? বুড়ি মা'র কথা একবারও পড়ে না তোর?'

ফ্রান্সিস অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলল—'আমার মা বুড়ি না।'

মা হাসল। কিছু বলল না। বাবা এর মধ্যে কাছে এলেন। বললেন—'চলো।'

বাড়ির দিকে যেতে যেতে মা বললো, 'হ্যাঁরে—সবাই বলছে তুই নাকি বিরাট দু'টো হীরে এনেছিস্?'

—'হ্যাঁ মা। কালকে তোমাকে জাহাজঘাটে নিয়ে গিয়ে দেখাবো।'

মা মাথা নাড়লেন—'ও দেখে কি হবে। তুই ফিরে এসেছিস্ এতেই আমি খুশি।'

বাবার দিকে তাকিয়ে বলল—'দেখেছো, ছেলেটা কেমন রোগা হ'য়ে গেছে।'

বাবা একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে মুখে একটা শব্দ করলেন—'হুম্।'

* * *

সন্ধ্যে হ'তে না হতেই মা ফ্রান্সিসকে বলতে লাগল—'রাজার বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিস, একটু সভ্য-ভব্য হবি তো?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'আমি কি বুনো-ভাজিম্বাদের মত?'

'—ভাজিম্বা আবার কারা?' মা তো অবাক।

'—সে তুমি বুঝবে না। যাকগে—কি করতে হবে বলো।'

'—ভালো ক'রে, স্নান-টান ক'রে, পরিপাটি মাথার চুল আঁচড়ে, সবচেয়ে ভালো পোষাকটি পরে, সুগন্ধি গায়ে ছড়িয়ে রাজবাড়িতে যেতে হবে?'

ফ্রান্সিস কপালে ভুরু তুললো—'এতো কিছু করতে হবে?'

মা হাসল—'হ্যাঁ, শুধু রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস না, নিমন্ত্রণ খেতে

যাচ্ছিস—কাজেই—।'

মা যেভাবে বললো, সে ভাবেই ফ্রান্সিসকে সাজগোজ করতে হ'ল। গাড়িতে উঠে দেখলো বাবাও বিশেষ সাজপোষাক পরেছেন। মা শরীর ভালো নেই বলে গেলেন না।

গাড়ি চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি রাজপ্রাসাদের সিঁড়ির সামনে পোঁছলো। চারদিকে নানারঙের নানারকমের ঘোড়ায় টানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা বেশ হবে ব'লেই ফ্রান্সিসের মনে হ'ল।

বিরাট হলঘরে একদিকে নাচ-বাজনার আসর। অন্যদিকে বিরাট টেবিলে নানা মুখরোচক খাবার সাজানো। টেবিলের ধারে-ধারে চেয়ার পাতা। মাথার ওপরে ঝাড়-লণ্ঠন। তাতে নানা আকারের রঙীন কাঁচ বসানো। দেয়ালে বিরাট-বিরাট তেলরঙের ছবি। চারদিক আলোয়-আলোয় ঝক্‌মক্‌ করছে।

ফ্রান্সিস যখন বাবার সঙ্গে ঢুকল, তখন ঢিমে-তালে বাজনা বাজছে। অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষ জোড়ায়-জোড়ায় নাচছে, সেই বাজনার তালে-তালে। প্রবেশের দরজার মুখোমুখি রাজা-রাণী আর রাজকুমারী মারিয়া বসে আছে। ফ্রান্সিসের বাবা রাজার কাছে গিয়ে একটু মাথা নিচু ক'রে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। রাণী ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি রাণীর হস্ত চুম্বন করলেন। বাবার দেখাদেখি ফ্রান্সিসও তাই করলো। ওর বাবা তারপর যেদিকে গণামান্য অমাত্যরা হাতের মদের গ্লাস নিয়ে এখানে-ওখানে জটলা বেঁধে কথাবার্তা বলছেন, সেখানে চলে গেলেন।

রাজা রাজকুমারী মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—'এই হচ্ছে ফ্রান্সিস'।

ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে মারিয়ার হস্ত চুম্বন করল। কি অপরূপ সুন্দরী মারিয়া। ফ্রান্সিস সব ভুলে বেশ বোকার মতই রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

মারিয়া হেসে বলল—'আপনি খাবার সময় আমার পাশে বসবেন—আপনার সোনার ঘণ্টা, হীরে দু'টো আনার গল্প শুনবো।'

ফ্রান্সিস তখনো দেখছে রাজকুমারীকে। হলুদ গাউন পরে রাজকুমারীকে মনে হচ্ছে যেন একটা ফুটন্ত ফুল। রাজকুমারী হাসলে গালে টোল পড়ে। রাজা একটু কাশলেন। ফ্রান্সিস ফের সম্বিত ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

তারপর বেশ দ্রুতপায়ে ওখান থেকে সরে এল। দেখলো, একপাশে ওর সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলছে। সবাই সেজেগুজে এসেছে। হ্যারিও রয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে এসে ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এত জাঁক-জমক, আলো-বাজনা নাচ ও বিচিত্র দামী-দামী পোষাকে সজ্জিত নরনারীর ভীড়, এসব ভালো লাগছিল না ওর। কিন্তু এখান থেকে এখন চলেও যাওয়া না। স্বয়ং রাণীর নিমন্ত্রিত অতিথি ওরা! ভালো না লাগলেও থাকতে হবে। ও হ্যারির সঙ্গে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, আর অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে খাওয়ার ডাক পড়বে। খাওয়াটা হ'য়ে গেলেই এই জায়গা থেকে পালানো যাবে। কিন্তু খাওয়ার তখনও অনেক দেরি। তখন নাচের আসর জমে উঠেছে। সুবেশা সুন্দরী মেয়েরা এসে ফ্রান্সিসের বন্ধুদের নাচের আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। ওর বন্ধুরা প্রায় সকলেই

কিছুক্ষণ সময় নেচে এলো। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করলো, পাছে কোন মেয়ে ওদের নাচের আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করা গেল না। রাজকুমারী মারিয়া খুঁজে-খুঁজে থামের পেছনে ফ্রান্সিসকে আবিস্কার করল। হাত বাড়িয়ে বলল—'চলুন আমার সঙ্গে, নাচবেন আসুন।'

হতাশার একটা ভঙ্গি ক'রে ফ্রান্সিস মারিয়ার সঙ্গে নাচের জায়গায় এলো। দু'জনে বাজনার তালে-তালে নাচতে লাগল। যারা নাচতে-নাচতে ওদের দু'জনের কাছে যারা আসছে, তারাই মাথা নুইয়ে একবার ক'রে রাজকুমারীকে অভিবাদন জানাচ্ছে। নাচতে-নাচতে রাজকুমারী বললো 'এবার কি আনতে যাবেন ?'

যাক্ অন্য কিছু জিজ্ঞেস করে নি। এমন একটা বিষয় জিজ্ঞেস করেছে, যা নিয়ে কথা বলতে ফ্রান্সিসের উৎসাহ কমতি নেই। ও নাচ থামিয়ে হাত দিয়ে দেখালো—'জানেন, মুক্তোর সমুদ্রের মুক্তোগুলো এত বড়-বড়।'

রাজকুমারী হাসল। তার চোখে বিস্ময়। বললো—'বলেন কি ?'

—আমি নিজের চোখে দেখেছি।

—আমার জন্যে কিন্তু একট বড় মুক্তো আনবেন, আমি লকেট তৈরি করবো।

'—আনবো বৈকি!' ফ্রাসিস বলল—'ওসব তো বিক্রী করা যাবে না।'

—কেন ?

—চাঁদের দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতার অভিশাপ লাগবে।

—চাঁদের দ্বীপ কোথায় ?

—আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর।

—আপনি কবে যাবেন ?

ফ্রান্সিস একটু চিন্তিতস্বরে বলল—'দেখি।'

নাচের বাজনা থেমে গেল। সকলেই করতালি দিল। ফ্রান্সিসও সঙ্গে-সঙ্গে রাজকুমারীকে অভিবাদন জানিয়ে থামের আড়ালের কাছে চ'লে এল। দেখলো, হ্যারি-দাঁড়িয়ে আছে। এখনও কেউ ওকে পাকড়াও করতে পারে নি। হ্যারি মুচকি হেসে বলল—রাজকুমারী যেভাবে তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল, তাতে সত্যিই তুমি ভাগ্যবান।

—এখন ভাগ্যে খাওয়াটা জুটলেই পালাতে পারি।

—আমারও এত জাঁকজমক, বাজনা, নাচ, ভীড় ভালো লাগছে না।

একসময় রাজা উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে আহারে বসতে বললেন। সবাই একে-একে খেতে বসলো। একজন পরিচারক এসে ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে গেল। ওকে রাজকুমারীর পাশেই বসতে হ'ল। সামনে টেবিলের কত রকমের খাবার থরে-থরে সাজানো। চাইলেই পরিবেশনকারীরা খাবার তুলে দিচ্ছে। কেউ-কেউ নিজেরাই তুলে নিচ্ছে। রাজকুমারী খেতে-খেতে বলল—আপনার 'সোনার ঘণ্টা' গল্পটা আমায় বলুন।'

ফ্রান্সিসের মনে পড়লো, আমদাদ শহরের বাজারে কুয়োর ধারে খেজুরতলায় কতদিন এই গল্পটা বলেছে ও। সেইভাবেই ও গল্পটা বলতে শুরু করল। কুয়াশা, ঝড় আর জাহাজ ভেঙে যাওয়ার ঘটনাগুলো বলার সময় ও খেতে ভুলে যাচ্ছিলো।

রাজকুমারী হেসে তখন বললো—'খেতে-খেতে বলুন।'

এক সময় খাওয়া শেষ হ'ল। সকলেই টেবিল ছেড়ে উঠে এল। ফ্রান্সিসের গল্পও শেষ হ'ল। রাজকুমারী বললো—'কিন্তু আপনার হীরে আনার গল্পটা শোনা হ'ল না। ওটা কবে বলবেন?'

ফ্রান্সিস কি বলবে ভেবে পেল না। আমতা-আমতা ক'রে বললো—'সেটা মানে—যেদিন আপনি বলবেন।'

'—ঠিক আছে আমি আবার খবর পাঠাবো।'

ফ্রান্সিস হ্যারিকে খুঁজতে লাগল। ভীড়ের একপাশে ওকে পেলো। বললো, 'চলো পালাই।'

—রাজা-রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে যেতে হয়, এটাই রীতি। দেখছো না, সকলেই রাজা-রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

'—চলো, ওটা সেরে আসি।' ওরা যখন রাজা-রাণীকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, তখন পাশে বসা রাজকুমারী হেসে মৃদুস্বরে বলল—'আমি কিন্তু খবর পাঠাবো।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

দু'জনে বাইরে আসছে। হলঘরের দরজার কাছেই বাধা। ফ্রান্সিসের বাবা দাঁড়িয়ে বললেন—'আমার সঙ্গে যাবে।'

'—হ্যারি রয়েছে আমার সঙ্গে—'

'—হ্যারিও আমাদের সঙ্গে যাবে। ওকে ওর বাড়ির কাছে নামিয়ে দেবো।'

আর উপায় নেই, বাবার সঙ্গে যেতেই হবে। তিনজনে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি চললো। কেউ কোন কথা বলছে না। ফ্রান্সিস, হ্যারি দু'জনেই বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের বাবা এক সময় বললেন—'তুমি রাজকুমারীকে কি বলছিলে অতো।'

'—সোনার ঘণ্টার গল্পটা শোনাচ্ছিলাম।'

—'হুম্।' ওর বাবা আর কিছু বললেন না।

* * *

পরের দিন সকালে জাহাজ থেকে হীরের গাড়ি দু'টো নামানো হ'ল। ঘোড়া জুড়ে গাড়ি দু'টোকে রাস্তায় আনা হ'ল। সামনে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যদল, পেছনেও আর একদল অশ্বারোহী সৈন্য। গাড়িটা দু'জন কোচম্যান চালাতে লাগল। মিছিল চললো রাজধানীর পথ দিয়ে। হাজার-হাজার লোক জড়ো হলো রাস্তায়, বাড়ির ছাতে, বারান্দায়, অলিন্দে। অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখতে লাগল হীরে দু'টো। সূর্যের আলো সোজা পড়েছে হীরে দু'টোয়। নীল, বেগুনী, সবুজে কত বিচিত্র রঙের আলোর খেলা চললো হীরে দু'টোর গায়ে। অতবড় দু'টো হীরে, আর তাতে ঐ রকম রঙের খেলা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শহরবাসীরা চেয়ে রইলো। সব প্রধান-প্রধান রাস্তা ঘুরে মিছিলটা রাজপ্রাসাদে এসে শেষ হলো। হীরে দু'টো রাখা হ'ল রাজার নিজস্ব যাদুঘরের বিরাট ঘরটায়। তার পাশেই রাখা আছে সেই বিখ্যাত 'সোনার ঘণ্টা।'

শুরু হ'ল ফ্রান্সিসের গৃহবন্দী জীবন। ওর বাবা যা বলেছিলেন, তাই করলেন।

আট দশজন সৈন্য বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলো। ফ্রান্সিস হতাশ হ'ল। এবার আর পালানো যাবে না। ও ভাবতে লাগলো—পালাবার একটা উপায় বার করতেই হবে। প্রথমে যেতে হবে মরিটাস দ্বীপে। বসির আয়নাওলাকে খুঁজে বের করতেই হবে। একটা বিশেষ শক্তিশালী আয়না ওকে দিয়ে তৈরি করাতে হবে। তারপর চাঁদের দ্বীপ। লা ব্রুশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তারপর মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো সংগ্রহ। কিন্তু তার আগে বাড়ির এই বন্দীজীবন থেকে তো মুক্তি চাই। সেটা কি ক'রে হবে।

বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে একটা উপায় বার করা যেতো। কিন্তু বাবার স্পষ্ট হুকুম কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অতঃপর ফ্রান্সিস মা'কে বলল—'ঠিক আছে—আর কেউ না আসুক, অন্ততঃ হ্যারিকে এখানে আসতে দাও।'

মা বাবাকে বলল। দু'একবার আপত্তি ক'রে বাবা রাজি হলেন। বললেন—'হ্যারি একা আসতে পারবে।'

তাই হ'লো। হ্যারি দু'বেলাই আসে। ফ্রান্সিস এতেই খুশি। দু'জনেই নানা পালাবার বন্দী-ফিকির ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই কার্যকরী হবে ব'লে মনে হয় না।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়ির একটি গাড়ি এসে ফ্রান্সিসদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। গাড়িটা কালো কাঠের তৈরি। নানা সোনালি কারুকাজ সারা গাড়িটার গায়ে। ঘোড়া দু'টোরও সাজের কতো ঘটা। সবুজ-সাদা পোষাক পরা কোচয়ান ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা ক'রে একটা চিঠি দিল। মোটা কাগজে বাঁকা-বাঁকা হরফে লেখা। ওপরে কোন সম্বোধন নেই। শুধু লেখা—'আপনি গল্প শোনাবেন বলেছিলেন। আজকে অবশ্যই আসবেন—' ইতি—মারিয়া।

রাজকুমারী গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কাজেই সোজা কথা নয়। ফ্রান্সিসের না গিয়ে উপায় রইল না। মা ওকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলো। রাজকুমারীর পাঠানো গাড়ি চড়ে ও রাজপ্রাসাদে গেল। বিরাট হলঘর পেরিয়ে টানা বারান্দা। তারপর কত ঘর। মেঝেটা শ্বেতপাথরে বাঁধানো। দেয়ালে, জানালায়, দরজায় সোনালি-রুপোলি কাজ করা। একজন পরিচারক ফ্রান্সিসকে অন্দরমহলে নিয়ে এসেছিল, এক পরিচারিকার জিম্মায়। পরিচারিকাটি ওকে রাজকুমারীর বসার ঘরে নিয়ে গেল। ছোটবেলায় ফ্রান্সিস অনেকবার বাবার সঙ্গে এসেছে। বড় হ'য়ে এই প্রথম এল। তখন যেমন অবাক চোখে তাকিয়ে সব দেখতো, আজও তেমনি অবাক চোখে দেখতে লাগলো চারিদিকের সাজসজ্জা, আলো, রঙ্।

রাজকুমারী ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। ও কাছে আসতে রাজকুমারী ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলো। ও সেই হাত চুম্বন করল। গদিমোড়া একটা সবুজ রঙের চেয়ার পরিচারিকাটি এগিয়ে দিল। ও তাতে বসল। রাজকুমারী মারিয়া হেসে বলল—'কি খাবেন বলুন?'

'—আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি।' ফ্রান্সিস দ্রুত ব'লে উঠল।

'—তবু একটু ফলের রস খান।' রাজকুমারী পরিচারিকাটিকে ইঙ্গিত করলো। পরিচারিকাটি চ'লে গেল। একটু পরে শ্বেতপাথরের গ্লাসে ফলের রস নিয়ে এল।

ওটা খাচ্ছে ও। তখনই রাজকুমারী বললো—'হীরে দু'টো আনার গল্পটা বলুন।'

ফ্রান্সিস ফলের রস খেতে-খেতে গল্পটা শুরু করল—'গল্পটা প্রথম শুনেছিলাম মকবুলের মুখে, আমদাদের এক সরাইখানায়।'

ও গল্পটা ব'লে চললো। রাজকুমারী থুতনিতে আঙ্গুল ঠেকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল গল্পটা। গল্প শেষ হতে রাজকুমারী অবাক হ'য়ে বললো—'এত সব কাণ্ড করেছেন আপনি?'

ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। শুধু সলজ্জ মৃদু হাসলো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর হস্ত চুম্বন ক'রে বলল—'আজকে এই থাক্। আর একদিন আপনাকে 'মুক্তোর সমুদ্রে'র গল্প বলবো।'

'—আমিও আপনাকে আনাতে গাড়ি পাঠাবো।' রাজকুমারী বললো।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—'বেশ।'

সেই গাড়ি চড়েই ও বাড়ি ফিরে এল। গাড়ি চড়ে ফিরে আসতে-আসতেই একটা চিন্তা ওর মাথায় খেলে গেলো। রাজকুমারী তো আবার গাড়ি পাঠাবে। সেদিন এই চলন্ত গাড়ি থেকেই পালাতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বাড়ির ঐ কড়া পাহারা থেকে পালাবারও কোন উপায় নেই। আবার রাজকুমারী কবে গাড়ি পাঠায় ও সেই আশায় রইল। এর মধ্যে ফ্রান্সিস বাবাকে বলল—'আমি রোজ কয়েক ঘণ্টার জন্যে সমুদ্রের ধারে যাবো।'

—'কেন?' বাবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

—'মুক্তোর শিকারীরা কিভাবে মুক্তো তোলে, তাই দেখবো।'

'—বেশ যেতে পারো—কিন্তু তিনজন সৈন্যের পাহারা যাবে।'

ফ্রান্সিস সম্মত হলো।

ফ্রান্সিস তিনজন সৈন্যের পাহারায় সমুদ্রের ধারে যেতে লাগলো। যে সব মুক্তো শিকারীরা শুধু কোমরে গোঁজা একটা মাত্র ছোরা নিয়ে জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলে আনে, তারপর ঝিনুক ভেঙে বা মুখ খুলে মুক্তো বের করে, ও তাদের সঙ্গে ক'দিনের মধ্যেই ভাব জমিয়ে ফেললো। ওরা কিভাবে ডুব দিয়ে, কিভাবে দ্রুত জল ঠেলে নামে, কিভাবে হাঙরের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে, কিভাবে দম বেশিক্ষণ রাখে, ঐ সবকিছুই শিখে নিল। তারপর ওদের সঙ্গে জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক আনতে লাগলো। দিন সাত-আটের মধ্যেই ও প্রায় পাকা মুক্তো শিকারী হ'য়ে গেল। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় জলের নীচে থাকতে শিখলো, দ্রুত কেটে নেমে যেতে, উঠে আসতে শিখলো। শিখলো কি ক'রে হাঙরের আক্রমণ ঠেকাতে হয়। ওরা শেখালো যে জলের নিচে কখনো হাঙরকে নীচে থাকতে দেবে না। তাহ'লেই হাঙরের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য ক'রে ছোরা চালানো সহজ। ফ্রান্সিস এভাবে দু'টো আক্রমণকারী হাঙরও মারলো। মুক্তো শিকারীরা খুব খুব খুশী হ'ল। ও যে অল্পদিনেই প্রায় একজন পাকা মুক্তো শিকারী হ'য়ে গেছে, এ বিষয়ে ওদের মনে কোনো সন্দেহ রইলো না। ফ্রান্সিস চলে আসার দিন অনেক রাত পর্যন্ত মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে রইলো। ওদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারা রান্না-বান্না করলো, খাওয়া-দাওয়া করলো। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো।

পরের দিন সকালে হ্যারি ওর কাছে এলো। ও হ্যারিকে সমস্ত পরিকল্পনার কথা

বলল। হ্যারি বলল—'তার চাইতে তুমি রাজকুমারীকেই বলো না—ও যেন রাজাকে বলে, তোমাকে একটা জাহাজ দেবার জন্যে।'

—'তা আমি বলতে পারি। রাজাও কোন আপত্তি করবেন না, জানি। কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে বাবা-মাকে নিয়ে। বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না। কাজেই আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে, সুযোগ বুঝে আবার জাহাজ চুরি করে পালাতে হবে।'

হ্যারি আর কিছু বললো না, বুঝল ফ্রান্সিস ওর পরিকল্পনা পাল্টাবে না। যা ভেবেছে তা করবেই।'

দু'দিন পরে আবার সন্ধ্যের সময় রাজকুমারীর পাঠানো গাড়ী এল। ফ্রান্সিস যথারীতি সাজগোজ করল। বাড়ির বাইরে যাবার আগে মা'কে একবার জড়িয়ে ধরল। মা তো অবাক। জিজ্ঞেস করল—'কি হ'ল তোর? হঠাৎ এভাবে জড়িয়ে ধরলি।'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। ওর চোখে জল এসে গেছে। জানে কথা বললেই ওর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর মা ধ'রে ফেলবে। মা'র মনে সন্দেহ হবে। কাজেই ও তাড়াতাড়ি মা'কে ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল।'

মেঝেয় দামী-দামী কার্পেট পাতা, দরজা-জানালায় নানা কারুকাজ করা ঘরগুলো পেরিয়ে ও অন্দরমহলে রাজকুমারীর বসার ঘরে এলো। রাজকুমারী মারিয়া ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। ও 'মুক্তোর সমুদ্রে'র গল্প বলতে লাগলো, 'জলের নীচে মেঝের মত একটু এবড়ো-থেবড়ো জায়গায় কত মুক্তো ছড়িয়ে আছে। একটা নীল্‌চে বেগুনী রঙের আলোয় জায়গাটা ভ'রে আছে। বীভৎস চেহারার লাফ্‌ মাছ পিঠের কাঁটাগুলো উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরাই হচ্ছে মুক্তোর সমুদ্রের প্রহরী···।'

গল্প শেষ হ'তে রাজকুমারী বললো—'আপনি কি আবার মুক্তো আনতে যাবেন?'

—'কেন?' ফ্রান্সিস ভেঙে কিছু বললো না।

'—আমার লকেটের জন্যে একটা বড়ো মুক্তো আনবেন কিন্তু।'

ফ্রান্সিস হেঁসে মাথা ঝাঁকালো।

রাজবাড়ির গাড়ি চড়ে ও ফিরে আসছে। তখন রাত হ'য়েছে। রাস্তাঘাটে আঁধারি বাজারের কাছে গাড়ি, ঘোড়া, লোকজনের ভিড়। কোচ্‌ম্যান গাড়ির গতি কমালো। ফ্রান্সিস এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। কোচ্‌ম্যানের অজ্ঞাতে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে আস্তে-আস্তে রাস্তার নেমে পড়ল। কোচ্‌ম্যান কিছু বুঝতেই পারল না। গাড়ি চালিয়ে সে আপনমনেই চলে গেল।

ফ্রান্সিস বিস্কোর বাড়ির দিকে চললো। ও জানে, ও পালিয়েছে জানলে বাবা প্রথমেই হ্যারির বাড়িতে খোঁজ নেবেন। কাজেই হ্যারিদের বাড়িতে থাকা চলবে না।

বিস্কোদের বাড়িতে যখন পোঁছলো, তখন বেশ রাত হ'য়েছে। দোতলায় বিস্কো কোন ঘরে থাকে, ফ্রান্সিস জানতো। দেখলো সেই ঘরের জানালা অব্দি একটা মোটা লম্বাগাছ উঠে গেছে। কত ফুল ফুটে আছে সেই গাছটায়। ও দেওয়াল টপকে বাগানে ঢুকল। গাছের আড়ালে-আড়ালে চলে এলো জানালাটার নীচে। তারপর লম্বাগাছটা বেয়ে উঠতে লাগলো। নরম লম্বাগাছ। বেশি চাপ দিতে ভরসা হচ্ছে না। খুব সাবধানে লতাগাছটা বেয়ে ও জানালাটার কাছে এল। জানালায়

কয়েকটা টোকা দিল। বিস্কো তখন শুয়ে পড়েছিল। জানালায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনে এসে জানালা খুলে দিল। অন্ধকারে ফ্রান্সিসকে চিনতে ওর অসুবিধে হ'ল, ও একটুক্ষণ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো—'আমি ফ্রান্সিস।' বিস্কো চিনতে পেরে হাসলো। হাত বাড়িয়ে বললো—'কি ব্যাপারে এত রাত্রে এভাবে লুকিয়ে—।'

ফ্রান্সিস ওর বাড়ানো হাতটা ধ'রে লতাগাছটা থেকে জানালায় উঠে এলো। তারপর ঘরের মধ্যে নামলো। বিস্কো বিছানাটা দেখিয়ে বললে, 'বসো'।

ফ্রান্সিস বসলো। ওর পালাবার গল্প বললো। তারপর বললো, 'তোমাদের বাড়িতে দু'চারদিন আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। আমার পালাবার খবর পেলেই বাবা আমার খোঁজে লোকজন পাঠাবেন। আমার প্রায় সব বন্ধুর বাড়িতেই বাবার পাঠানো লোকজন আমার খোঁজে আসবে। আমি জানি প্রথমেই খোঁজ হবে হ্যারিদের বাড়িতে। তারপর একে-একে সকলের বাড়ি।'

—তুমি অনায়াসে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে পারো। কেউ তোমার খোঁজ পাবে না। কিন্তু তুমি কি ভেবেছো, মানে তোমার পরিকল্পনাটি কি ?'

—'সব বন্ধুদের আবার একত্র করবো। রাজার জাহাজ চুরি ক'রে পালাবো। যাবো চাঁদের দ্বীপে। আবার মুক্তো আনবো।

এসব যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে দু'জনে কথাবার্তা হ'ল অনেকক্ষণ, তারপর দু'জনে একই বিছানায় শুয়ে পড়লো। বাকি রাতটুকু ঘুমোল।

পরের দিন। ফ্রান্সিসের বাবা বুঝলেন, ফ্রান্সিস আবার পালিয়েছে। এবারের লক্ষ্য নিশ্চয়ই 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে মুক্তো আনা। কারণ ফ্রান্সিস মুক্তোর ব্যাপারে কি যেন বলেছিলো। ওর বাবা নিজেই এলেন হ্যারির বাড়িতে। হ্যারি সে সব শুনে আকাশ থেকে পড়লো। ও বললো গত দু'দিন যাবৎ ফ্রান্সিসের সঙ্গে তার দেখা নেই। সে জানেই না, যে ও পালিয়েছে। প্রায় সব বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজ খবর ক'রে ফ্রান্সিসের বাবা হাল ছেড়ে দিলেন। ওর মা মুখে কিছু বললো না। আড়ালে কাঁদলো কিছুক্ষণ।

পরের কয়েকটা দিন ফ্রান্সিস বিস্কোর বাড়িতেই খেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো। তারপর বিস্কোকে পাঠালো হ্যারি আর অন্য বন্ধুদের খবর দিতে। রাত্রিবেলা যেন সবাই সেই পোড়ো বাড়িতে আসে। সভা হবে।

পোড়ো বাড়িটায় যখন ফ্রান্সিস এলো, তখন রাত হ'য়েছে। অনেক বন্ধু এসে গেছে। বাকিরা দু'জন একজন ক'রে আসতে লাগল। কিছু পরেই ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়ালো। বলতে লাগলো, 'ভাইসব, আমরা আবার সমুদ্রযাত্রা করবো। বাবার আপত্তি, কাজেই ইচ্ছে থাকলেও রাজা আমাদের জাহাজ দেবেন না। কাজেই সোজা রাস্তা জাহাজ চুরি। পরশুদিন এইসময় এইখানে সবাই তৈরি হয়ে হাজির থাকবে। রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ চুরি ক'রে আমরা পালাবো।'

সবাই 'ও-হো-হো করে চীৎকার করে ফ্রান্সিসের প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। সভা ভেঙে গেলো। নির্দিষ্ট দিনে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা রাত একটু গভীর হ'তে পোড়ো বাড়িটায় জড়ো হ'তে লাগলো। সবাই সমুদ্রযাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে।

দল বেঁধে সবাই জাহাজঘাটায় এসে হাজির। জাহাজঘাটায় এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। জলে সেই আলোর প্রতিবিম্ব কাঁপছে। খোলা তরোয়াল হাতে রাজার সৈন্যরা জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস সবাইকে কেরোসিন কাঠের ভাঙ্গা বাক্স আর খড়ের গাদার পেছনে লুকিয়ে পড়তে বললো। পাথরের দেওয়াল আর থামের আড়ালে ফ্রান্সিস আর তার তিন-চারজন সঙ্গী পাহারাদার খুব কাছাকাছি চলে এলো। তারপর একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রেই সুযোগ বুঝে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্য ক'জনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। ফ্রান্সিস একটা মশাল নিয়ে খড়ের গাদা আর কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর ছুঁড়ে দিলো। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। অন্য পাহারাদারেরা ছুটে এলো। ওরা তাড়াতাড়ি কোমরে তরোয়াল গুঁজে বালতি নিয়ে সমুদ্র ঘাট থেকে জল তুলতে লাগল। আর আগুনে ছিটিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু আগুন নিভলো না, বরং বেড়েই চললো। জাহাজে না আগুন লেগে যায়, এই জন্য ওরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। এই গোলমালের মধ্যে ফ্রান্সিস একটা ভালো দেখে জাহাজ লক্ষ্য করে, জাহাজঘাটা থেকে পাতা তক্তার ওপর দিয়ে ছুটলো, সঙ্গী কয়েকজনও ছুটলো। হাতে একটা মশাল নিয়ে ও জাহাজের ডেক-এর ওপর দাঁড়িয়ে নাড়তে লাগলো। জাহাজঘাটায় লুকিয়ে থাকা বন্ধুরা দ্রুত ছুটে গিয়ে জাহাজটায় উঠলো। তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে নিলো ওরা। একদল চলে গেল দাঁড়ঘরে। দাঁড় বাইতে লাগলো। জাহাজ মাঝসমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললো। এতক্ষণে যে সৈন্যরা আগুন নেভাচ্ছিল, তারা দেখলো একটা জাহাজ মাঝসমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছে। তখন অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। জাহাজটাকে আর ফেরাবার উপায় নেই।

শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ চললো। দাঁড়ঘরে যারা দাঁড় বাইছিল, তারা বাদে প্রায় সবাই ডেকঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস আর হ্যারির চোখে ঘুম নেই। ওরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলো। ফ্রান্সিস বললো—'হ্যারি, আমাদের প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে মরিটাস দ্বীপটা কোথায়।'

—আন্দাজে কোথায় খুঁজে বেড়াবে ?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ দ্বীপে আছে পশ্চিম আফ্রিকার কাছাকাছি কোথাও, আর চাঁদের দ্বীপ থেকে বেশি দূরে নয়।

—কি ক'রে বুঝলে ?

—চাঁদের দ্বীপের রাজপুরোহিত যখন ওখানে মাঝে-মাঝে যেতো, তখন নিশ্চয় মরিটাস দ্বীপ চাঁদের দ্বীপেরই কাছাকাছি কোথাও আছে।

—তুমি কি মরিটাস দ্বীপে বসির আয়নাওলাকে খুঁজবে ?

—হ্যাঁ—খুঁজে বের করতেই হবে। ওর কাছ থেকে আয়না তৈরি করিয়ে নিতে হবে। নইলে 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে মুক্তো তোলা যাবে না।

—কিন্তু বসির আয়নাওলাকে কি করে খুঁজে বের করবে ?

—কত বড় আর হবে মরিটাস দ্বীপ। নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারবো।

কথা বলতে-বলতে ভোর হলো, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত ওরা ঘুমিয়ে পড়লো।

হালেরও ক্ষতি হ'লো। ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে বন্দরে জাহাজটাকে নোঙর করা হ'লো। পাল-হাল সারাই করা হ'লো। এসময়ে ফ্রান্সিস দেশী-বিদেশী জাহাজী নাবিকদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে লাগলো। একটু কথাবার্তার পরেই ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করে, 'মরিটাস দ্বীপটা কোথায় বলতে পারেন?' সকলেই মাথা নাড়ে-'উঁহু জানিনা, নামই শুনিনি কখনো।' শুধু একজন বৃদ্ধ নাবিক বলেছিল—'নাম শুনেছি, তবে সঠিক কোথায় বলতে পারবো না।' ফ্রান্সিসও হাল ছাড়লো না। যাকে পায়, যার সঙ্গে আলাপ হয়, তাকেই জিজ্ঞেস করে, 'মরিটাস দ্বীপটা কোথায় জানেন?'

কেউ বলতে পারে না। অবশেষে পশ্চিম আফ্রিকার তেকরুর বন্দরে ওদের জাহাজ ভিড়লো। তেকরুর বন্দর ফ্রান্সিসদের পরিচিত। এই বন্দর দিয়েই ওরা হীরে আনতে গিয়েছিলো। হীরে এনে এই বন্দর থেকেই ওরা দেশের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলো। তেকরুর বন্দরে পাঁচ-ছ'টা ছোট-বড় বিদেশী জাহাজ নোঙর করা ছিলো! জাহাজ ফাঁকা ক'রে সব নাবিকরাই পারে নেমে এসেছিলো। হাজার হোক মাটির টান। যে ছোট হোটেলটা ওখানে ছিলো, সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই। ভীষণ ভীড় সেখানে। সবাই খাচ্ছে-দাচ্ছে, আনন্দে হৈ-হল্লা করছে। ভাইকিংরাও হোটেলে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দে-হুল্লোড়ে মেতে উঠলো। হ্যারি জাহাজ থেকে নামেনি। ওর শরীরটাও ভালো নেই। ফ্রান্সিস হোটেলে খেতে-খেতে যাকে সামনে পেলো, তাকেই মরিটাস দ্বীপের কথা জিজ্ঞেস করলো। সকলেই বললো, তারা জানে না। একজন বললো 'দক্ষিণদিকে কোথায় শুনেছি।'

হোটেলের ভেতরের হৈ-হট্টগোল আর ভালো লাগছিলো না।

ও বাইরে চ'লে এলো। দেখলো, হোটেলের কয়েকটা লোক রসুইঘরের কাছে কাকে মারছে। লোকটা চীৎকার করে কাঁদছে, আর ছেড়ে দেবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করছে। ফ্রান্সিস জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। নির্দয়ভাবে মার খাচ্ছে লোকটা। ওর সহ্য হ'লো না। লোকগুলোকে দু'হাতে সরিয়ে দিল ও। দেখলো লোকটা এমন মার খেয়েছে, যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ও হোটেলে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হ'য়েছে?' লোকগুলোর মধ্যে থেকে একজন মোটামত্তো লোক এগিয়ে এসে বলল—'এটা চোর। প্রায় মাসখানেক হ'ল সুযোগ পেলেই রসুইঘরে ঢুকে খাবার চুরি ক'রে খায়। এর আগেও মার খেয়েছে। কিন্তু স্বভাব যায় নি। আজকে তাই ধ'রে আচ্ছামত দিলাম। আর কোনোদিন এদিকে আসবে না।'

ফ্রান্সিস নীচু হ'য়ে লোকটাকে তুলে দাঁড় করালো। তারপর ওকে ভীড় থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবার সময় কিছু মুদ্রা মোটালোকটার হাতে গুঁজে দিলো। ওরা যে যার কাজে চলে গেলো।

ফ্রান্সিস লোকটাকে নিয়ে জাহাজঘাটার কাছে এলো। এখানে একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোতে দেখলো লোকটাকে। বৃদ্ধই বলা যায়। হয়তো না খেয়ে থাকার জন্যেই লোকটাকে আরো শীর্ণ লাগছে দেখতে। ফ্রান্সিস ওর হাতে কয়েকটা পর্তুগীজ মুদ্রা দিলো। তারপর বললো—'তোমার নাম কি?'

—'চুকো।' লোকটা বুকে-পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বললো।

—'তুমি চুরি করো কেন ?'

'—কি করবো ? বয়স হ'য়েছে। জাহাজের ঐ অত খাটুনির কাজ করে পেরে উঠি না। তাই দিন কুড়ি আগে যে জাহাজে কাজ করতাম, তার ক্যাপ্টেন আমাকে এখানে ফেলে জাহাজ নিয়ে চ'লে গেছে। চুরি ক'রে খেতে পেয়েছি ব'লেই এখনো বেঁচে আছি, নইলে কবে ম'রে ভূত হ'য়ে যেতাম।' চুকো ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল।

—'হুঁ'। ফ্রান্সিস একটু ভাবলো। মরিটাস দ্বীপের কথা একে জিজ্ঞেস ক'রে লাভ নেই। সেই একই উত্তর শুনতে হবে—'জানি না।'

তবু জিজ্ঞেস করলো—'এ দিকটায় তুমি কতবার এসেছো।'

—অনেকবার।

—চাঁদের দ্বীপ, ডাইনীর দ্বীপ চেনো এ'সব।

—ভালো ক'রেই চিনি।

—চাঁদের দ্বীপে কারা থাকে ?

—যারা থাকে, ওদের বলে 'ভাজিম্বা।'

ফ্রান্সিস বেশ অবাক হ'লো। একটু আশান্বিত হয়ে ও জিজ্ঞেস করলো—'মরিটাস দ্বীপ চেনো ?'

—চিনি বৈকি।

ফ্রান্সিস চমকে উঠলো। লোকটা বলে কি ! তবু একটু যাচাই ক'রে নিতে হয়। বললো—'মরিটাস দ্বীপটা কোথায় জানো ?'

—চাঁদের দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে।

ফ্রান্সিস যেন হাতে স্বর্গ পেল। তা'হলে তো একে ছাড়া হবে না। জিজ্ঞেস করল—'ঐ দ্বীপে তুমি কখনো গেছো ?'

—'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।' চুকো পেছনে ফিরে হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে ওকে ধরলো। বললো—'চলো আমাদের জাহাজে। তোমাকে আজ পেট পুরে খাওয়াবো।'

চুকো ফিরে দাঁড়াল—'বেশ চলো।'

ফ্রান্সিস আর ওকে কোন প্রশ্ন করলো না। একে পেট খিদেয় জ্বলছে, তার ওপর ঐ লোকগুলোর মার খেয়েছে। ও যে এখনো মাটিতে শুয়ে পড়েনি, এটাই আশ্চর্য। ও চুকোকে জাহাজে নিয়ে নিজের কেবিন ঘরে নিয়ে এলো। ভাইকিংরা যারা চুকোকে দেখলো, তারা বেশ অবাক হ'ল। ফ্রান্সিস আবার হাড়-হাভাতেটাকে কোত্থেকে ধ'রে নিয়ে এল ? চুকোকে বসিয়ে ফ্রান্সিস ছুটলো হ্যারিকে ডাকতে। হন্তদন্ত হ'য়ে ওকে কেবিনঘরে ঢুকতে দেখে হ্যারি বেশ অবাক হ'ল। বললো—'কি হয়েছে ?'

—'সে পরে বলবো, তুমি এখন শীগগির আমার ঘরে এসো।' হ্যারি উঠে দাঁড়ালো। নিজের কেবিনঘরের দিকে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস বললো—'চুকো নামে একটা লোককে আমার ঘরে বসিয়ে রেখেছি। তুমি একথা সেকথা বলে নানা গল্প ফেঁদে ওকে আটকে রাখবে। সাবধান যেন ও পালাতে না পারে।'

নিজের কেবিনঘরে ঢুকে চুকোকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—'হ্যারি, এর নাম চুকো। জাহাজে-জাহাজে বহু জায়গায় ঘুরেছে।' এবার চুকোর দিকে তাকিয়ে বলল—'চুকো, এ হ'ল হ্যারি, আমার প্রাণের বন্ধু। দু'জনে গল্প-টল্প কর।'

—'আমার খিদে পেয়েছে।' চুকো ভাঙাগলায় বলল।

—'আমি এক্ষুণি খাবার নিয়ে আসছি।' ফ্রান্সিস দ্রুত বেরিয়ে গেল। রসুইঘরে ঢুকে মাংস, রুটি যা হাতের কাছে পেলো থালায় তুলে নিল। ফিরে এসে দেখলো চুকো আর হ্যারি দু'জনেই চুপ ক'রে ব'সে আছে। হ্যারি দু'-হাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গী করলো। তার মানে চুকো এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। ফ্রান্সিস বুঝলো—সত্যিই ওর খিদে পেয়েছে। খাবারের থালা টেবিলের ওপর রেখে বললো—'চুকো—খেয়ে নাও।' চুকো যেন খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মিনিট দশ-পনেরো একনাগাড়ে খেয়ে গেল। একটা কথাও বললো না। খেতে-খেতে জল তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু সেটা বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে শব্দ বেরুলো না। খাবারে গলা আটকে গেছে। হাতের ইশারায় জল দিতে বললো। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিলো। তাড়াতাড়ি গ্লাসে জল নিয়ে এল। এক চুমুকে সবটা জল খেয়ে নিয়ে চুকো ঢেকুর তুলল। তারপর আস্তে-আস্তে খেতে লাগলো। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল—'চুকো—এই জাহাজে থাকবে?'

—'হুঁ।' শব্দ ক'রে চুকো ঘাড় নাড়ল। তারপর বললো—'কিন্তু কোন কাজ করতে পারবো না।'

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি ব'ল উঠলো—'তোমাকে কিছুই করতে হবে না।'

—'তাহ'লেই থাকা যাবে।'

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বললো না। চুপ ক'রে চুকোর খাওয়া দেখতে লাগলো। একটুক্ষণের মধ্যেই মাংস-রুটি শেষ। চুকো ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো—'আমার এখনো কিন্তু পেট ভরে নি।'

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—' ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে ইসারা ক'রে ছুটলো রসুইঘরের দিকে। আর একদফা মাংস-রুটি নিয়ে এল। চুকো আবার নিঃশব্দে খেতে লাগলো। এবার আরো আস্তে-আস্তে, খেতে লাগল। খাওয়া শেষ ক'রে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ফ্রান্সিসও কৃতার্থের হাসি হাসলো।

হাতমুখ ধুয়ে এসে চুকো বিছানায় চোখ বুঁজে আধশোয়া হ'ল। ফ্রান্সিস একটু সময় নিল। কি ভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে নিলো। তারপর বলল—'চুকো—তুমি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছো।'

চুকো চোখ বন্ধ ক'রেই তর্জনীটা ঘোরাল। তার মানে সমস্ত পৃথিবী।

—'তা হলে তো মরিটাস দ্বীপেও গেছো তুমি।'

—'দু'বার।' চোখ বন্ধ ক'রেই চুকো বলতে লাগল—'একবার দ্বীপে নেমেছিলাম, অন্যবার আর নামিনি। জাহাজেই ছিলাম।'

—'চুকো—আমাদের ঐ দ্বীপে নিয়ে যেতে হবে।'

—'সে অনেক ঝঞ্ঝাট, দ্বীপটার চারদিকে আধডোবা প্রবালের স্তর। কোমর অবধি জল ঠেলে যেতে হয়। কোথাও গলা অবধি জল।'

—'জাহাজ থেকে নেমে হেঁটেই যাবো।' ফ্রান্সিস বললো। চুকো হাসলো—'আগুনের প্রবালে পা রাখলে পা জ্বালা করতে থাকবে, তাছাড়া এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, অসাবধান হ'লে পা কেটে দোফালা হয়ে যাবে।'

—'তবে ওখানকার লোকেরা যাতায়াত করে কি ক'রে?'

—'ভাজিম্বাদের নৌকো দেখেছো, গাছের গুঁড়ি কুঁড়ে-কুঁড়ে তৈরি করে।'

—'হ্যাঁ দেখেছি।'

—'ঐ ডোঙা নৌকোয় চড়ে ঐ জায়গাটা পার হ'তে হয়।'

—'কতটা জায়গায় এই প্রবালের স্তর?'

—'কোথাও এক মাইল, কোথাও দু'মাইল। তারপর দ্বীপের মাটি।'

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবলো। তারপর বলল—'ওখানে আয়না কিনতে পাওয়া যায়?'

—'আয়না তৈরিই তো মরিটাস দ্বীপের মানুষদের একমাত্র জীবিকা। ওখানকার বালি খুব মিহি। সোডা বা পটাশ পাহাড় এলাকায় প্রচুর। তাই দিয়ে খুব ভালো কাঁচ তৈরি হয়। লাল ভার্মিলিয়ন দিয়ে পারদ তৈরি করে তাই দিয়ে নানারকম আয়না বানায় ওরা। দূর-দূর দেশের লোকেরা ওখানে আয়না কিনতেই জাহাজ ভেড়ায়।'

ফ্রান্সিস চুকোকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলো না! জিজ্ঞেস করলেও চুকো আর কথা বলতো না। কারণ ও ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

জাহাজ এবার চললো দক্ষিণমুখো। ফ্রান্সিস ভেবে দেখলো চাঁদের দ্বীপ হ'য়েই ওদের যেতে হবে। চাঁদের দ্বীপ থেকে ভাজিম্বাদের গুঁড়ি কাটা নৌকা নিতে হবে, যে ক'টা পাওয়া যায়। কথাটা ও হ্যারিকে বললো, ঐ নৌকো জোগাড় না ক'রে যাওয়া অর্থহীন। প্রবালের স্তর না পেরোতে পারলে ঐ দ্বীপেও যাওয়া যাবে না।

—'বুঝলে হ্যারি'—ফ্রান্সিস বলল—'মাহাবো সঠিক জানতো না, ওর বাবা সেই রাজপুরোহিত কিভাবে আয়না আনতো। আমার মনে হয়, ঐ রাজপুরোহিত ভাজিম্বাদের ডোঙা নৌকা চড়েই মরিটাস দ্বীপে যেত। বসির আয়নাওলাকে দিয়ে আয়না তৈরি করিয়ে ঐ ডোঙার চড়েই ফিরে আসত। এটা ঐ রাজপুরোহিত খুব গোপনে করত।'

—'আমারও তাই মনে হয়।' হ্যারি মাথা নেড়ে বললো।

* * *

দিন পনেরো-কুড়ি কাটলো। খুব সাংঘাতিক ঝড়ের মুখে পড়তে হ'লো না ওদের। দু'-একদিন যা ঝড়বৃষ্টি হ'লো, তাতে ওদের কোনো ক্ষতি হ'ল না।

দূর থেকে দেখা গেলো ডাইনীর দ্বীপ। সেই সবুজ পাহাড় গাছ-গাছালি ঘেরা। চাঁদের দ্বীপ আর বেশি দূরে নেই।

দিন কয়েক পরেই ওরা চাঁদের দ্বীপের কাছে এলো। দূর থেকেই দেখা গেলো কালো কাঁচপাহাড়ের টানা এবড়ো-খেবড়ো প্রাচীর। তখন দুপুরবেলা। ফ্রান্সিস জাহাজ থামাতে বলল। রাত হ'লে তবে সোফালা বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো হ'লো। ফ্রান্সিস হ্যারির সঙ্গে পরামর্শ করলো। বললো—'আমরা কেউ দ্বীপে নামবো না। আমাদের কাউকে দেখলে লা ব্রুশের দস্যুদলের লোকেরা চিনে ফেলতে পারে।'

—'এক কাজ করা যাক', হ্যারি বলল, 'চুকোকে পাঠাও। ভাজিম্বাদের দু'-একটা নৌকো ও অনায়াসে বন্দরের ঘাট থেকে নিয়ে আসতে পারবে।'

—'আমিও চুকোকে পাঠাবার কথাই ভাবছিলাম।'

রাত হ'লো। ফ্রান্সিসরা আস্তে-আস্তে জাহাজটা সোফালা বন্দরের কাছে নিয়ে এলো।

চুকোকে ডাকা হ'লো। কি করতে হবে, বলা হ'লো। চুকো মাথা নেড়ে বললো—'ওসব আমি পারবো না। সবে খেয়ে উঠেছি। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

ফ্রান্সিসরা পড়ল মহা সমস্যায়। ওরা যতই চুকোকে বোঝায়, চুকো ততই মাথা নাড়ে আর বলে—'আমার এখন ভীষণ ঘুম পেয়েছে।'

এবার হ্যারি এগিয়ে এলো। চুকোর কাঁধে হাত রেখে হ্যারি ডাকল—'চুকো।'

—'হুঁ।' চুকো চোখ বুজে ঝিমুতে-ঝিমুতে বলল।

—তুমি একটা জাহাজের মালিক হতে চাও?

চুকো চোখ খুলে বড়-বড় চোখে হ্যারির দিকে তাকাল।

—'হ্যাঁ—' হ্যারি বলল—'যদি ডোঙা-নৌকো একটা এনে দিতে পারো—তুমি তার বদলে একটা জাহাজ পাবে।'

—'বাজে কথা।' চুকো আবার চোখ বুজল।

—'আচ্ছা—মুক্তোর সমুদ্রের নাম শুনেছো?'

—'ওখানে গেলে কেউ ফেরে না।'

—'আমরা ওখান থেকে মুক্তো তুলে আনবো।' হ্যারি বললো।

—'তোমার মাথায় গোলমাল হ'য়েছে, ঘুমোগে যাও।' চুকো নিস্পৃহস্বরে বললো।

—'চুকো—আমার মাথা ঠিক আছে। তোমাকে আমরা হাঁসের ডিমের মত দুটো মুক্তো দেব।'

চুকো এবার চোখ তুলল। বলল—'মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনতে পারবে?'

—অনায়াসে পারবো, যদি তুমি একটা শুধু একটা নৌকা এনে দাও।

—তোমরা যাচ্ছ না কেন?

—সে অনেক কথা। তোমাকে পরে বলবো। এখন এই কাজটুকু ক'রে দাও। তোমরা হচ্ছো স্পেন দেশের লোক। বীরের জাত সামান্য কাজটুকু করতে পারবে না।

হঠাৎ চুকো উঠে দাঁড়ালো। একবার চারপাশের দাঁড়ানো ভাইকিংদের দিকে জামাটা হাত দিয়ে ঝেড়ে নিল। ওর ভাবভঙ্গী দেখে অনেকেই আড়ালে হাসলো। হাসি সামলাতে অনেকে কেবিনঘরের বাইরে চলে গেল। চুকো কিন্তু গম্ভীর ভঙ্গীতে বললো—'একটা নৌকো নিয়ে আসা এ আর কি এমন কাজ।' ও দরজার দিকে এগোলো। হঠাৎ পেছন ফিরে বলল—'হ্যারি—আমাকে দু'টো মুক্তো দিতে হবে কিন্তু।'

—কথা যখন দিয়েছি নিশ্চয়ই দেবো। তুমি মুক্তো বিক্রী ক'রে জাহাজ কিনো।

চুকো বীরদর্পে বেরিয়ে গেলো। জাহাজ থেকে দড়ি বেয়ে-বেয়ে জলে নেমে গেল। তারপর সাঁতরে চললো সোফালা বন্দরের দিকে চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। জাহাজের আলোগুলো নেভানো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকারে জলভাঙার শব্দ উঠলো। অন্ধকারে ফ্রান্সিস ভালো করে তাকিয়ে দেখলো দু'টো নৌকো আসছে। একটাতে ভূতের মত চুকো ব'সে আছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো—'চুকো—নৌকো দু'টো দড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখো।'

নৌকো দু'টো জাহাজের ঝোলানো দড়ির সঙ্গে চুকো বেঁধে দিলো। তারপর উঠে এলো জাহাজের ডেক-এ। গম্ভীরচালে হেঁটে কেবিন-ঘরের দিকে চ'লে গেলো।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের ডেকে বলল—আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নয়। এই অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের পালাতে হবে। সবাই যে যার জায়গায় যাও। জাহাজ দক্ষিণমুখে চালাও।

নোঙর তোলা হ'লো। জাহাজ চললো দক্ষিণমুখো। কিন্তু মরিটাস দ্বীপ কি ঠিক দক্ষিণ দিকে? সংশয় দেখা দিলো ফ্রান্সিসের মনে। ও কেবিনঘরে গিয়ে ঢুকলো। দেখলো চুকোর ভিজে জামাকাপড় পালটানো হয়ে গেছে। ও ঘুমোবার উদ্যোগ করছে। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো—'চুকো—এখন আমরা কোনদিকে যাবো?'

'দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।' চুকো গম্ভীর ভঙ্গীতে বললো।

—মরিটাস দ্বীপে পৌঁছতে কতদিন লাগবে?

—'হুঁ!' চুকো হেসে বললো—'কাল সকালেই পৌঁছে যাবো।'

সত্যিই তাই। পরদিন ভোর-ভোর সময়ে দূর থেকে মরিটাস দ্বীপ দেখা গেলো। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল দ্বীপটার একদিকে ন্যাড়া পাহাড়, পাথর, ধুলো-বালি। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। অন্যদিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়, গাছ-গাছালি।

চুকোর নির্দেশমত এখন জাহাজ চলছে। প্রবালের স্তরের কাছাকাছি এসে চুকো হাত তুলে জাহাজ থামাবার নির্দেশ দিলো। চুকো ঠিকই বলেছিল। জাহাজের কাছ থেকে তীর পর্যন্ত আগুনে-প্রবালের স্তর। জাহাজ থেকে সেই লাল প্রবাল স্তর স্বচ্ছ জলের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবড়ো-খেবড়ো লাল সবুজে রঙের প্রবাল স্তর বিস্তৃত। এই স্তরের কাছে আরো দু'টো জাহাজ নোঙর করা ছিলো। তার মধ্যে একটা জাহাজ ছোট ভাঙাচোরা। অন্য জাহাজটা নতুন। জলদস্যুদের ক্যারাভেল সেটা! তার মাস্তুলের মাথায় কোন পতাকা উঠছে না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে না, ওটা অন্য কোন দেশের জাহাজ।

ফ্রান্সিস এসব দেখছিলো। চুকো ফ্রান্সিসের কাছে এলো। বললো—'একটা ভাঙা নৌকায় মাত্র একজনই যাওয়া যাবে।'

—কেন? দু'তিনজন উঠলে কি হবে?

—নৌকো নীচের প্রবাল স্তরে আটকে যাবে।

কাজেই ফ্রান্সিস আর চুকো দড়ি বেয়ে-বেয়ে দু'টো নৌকোয় নেমে এলো। তারপর দাঁড় বেয়ে দ্বীপের দিকে চললো। ফ্রান্সিস জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো, স্বচ্ছ নীল, জলের মধ্য দিয়ে প্রবালস্তর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কত বিচিত্র রকমের মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নৌকো দু'টো দ্বীপের মাটির কাছে এসে লাগলো। ফ্রান্সিস দেখলো ও'রকম আরো দুটো ডোঙা নৌকো তীরে বাঁধা রয়েছে। ওরা নৌকো দু'টো বেঁধে রেখে উঁচু-নীচু ধুলোটে পথ ধ'রে এগোতে লাগলো। একটু দূরেই বাজার দেখা গেল। সারি-সারি আয়নার দোকান। আয়না ছাড়াও রয়েছে নানা কারুকাজ করা গ্লাস, রেকাবি, জগ। ফ্রান্সিস পরপর কয়েকটা দোকানে জিজ্ঞেস করল—বসির আয়না-

অলার দোকান কোনটা ? কিন্তু কেউই বলতে পারলো না। ওরা ঘোরাঘুরি করছে তখনই একজন লোক চুকোকে জড়িয়ে ধরলো। চুকো প্রথমে চমকে উঠলো। তারপর লোকটাকে দেখে স্প্যানিশ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো—'আরে তুমি ?' রাস্তার মধ্যেই দু'জনে গলা জড়াজড়ি ক'রে গল্পে মেতে উঠলো। ফ্রান্সিস তফাতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। ওদের বকর্-বকর্ তখনও চলছে। ও বুঝলো, অনেকদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা। ওদের কথা তাড়াতাড়ি ফুরোবে না। ফ্রান্সিস ডাকল—'চুকো—আমার ভীষণ তাড়া।' চুকো ব'লে উঠলো—'আমি আমার বন্ধুকে পেয়েছি। ওদের জাহাজেই যাবো। তোমাদের সঙ্গে যাবো না।'

ফ্রান্সিস হাসল—'কিন্তু তোমার পাওনা মুক্তো দুটো ?'

—'হুঃ—' চুকো আবার হেসে বললো—'ভাজিম্বাদের প্রবাদ জানো তো—'যদি তুমি চিরদিনের জন্যে কোথাও যেতে চাও তাহ'লে মুক্তোর সমুদ্রে যাও।' তোমরা কোনোদিনই মুক্তো আনতে পারবে না কেউই ' ।

—'ঠিক আছে। তাহ'লে চলি চুকো—তুমি আমাদের অনেক উপকার করছো। তোমার কাছে আমরা ঋণী রইলাম।'

ফ্রান্সিস এবার একাই এ দোকান ও দোকান ঘুরতে লাগলো। কিন্তু বসির আয়নাঅলার দোকান কোথায় ঠিক বলতে পারলো না।

ঘুরতে-ঘুরতে বেলা হ'লো। খিদেও পেয়েছে ভীষণ। ফ্রান্সিস ভাবলো জাহাজে ফিরে যাবে। বিকেলের দিকে আসবে। কিন্তু কেমন একটা জেদ চেপে গেলো। বসির আয়নাঅলার হদিশ আজকেই খুঁজে বের করবো। জিজ্ঞেস করতে-করতে একজন বৃদ্ধ দোকানদার বললো, 'বসিরের কোন দোকান নেই। ও নিজের বাড়িতেই আয়না বানায় আর ওখান থেকেই বিক্রী করে।'

—ওর বাড়িটা কোথায় ?

—সোজা চলে যাও। একটা ন্যাড়া পাহাড়ের নীচে দেখবে পান্ডানাস গাছ। ওখানেই কোথাও ও থাকে।

হাঁটতে-হাঁটতে এসে ফ্রান্সিস পান্ডানাস গাছটা দেখতে পেলো। ওখানে দাঁড়িয়ে এদিক দেখছে, তখনই একটা দশ বারো বছরের ছেলে এসে ইসারায় জানতে চাইলো, ফ্রান্সিস কি চায়। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে বললো, বসির আয়নাঅলার বাড়ি। ছেলেটি মাথা ঝাঁকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ফ্রান্সিস ওর পেছনে-পেছনে একটা বাড়িতে ঢুকলো। ট্রাভেলার্স ট্রী'র কান্ড ডাল দিয়ে বাড়িটা তৈরি। ওপরটা পান্ডানাস গাছের পাতায় ছাওয়া। একটা ঘরের দিকে দেখিয়ে ছেলেটি চ'লে গেলো। ফ্রান্সিস দরজাটার কাছে গেলো। একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেলো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকলো—'বসির, বসির।' কোন উত্তর এলো না। ও দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। ভেতরের অন্ধকারে কি একটা নড়ে উঠল, আর সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় একটা আঘাত পেয়ে ফ্রান্সিস উবু হ'য়ে মেঝেয় পড়ে গেলো। পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞান হারালো।

যখন ওর জ্ঞান ফিরলো দেখলো, সেই ঘরের একটা খুঁটির সঙ্গে ওর হাতদু'টো বাঁধা। মাথায় অসহ্য ব্যথা। তাকিয়েই আবার চোখ বন্ধ করল।

'হা—হা—হা—।' হাসির শব্দে ফ্রান্সিস চমকে তাকাল। দেখলো, খোলা

তরোয়াল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে লা ব্রুশের সেই ঢ্যাঙামত ছোট সর্দার।

—'জ্ঞান ফিরেছে তাহ'লে। হা-হা—আমি ভাবলাম তরোয়ালের হাতলের এক ঘায়েই বুঝি অক্কা পেলে।' ফ্রান্সিস কোন কথা বললো না। ঢ্যাঙা সর্দার বললো—'আমাদের জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলে। মুক্তো বিক্রী ক'রে লা ব্রুশ নতুন জাহাজ কিনেছে। আসার সময় নিশ্চয়ই সেটা চোখে পড়েছে।'

ফ্রান্সিসের মনে পড়লো আসার সময় একটা নতুন জাহাজ দেখেছিল। ও দুর্বলস্বরে বললো—'হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

—'হা-হা—যে কারণে তুমি বসিরের কাছে এসেছো, আমিও সেই জন্যেই এসেছি। কথাটা ব'লে ঢ্যাঙা সর্দার গলার কাছে হাত নিয়ে বললো—'এই দেখো বসিরের হাতে তৈরি আয়না। এটাই ওর হাতে তৈরি শেষ আয়না। ওকে আমি খতম করে দিয়েছি।' ফ্রান্সিস দেখলো সেই ভাঙা আয়নার মত একটা আয়না ওর গলায় ঝুলছে। ওকোন কথা বললো না। মনে-মনে বললো—কি নির্মম এই জলদস্যুরা। ঢ্যাঙা সর্দার বলে উঠলো—'তোমাকেও খতম করতাম। কিন্তু এখনও সে সময় আসে নি।'

—'আয়নার কথা তোমরা জানলে কি ক'রে?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—'ভাজিম্বাদের সেনাপতি জঙ্গলের মধ্যে পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে। প্রাণের মায়া সকলেরই আছে। মেরে ফেলার ভয় দেখাতে ও যা জানে, সব বলেছে। রাজ-পুরোহিত মরিটাস দ্বীপে এসে বসির আয়নাঅলার কাছ থেকে আয়না বানিয়ে যেতো। তারপর মুক্তোর সমুদ্রে সে আয়না নিয়ে নামতো আর মুক্তো নিয়ে অক্ষত-দেহে ফিরে আসতো। এটুকু আমরা তার কাছ থেকে জেনেছি। কিন্তু আয়নাটা কোন কাজে লাগতো, সেটা সেনাপতির জানা নেই। নানাভাবে আমরা সে কথা বের করবার চেষ্টা করেছি। শাস্তিঘরের কোন শাস্তিই বাদ দিইনি। শেষে বোঝা গেল আয়নাটা কি কাজে লাগতো, ও সত্যিই সেটা জানে না।' একটু থেমে ঢ্যাঙাসর্দার তরোয়ালের সরু মাথাটা ফ্রান্সিসের গলায় ঠেকালো। একটু চাপ দিয়ে বললো—'এবার তুমি বলো আয়নাটা কি কাজে লাগে। আমি তোমার জন্যেই এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।'

ফ্রান্সিস চুপ ক'রে রইলো। তরোয়ালের ডগায় চাপ বাড়ল। ও ঢ্যাঙা সর্দারের চোখের দিকে তাকালো। কি নির্মম ভাবলেশহীন চোখ। বুঝলো, ওকে এই মুহূর্তে হত্যা করতে ঢ্যাঙা সর্দার বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। ওর হাতও কাঁপবে না। ঢ্যাঙা সর্দার চেঁচিয়ে উঠলো—'বলো—নইলে মরো।'

ফ্রান্সিস বলল—'ঐ আয়না রাখলে লাফ্ মাছগুলো ঐ আয়নাটার প্রতিবিম্ব দেখে বিভ্রান্ত হয়। প্রাণপণে আয়নাটার ওপর ঢুঁ মারতে থাকে। মুখ ফেটে যায়, আয়নার কোণায় লেগে মুখ ফালা হ'য়ে যায়, তবু ওরা ঢুঁ মেরে চলে। সেই ফাঁকে মুক্তো তুলে নিতে হয়।'

—'তাহ'লে এই ব্যাপার।' ঢ্যাঙা সর্দারের মুখে খুশি যেন উপ্‌চে পড়ছে। বললো—'কত মুক্তো আছে ওখানে?'

—'যত মুক্তো আছে তা বিক্রী করে তোমার পরের চার পুরুষ পর্যন্ত কাউকে কিছু করতে হবে না। যে অর্থ তারা পাবে, দু'হাতে খরচ ক'রেও তা শেষ করতে

পাবে না।

ঢ্যাঙা সর্দারের মুখ হাঁ হ'য়ে গেল। এত মুক্তো? ওর আর তর সইছিল না। ও কোমরে তরোয়াল গুঁজলো। বললো—'তোমার কাছে যা জানার জেনে নিয়েছি। তুমি আমাদের জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলে। আমিও এই বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেবো। মর পুড়ে তুই।' ঢ্যাঙা সর্দার ছুটে বাইরে চলে গেলো। একটু পরেই ঘরের কোণার দিকটা ধোঁয়ায় ভ'রে গেলো। তারপরেই দেখা গেলো আগুনের শিখা।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো ছোট-বড় আয়না সাজানো। পা বাড়িয়ে দেখলো আয়নাগুলোর নাগাল পাওয়া যায় কিনা। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কিন্তু বাঁচতে হ'লে আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। শরীরের সমস্ত জোর নিয়ে ফ্রান্সিস আয়নাগুলোতে লাথি মারলো। চৌচির হ'য়ে ভেঙে আয়নার টুকরোগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেলো। একটা ধারালো মুখওলা টুকরো ফ্রান্সিস পা দিয়ে টেনে-টেনে কাছে আনলো। তারপর ব'সে পড়ে অতিকষ্টে হাত বেঁকিয়ে টুকরোটা তুলে নিল। ঘরের একপাশের ট্রাভেলার্স ট্রীর কাণ্ড কেটে তৈরি বেড়া আগুনে পুড়ে ফুলকি তুলে ধপাস ক'রে পড়ে গেল। আগুন পাতায় ছাওয়া চালায় উঠে আসছে। ফ্রান্সিস কাঁচের টুকরোটা হাতে বাঁধা দড়িটায় ঘষতে লাগলো। কব্জি কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিস সব ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলে এক-নাগাড়ে কাঁচটা ঘষতে লাগলো। দড়িটা কিছুটা কেটে যেতে এক হ্যাচ্‌কা টানে দড়িটা ছিঁড়ে ফেললো। ততক্ষণে মাথার ওপরের ছাউনিতে আগুন লেগে গেছে। বাইরে অনেক মানুষের চীৎকার, চেঁচামেচি কানে এলো। একবার দেখতে হয় বসির বেঁচে আছে কি না। ফ্রান্সিস দৌড়ে পেছনের ঘরে এল। দেখল, কম্বল পাতা বিছানায় শুভ্র দাড়ি-গোঁফঅলা এক বৃদ্ধ শুয়ে আছে। কাছে এসে দেখলো, একটা ছোরা তার বুকে আমূল বেঁধা। বুঝলো, বসির বেঁচে নেই। মাথার ওপর থেকে ছাউনির একটা অংশ সশব্দে ভেঙে পড়লো। আগুনের ফুলকি উড়ল। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। ফ্রান্সিস জ্বলন্ত দরজার মধ্যে দিয়ে এক লাফে বাইরে চ'লে এলো। দেখলো, অনেক লোক জড়ো হ'য়েছে। তারা জল ছিটিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে।

আগুন থেকে ফ্রান্সিসকে বেরিয়ে আসতে দেখে অনেকেই অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। দু'একজন কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করতে এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিস কোনোদিকে তাকাল না। একছুটে রাস্তায় উঠে এলো। তারপর সমুদ্রতীর লক্ষ্য ক'রে জোরে ছুটতে লাগলো।

হাঁপাতে-হাঁপাতে সমুদ্রের তীরে এখন পেঁৗছল ও। দেখলো, ওদের জাহাজ আর অন্য ভাঙাচোরা জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নতুন জাহাজটা নেই। ও আর এক মুহূর্তও দেরী করলো না। লাফিয়ে ডোঙা নৌকায় উঠলো। দ্রুত হাতে দাঁড় বেয়ে ওদের জাহাজের দিকে চললো।

জাহাজে উঠে দেখলো ডেক-এর এখানে-ওখানে দল বেঁধে সবাই খেলায় মত্ত। ওর মধ্যে আবার নাচের আসরও বসেছে। ফ্রান্সিস চিৎকার ক'রে বলতে লাগল—'ভাইসব—এক্ষুণি পাল তুলে দাও—দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে চলে যাও। আপ্রাণ চেষ্টায় জাহাজের যতটা গতি বাড়ানো সম্ভব বাড়াও। কেউ দেরি করবে না।'

সকলেই প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলো কিছু একটা হ'য়েছে। জাহাজের ডেক-এর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। একদল দড়ি-দড়া ঠিক ক'রে পাল খুলে দিলো। গড়-গড় শব্দে নোঙর তোলা হ'ল। দাঁড়িরা দাঁড় টানতে শুরু করলো। একটা পাক খেয়ে জাহাজ চললো উত্তর-পূর্ব মুখো।

ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—'কিছুক্ষণ আগে একটা নতুন জাহাজ নোঙর তুলে চলে গেছে, তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। সেই জাহাজটায় আছে লা ব্রুশের ছোট সর্দার। যেভাবেই হোক চাঁদের দ্বীপে পেঁছিবার আগেই ওটাকে সমুদ্রপথে ধরতে হ'ব! আমরা ভাইকিংরা নাকি জাহাজ চালাতে ওস্তাদ। আজকে তা' প্রমাণের সময় এসেছে। চূড়ান্ত গতিতে জাহাজ চালাও। ঐ জাহাজটাকে ধরা চাই-ই চাই।' ডেক-এ যারা ছিল, তারা একসঙ্গে 'ও-হো-হা—'শব্দ ধ্বনি দিল। দাঁড়িঘর থেকেও ঐ ধ্বনি ভেসে এলো। জাহাজ দ্রুত বেগে জল কেটে ছুটল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসের শরীর জুড়ে অবসাদ নামলো। এতক্ষণ মাথায় তরোয়ালের হাতলের ঘা-এর ব্যাথা ভুলে ছিল। তার ওপর সারাদিন এক ফোঁটা জলও পায় নি। বলতে-বলতে লক্ষ্য করলো ফ্রান্সিসের মাথার পেছনদিকের চুলে জমাট রক্তের জট, ঘাড়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। দু'হাতের কব্জিতে কালচে রক্তের দাগ। হ্যারি ব'লে উঠলো, 'ফ্রান্সিস এসব কি?'

ফ্রান্সিস ক্লান্তভাবে একটু হাসলো। তারপর সব ঘটনা বললো। ওদের মধ্যে যে ওষুধ-টষুধ দেয়, হ্যারি তাকে ডেকে পাঠাল। ফ্রান্সিসের মাথা ভালো ক'রে জল দিয়ে ধুয়ে সেই লোকটা ওষুধ লাগিয়ে দিল। ব্যাথা একটু কমলো। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। পেট পুরে খেলো। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে নিলো। পরে হ্যারিকে ডেকে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়ালো। বেশ ভালো গতিতেই জাহাজ চলছে।

রাত বাড়তে লাগলো। ছোট সর্দারের ক্যারাভেল জাহাজের দেখা নেই। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করে। কখনো দিগন্তের দিকে স্থির দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে। জাহাজে কারো চোখেই ঘুম নেই। দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাইছে। দু'-তিনজন মাস্তুলে উঠে বসে আছে। দড়ি-দড়া টেনে পালগুলো যাতে বেশি বাতাস পায়, তার জন্যে চেষ্টা করছে। জাহাজটা যেন উড়ে চলেছে, এমনি তার গতিবেগ।

হঠাৎ মাস্তুলের ওপর থেকে একজন চেঁচিয়ে বললো—'জলদস্যুদের ক্যারাভেলটা দেখা যাচ্ছে। ওটার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে আমাদের জাহাজ যাচ্ছে।'

ফ্রান্সিস দিগন্তের দিকে তাকালো। অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মত ক্যারাভেল-এর পালগুলো নজরে পড়ল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বললো—'জাহাজের সব আলো নিভিয়ে দাও। কেউ কোন শব্দ করবে না। আমরা অন্ধকারে ক্যারাভেলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ ক্যারাভেল-এর অনেক কাছে চ'লে এলো। কিন্তু ছোট সর্দারও কম চালাক নয়। ও জানতো যে ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই ওদেরই পেছনে ধাওয়া ক'রে আসবে। ওরাও সজাগ ছিলো। সেটা বোঝা গেলো, যখন ক্যারাভেল থেকে কামান দাগা শুরু হ'ল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কামানের আগুনের গোলা ফ্রান্সিসদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে ছুটে এলো। কপাল ভালো। গোলাটা জাহাজ

পার হ'য়ে সমুদ্রের জলে পড়ল। হ্যারি বলল—'ফ্রান্সিস ওরা টের পেয়েছে। জাহাজের গতি কমাও। জাহাজ সরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

—'না—' ফ্রান্সিস বলল—'ওদের লোকসংখ্যা কম। সর্দার বেশি লোক নিয়ে আসেনি। যদি ওদের দাঁড়ির সংখ্যা বেশি থাকতো, তাহ'লে এত তাড়াতাড়ি ওদের ধরতে পারতাম না।'

—'কিন্তু কামানের গোলার মুখে আমরা কি ক'রে এগোবো ?' হ্যারি বললো।

ফ্রান্সিস বললো—যদি জাহাজে আগুন লাগে, তবু আমরা এগিয়ে যাবো।' আর একটা গোলা এসে জাহাজটার পেটের কাছে লাগলো। ওই জায়গাটার কাঠ ভেঙে একটা খোঁদল হ'য়ে গেলো। আর একটা গোলা এসে মাস্তুলের ওপর পড়লো। পালে আগুন লেগে গেলো। মাস্তুলের ওপর যে ভাইকিংটি ছিলো, সে ছিট্‌কে জলে পড়ে গেলো। দাঁড়িরা কিন্তু টেনে চললো। পাল থেকে আগুন ছড়ালো। আস্তে-আস্তে ডেক-এও আগুন লেগে গেলো। ততক্ষণে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ক্যারাভেল-এর অনেক কাছে চলে এসেছে। আবার একটা গোলা এসে ডেক-এ পড়লো। আগুন আরো ছড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। শুধু দেখছিল ক্যারাভেলটা কত দূরে। এবার ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে ফিরে বললো—'শীগ্‌গির দাঁড়ুদের উঠে আসতে বলো।' হ্যারি ছুটল ওদের ডেকে আনতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই তরোয়াল নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ ক্যারাভেল-এ উঠে লড়াই শুরু হবে।' ঠিক তখনই গোলা ছুটে আসছে দেখা গেলো। একসঙ্গে সবাই চীৎকার ক'রে উঠল 'ও-হো-হো'। তারপরই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। গোলাটাও এসে ডেক-এর ওপর পড়লো। এক মুহূর্তের ব্যবধানে ওরা বেঁচে গেলো। দাঁতে তরোয়াল চেপে সবাই সাঁতরে চললো ক্যারাভেলটার দিকে। ওদিকে ফ্রান্সিসদের জাহাজটায় তখন অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হ'য়েছে। দাউ-দাউ করে জ্বলছে জাহাজটা। ঐ আগুনের আভায় চারদিক আলোকিত হ'য়ে গেল।

ক্যারাভেল-এর গা থেকে যে দড়িদড়া ঝুলছিলো, ভাইকিংরা সাঁতরে এসে তাই বেয়ে উঠতে লাগলো। দু'তিনজন জাহাজের ডেক-এ ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু পারলো না। জলদস্যুদের তরোয়ালের ঘায়ে কয়েকজনের মৃত্যু হ'লো। ফ্রান্সিস বুঝলো—এভাবে—ওঠা যাবে না। ও তখন পিছনের হালের কাঠের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে-রেখে নিঃশব্দে ডেক-এর ওপর উঠে এলো। দেখলো আট-দশজন জলদস্যু জাহাজের রেলিং ধ'রে ঝুঁকে নীচে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে ছুটে গিয়ে পরপর দু'জনের পিঠে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিলো। অন্য দস্যুরা ঘুরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করুক, এটাই সে চাইছিলো। ও নিপুণ হাতে তরোয়াল চালিয়ে ওদের আটকে রাখলো। সেই ফাঁকে দড়ি বেয়ে-বেয়ে ভাইকিংরা ক্যারাভেল-এর ডেক-এ উঠে এলো। শুরু হ'লো তরোয়ালের লড়াই। জলদস্যুরা দু-একজন মারা পড়তেই বাকিরা প্রাণ বাঁচাতে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস চারদিক তাকিয়ে কোথায় সেই ঢ্যাঙা ছোট সর্দারকে দেখতে পেল না। কোথায় গেলো ছোট সর্দার ? ও দ্রুতপায়ে ছুটলো নিচে কেবিন-ঘরের দিকে। সব কেবিনঘর ফাঁকা। রসুইঘর, ভাঁড়ারঘর, কয়েদঘর কোথাও ঢ্যাঙা সর্দার নেই। ও ওপরে ডেক-এ উঠে এলো। রেলিঙে ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে

তাকালো। ওদের জাহাজের আগুনের আভায় দেখলো, একটা ডোঙা-নৌকো ভেসে চলেছে। একটা লোক ডোঙা-নৌকাটা দাঁড় দিয়ে বাইছে। নিশ্চয়ই ঢ্যাঙা ছোট সর্দার। নৌকায় চড়ে পালাচ্ছে।

ফ্রান্সিস এক মুহূর্তও দেরী করলো না। তরোয়ালটা দাঁতে চেপে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঐ ডোঙা-নৌকোটা লক্ষ্য ক'রে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগলো। ডোঙা-নৌকাটা উঁচু-উঁচু ঢেউয়ের ধাক্কায় বেশিদূর যেতে পারল না। ফ্রান্সিস অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকোটার কাছে পৌঁছে গেলো; সত্যিই ঢ্যাঙা ছোট সর্দার। ফ্রান্সিসকে দেখতে পেলো ও। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড় ফেলে কোমর থেকে তরোয়াল খুললো। নৌকোর ওপর থেকে ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য ক'রে তরোয়াল চালালো। ফ্রান্সিস স'রে এলো দ্রুত। কিন্তু ততক্ষণে তরোয়ালের ফলাটা ওর বুক ছুঁয়ে গেছে। জামা কেটে গেলো। বুকের অনেকটা জায়গা লম্বালম্বি কেটে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝলো, নৌকোর কাছে গিয়ে ওকে আক্রমণ করা যাবে না। ওকে অন্য উপায়ে মারতে হবে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা দাঁতে চেপে ডুব দিল। ঢ্যাঙা সর্দার নৌকার উপর দাঁড়িয়ে তরোয়াল উঁচিয়ে চারদিকে জলে তাকাতে লাগলো। কখন ফ্রান্সিস ভেসে ওঠে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা হাতে নিয়ে নৌকাটার এক হাতের মধ্যে হঠাৎ ভেসে উঠলো। ঢ্যাঙা সর্দার তরোয়ালটা চালাবার আগেই ফ্রান্সিস ওর তরেয়োলের বাঁটটা বর্শার মত ধ'রে দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ওর বুক লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লো। আর সঙ্গে-সঙ্গে ডুব দিলো। তারায়াল সোজা ঢ্যাঙা সর্দারের বুকে গিয়ে বিঁধে গেল। ঢ্যাঙা সর্দার নিজের তরোয়াল ফেলে দিয়ে বুকে বেঁধা তরোয়ালটা দু'হাতে টেনে বার করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল। তরোয়ালটা টেনে খোলার জন্যে বার কয়েক নিস্ফল চেষ্টা করলো। তারপর শুয়ে পড়ে কয়েকবার হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে স্থির হ'য়ে গেলো।

ফ্রান্সিস নৌকাটায় উঠলো। নৌকাটা জোরে দুলে উঠলো। ও ঢ্যাঙা সর্দারের গলা থেকে আয়নাটা খুলে নিলো। তখনই হঠাৎ একটা বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকাটা কাত হ'য়ে গেলো। ফ্রান্সিস দু'হাতে জল ঠেলে-ঠেলে ক্যারাভেল-এর দিকে সাঁতরাতে লাগলো।

দড়ি বেয়ে-বেয়ে ক্যারাভেল-এ উঠলো। মাথার তীব্র যন্ত্রণাটা এতক্ষণে অনুভব করলো। সমস্ত শরীর জুড়ে অসহ্য ক্লান্তি। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা হ'য়ে এলো। হ্যারি ছুটে এসে ওকে ধরলো। ফ্রান্সিসেস শরীরে আর একফোঁটা শক্তি নেই। ও শরীর ছেড়ে দিলো। কয়েকজন ভাইকিং ছুটে এল। সবাই ধরাধরি ক'রে ফ্রান্সিসকে ওর কেবিনঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো। বৈদ্যিকে ডাকা হ'লো। সে এলে ফ্রান্সিসের মাথায় ওষুধ লাগিয়ে দিলো। মাথার তীব্রতা একটু কমলো বটে, যা হোক ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়লো। আয়নাটা তখনও ওর হাতে ধরা। হ্যারি হাত থেকে আয়নাটা নিয়ে ওর শিয়রের কাছে রেখে দিলো।

সকাল হ'লো। ভাইকিংরা সকলেই খুব খুশি। একটা ঝকঝকে নতুন জাহাজ পাওয়া গেছে। রাত্রে ভালো ক'রে দেখা হয় নি। এখন সবাই ঘুরে-ঘুরে ক্যারাভেলটা দেখতে লাগলো। সত্যিই ক্যারাভেলটা সুন্দর। ভালো জাতের কাঠে তৈরি।

ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙলো। মাথার ব্যথাটা অনেক কমেছে। আবার বৈদ্যি

এসে ওষুধ দিয়ে গেলো। ও শিয়রের কাছ থেকে আয়নাটা এনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। ঠিক ক্বেদারিকোর সেই আয়নার মত কাটা। নীচে ছিদ্র। হ্যারি ঘরে ঢুকলো। বললো 'কি হে কেমন আছো?'

ফ্রান্সিস হাসলো—'এখন অনেকটা ভালো।'

—কি করবে এবার ভেবেছো কিছু?

—হুঁ। ভেবেছি জাহাজটা দু'দিন এখানেই থাকবে। আমি ভীষণ ক্লান্ত। দু'টো দিন বিশ্রাম চাই। তারপর চাঁদের দ্বীপে—লা ব্রুশের সঙ্গে মোকাবিলা।

পরের দু'দিন জাহাজ ওখানেই থেমে রইলো। পাল নামিয়ে রাখা হ'লো। জাহাজের কোন কাজ নেই। বেশ একটা ছুটির আবহাওয়া। সবাই ডেক-এর এখানে-ওখানে জটলা বাঁধলো। কোথাও ছক্কাপাঞ্জা খেলা চললো, কোথাও মোটা ভারি গলায় গান চললো, কোথাও দেশের বাড়ির গল্পগাছা চললো। দু'দিন পরে সন্ধ্যেবেলা আবার সাজ-সাজ রব। একদল উঠলো মাস্তুলে। একদল পাল বাঁধলো, একদল চলে গেল দাঁড়ঘরে! জাহাজ চললো চাঁদের দ্বীপ লক্ষ্য ক'রে।

সোফালা বন্দরে গিয়ে জাহাজটা যখন নোঙর করল, তখন গভীর রাত্রি। যে ক'টা ডোঙা-নৌকা জাহাজটার সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেই নৌকোয় চড়ে দফায় দফায় ভাইকিংরা সবাই সমুদ্রতীরে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়ালো।

আকাশে ভাঙা চাঁদ। অল্প জোৎস্নায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে গুদোমঘর। নির্জন বাজার পেরিয়ে সবাই রাজবাড়ির দিকে চললো।

রাজবাড়ির কাছে পৌঁছে অল্প চাঁদের আলোয় দেখলো দু'জন জলদস্যু খোলা তলোয়ার হাতে। রাজবাড়ি পাহারা দিচ্ছে। এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—আমি আর হ্যারি ঐ দু'টোকে ঘায়েল করছি। তারপর আমি ইসারা করলেই সবাই রাজবাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘরের আড়ালে-আড়ালে পাহারাদার দুই জলদস্যুদের কাছাকাছি চ'লে এলো। তারপর সুযোগ বুঝে দু'জনে একসঙ্গে পাহারাদার দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গলা চেপে ধ'রে দু'জনকেই মাটিতে ফেলে দিলো। হ্যারি একজন পাহারাদারের বুকে সোজা তরোয়াল চালিয়ে দিল। অল্প গোঙানি বেরুলো ওর গলা থেকে! ফ্রান্সিস অন্যটাকে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে মাথায় মারলো। জলদস্যুটা জ্ঞান হারালো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়াল তুলে আক্রমণের ইঙ্গিত করলো।

'ও—হো—হো—' প্রচণ্ড চীৎকারে রাত্রির আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে ভাইকিংরা রাজবাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঘুমন্ত জলদস্যুর দল আচমকা এই আক্রমণে বিছানা ছেড়ে ওঠারও সময় পেল না। দু'-একজন অন্ধকারে বাইরে ছুটে এলো। তারপর ধরবার আগেই গা ঢাকা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকি সব ক'জন জলদস্যুকে বন্দী করা হ'ল। ওদের রাখা হ'ল শাস্তিঘরে।

এর মধ্যে ফ্রান্সিস বেনজামিনকে খুঁজল। কিন্তু কোন ঘরেই তাকে পেলো না। বারান্দায় নেই, বাইরের চত্বরেও নেই। বুঝলো, লা ব্রুশ ওকে মেরে ফেলেছে। ফ্রান্সিস ছুটলো, দরবার ঘরের মধ্যে দিয়ে ভেতরের অন্দরমহলে।

অন্দরমহলের ঘরে তখন লা ব্রুশ চীৎকার-চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে সবে উঠে

বসেছে। তাড়াতাড়ি পিস্তল নিয়ে ঘরের বাইরে আসতে যাবে, তখনই দরজার মুখে একেবারে ফ্রান্সিসের মুখোমুখি। লা ব্রুশ পিস্তল তুললো। ফ্রান্সিস তার আগেই দ্রুত বসে পড়লো। গুলি ছুটে গিয়ে দরজাটায় লাগলো। ফ্রান্সিস আর দ্বিতীয়বার গুলি চালাবার সময় দিলো না। লা ব্রুশের পিস্তল ধরা হাত লক্ষ্য ক'রে বিদ্যুৎবেগে তরোয়াল চালালো। আঙুল কেটে গেলো। পিস্তলটাও ছিট্‌কে পড়লো। লা ব্রুশ বিছানার পাশে রাখা হাতীর দাঁতের বাটঅলা তরোয়ালের দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু কাটা আঙুল নিয়ে তরোয়ালটা তুলতে পারলো না। ফ্রান্সিস ততক্ষণে দ্রুতহাতে তরোয়ালটা ওর বুকে আমূল বিঁধেয়ে দিল। মুখ দিয়ে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল। দু'-তিনবার এপাশ-ওপাশ করে লা ব্রুশ বিছানার ওপর পড়ে গেলো। ওর শরীরটা স্থির হ'য়ে গেল।

ফ্রান্সিস তখন হাঁপাচ্ছে। হ্যারি সঙ্গে আর কয়েকজন ভাইকিং ছুটে ঘরে ঢুকলো। দেখলো লা ব্রুশের মৃত শরীরটা পড়ে আছে। ওরা আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল—'ও—হো—হো—।' বাইরের উঠোন থেকে, বারান্দা থেকে অন্য সব ভাইকিংরা চীৎকার ক'রে সাড়া দিল। অর্থাৎ যুদ্ধে জয় হয়েছে।

দরবার কক্ষে গিয়ে ফ্রান্সিস বসলো। একটু পরে কয়েকজন ভাইকিং ভাজিম্বা সেনাপতিকে নিয়ে এল। সেনাপতিকে ওরা শাস্তিঘর থেকে ধ'রে নিয়ে এলো। সেনাপতির হাঁটবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। তার সারা শরীরে আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার দাগ। চোখ দু'টো কোটরে বসা। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে সেনাপতিকে বললো 'আপনি জেনে খুশি হবেন অত্যাচারী লা ব্রুশ মারা গেছে। ওর ছোটো সর্দারও মারা গেছে। অন্য সঙ্গীরা অনেকেই বন্দী, কিছু অন্ধকারে পালিয়েছে।' সেনাপতি কথাগুলো শুনলো। একটু হাসি ফুটলো তার মুখে।

—'আপনি দিন কয়েক খাওয়া-দাওয়া করুন, বিশ্রাম করুন, তারপরে আপনাকে নিয়ে বনে-পাহাড়ে যাবো। রাজা, মন্ত্রী আর সব ভাজিম্বাদের ফিরিয়ে আনবো। আপনাদের চাঁদের দ্বীপ আপনাদের হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাবো।' ফ্রান্সিস বললো।

অন্দরমহলে যে ঘরে লা ব্রুশ থাকত একটা কারুকার্য করা কাঠের বাক্সে তিনটে মুক্তো পাওয়া গেল। আর কোথাও মুক্তো পাওয়া গেলো না। বাকি যে দু'-তিনটে মুক্তো লা ব্রুশ পেয়েছিল, বোধহয় বিক্রী করে জাহাজ কিনেছে। ফ্রান্সিস স্থির করলো, তাহলে এবার 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে কিছু মুক্তো তুলতে হবে।

কয়েকদিন পরে হ্যারি আর দু'জন ভাইকিংকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস চললো মুক্তোর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে, সঙ্গে নিলো আয়নাটা। এখানে-ওখানে ভাজিম্বাদের পাতা ফাঁদ এড়িয়ে ওরা যখন আগুনে প্রবালের স্তর পেরিয়ে মুক্তোর সমুদ্রের ধারে এলো, তখন বেলা দুপুর। জলে শির্ শির্ ঢেউ উঠছে। চারিদিকে শুধু পাখির ডাক। আর কোনো শব্দ নেই।

ফ্রান্সিস একটা কম্বলের ঝুলিমত এনেছিল। সেটা নিয়ে আর আয়নাটা কোমরে গুঁজে জলে ঝাঁপ দিল। সোজা নীচে নেমে গেল। অসমান তলদেশে আগে কোমর থেকে খুলে আয়নাটা রাখলো। তারপর জলের ওপরে উঠে এলো। ভালো ক'রে দম নিয়ে আবার ডুব দিলো। দেশে মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে জলের নীচে ডুব

দেওয়া, সাঁতার দেওয়া, এসব ভালোভাবেই অভ্যেস করেছিল। এখন সেটা দারুণভাবে কাজে লাগলো।

সেই অপরূপ দৃশ্য জলের তলদেশে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মুক্তো। বড়-বড় ঝিনুকের মুখখোলা পেটেও মুক্তো। ঝিনুকের সংখ্যাও কত। সেই নীলচে-বেগুনী আলোর বন্যা। ফ্রান্সিস দেখলো বেশ কয়েকটা লাফ্ মাছ আয়নাটাতে ঢুঁ দিচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে মাছগুলোর থেকে। তবু ঢুঁ দেবার বিরাম নেই। ফ্রান্সিস মুক্তো তুলতে লাগলো। ভরতে লাগলো সঙ্গে আনা কম্বলের ঝোলাটাতে। দম ফুরিয়ে গেলে উপরে উঠে এলো। আবার ডুব দিলো। আবার মুক্তো তুলতে লাগলো। ঝোলাটা ভরে গেলো। অনেক মুক্তো তুলে ফেলাতে জলের তলদেশে আলোর তেজ কমে গেলো। আয়নাটা থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো, তাতে আগের উজ্জ্বলতা আর রইলো না। আর এখানে থাকা বিপজ্জনক। ওর দিকে লাফ্ মাছের নজর পড়তে পারে। ও উপরে উঠে এলো। সাঁতরে এসে পারে উঠে ঝোলাটা হ্যারির হাতে দিলো।

এত মুক্তো? আর কত বড়-বড়। হ্যারি খুশিতে ঝোলাটা উঁচিয়ে হাসতে লাগলো। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ জলের ধারে ব'সে দম নিলো, তারপর সকলেই ফিরে চললো।

ফ্রান্সিস ঝোলা ভর্তি মুক্তো এনেছে, দেখে ভাইকিংরা আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে গেলো। রাত হ'লে চত্বরে আগুন জেলে তার চারপাশে সবাই ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগলো, আর গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলো। সারারাত আনন্দের আসর চললো। যখন আনন্দের জোয়ার ঝিমিয়ে এলো, তখন ভোর হয়-হয়।

* * *

দিন সাতেক কেটে গেলো। ভাজিম্বা সেনাপতি এখন একেবারে সুস্থ। সে ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বারবার ফ্রান্সিসকে ধন্যবাদ দিলো। ওদের জন্যেই সে বেঁচে গেছে, এটা সে জীবনেও ভুলবে না, একথাই বারবার বলতে লাগল।

কদিন পর ফ্রান্সিস একদিন সেনাপতিকে বললো, 'চলুন বনে গিয়ে রাজা, মন্ত্রী আর অন্য যারা আছে, তাদের নিয়ে আসি। আমরা এবার দেশে ফিরবো।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি সেনাপতিকে নিয়ে চললো। ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সেনাপতি সেই সব অত্যাচারের কাহিনী বলছিল পথ চলতে-চলতে।

বনের মধ্যে ঢুকলো ওরা। হ্যারি বললো—'আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এলে হ'তো।' ফ্রান্সিস বললো—'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনি নি। কারণ অত লোকজন দেখলে আত্মগোপনকারী ভাজিম্বারা আমাদের ভুল বুঝতো। আমাদের বিপদই বাড়তো তাতে।' হ্যারি ভেবে দেখলো কথাটা ঠিক।

প্রথমে ছাড়া গাছপালা। তারপর বন ঘন হ'তে লাগলো। সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢোকে না, এমন নিবিড় সেই বন। সেনাপতি ব'লে যেতে লাগলো, এই বনে-পাহাড়ে কি কষ্টের মধ্যে দিন কেটেছে। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কত ভাজিম্বা যুবক লা ব্রুশের সঙ্গীদের হাতে ধরা দিয়েছে। লা ব্রুশ ওদের পেট পুরে খেতে দিয়েছে। তারপর ধ'রে নিয়ে গেছে 'মুক্তোর সমুদ্রে'। জোর ক'রে বর্শার খোঁচা মেরে ওদের মুক্তো আনতে জলে নামিয়ে দিয়েছে। তারপর কেউ বেঁচে

ফিরে আসেনি।

ওরা নানা কথা বলতে-বলতে বনজঙ্গল ভেঙে চলেছে। তখনই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করলো বাঁদিকে একটা পাণ্ডানাস গাছের ডাল ভীষণ জোরে দুলে উঠলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই ফ্রান্সিস দেখলো একটা বর্শা বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে হ্যারির দিকে। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে হ্যারিকে জোরে ধাক্কা দিল। হ্যারি উবু হ'য়ে একটা ঝোপের ওপর পড়ে গেল। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না। ফ্রান্সিস দ্রুত স'রে যেতে গেলো, কিন্তু ততক্ষণে বর্শাটা ছুটে এসে ফ্রান্সিসের উরু ছুঁয়ে চ'লে গেলো। এক পলকে ঘটনাটা ঘটে গেল। ফ্রান্সিসের উরু অনেকটা জখম হ'ল। গলগল ক'রে রক্ত ছুটলো। ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো। মাটিতে শুয়ে পড়লো। হ্যারি পাগলের মত ছুটে এসে ওর উরুটা চেপে ধরলো। কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হ'লো না। ফ্রান্সিস ব্যথায় গোঙাতে লাগলো। হ্যারি চীৎকার ক'রে সেনাপতিকে বললো 'শীগ্‌গির ভাজিম্বাদের বলুন, আমরা ওদের শত্রু নয়।'

সেনাপতি সঙ্গে-সঙ্গে ভাজিম্বাদের ভাষায় চীৎকার ক'রে একনাগাড়ে কি বললো। বোধহয় লা ব্রুশের পরাজয় সংবাদ দিলে। ফ্রান্সিনরা যে ওদের বন্ধু, এ কথাও বললো। বনজঙ্গলের গাছ-গাছালির আড়াল থেকে ভাজিম্বা যোদ্ধারা বর্শা হাতে কাছে আসতে লাগলো। কাছে এসে ফ্রান্সিসদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো ওরা। রোগার্ত, পাংশুমুখ ওদের। কতদিন না খেয়ে আছে, কে জানে! সেনাপতি ওদের কি বললো। ওদের মধ্যের একজন ছুটে গিয়ে একটা লতাগাছ নিয়ে এলো। ফ্রান্সিসের জখমের দু'পাশে লতা দিয়ে বেঁধে দিলো। রক্তপড়া একটু কমলো। তারপর ঐ ভাজিম্বাটি লতাগাছটার কয়েকটা পাতা মুখে পুরলো। কিছুক্ষণ চিবিয়ে তারপর উরুর ক্ষতের উপর সেই চিবিয়ে থ্যাৎলানো পাতাগুলো লাগিয়ে দিলো। একটু জ্বালা করে উঠলো। আস্তে-আস্তে ঠাণ্ডা লাগলো ক্ষতের জায়গাটা। ফ্রান্সিস একটু আরাম বোধ করলো।

সেনাপতি ওদের কি জিজ্ঞেস করলো। ওরা বাড়িয়ে দূরের পাহাড়টা দেখলো। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে পর্তুগীজ ভাষায় বললো—'ঐ পাহাড়ের কোন গুহায় রাজা আছেন। আমি রাজা-মন্ত্রী ওদের আনতে যাচ্ছি। ওদের ব'লে যাচ্ছি এর মধ্যে ওরা গাছের ডালপালা কেটে মাচামতো তৈরী করবে। তাতে আপনাকে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি রাজা-মন্ত্রী নিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি রাজা, মন্ত্রী এবং অন্য সব গণ্যমান্য ভাজিম্বাদের নিয়ে সেখানে এলো। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে দেখিয়ে রাজাকে কি বললো। রাজা হেসে ফ্রান্সিস আর হ্যারির গায়ে হাত বুলালো। চারজন ভাজিম্বা ফ্রান্সিসের মাচাটা কাঁধে তুলে নিল। সকলে মিলে এবার ফিরে চললো রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। এবার ভাইকিংদের দেশে ফেরার পালা। এর মধ্যে একদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে বললো—'হ্যারি, আমাকে একবার রাজদরবারে নিয়ে চলো।'

—ওখানে যাবে কেন ?

—আমি যে 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে অনেক মুক্তো এর মধ্যেই এনেছি, যে কথাটা রাজাকে বলবো। দেশে মুক্তো নিয়ে যাবার অনুমতি চাইবো।

—মনে তো হয় না ; রাজা এতে আপত্তি করবে।

—তবু ব'লে-কয়ে নেওয়াটাই ভালো।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নৌকোয় চড়ে চাঁদের দ্বীপে এলো। রাজদরবারে ওরা যখন পৌঁছলো, তখন দুপুর হ'য়ে গেছে। দেখলো, রাজসভার কাজ চলছে। ওদের দরবার ঘরে ঢুকতে দেখে সেনাপতি এগিয়ে এসে ওদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে বসার জায়গা ক'রে দিলো। ফ্রান্সিস সেনাপতিকে বললো, 'রাজাকে আমরা একটা কথা বলতে চাই।'

—কি কথা ?

—আপনি রাজাকে বলুন, যে আমি রাজার অনুমতি না নিয়ে 'মুক্তোর সমুদ্র' থেকে কিছু মুক্তো তুলেছি। এখন এ সব মুক্তো নিয়ে যেতে পারি কিনা।

তখন রাজসভায় একটা বিচার চলছিলো। সেটা শেষ হ'তেই সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসের কথাগুলো রাজাকে বললো। রাজা মৃদু হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ভাজিম্বা ভাষায় কি সব বলে গেলো। সেনাপতি সেটা পর্তুগীজ ভাষায় বলে দিলো—'রাজা বলছেন, আপনি যে সৎ এবং মহৎ প্রকৃতির মানুষ, এটা আপনার ব্যবহারেই প্রকাশ পেয়েছে। আপনি আমাকে না জানিয়ে অনায়াসে মুক্তোগুলো নিয়ে চলে যেতে পারতেন। আপনি তা করেন নি। এতেই আপনার সততা প্রকাশ পাচ্ছে। আপনি সাহস আর বুদ্ধিবলেই মুক্তো সংগ্রহ করেছেন। ঐ মুক্তোগুলো আপনার সাহসিকতার পুরস্কার। তবে চাঁদের দ্বীপে অধিষ্ঠাতা দেবতার নামে শপথ ক'রে বলছি, ঐ মুক্তোগুলো নিয়ে ব্যবসা করবেন না। আমি ঐ ব্যবসা করতে চেয়েছিলাম ব'লেই রাজত্ব হারিয়েছিলাম। চাঁদের দ্বীপের অধিষ্ঠাতা দেবতার অভিশাপ লেগেছিলো। আমার অনুরোধ, আপনি তা করবেন না। যে সব মুক্তো আপনি সংগ্রহ করেছেন, সে সবই আপনার।' ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে বারবার রাজাকে ধন্যবাদ দিলো। তারপর জাহাজে ফিরে এলো।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজে ফিরতেই সবাই ছুটে এলো। ফ্রান্সিস ওদের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলো 'জাহাজ ছাড়ো, এবার দেশে ফেরা যাক্।

সকলেই একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো 'ও-হো-হো-।'

ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তুলে নতুন জাহাজটা দ্রুত বেগে ঢেউ ভেঙে চুটলো।

বিকেল হ'য়ে এসেছে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম আকাশে নেমে আসা সূর্যের শেষ আলোয় ওখানে যেন রঙের বন্যা চলেছে। সেইদিকে আনমনে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা কি যেন বের করলো। হ্যারি দেখলো। হ্যারি দেখলো, বেশ বড় আকারের মুক্তো একটা। হেসে বললো—"কি ব্যাপার ? এই মুক্তোটা এখনও যে হাতছাড়া করছো না ?"

ফ্রান্সিস হেসে বললো—'এটা সবচেয়ে বড়। এটা রাজকুমারীকে উপহার দেবো।'

'—তাই বলো।' হ্যারি হাসলো। ও আর কোনো কথা বললো না। লাল আলোময় দূরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস তখন কি কথা ভাবছিলো, তা ফান্সিসই জানে।

তুষারে গুপ্তধন

অনিল ভৌমিক

তুষারে গুপ্তধন

তুষারে গুপ্তধন

জাহাজ চলেছে ভাইকিংদের স্বদেশের দিকে। সমুদ্র শান্ত। হাওয়ার বেগও যথেষ্ট। পালগুলো প্রায় বেলুনের মত ফুলে উঠেছে। নিরুদ্বেগ সমুদ্রযাত্রা। ভাইকিংরা সকলেই খুশী। অনেকদিন পর স্বদেশে ফিরে চলেছে। হাওয়া ভাল থাকাতে দাঁড় টানতে হচ্ছে না। শুধু ডেক ধোয়া-মোছা, পালের দড়ি ঠিক-ঠাক করা এসব কাজ। সে আর কতক্ষণের কাজ। বাকী সময় ওরা হৈ-হল্লা ক'রে, ছক্কা-পাঞ্জা খেলে। গান গায়, বাজনা বাজায়, নাচে। রাত হ'লে ডেকের এখানে ওখানে সবাই গোল হ'য়ে বসে। দেশের বাড়ীর গল্প করে। সোনার ঘণ্টা নিয়ে গেছে ওরা, অত বড় দু'টো হীরে। এবার নিয়ে যাচ্ছে হাঁসের ডিমের মত মুক্তো। দেশের লোকেরা অবাক হ'য়ে যাবে। মানুষের কল্পনাতেও আসে না এত বড় মুক্তো। কী সম্বর্ধনাটাই না ওরা পাবে!

ফ্রান্সিস, হ্যারি দুই বন্ধুও খুশী। তবে ফ্রান্সিস মাঝে-মাঝে বলে হ্যারিকে—'দেখ ভাই, দেশে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না। জানো তো হীরে নিয়ে যাবার সময় কী ক'রে লা ব্রুশের পাল্লায় পড়েছিলাম।'

হ্যারি হেসে বলে—'মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছো। এবার অনেক সাবধান হ'য়েছি।'

—'তবু বলা যায় না কিছু।' ফ্রান্সিস বলে। হ্যারি ঠিকই বলেছে। এবার জাহাজের পাহারাদারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন রাত জেগে পাহারা দেয়। পরের দিন বাকীরা। ঘরে-ঘরে সকলের ওপরই রাত জেগে পাহারা দেবার ভার পড়ে। ফ্রান্সিস, হ্যারি, বিস্কো কেউ বাদ যায় না। তবে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা হ্যারিকে সারারাত জাগতে দেয় না। ওকে জোর ক'রে ঘুমুতে পাঠিয়ে দেয়। হ্যারি বড় একটা সুস্থ থাকে না। এটা-ওটা লেগেই আছে। হ্যারি তাই দুঃখ ক'রে বলে—'ফ্রান্সিস আমাকে না আনলেই ভালো করতে।'

ফ্রান্সিস মাথা নাড়ে। বলে—'তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও বেরোবোই না।'

—তোমাদেরই তো ভোগান্তি।

—'হোক ভোগান্তি।' তারপর থেমে বলে—'এ্যান্তনীকে সেই জন্যেই সঙ্গে এনেছিলাম। এ্যান্তনী রাজ-চিকিৎসকের সাগরেদ। ও অনেক ওষুধ-পত্তরও সঙ্গে এনেছে। কখন কে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, কে আহত হয়। চিকিৎসা করতে হবে তো।'

—'তারপর বরাবরের রোগী আমি তো আছিই।'

দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

হ্যারি এর মধ্যেই একদিন গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। সেদিন বিকেলে হ্যারি ডেক-এ দাঁড়িয়ে দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে, হঠাৎ ওর মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। তারপর বুকে একটা মোচড়। দু'হাত শূন্যে তুলে হ্যারি ডেকের ওপর পড়ে গেল। ধারে কাছে যারা ছিল ছুটে এল। হ্যারির মুখটা তখন বেঁকে গেছে। হাত-পা শক্ত কাঠ। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। খবর পেয়ে ফ্রান্সিস ছুটে এল। একটু পরে এ্যান্তনী ওর ওষুধ রাখার বেতের বাক্সটা নিয়ে এল। ও হ্যারির শক্ত হাত-পা বারকয়েক

টানাটানি করল। তারপর বুকে কান রাখল। নাকের সামনে আঙ্গুল রাখল। খুব ধীরে শ্বাস পড়ছে। প্রায় বোঝাই যায় না। বুকে হৃদস্পন্দনও অস্পষ্ট। বেতের বাক্স খুলে একটা চিনেমাটির বোয়াম বের করল। দু'হাত তুলে সবাইকে বলল—'সরে যাও—হাওয়া ছাড়ো।'

সবাই স'রে গেল। এ্যান্তনী বোয়াম থেকে আঙ্গুলের ডগায় ক'রে ওষুধ বার করল। তারপর হ্যারির নাকের কাছে ধরল। হ্যারি সেই শক্ত হাত-পা নিয়ে একই-রকম ভাবে শুয়ে রইল। এ্যান্তনী কিছুটা ওষুধ হ্যারির নাকে লাগিয়ে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর হ্যারির মুখ থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুলো। কয়েকবার মাথাটা এ'পাশ-ও'পাশ ক'রে হ্যারি সহজ দৃষ্টিতে তাকালো। মাথা ঘুরিয়ে চারদিক তাকিয়ে নিল। শক্ত হাত-পা নরম হ'ল। ও আস্তে-আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস ওর মুখের ওপর ঝুঁকে বলল—'এখন কেমন লাগছে?'

—'একটু ভালো।' দুর্বল স্বরে হ্যারি বলল—'আমার কী হয়েছিল?'

—'কিছু না, মাথা ঘুরে গিয়েছিল বোধহয়।'

—'মাথা ঘুরে গিয়েছিল ঠিকই, তারপর বুকে একটা চাপা ব্যথা। তারপর সব কেমন অন্ধকার হ'য়ে গেল।

—'ও ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবিনে যেতে পারবে? আমার কাঁধে ভর দিয়ে?'

—'বোধহয় পারবো।'

হ্যারি উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলো না। বোঝা গেল, ওর শরীরের দুর্বল ভাবটা এখনও কাটে নি। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে ওর হাতটা নিজের কাঁধে তুলে নিল। তারপর ধরে-ধরে আস্তে-আস্তে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল। হ্যারিকে বিছানায় শুইয়ে দিল ফ্রান্সিস। অল্পক্ষণের মধ্যেই হ্যারি অনেকটা সহজ হল। এ্যান্তনী একটা মোটা কাপড়ের পুঁটুলি থেকে দু'টো কালো-কালো বড়ি বের করল। হ্যারির হাতে দিয়ে বলল—'খেয়ে নাও।'

একজন জলের গ্লাস নিয়ে এল। হ্যারি বড়ি দু'টো খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল ও। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। এবার ফ্রান্সিস এ্যান্তনীকে জিজ্ঞেস করল 'হ্যারির কী হয়েছে?'

—'ঠিক বুঝতে পারছি না।' এ্যান্তনী বেতের বাক্স বন্ধ করতে-করতে বলল—'মনে হয় মৃগী রোগের মত কিছু। দেশে ফিরে ওর ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।'

—'হুঁ'।

ফ্রান্সিস মুখ নীচু করে কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর যারা ছিল তারাও বেরিয়ে এল।

জাহাজ চলেছে। দু'-একবার অল্প ঝড় উঠেছিল সমুদ্রে। কিন্তু জাহাজের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। দিন-রাত জাহাজ পাহারা দেওয়া চলল। শুধু হ্যারিকে কোন কাজে ডাকা হতো না। হ্যারি এখন মোটামুটি সুস্থ। ও কাজ-টাজ করতে চায়। কিন্তু ফ্রান্সিস চড়া গলায় বলে দিয়েছে—'তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না। এখন শুধু বিশ্রাম'।

হ্যারি আর কি করে। চুপচাপ শুয়ে-বসে থাকে। ফ্রান্সিসরা ওর ঘরে আসে গল্প-টল্প করে ওর সঙ্গে। ফ্রান্সিস মাঝে-মাঝে ওকে ডেকের ওপর নিয়ে যায়। ফ্রান্সিসের হাত ধরে আস্তে-আস্তে পায়চারী করে। কিছুদিন যেতে হ্যারি সুস্থ হয়ে উঠল। আগের মতই কাজকর্ম করতে লাগল।

তুষারে গুপ্তধন

পর্তুগালের কাছাকাছি আসতে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা এক প্রকাণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ল। তখন বিকেল। সূর্য অস্ত যায়-যায়। হঠাৎ একটা কালো মেঘ উঠল পশ্চিম আকাশের দিকে। সেই মেঘ বড় হতে-হতে, ছড়াতে-ছড়াতে সমস্ত আকাশ ঢেকে দিল। ওর মধ্যে পূব আকাশটা কেমন আগুনরঙা হয়ে উঠল। টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়তে লাগল। সারা আকাশ জুড়ে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎরেখা সারা আকাশ চিরে ফেলতে লাগল যেন। তারপরই হঠাৎ প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ শব্দ উঠল। আর তারপরই বিরাট-বিরাট ঢেউ ছুটে এলো। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। ঢেউগুলো কান-ফাটানো শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। ভাইকিংরা অভিজ্ঞ নাবিক। ওরা আকাশের চেহারা দেখেই বুঝেছিল, বেশ বড় রকমের ঝড় আসছে। ওরা সমস্ত পাল নামিয়ে ফেলেছিল। দাঁড়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর তৈরী হয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়িয়েছিল ঝড়ের মোকাবিলা করবার জন্য।

কিন্তু ওরা যতটা আশঙ্কা করেছিল, ঝড় তার চেয়েও ভয়াবহ চেহারা নিল। মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে মুহুর্মুহু জলের উত্তাল ঢেউ, জাহাজের ডেকের ওপর ভেঙে পড়তে লাগল। ভাইকিংরা ঐ প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কার মধ্যে, পালের দড়ি মাস্তুল হুইল আঁকড়ে ধরে রইল। সবাই ভিজে জবজবে হয়ে গেল। যে হুইল ধরে দাঁড়িয়েছিল, সে ওর মধ্যেই হুইল ঘুরিয়ে চলল। জাহাজের গতি পরিবর্তন করে ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটার মোকাবিলা করতে লাগল। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনির মধ্যে পা ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কয়েকজন পারলও না পা ঠিক রাখতে। রেলিঙের গায়ে, মাস্তুলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কয়েকজন আহতও হল। একেবারে নতুন জাহাজ। তাই ঝড়ের এই প্রচণ্ডতা সহ্য করতে পারল। মাত্র আধঘণ্টা ঝড় চলল। তাতেই সবাই কাহিল হয়ে পড়ল। ঝড় কমল। অল্প-অল্প বৃষ্টি চলল কিছুক্ষণ। তারপরেই আকাশ পরিষ্কার। সন্ধ্যার আকাশে আবার তারা ফুটল।

তারপরে আর ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হল না। কিছুদিন পরেই জাহাজ ভিড়ল ভাইকিং দেশের বন্দরে। অনেকদিন পর দেশে ফেরা। সকলেই খুশী। তার ওপর অত বড়-বড় মুক্তো নিয়ে ফিরেছে। দেশের মানুষেরা তো তাই দেখে অবাক হয়ে যাবে।

জাহাজটা যখন জাহাজঘাটায় ভিড়ল, তখন ভোর হয়-হয়। জাহাজঘাটায় লোকেরা তাকিয়েও দেখল না ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে। তারা তো জানে না কি নিয়ে কত দূর দেশ পাড়ি দিয়ে, এই জাহাজ আসছে। ফ্রান্সিসদের বন্ধুদের আর তর সইল না। ওরা বাড়ী যাবার জন্যে বার-বার ফ্রান্সিসকে বলতে লাগল। ফ্লান্সিস আর কী করে। ওদের বাড়ী যেতে অনুমতি দিল। শুধু বিস্কোকে বলল — 'রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজাকে জানিয়ে যাবে যে, আমরা ফিরেছি। সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান মুক্তো। রাজামশাই যেন এসব নিয়ে যাবার জন্যে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেন।'

সৈন্যদল না আসা পর্যন্ত ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজে থাকবে, এটাই স্থির হল। বন্ধুরা সব হৈ হৈ করতে করতে পথে নামল, তারপর গাড়িভাড়া করে ছুটল যে-যার বাড়ির দিকে। আধঘণ্টার মধ্যে একদল অশ্বারোহী সৈন্য এল। সৈন্যদের দলপতি জাহাজে উঠে ফ্রান্সিসের কাছে এল। সসম্মানে রাজার একটা চিঠি ওর হাতে দিল। মোটা কাগজে মোড়ানো চিঠিটা খুলে ফ্রান্সিস পড়ল — 'তুমি আর হ্যারি অপেক্ষা করবে। আমার গাড়ি যাবে তোমাদের আনতে।'

হ্যারি চিঠিটা পড়ে বলল—'এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

সৈন্যরা। জাহাজের দেখাশুনোর ভার নিল। ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে একটা বড় কাঠের বাক্সে মুক্তোগুলো রাখা ছিল। সৈন্যরা পাহারা দিতে লাগল সেই কেবিন ঘর।

এরমধ্যে শহরে রটে গেছে বড়-বড় অনেক মুক্তো নিয়ে ফ্রান্সিসদের ফেরার কথা। আস্তে-আস্তে জাহাজঘাটায় লোক জমতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসুক জনতার ভীড় বাড়তে লাগল। ভীড় ক্রমে জনসমুদ্রে পরিণত হ'ল। রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেল! উৎসুক জনতা ধ্বনি দিতে লাগল—'ফ্রান্সিস, দীর্ঘজীবী হও'। তারপর চীৎকার শুরু হ'ল—'আমরা ফ্রান্সিসকে দেখতে চাই'।

কেবিন ঘরে ব'সেছিল ফ্রান্সিস আর হ্যারি। হ্যারি হেসে বলল—'আর লুকিয়ে থাকা চলবে না। চলো ডেকে গিয়ে দাঁড়াই'।

—'আমার এসব আর ভালো লাগে না'। বিরক্তির সঙ্গে বলল ফ্রান্সিস।

—'উপায় নেই, চলো'—বলে হ্যারি উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকেও উঠতে হ'ল।

দু'জনে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠল—'ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হও'।

দু'জনেই হেসে হাত নাড়াতে লাগল উৎসুক জনতা মুক্তোগুলো দেখতে চেয়ে চীৎকার করতে লাগল। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে ওর বাছাই করা মুক্তোটা বের করল। তারপর হাত তুলে দেখাতে লাগল। জনারণ্যে চাঞ্চল্য জাগল। সকলেই অবাক —এত বড় মুক্তো! অনেকক্ষণ ধরে করতালি চলল। সে শব্দে কান পাতা দায়। আবার শুরু হ'ল ধ্বনি—'ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হও'।

এর মধ্যে রাজার পাঠানো আটটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি এল। জনতার ভীড় স'রে গিয়ে পথ ক'রে দিল। গাড়ির চালকের মাথায় পালকগোঁজা টুপী। পরণে জেল্লাদার পোশাক। ঘোড়াগুলি সুসজ্জিত। কালো গাড়িটার গায়ে সোনালী পাতের কারুকাজ। গাড়িটা জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজ থেকে নেমে এল। উঠল গাড়িটায়। তখনও জনতার উল্লাসধ্বনি চলেছে। ওদের নিয়ে গাড়ি চলল রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

গাড়ির সামনে ও পেছনে দু'দল সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য চলল। জনসমুদ্রের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে গাড়ি চলল। দর্শকের অনুরোধে ফ্রান্সিসকে মাঝে-মাঝে মুক্তোটা তুলে দেখাতে হ'ল। অতবড় মুক্তো দেখে সবাই হতবাক। পরক্ষণেই উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠছে সবাই।

একসময় রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটক পেরোল গাড়িটা। ফ্রান্সিসরা দেখল রাজপ্রাসাদের বড়-বড় সিঁড়িগুলির ওপর লাল কার্পেট পাতা। সিঁড়িগুলি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রাজা ও রাণী দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান-প্রধান অমাত্য ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। আবার রাজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রীমশাই, ফ্রান্সিসের বাবা।

গাড়ি এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস, হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সমবেত সকলেই করতালি দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাল। ওরা প্রথমে রাণীর কাছে দাঁড়াল। রাণীর পরণে একটা গোলাপী রঙের গাউন। গলায় ছোট-ছোট মুক্তোর হার। রাণী হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। দু'জনেই বাঁ পা ঝুঁকিয়ে মাথা নীচু ক'রে রাণীর হস্ত চুম্বন করল। রাজার দিকে ফিরে দাঁড়াতেই রাজা ফ্রান্সিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হ্যারিকে। রাজা শুধু বললেন —'তোমরা আমার দেশের গৌরব।'

হঠাৎ রাজার পেছনে রাজকুমারী মারিয়া এগিয়ে এল হাসতে হাসতে।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ মারিয়াকে দেখতেই পায়নি। ওরা দু'জনে মাথা ঝুঁকিয়ে রাজকুমারীর হস্ত চুম্বন করল। একটা ফিকে সবুজ রঙের গাউন পরে আছে মারিয়া। ফ্রান্সিসের মনে হ'ল যেন সবুজ ডাঁটায় সদ্য ফোটা একটা লিলাক ফুল। মারিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে উঠল—'আমার জন্যে যে মুক্তো আনবেন বলেছিলেন।'

—'এই যে'— ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে মুক্তোটা বের ক'রে মারিয়ার হাতে দিল। মুক্তোটা হাতে নিয়ে মারিয়া খুশিতে মাথা দুলিয়ে হেসে উঠল। বাবা ও মাকে মুক্তোটা দেখাতে লাগল। ওদিকে সমবেত অমাত্যরা অভিজাত ব্যক্তিরা হাঁ হয়ে দেখতে লাগল সেই মুক্তোটা। এত বড় মুক্তো! ও-যে মানুষের কল্পনার বাইরে। বেশ গুঞ্জন উঠল সেই ভীড়ের মধ্যে।

ফ্রান্সিস বলল—'রাজকুমারী'।

—'বলুন!' মারিয়া খুব খুশীভরা চোখে ওর দিকে তাকাল।

—'জাহাজে আরও মুক্তো রয়েছে। তাই থেকেও মুক্তো বেছে নিতে পারেন।'

—'না'—মারিয়া মাথা ঝুকিয়ে আস্তে-আস্তে বলল—'আপনি যেটা দিয়েছেন, সেটাই আমি নেবো।'

একথা শুনে ফ্রান্সিসও খুশী হ'ল। কারণ ও খুব যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিল বাছাই করা মুক্তোটা।

রাণী একটু এগিয়ে এসে ডাকলেন—'ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস সসম্ভ্রমে বলল—'বলুন।'

—'আজকে রাত্রে এখানে তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ। তোমরা সবাই আসবে।'

—'নিশ্চয়ই রাণী-মা'। ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে বলল।

এবার রাজামশাই উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কালকে জমকালো মিছিল ক'রে মুক্তোগুলো জাহাজ থেকে এখানকার যাদুঘরে আনা হবে। আগামী দু'দিন দেশব্যাপী আনন্দ উৎসব হবে।'

সকলেই করতালি দিল। এদিকে রাজপ্রাসাদের বাইরে উৎসুক সাধারণ মানুষের ভীড় বাড়তে লাগল। সকলেই ফ্রান্সিসকে দেখতে চায়। রাজার ঘোষণাটা তাদের মধ্যে প্রচারিত হ'ল। সকলে সমস্বরে ধ্বনি দিল—'আমাদের রাজা দীর্ঘজীবী হোন।'

রাজার এই ঘোষণা প্রচার করতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য বেরিয়ে পড়ল।

এবার ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে এসে রাজামশাইকে বলল— 'আমরা অনেকদিন ঘর ছাড়া আমাদের যেতে অনুমতি দিন।'

—'নিশ্চয়ই। তোমরা এবার বাড়ি যাও।' রাজা বললেন।

সকলেই রাজা-রাণী ও রাজকুমারীকে সম্মান জানিয়ে নিজেদের গাড়িতে গিয়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস ও হ্যারি রীতিমাফিক রাজা-রাণী ও রাজকুমারীর কাছে বিদায় নিল। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখনই ফ্রান্সিস শুনল, পেছন থেকে ওর বাবা বলছেন- 'তোমরা দু'জনে আমার গাড়িতে গিয়ে ওঠ।'

ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ওর গাড়িতে গিয়ে উঠল। ওর বাবাও এসে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি প্রাসাদের বাইরে আসতেই সমবেত জনতা ধ্বনি দিল—'আমাদের রাজা

দীর্ঘজীবী হোন। ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হোক।'

সকলেই ফ্রান্সিসদের গাড়ীর কাছে এগিয়ে আসতে চায়। ভালো ক'রে দেখতে চায় ওদের। ফ্রান্সিস আর হ্যারি হেসে হাত নাড়তে লাগল। গাড়ি আস্তে-আস্তে চলল। ভীড় ছাড়িয়ে গাড়ি দ্রুত ছুটল। হ্যারির বাড়ির কাছে এসে থামল।

হ্যারি নেমে যাবার সময় বলল—'রাত্তিরে দেখা হচ্ছে।'

এবার বাবার সঙ্গে একা। গাড়ি চলেছে। আবাল্য-পরিচিত শহরের রাস্তাঘাট। ভালোই লাগছিল ফ্রান্সিসের। কতদিন পরে এখানে ফিরল। হঠাৎ কেন জানি মা'র জন্যে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। ও থাকতে না পেরে বলল— 'মা কেমন আছেন?'

—'শয্যাশায়ী'! বাবা গম্ভীর গলায় বলল।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল— 'বলো কি বাবা?'

বাবা আর কোন কথা বললেন না।

—'বৈদ্যিরা কী বলছে?'

—'নানা রকম অসুখের কথা বলছে। তবে আমার মনে হয়'—

বাবা একটু কাশলেন—'তোমার জন্যে ভেবেভেবেই এই অবস্থা।'

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না।

বাড়ির গেটের সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস গাড়ি থেকে নেমে দেখল দেয়ালের গায়ে জড়ানো লতাগাছটা আরো অনেক দূর ছড়িয়েছে। নীল ফুলে ছেয়ে আছে দেওয়ালটা। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল বাগানটা অযত্নে শ্রীহীন হয়ে আছে। কিছু আগাছাও গজিয়েছে এখানে-ওখানে।

এবার ফ্রান্সিস বুঝল—মা নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে। কে আর বাগানের দিকে লক্ষ্য রাখবে। বাড়িতে ঢুকে ফ্রান্সিস আর অন্য কোনদিকে তাকাল না। ছুটল মার শোবার ঘরের দিকে। দোরগোড়া থেকেই ডাক দিল—'মা-মাগো'।

ওর মা তখন একটা বালিসে ঠেসান দিয়ে আধশোয়া হয়ে শুয়েছিলেন। ফ্রান্সিস দেখল, মা আরো রোগা হয়েছে। মুখের কপালের বলিরেখাগুলো আরও স্পষ্ট হয়েছে।

চোখ কুঁচকে মা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফ্রান্সিস এসেছিস বাবা?'

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলতে পারল না। ওর বুক ঠেলে কান্না এল। কিন্তু ও কাঁদল না।

জানে ওর চোখে জল দেখলে মা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা-ও ওর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে শান্তস্বরে বলতে লাগল- 'কবে যে আর এসব পাগলামি যাবে। তোর বাবা তোর জন্যে এত ভাবে, যে কী বলবো। কত রাত দেখেছি, বারান্দায় পায়চারী করছে।'

কথা বলতে-বলতে মা'র চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। ফ্রান্সিসও বুকে একটা শূন্যতা অনুভব করল। অনেকক্ষণ মাকে জড়িয়ে ধরে থেকে নিজের আবেগ সামলাল।

মা বলে উঠল—'নে ওঠ, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।'

ফ্রান্সিস মুখ তুলল। বলল—'এখন কেমন আছ মা?'

—'তুই এসেছিস, এবার ঠিক ভালো হয়ে যাবো।'

—'তুমি ভালো না হওয়া পর্যন্ত আমি দূরে কোথাও যাবো না।'

—'কথা দিলি, মনে থাকে যেন।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফ্রান্সিস ভেবেছিল একা-একা খেয়ে নেবে। কিন্তু সেটা হল না। খাবার টেবিলে বাবার মুখোমুখি বসে দু'জনেই চুপচাপ খেতে লাগল।

একসময় বাবা বলল—'আবার কোথাও বেরোবে নাকি?'

—'না। মা ভালো না হওয়া পর্যন্ত আমি বাড়িতেই থাকবো।

—'তাহলে বাড়িতে পাহারাদার রাখার প্রয়োজন নেই?'

—'না।'

—'ভাল।'—আর কোন কথা না বলে বাবা খেতে লাগলেন।

অনেকদিন পরে নরম বিছানায় শান্ত পরিবেশে শুয়ে ফ্রান্সিস জেগে থাকতে পারল না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। একটানা বিকেল পর্যন্ত ঘুমলো ও।

★ ★ ★

সন্ধ্যার পর থেকেই মা'র তাগাদা শুরু হলো—'রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ। যা, ভালো পোশাক-টোশাক পরে নে।'

মা বিছানায় শুয়ে শুয়েই পরিচারিকাকে দিয়ে ফ্রান্সিসের পোশাকগুলো আনাল। তাই থেকে বেছে-বেছে একটা খুব ভালো পোশাক বের করল। ফ্রান্সিস বেশ কষ্ট করে পোশাকটা পরল। বোতাম-টোতাম আটকাল। গলা পর্যন্ত আঁটা সেই পোশাক পরে ওর অস্বস্তিই হতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই। রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ।

ও যখন সেজেগুজে মা'র কাছে এল, তখন মা ওকে দেখে খুশীই হলো। পোশাকটা বেশ মানিয়েছে ফ্রান্সিসকে। মা ওর গায়ে সেন্ট ঢেলে দিল। বাবাও ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছিলেন দু'জনে গিয়ে উঠতেই গাড়ি চলল রাজবাড়ীর দিকে।

রাজপ্রাসাদের সিঁড়ির নীচের চত্বরে অনেক গাড়ি ঘোড়া। গাড়ি-গুলোর গঠন-ভঙ্গীও বিচিত্র। বোঝা গেল, অনেক লোকজন এসেছেন।

আলোকোজ্জ্বল বিরাট হলঘরের একদিকে রাজা-রাণী বসে আছেন—পিঠের দিকে উঁচু বিরাট দু'টো চেয়ার। রাজার পরণে চকচকে সোনালী-রূপালী কাজ করা পোশাক। রাণীও খুব সেজেছেন। পরণে চকচকে রূপোলী সাটিনের পোশাক। কাঁধের কাছে ঝালর দেওয়া টকটকে লাল কাপড়ের ফুল। রাণী ফ্রান্সিসকে দেখে হাসলেন তারপর ডান হাতের দস্তানাটা খুলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফ্রান্সিস প্রথমতঃ হাতে চুম্বন করল। রাজাও ফ্রান্সিসকে দেখে হাসলেন। রাজা-রাণীর পাশের চেয়ারটা খালি ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ দেখা গেল, রাজকুমারী মারিয়া নাচের আসরের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। দুধের মত সাদা একটা গাউন পরণে। সকালের চেয়ে এখন আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। একটু হাঁপাচ্ছেও। বোধহয় নেচে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিসকে দেখে মারিয়া হাসল। তারপর বলল— 'আমার সঙ্গে খেতে বসবেন। মুক্তোর সমুদ্রের গল্প শুনবো।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে হাসল। মারিয়া নিজের চেয়ারটায় বসে পড়ল। ফ্রান্সিস এবার ওখান থেকে সরে এসে ভীড়ের মধ্যে বন্ধুদের খুঁজতে লাগল।

প্রথমেই বিস্কোর সঙ্গে দেখা। বেশ জমকালো পোশাক পরেছে। বিস্কো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, বোধহয় নাচের সঙ্গিনী খুঁজছে। অন্যসব বন্ধুদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো। বাকিরা সব মহানন্দে বাজনার তালে-তালে নাচছে।

হঠাৎ একটা খুব রঙচঙে পোশাক পরা মেয়ে এসে ফ্রান্সিসের সামনে দাঁড়াল। ভুরুর ভঙ্গী করে বলল, 'নাচবেন আসুন।'

ফ্রান্সিস খোঁড়াতে খোঁড়াতে দু'পা পিছিয়ে গেল। মেয়েটি বলে উঠল— 'কী হয়েছে আপনার?'

ফ্রান্সিস মুখ-চোখ কুঁচকে বলল, ডান পাটা মচকে গেছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন।'

মেয়েটি দু'হাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গী করল, তারপর চলে গেল যেদিকে ফ্রান্সিসের অন্য সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে আড়াল খুঁজতে লাগল। একটাকে ঠেকানো গেছে। আবার কার পাল্লায় পড়তে হয়। ঘরের পেছনের দিকে দুটো বড় থাম। ফ্রান্সিস দ্রুত হেঁটে গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াল। অস্পষ্ট শিস দেওয়ার শব্দ শুনে পেছনে তাকাল। অন্য থামটার আড়ালে হ্যারি দাঁড়িয়ে হাসছে। ফ্রান্সিস একছুটে গিয়ে হ্যারির কাছে দাঁড়াল। বলল, 'খুব ভালো জায়গা বেছেছো। কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের।'

—'অত সহজে রেহাই পাবে না তুমি।' হ্যারি বলল।

—'তার মানে?'

—'মারিয়া তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করবে।'

—'দেখি, যতক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায়।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, 'এত আলো-বাজনা-নাচ-জমকালো পোশাকপরা মেয়ে-পুরুষ, এর চেয়ে জাজিম্বাদের নাচের আসর অনেক সুন্দর, উপভোগ করার।'

ওরা দু'জনে এসব নিয়ে কথাবার্তা বলছে, হঠাৎ রাজকুমারী মারিয়া এসে হাজির। হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক জানি আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন। নাচবেন চলুন।'

ফ্রান্সিস হতাশভঙ্গিতে হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি হাসি চাপতে মুখ ফেরাল। নাচের জায়গায় বেশ ভীড়। ওর মধ্যেই ফ্রান্সিস আর মারিয়া নাচতে লাগল। যখন নাচিয়েরা মারিয়ার সামনে পড়ে যাচ্ছে, তখনই মাথা নুইয়ে সম্মান জানাচ্ছে। নাচতে-নাচতে হঠাৎ সেই জমকালো পোশাকপরা মেয়েটি মুখোমুখি পড়ে গেল ফ্রান্সিসের। মেয়েটি অবাক-চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওর নাচের জুটিকে কানে-কানে কী বলতে লাগল। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে নাচ থামিয়ে হাত দিয়ে হাঁটুটা চেপে ধরল। মারিয়া বলে উঠল, —'কী হলো?'

ফ্রান্সিস চোখ-মুখ কুঁচকে বলল— 'সকালে হঠাৎ পা ফসকে মুচকে গেছে।'

—'ইস আগে বলেন নি কেন? এই পা নিয়ে কেউ নাচতে আসে?'

—'কী করবো, আপনি ডাকলেন।'

—'তাই বলে, যাক গে আপনি বন্ধুদের কাছে যান'।

ফ্রান্সিস খোঁড়াতে খোঁড়াতে নাচের আসর থেকে বেরিয়ে এল। আবার থামটার আড়ালে হ্যারির কাছে এসে দাঁড়াল। হ্যারি বেশ অবাকই হলো। বলল, 'এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেলে?'

ফ্রান্সিস হেসে নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বলল, 'মস্তিষ্ককে কাজে লাগাও। অনেক সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে।'

থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে গল্প করে কাটাল। এক সময় ফ্রান্সিস

বলে উঠল, 'কখন খেতে ডাকবে রে বাবা। এসব পোশাক-টোশাক পরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

একটু পরে ঢং করে ঘণ্টা বাজল। বাজনা থেমে গেল, নাচও বন্ধ হলো। সবাই পাশের ঘরে খাবার টেবিলের দিকে যেতে লাগল। আবার মৃদু বাজনা উঠলো। সবাই খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা ও রাণী এলেন, সঙ্গে রাজকুমারী। তাঁরা চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে সব নিমন্ত্রিতরা বসলেন। রাজকুমারীর পাশের চেয়ারটা তখনও খালি। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বসতে যাচ্ছে, হেড বাবুর্চি এসে ফ্রান্সিসকে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি রাজকুমারীর পাশে বসবেন।'

অগত্যা ফ্রান্সিসের আর হ্যারির পাশে বসা হলো না। ও রাজকুমারীকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে রাজকুমারীর পাশের চেয়ারটায় বসল।

বিরাট লম্বা টেবিলে কত খাবার সাজানো। যে যেমন খুশী তুলে নিয়ে খাও। বাবুর্চিরাও টেবিলের চারপাশে ঘুরছে। যে-যা চাইছে, সন্তর্পণে প্লেটে তুলে দিচ্ছে। খাওয়াদাওয়া খুব জোরে চলছে। রাজকুমারী খেতে-খেতে বলল, 'আপনার মুক্তোটা লকেট করে একটা হার গড়াতে দিয়েছি।'

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, 'মুক্তোটা আপনার পছন্দ হয়েছে'?

—'খুব'। রাজকুমারী বলল, 'এবার আপনার মুক্তোর সমুদ্রের গল্পটা বলুন'।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কী নিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে কথা বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ও জলদস্যু লা ক্রুশের হাতে ধরা পড়া থেকে গল্পটা শুরু করে দিল। মাঝে-মাঝে খেতে ভুলে যাচ্ছিল। তখন রাজকুমারী হেসে বলছিল, 'খেতে-খেতে বলুন।'

ফ্রান্সিস লজ্জিত মুখে খেতে শুরু করছিল তখন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো, কিন্তু ফ্রান্সিসের গল্প শেষ হলো না। নিমন্ত্রিতরা রাজা-রানী রাজকুমারীকে সম্মান জানিয়ে একে-একে বিদায় নিতে লাগল। বিভিন্ন রকমের ঘোড়ার গাড়ী তাঁদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও রাজা রানী ও রাজকুমারীকে সম্মান জানিয়ে বিদায় নিল। ওরা সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে, তখনই হ্যারি ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'রাজকুমারী তোমাকে লক্ষ্য করছে যেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। হ্যারি অবাক হয়ে বলল, 'কী হলো তোমার'?

—'কিছু না, চলো'। দু'জনে বাইরে চত্বরে এসে দাঁড়াল। বাবা আসতেই ফ্রান্সিস বলল —'বাবা হ্যারিদের গাড়িতে যাচ্ছি'।

—'বেশ, কিন্তু সোজা বাড়ি'। মন্ত্রীমশাই চ'লে গেলেন। ওরা দু'জনে গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল!

একটু পরে হ্যারি বলল, 'তোমার বাবা তোমাকে একা ছেড়ে দিল'?

—মা খুব অসুস্থ।

—ও জানতাম না তো।

—জানো হ্যারি মা'কে কথা দিয়ে ফেলেছি, মা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাবো না।

—তুমি শান্ত হয়ে বসে থাকবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।

—উপায় নেই, তাই।

গাড়ী চলল। রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে খাওয়া-দাওয়া, এসব নিয়ে কথা হ'ল। এক সময় ফ্রান্সিসদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। ফ্রান্সিস নেমে গেল। নামার সময় বলল, 'হ্যারি মাঝে-মাঝে এসো'।

হ্যারি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফ্রান্সিস সোজা মা'র ঘরে এসে হাজির হ'ল। মা ওর জন্যই জেগে ছিল। ঘুমোয় নি তখনও। ফ্রান্সিস মা'র বিছানায় বসল। মা'র একটা হাত ধ'রে বলল, 'মা এখন কেমন আছো'?

—'আমার কথা থাক্। তোদের নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া কেমন হ'ল বল্'।

ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে সে-সব কথা বলতে লাগল। রাজকুমারী মারিয়ার কথাও বলল। পা মচ্‌কানোর বাহানা তুলে নাচের আসর থেকে পালানো, সে-সব কথাও বলল। মা হেসে বলল, 'তোর মাথায় এত দুষ্টুবুদ্ধিও খেলে'।

এক সময় ফ্রান্সিস বলল, 'মা, কতকিছু নিয়ে এলাম, তুমি কিছুই দেখলে না'।

—'দাঁড়াও, তুমি ভালো হ'য়ে ওঠ। তোমাকে রাজার যাদুঘরে নিয়ে যাবো। সব দেখাবো তোমাকে'।

—'সে দেখা যাবে'খন। এবার যা, রাত হ'ল'।

ফ্রান্সিস নিজের ঘরে এল পোশাক-টোশাক ছেড়ে যখন শুয়ে পড়ল, তখন রাত হয়েছে। ও শুয়ে-শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল। মা সুস্থ হ'য়ে উঠলেই আবার বেরিয়ে পড়বো। এবার কোনদিকে দেখা যাক, মূল্যবান কিছুর খোঁজ পাওয়া যায় কিনা! একসময় এ-সব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

★ ★ ★

পরদিন জাহাজঘাটায় হাজার-হাজার লোকের ভীড় জমে গেল। সকলেই মুক্তো দেখতে চায়। মুক্তো-ভরা বাক্সটা নিয়ে মিছিল বেরোবে। ফ্রান্সিসের অনুরোধে বিস্কোই সমস্ত দায়িত্ব নিল। একটা কালো গাড়ি। নানা সোনালী-রূপালী কাজ করা তাতে। সেই গাড়িটার মাঝখানে একটা বেদীমত করা হয়েছে। গাঢ়নীল রঙের ভেলভেটের কাপড় মোড়া হ'য়েছে সেটা। তারই ওপর আটটা গর্ত মতো করা হ'য়েছে। আট'টা মুক্তো রাখা হয়েছে তাতে। বাকী মুক্তোগুলি রাখা হ'য়েছে বেদীর ভেতরে। বিস্কো রইলো সেই গাড়ীতে। সঙ্গে দু'-তিনজন বন্ধু। গাড়ির সামনে ও পেছনে ঝালর দেওয়া সবুজ পোষাক পরা সুসজ্জিত দুই দল অশ্বারোহী সৈন্য। জাহাজঘাটা থেকে মিছিল শুরু হ'ল। হাজার-হাজার লোক ফ্রান্সিস ও রাজার নামে জয়ধ্বনি দিল। মিছিল এগিয়ে চলল প্রধান রাজপথ দিয়ে। সবাই যাতে মুক্তোগুলো ভালভাবে দেখতে পায়, তার জন্যে বিস্কো আর তার বন্ধুরা মাঝে-মাঝে বেদী থেকে মুক্তো তুলে হাত উঁচু ক'রে দেখাতে লাগলো।

দর্শকরা তো বিস্ময়ে হতবাক। এত বড় মুক্তো! মিছিল চললো। সারা শহরের লোক যেন ভেঙ্গে পড়েছে রাস্তায়। শহরবাসীরা যেন মেতে উঠলো।

সারা শহর ঘুরে একসময় মিছিলটা শেষ হ'ল রাজপ্রাসাদের সামনের চত্বরে। মুক্তোসুদ্ধু বেদীটা আর বাকী সব মুক্তোগুলো রাখা হ'ল রাজার যাদুঘরে। এই যাদুঘরেই রাখা আছে 'সোনার ঘণ্টা' আর 'হীরের চাঁই' দু'টো। স্থির হ'ল, পরদিন থেকে যাদুঘর উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে জনসাধারণের জন্যে। রাজার ফরমাস অনুযায়ী দু'দিনব্যাপী সারা রাজ্যে আনন্দ উৎসব চলল।

দেশবাসী তাতে মেতে উঠল। চলল খাওয়া-দাওয়া হৈ-হল্লা।

ফ্রান্সিস আর বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোয় না। মন্ত্রীমশাইও ওর জন্যে পাহারাদার বসায় নি। একঘেয়ে দিন কাটতে লাগল ফ্রান্সিসের। মা মাসখানেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল। এখন হাঁটাচলা, সংসারের সব কাজকর্ম করে। ফ্রান্সিস আর তার বাবা দু'জনেই নিশ্চিন্ত হলেন। ফ্রান্সিস সময় কাটাবার জন্যে কী করবে ভেবে পায় না। কখনও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ছক্কা-পাঞ্জা ফেলে, নয়তো বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে। হ্যারি, বিস্কো আর অন্যান্য বন্ধুরা অনেকেই আসে। গল্প-গুজব হয়। তবু ফ্রান্সিসের একঘেঁয়েমি কাটতে চায় না।

কিছুদিন কাটলো। একদিন সকালে রাজার একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ফ্রান্সিসের বাড়ির সামনে। কোচ্ম্যান বাড়ির ভেতরে এল। সঙ্গে একটা চিঠি! ফ্রান্সিস বাইরের ঘরে এসে ওর কাছ থেকে চিঠিটা নিল। রাজা লিখেছেন—

'স্নেহের ফ্রান্সিস,

পত্রপাঠ আমার সঙ্গে দেখা কর। বিশেষ প্রয়োজন'।

আর কিছুই লেখেন নি রাজামশাই। ফ্রান্সিসও ভেবে পেল না, কী এমন প্রয়োজন পড়ল যে, রাজা একেবারে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস ভালো পোশাক-টোশাক পরে তৈরী হয়ে নিয়ে গাড়ি চেপে চলল রাজামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। রাজপ্রাসাদের সামনের চত্বরে এসে গাড়ি দাঁড়াতেই একজন প্রাসাদরক্ষী এগিয়ে এল। মাথা নুইয়ে ফ্রান্সিসকে সম্মান জানিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'মহানুভব রাজা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন'।

ফ্রান্সিস ওর পেছনে পেছনে চলল। সুসজ্জিত কয়েকটা ঘর পেরিয়ে রাজবাড়ির ভেতরে একটা পুকুরের ধারে এল। পুকুরটার চারধার শ্বেতপাথরে বাঁধানো। পরিষ্কার নীল জল তাতে। অনেক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রঙের কত রকমের মাছ। তারপরেই একটা বাগানমত। এলাকাটা রাজার নিজস্ব চিড়িয়াখানা। বাঘ, ময়ূর, সাপের খাঁচা পেরিয়ে দেখল, রাজামশাই একটা নতুন খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। খাঁচাটায় একটা মেরুদেশীয় শ্বেত ভল্লুকের বাচ্চা। রাজা ভালুকটাকে গমের দানা খাওয়াচ্ছেন, আর পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছেন।

ফ্রান্সিস রাজার সামনে গিয়ে অভিবাদন করে দাঁড়াল। রাজা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রেখে পাশের ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে ফ্রান্সিস, আমাদের ভাইকিং জাতির গর্ব।

ফ্রান্সিস এত উচ্চ প্রশংসায় বেশ বিব্রত বোধ করল। এবার পাশের ভদ্রলোককে দেখিয়ে রাজা বললেন, 'ইনি হচ্ছেন এনর সোক্কাসন। দক্ষিণ গ্রীনল্যাণ্ডের রাজা। একটা জরুরী ব্যাপারে উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান'।

ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানালো। ভালো করে দেখলো রাজা এনর সোক্কাসনকে। বিশাল দেহ রাজার, মুখে দাড়ি, গোঁফ! পরণে ছাইরঙের গরম কাপড়ের আলখাল্লার মত। গলায় সোনার মোটা চেন, হীরা-বসানো লকেট তা'তে। কোমরবন্ধনীটাও সোনার মোটা চেন-এর। মাথায় সীলমাছের চামড়ায় তৈরী টুপী। সোক্কাসন হাত দুটো ঘষে নিয়ে বললেন, 'চলুন কোথাও বসা যাক'—

পুকুরের ধারে শ্বেতপাথরের বেদী রয়েছে। ফ্রান্সিস একটা বেদী দেখিয়ে বলল, 'ওখানে বসা যেতে পারে'।

দু'জনে যখন যাচ্ছে ওদিকে, তখন ভাইকিংদের রাজা বললেন, 'ফ্রান্সিস এই মেরুভল্লুকটা রাজা সোক্কাসন আমাকে উপহার দিয়েছেন।'

ফ্রান্সিস সোক্কাসনকে জিজ্ঞেস করলো, 'মেরুভল্লুক কি মাংসাশী?'

সোক্কাসন বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানে তো ঘাস-গাছপালা বলে কিছু নেই। বরফের জলের মাছটাছ খায়'।

দু'জনে বেদীতে বসল। সোক্কাসন বললেন, 'এখানকার যাদুঘরে আপনার আনা সোনার ঘণ্টা, হীরে, মুক্তো দেখেছি! আপনার দুঃসাহসের প্রশংসা শুনেছি।'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না, সোক্কাসন বলতে লাগলেন, 'আসল কথায় আসি। আপনি নিশ্চয়ই এরিক দ্য রেডের নাম শুনেছেন'?

—'হ্যাঁ উনি তো গ্রীনল্যাণ্ডের প্রবাদপুরুষ। তাঁকে নিয়ে গল্প প্রচলিত আছে'।

—'আমরা তাঁরই বংশধর। এরিক দ্য রেডই ওখানে প্রথম য়ুরোপীয়দের বসতি স্থাপন করেন। তার আগে ওখানে ল্যাপ্ এস্কিমোরা বাস করত। উত্তরের দিকে আর এক উপজাতি বাস করতো এবং এখনও বাস করে। তাদের বলে ইউনিপেড। এরা অসভ্য-বর্বর-হিংস্র। এদের রাজার নাম এ্যাভাল্ডাসন'। সোক্কাসন একটু থামলেন, তারপর বলতে লাগলেন, 'এরিক দ্য রেড ওদিকে আলাস্কা, এদিকে আইসল্যাণ্ড, নরওয়ের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া কিছু পথ-হারানো জাহাজ, তার মধ্যে জলদস্যুদের জাহাজও তাঁর অধিকারে এসেছিল। এই ধনসম্পত্তি তিনি যে সবটাই সৎপথে উপার্জন করেছিলেন তা নয়। যা হোক, আমার দেশের রাজধানীর নাম 'বাট্টাহালিড'। সেখানে আমার প্রাসাদ আছে'। একটু থেমে হেসে বললেন, 'এখানকার প্রাসাদের মত নয় কিন্তু, খুবই সাধারণ! এরিক দ্য রেডের আমলে ওটা তৈরী হয়েছিল। তা ছাড়া বড় গীর্জা আছে একটা। এখন সমস্যা দাঁড়িয়েছে, এরিক দ্য রেডের খামখেয়ালীপনার জন্যে। উনি তাঁর উপার্জিত ধনভাণ্ডার যে কোথায় রেখে গেছেন, সেটা আজও রহস্যময়'!

—'উনি কি সেটা বলে যান নি'। —ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—'না। কারণ চিরশত্রু ইউনিপেডদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি হঠাৎ মারা যান! কাজেই স্ত্রী-পুত্র বা মন্ত্রী কাউকেই গুপ্ত-ধনভাণ্ডারের কথা বলে যেতে পারেন নি। এই নিয়ে আমার দেশে অনেক লোককাহিনী প্রচলিত আছে'।

—'আচ্ছা, উনি গীর্জা তৈরী করিয়েছিলেন'?

—'হ্যাঁ, এবং বেশ যত্নের সঙ্গেই সেটা তৈরী করিয়েছিলেন'।

—'তাহ'লে খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল'।

—'তা ছিল'।

—'তাঁর ব্যবহৃত কী-কী জিনিস আপনাদের কাছে আছে'?

—'অস্ত্রশস্ত্র, কিছু পোশাক আর নরওয়ের ভাষায় অনুদিত বাইবেল'।

—'উনি কি নিজেই অনুবাদ করেছিলেন?'

—'হ্যাঁ, আমাদের তাই বিশ্বাস'।

—'হুঁ'। ফ্রান্সিস একটু থেমে ভাবল। তারপর বলল, 'ঐ গুপ্তধন কোথায় আছে বলে আপনাদের ধারণা?'

—'রাজপ্রাসাদের গীর্জায় অথবা সুক্কারটপ পাহাড়ের নীচে কোথাও'।

—'আপনারা ভালোভাবে খুঁজে দেখেছেন'?

—'কয়েক পুরুষ ধরেই খোঁজাখুঁজি চলছে। কিন্তু কেউ কোন হদিস করতে পারে নি'।

—'এবার রাজা সোক্কাসন, বলুন আমাকে কী বলতে চান'?

সোক্কাসন একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। দাড়িতে হাত বুলোলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন, ভেবে দেখলাম আপনি শুধু দুঃসাহসীই নন, বুদ্ধিমানও। আপনিই পারবেন, এ গুপ্তধনের হদিস বার করতে। দেশের রাজা হিসেবে, আপনাকে আমাদের দেশে যাবার সাদর আহ্বান জানাচ্ছি'।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আপনার আমন্ত্রণে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। কিন্তু আমার মা এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। কাজেই এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না'।

—'ঠিক আছে, আপনি সময়-সুযোগমত যাবেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন'। সোক্কাসন বললেন।

—'ফ্রান্সিস সব শুনলে'? ভাইকিংদের রাজা এগিয়ে এলেন।

দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল, 'হ্যাঁ মহারাজ'!

—'কী? এরিক দ্য রেডের ধন-ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে পারবে'? রাজা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

—'বাট্টাহালিডে আগে যাই, সব দেখে-শুনে তবেই বলতে পারবো'।

রাজামশাই একটু আমতা-আমতা ক'রে বললেন, 'ইয়ে—দেখো—আমি তোমাকেই এই কাজের উপযুক্ত ব'লে মনে করি। তবে তোমাকে কিন্তু তোমার বাবা-মার সম্মতি নিয়ে যেতে হবে'।

—'বেশ'।

ফ্রান্সিস সোক্কাসনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কবে দেশে ফিরছেন'?

—'দু-তিনদিনের মধ্যেই'।

—'আচ্ছা, তাহ'লে চলি'। ফ্রান্সিস দু'জনকেই মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে রাজাপ্রাসাদের প্রধান ফটকের দিকে পা বাড়াল। রাজার গাড়ি ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে চড়ে ও বাড়ির দিকে এল। মাঝপথে এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের কথা ভাবতে-ভাবতে এল। ফ্রান্সিসের একঘেঁয়ে দিন কাটতে লাগল। বন্ধুরা আসে, গল্পগুজব হয়। ওরা চলে গেলে ফ্রান্সিস আবার একা। সময় পেলেই অবশ্য মা'র বিছানায়, মা'র পাশে এসে বসে। মা'কে তার আমদাদ নগর, চাঁদের দ্বীপ, আফ্রিকার বন-জঙ্গল এসব গল্প শোনায়। ছাড়া-ছাড়া ভাবে বলে, মা তাই শোনে। মা'র ভাবতেও অবাক লাগে, পৃথিবীতে এমন সব মানুষেরা আছে, এমন সব দেশ আছে। গল্প করার সময়ই ও একদিন বলল, 'মা, তুমি কি আর কোথাও যেতে দেবে না'?

—'না'। মা শান্তস্বরেই বলল, 'অনেক হয়েছে, এবার সংসার করো'।

ফ্রান্সিস বুঝল, মা'কে রাজী করানো খুব মুস্কিল হবে। ও মা'র কাছে রাজা সোক্কাসনের গল্প করলো, কিন্তু তিনি যে ওকে গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এসব কিছু বলল না।

কথায়-কথায় হ্যারিকে একদিন এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন, আর রাজা সোক্কাসনের

আমন্ত্রণের কথা বলল। হ্যারি সব শুনে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তুমি ওখানে গেলে, তোমাকে ওরা রাজার হালে রাখবে সন্দেহ নেই, কিন্তু পারবে কি গুপ্তধন খুঁজে বের করতে'?

—'সেটা বাট্রাহালিডে না গিয়ে তো বলতে পারছি না'।

—'তোমার বাবা-মা যেতে দেবেন'?

—'না দেন তো আবার জাহাজ চুরি করে ওদেশে যাবো'?

আস্তে-আস্তে বন্ধুরাও শুনল, রাজা সোক্কাসনের আমন্ত্রণ, এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের কথা। ওরা তো ফ্রান্সিসকে উত্যক্ত করলো, 'চলো আবার ভেসে পড়ি'।

ফ্রান্সিস হাসে আর বলে, 'হবে-হবে, সময় আসুক'।

★ ★ ★

মা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আবার সংসারের সব ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে। ফ্রান্সিস মা'র সঙ্গে বাগান দেখাশুনা করে। অনেক নতুন ফুলের চারা লাগিয়েছে। কয়েকটা ফলের গাছও লাগিয়েছে। বাগানটা যেন আবার শ্রী ফিরে পেয়েছে।

একদিন দুপুরে বাবা ফ্রান্সিসকে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। এ-সময়টা বাবা রাজবাড়িতেই থাকেন। আজকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন, 'বসো কথা আছে'।

ফ্রান্সিস আসনপাতা কাঠের চেয়ারটায় বসল।

একটু কেশে নিয়ে বাবা বললেন, 'রাজামশাই আমাকে সব কথা বলেছেন। বাট্রা-হ্যালিড থেকে রাজা সোক্কাসন চিঠি পাঠিয়েছেন। তুমি কবে নাগাদ যেতে পারবে, জানতে চেয়েছেন'।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

—'তোমার কী ইচ্ছে'?

—'বাবা তুমি তো জানো, গৃহবন্দী জীবন আমার অসহ্য'।

—'হুঁ'।

—'তোমরা অনুমতি দিলেই আমি যাবো। মা'র শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তা'ছাড়া গ্রীনল্যাণ্ড এমন কিছু দূরের দেশ না! যাচ্ছিও রাজার অতিথি হয়ে'।

কিছুক্ষণ চুপ করে দেখে বললেন, 'দেখি তোমার মা কী বলেন'?

ফ্রান্সিস আর মা'কে কিছু বলল না। কিন্তু বাবার কাছ থেকে মা সবকিছুই জানলো। সেদিন মার ঘরে ঢুকতেই মা বলল, 'হ্যাঁরে, তুই নাকি গ্রীনল্যাণ্ড যাবি ঠিক করেছিস'?

—'কী করবো বলো, ঘরে বসে থাকতে-থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি'।

—'তাই বলে আবার ঘরবাড়ি ছেড়ে, অজানা-অচেনা দেশে—না-না'!

—'বুঝছো না কেন—' ফ্রান্সিস মা'কে বোঝাতে লাগলো, 'রাজা সোক্কাসনের অতিথি হয়ে আমি যাচ্ছি। দেশটা এমন কিছু দূরেও না'।

—'তবু বিপদ-আপদের কথা কি কিছু বলা যায়'?

—'তাই যদি বলো মা, তা'হলে তো এক্ষুণি ভূমিকম্প হতে পারে, তখন কোথায় থাকবে তুমি, আর কোথায় থাকবো আমি'।

—'অমন অলুক্ষুণে কথা বলিস নে'। মা বলল।

—'ঠিক আছে, আজই চলো রাজার যাদুঘর দেখতে'।

—'কেন'।

—'কত দূর-দূর দেশ থেকে আমরা কী এনেছি তোমাকে দেখাবো'।

—'সে তো সব শুনেছি'।

—'শুধু শুনেছো, আজকে নিজের চোখে দেখবে, চলো'।

কিছুক্ষণের মধ্যে মা তৈরী হয়ে নিল। ফ্রান্সিসও তৈরী হয়ে মা'কে ডাকতে এলো। আজকে খুব খুশী। মা তো সোনার ঘণ্টা, হীরে, মুক্তো এসব দেখে নি। আজকে দেখবে।

ওদের গাড়ি চললো। অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়ে মা'র ভালোই লাগছিল। যাদুঘরের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। ফ্রান্সিস মা'কে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামালো। যাদুঘরের দরজায় দু'জন ভাইকিং সৈন্য খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছিলো। দু'জনেই ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালে।

প্রথম ঘরটাতে রাখা ছিল 'সোনার ঘণ্টা'টা। মা তো সোনার ঘণ্টা দেখে হতবাক। এত বড়ো ঘণ্টা, তাও নিরেট সোনায় তৈরী। মা বিশ্বাস করতে চাইল না। ফ্রান্সিস হেসে বলল, হাত দিয়ে দেখো'।

মা ঘণ্টাটার গায়ে হাত বুলোতে লাগলো। মা'র তখনও বিস্ময়ের ভাব কাটে নি। বলল, 'তোরা এটা এনেছিস'?

—'হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল, 'চলো মা পাশের ঘরে'।

পাশের ঘরে রাখা হয়েছে হীরের টুকরো দু'টো। আবার মা'র অবাক হবার পালা। এত বড়ো হীরে? মা'র সংশয় তবু যেতে চায় না। বলল, 'এই সবটাই হীরে'?

ফ্রান্সিস হাসলো, 'হ্যাঁ-মা'।

পরের ঘরটায় গেল ওরা। একটা উঁচু বেদীমত করা হয়েছে সেখানে। গাঢ় বেগুনী রঙের ভেলভেট কাপড়ে ঢাকা। তা'তে মুক্তোগুলো রাখা হয়েছে। এত বড়ো-বড়ো মুক্তো? মা'র মুখে আর কথা নেই। পাশেই রাখা হয়েছে লা ব্রুশের লুঠ করা মোহর অলঙ্কার ভর্তি বাক্স দু'টো। ফ্রান্সিস বলল, 'মা তোমাকে তো লা ব্রুশের গল্প বলেছি। এ-সব হচ্ছে ঐ কুখ্যাত খুনী জলদস্যুটার সম্পত্তি।'

মা অবাক হয়ে দেখতে লাগল। কত মোহর, কত অলঙ্কার। ফ্রান্সিস বলল, 'মা, তুমি এই থেকে একটা অলঙ্কার নেবে?'

—'না।' মা দৃঢ়স্বরে বলল, 'কত নিরীহ মানুষের রক্তে ভেজা এ-সব অলঙ্কার। এসব পরলে অমঙ্গল হয়।'

ফ্রান্সিস বুঝলো, মা'কে অলঙ্কার নিতে রাজী করানো যাবে না। মা আর একবার সব ঘুরে-ঘুরে দেখল। তারপর গাড়িতে এসে উঠলো। মা'র তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। গাড়ি চললো। ফ্রান্সিস একসময় হেসে বলল, 'এবার বিশ্বাস হলো তো?'

—'হুঁ'। মা আর কোনো কথা বলল না।

—'এবার বুঝলে তো, তোমার ছেলে কতটা সাহস আর বুদ্ধি রাখে!'

—'আমার বুঝে দরকার নেই। তুমি আমার চোখে চোখে থাক, তা'হলেই হবে।' ফ্রান্সিস একটু চুপ করে রইল, তারপর মৃদুস্বরে ডাকল, 'মা।'

—'বল।'

—'তাহ'লে এবার আমাকে গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে দেবে তো?'

—'আবার?'

—'রাজা সোক্কাসনের অতিথি হয়ে। ভয়ের কিছু নেই।'

—'কদ্দিনের মধ্যে ফিরবি?'

—'কদ্দিন আর?' ফ্রান্সিস মা'কে নিশ্চিতকরবার জন্যে বললো, 'মাস দু'য়েক। একটু থেমে বলল, 'মা তুমি রাজী হলেই বাবা আর আপত্তি করবেন না।'

—'দেখি তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে।' মা বলল। খুশীতে ফ্রান্সিস মা'কে জড়িয়ে ধরলো।

মা মৃদু হেসে বলল, 'ছাড়-ছাড় পাগল ছেলে।'

ক'দিন পরে রাজবাড়ি থেকে গাড়ি এলো। কোচম্যান ফ্রান্সিসকে রাজকুমারীর চিঠি দিলো। চিঠিতে শুধু লেখা—

'আপনার মুক্তো আনার গল্পটা শুনবো। অবশ্য আসবেন।

—মারিয়া।'

মা ফ্রান্সিসকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিল। সে রাজপরিবারের গাড়ি চড়ে রাজবাড়িতে চললো।

অন্দরমহলে একজন পরিচারিকা ওকে একটা ঘরে বসালো। কী সুন্দর সাজসজ্জা সেই ঘরে। দেয়ালে লাল-হলুদ পাথর বসানো। নানা রঙের মোজাইকের কাজ করা মেঝে। জানলায় রঙীন কাঁচ। তার মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো নানা রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘরটাতে। মারিয়া ঘরে ঢুকলো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়ালো, মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। একটা হালকা সবুজ রঙের গাউন পরেছে মারিয়া। মাথায় সোনালী চুল বিনুনী বাঁধা। কী সুন্দর যে লাগছে দেখতে। ফ্রান্সিস কথা বলবে কি, ও যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে ডুবে গেল।

—'খেয়ে নিন আগে।'

মারিয়ার কথায় ফ্রান্সিস যেন সম্বিত ফিরে পেল। দেখলো, একজন পরিচারিকা শ্বেতপাথরের গ্লাসে সরবৎ এনেছে, সঙ্গে একথোকা আঙ্গুর। ফ্রান্সিস সুগন্ধি সরবৎটা একচুমুকেই খেয়ে নিল। তারপর আঙ্গুর খেতে-খেতে মুক্তোর সমুদ্রের গল্প বলতে লাগলো। মারিয়া গালে হাত দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সেই গল্প শুনতে লাগলো। গল্প সবটা সেদিন শেষ হলো না। আর একদিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্রান্সিস সেদিন বাড়ি চলে এলো।

আবার একদিন মারিয়ার চিঠি নিয়ে রাজ পরিবারের সেই কালো চকচকে কাঠে সোনালী-রূপালী কাজ করা গাড়িটা এলো। সেদিনও সরবৎ, আপেল খাওয়ার পর ফ্রান্সিস মুক্তোর সমুদ্রের গল্পটা বলতে লাগল, 'জলের নীচে নেমে দেখি একটা নরম নীলচে আলো। মেঝের মতো তলায় কত মুক্তো ছড়ানো। সেই আলো আসছে ছড়ানো মুক্তোগুলো থেকে। সে এক অপার্থিব দৃশ্য। অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছি, হঠাৎ গা ঘেঁষে চলে গেলো কুৎসিত-মুখো একটা লাফ মাছ।'

ফ্রান্সিস গল্প বলছে, আর মারিয়া অবাক হয়ে শুনতে লাগলো সেই গল্প। একসময় গল্প শেষ হলো, মারিয়ার বিস্ময়তার ঘোর তখনও কাটে নি।

একটু চুপ করে থেকে মারিয়া বলল, 'আপনি এতো কাণ্ড করেছেন?'

ফ্রান্সিস সলজ্জ হাসলো। মারিয়া বলল, 'এবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

—'এবার বরফের দেশ গ্রীণল্যাণ্ডে যাবো।'

—'সব ঠিক হয়ে গেছে?'

—'উঁহু, বাবার সম্মতির অপেক্ষায় আছি।'

—'গ্রীণল্যাণ্ডে যাচ্ছেন কেন?'

—'এরিক দ্য রেডের নাম শুনেছেন তো?'

—'হ্যাঁ, উনি তো ওখানকার প্রবাদ-পুরুষ ছিলেন।'

—হ্যাঁ, তাঁরই গুপ্তধন উদ্ধার করতে।' ফ্রান্সিস বলল।

★ ★ ★

কয়েকদিন কেটে গেল। সেদিন ফ্রান্সিসের বাবা তাড়াতাড়ি রাজবাড়ি থেকে ফিরলেন। ফিরেই ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্রান্সিস বাবার ঘরে গেল। মন্ত্রীমশাই টেবিলে মুখ নীচু করে কিছু লিখছিলেন। ফ্রান্সিস ডাকল, 'বাবা!'

মন্ত্রীমশাই মুখ তুলে বললেন, 'তুমি কি রাজা সোক্কাসনের দেশে যেতে চাও?'

—হ্যাঁ, বাবা। এই অলস-নিষ্কর্মার জীবন আমার ভালো লাগে না।'

—'হুঁ। তোমার মা তোমার এই যাওয়ার ব্যাপারে, সমস্ত দায়িত্বটাই আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে।'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—'রাজামশাইও আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন সম্মতি দিই।' একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'সবদিক ভেবে আমি সম্মতি দিলাম।'

ফ্রান্সিস ভেবেই রেখেছিলো, বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু এভাবে এক কথায় বাবাকে রাজী হতে দেখে তার মন আনন্দে নেচে উঠলো। ইচ্ছে হলো, ছুটে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু বাবার সঙ্গে ও-রকম ব্যবহারে সে অভ্যস্ত নয়। হেসে বলল, 'মাকে বলে আসি?'

—'যাও। কিন্তু একটা কথা, আমি একমাস সময় দিলাম। এক মাসের মধ্যে তুমি চলে আসবে। তার মধ্যে গুপ্তধন উদ্ধার হোক বা না হোক'।

—'বেশ। তবে আমার একটা কথা ছিল।'

—'বলো।'

—'বাট্টাহালিড পৌঁছতেই প্রায় দিন পনেরো-কুড়ি লেগে যাবে। তারপর গুপ্তধন খোঁজা। এত-সব একমাসে হবে?'

—'বেশ আর পনেরো দিন।' মন্ত্রীমশাই বললেন।

—'ঠিক আছে, আমি ওর মধ্যেই ফিরে আসবো।'

—'আমাকে কথা দিচ্ছো কিন্তু।'

—'হ্যাঁ বাবা।' সে বলল।

★ ★ ★

দেখতে-দেখতে বাট্টাহালিডে যাওয়ার দিন এসে গেল। ফ্রান্সিস এর মধ্যে হ্যারি ও বিস্কো ছাড়া আরও দশজন বন্ধুকে বেছে নিল।

রাজামশাই সৈন্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আর লোক নিতে রাজী না।

সেদিন সকাল থেকেই জাহাজঘাটায় লোকজনের ভীড় হয়ে গেল। যে জাহাজে ফ্রান্সিসরা যাবে, সেই জাহাজটা একেবারে নূতন। কামানও বসানো আছে। রাজামশাই জাহাজটা নিজে দেখে বেছে দিয়েছেন।

একটু বেলা হতেই ফ্রান্সিসরা দল বেঁধে এলো। একটু পরে রাজা-রানী আর মারিয়া এলো। সঙ্গে মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্য আর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। জাহাজঘাটায় একটা সোনালী ঝালর দেওয়া সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিলো, নীচে বসবার আসন। রাজা-রানীর সঙ্গে আর সকলে সামিয়ানার নীচে বসলেন। ফ্রান্সিসরা একে-একে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলো। এবার আর রাতের অন্ধকারে জাহাজ চুরি করে পালানো নয়। দিনের বেলা স-সম্মানে সকলের উপস্থিতিতে জাহাজে চড়ে যাত্রা করা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে দু'বার কামান দাগা হলো। ঘর-ঘর শব্দে নোঙর তোলা হলো। পালগুলো তুলে দেওয়া হলো। আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্রও শান্ত। বাতাসের তোড়ে পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজঘাটা থেকে সকলেই জাহাজটার দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

রাজামশাই রাজা এনর সোক্কাসনকে লেখা একটা শীলমোহর করা চিঠি দিয়েছিলেন ফ্রান্সিসকে। বেশ যত্ন করে চিঠিটা রেখে দিল। ফ্রান্সিস বুদ্ধি করে সকলকে যত বেশী সম্ভব, গরম কাপড়-চোপড় আনতে বলে দিয়েছিল। গ্রীণল্যাণ্ডের ঠাণ্ডায় ওদের দেশীয় পোশাক চলবে না।

জাহাজ-যাত্রা শুরু হলো। জাহাজ চললো উত্তর-পশ্চিমমুখো। প্রথমে আইসল্যাণ্ডে যাবে। তারপর গ্রীণল্যাণ্ডে। দিন-রাত জাহাজ চলছে। ফ্রান্সিস আর তাঁর বন্ধুরা খুশীতেই আছে। ঝড়-ঝাপটার কবলে পড়েনি ওরা। বেশ নির্বিঘ্ন যাত্রা।

দিন-সাতেক যেতে না যেতেই চারপাশের আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা গেলো। সূর্যের আলোয় আর সেই তেজ নেই। বেশ ঠাণ্ডা। উত্তরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সকাল আর রাত্রে কুয়াশা পড়ে। তারই মধ্যে জাহাজ চলছে! যতদিন যাচ্ছে ঠাণ্ডাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সবাইকে বেশী-বেশী গরম পোশাক পরতে হচ্ছে, আর কান-ঢাকা টুপী।

হঠাৎ একদিন ওরা সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈল দেখতে পেলো। খুব বড়ো নয়, তবে ওপর থেকে বোঝবার উপায় নেই। কারণ হিমশৈলের বেশীর ভাগটাই থাকে জলের তলায়। যতো এগোচ্ছে জাহাজ, ততোই বিরাট আকারের সব হিমশৈলের সামনে পড়ছে। তাই সারাক্ষণ দু'তিনজন করে নজর রাখছে হিমশৈলের দিকে। কোনভাবে যদি জাহাজটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায় জাহাজ আর আস্ত থাকবে না। তাই দিনরাত সজাগ থাকতে হচ্ছে।

জাহাজ একদিন আইসল্যাণ্ডে পৌঁছল। বন্দরটার নাম রেকজাভিক, ছোট্ট বন্দর। তিনদিকে বিরাট-বিরাট বরফের খাঁড়া পাহাড়। তারই নীচে খাঁড়ির মধ্যে বন্দরটা। ফ্রান্সিসরা জাহাজ ভেড়ালো সেই বন্দরে। এখানে স্ক্রেলিং উপজাতির বাস। ওরা চামড়ার তৈরী তাঁবুতে থাকে। সীলমাছের চামড়ায় তৈরী কায়াক নৌকায় চড়ে এলো ওরা। এই কায়াক নৌকো উলটে গেলেও জলে ডুবে যায় না। পরণে চামড়া পোশাক, মাথার টুপীও চামড়ার। দলে-দলে ওরা নৌকা চড়ে এলো। ফ্রান্সিস প্রথমেই ওদের সঙ্গে শত্রুতা করল না। ওরা জাহাজে উঠতে চাইলে, উঠতে দিল। ঐ স্ক্রেলিংদের মধ্যে থেকে সর্দার গোছের একজন এগিয়ে এলো ফ্রান্সিসদের দিকে। ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বলল, রঙিন কাপড় আছে কিনা। ফ্রান্সিসদের কাছে লাল-নীল নানা রঙের কাপড় ছিল। সে-সব ওদের দেওয়া হলো, দেখা গেল ওরা খুব খুশী। সেই সব কাপড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মাথায়

বাঁধতে লাগলো। সর্দার কী যেন বলে উঠলো। কয়েকজন জাহাজ থেকে নেমে নৌকো থেকে নিয়ে এলো মেরুদেশের ভল্লুক আর বলগা হরিণের দামী দামী চামড়া। ফ্রান্সিসরাও ওসব পেয়ে খুব খুশী। স্ক্রেলিংরা দল বেঁধে হৈ-হৈ করতে-করতে মাথায় ছিট-কাপড়ের ফেট্টি বেঁধে নৌকায় চড়ে চলে গেলো। কোনো ঝামেলা না হতে দেখে ফ্রান্সিসরা খুশী হলো। সেই রাতটা ওরা রেকজাভিক বন্দরেই রইলো।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হলো। আইসল্যাণ্ডের তীরভূমির কাছ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। তখনই দেখলো সীলমাছ আর সিন্ধুঘোটকের দল। ওগুলো কখনো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আবার উঠছে বরফের তীরে। এইভাবে ওগুলো ছোট-ছোট মাছ ধরে খাচ্ছে। আবার এক দঙ্গল সিন্ধুঘোটককে দেখলো চুপচাপ শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। গোঁফদাড়ি আর বড়-বড় দু'টো দাঁতওলা সিন্ধুঘোটকগুলো এমনিতে শান্ত। বরফগলা হিমজলে ওদের কোনো অস্বস্তিই নেই।

একদিন পরেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ আইসল্যাণ্ডের আর একটা বন্দর হোলটা-ভানসসের কাছাকাছি এলো। উঁচু-উঁচু পাহাড়ের মত বরফের চাঁই, তারই নীচে বন্দর। ওদের ইচ্ছে ছিল বন্দরে জাহাজ ভেড়ানোর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারল না। তখন বিকেল, এমনিতেই এসব অঞ্চলে সূর্যালোক বেশীক্ষণ থাকে না। তাছাড়া কুয়াশা তো রয়েইছে। সেই আবছা-অন্ধকারে ফ্রান্সিসরা দেখলো, ল্যাপজাতীয় আদিবাসীরা অনেকগুলো কায়াক নৌকোয় চড়ে, ওদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে আসছে। ল্যাপদের হাতে কুঠার আর তীরধনুক। হঠাৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে তীর এসে ওদের জাহাজে পড়তে লাগলো, দু'চার জন আহতও হলো। বোঝাই যাচ্ছে, ল্যাপরা বন্ধুত্ব করতে আসছে না। ওদের উদ্দেশ্য জাহাজ লুঠ করা। ল্যাপরা মাঝে-মাঝে চীৎকার করে উঠছে, শূন্যে ধারালো কুঠার তুলে আস্ফালন করছে।

ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল, 'এই বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো হবে না।' জাহাজের মুখ ঘোরানো হলো। কিন্তু ল্যাপরা সেই মাঝে-মাঝে চীৎকার করে উঠছে, আর জাহাজের পিছু ছাড়ছে না দেখে ফ্রান্সিস তখন হুকুম দিল, 'গোলা-ছোঁড়ো।'

গোলন্দাজরা কামানের কাছে জড়ো হলো। ফ্রান্সিস তরোয়াল তুলে ইঙ্গিত করতেই গোলা ছুটলো ল্যাপদের নৌকো লক্ষ্য করে। কয়েকটা নৌকো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আবার গোলা ছুটলো, আবার কয়েকটা নৌকো-সুদ্ধু ল্যাপরা জলে পড়ে গেলো। ওদের মধ্যে থেকে আহতদের আর্তনাদ শোনা গেলো। আর তীর ছুঁড়লো না ওরা, নৌকোগুলো বন্দরের দিকে ফিরে যেতে লাগলো। জাহাজের মুখ ঘোরানো হলো গ্রীণল্যাণ্ডের দিকে। জলে ভাসমান বরফের স্তর এড়িয়ে জাহাজ নিয়ে যেতে হলো। কাজেই জাহাজের গতি ছিল ধীর। প্রায় তিনদিন লেগে গেলো গ্রীণল্যাণ্ডে আসতে। কয়েকদিন পরেই জাহাজ ভিড়লো দক্ষিণ গ্রীণল্যাণ্ডের বন্দরে।

এই বন্দর সমতল জমির ওপর কোনদিকে উঁচু পাহাড়ের মত, বরফের চাঁই নেই। এই বন্দরটা একটু বড়ো। বন্দরের ধারে-ধারে এস্কিমোদের চামড়ার তাঁবুর বসতি। এই প্রথম ফ্রান্সিসরা এস্কিমোদের দেখলো। বন্দরে আরো দু'তিনটি জাহাজ ছিল। ওরা জাহাজ থেকে দল বেঁধে নেমে এলো। কিন্তু ঠাণ্ডায় যেন সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। তবু অনেকদিন পরে মাটিতে পা দেওয়া, তার আনন্দই আলাদা। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। কুয়াশা কেটে গিয়ে কিছুটা উজ্জ্বল রোদ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। বরফে পড়ে

সেই রোদ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এস্কিমোদের চামড়ার তাঁবুর কাছাকাছি আসতে এস্কিমোরা বেরিয়ে আসতে লাগলো। খুঁটির ওপর দড়ি বেঁধে ওরা ওদের বলগা হরিণের চামড়ায় তৈরী লোমওলা পোশাকগুলো রোদে শুকোতে দিয়েছে। ফ্রান্সিসরা কাছাকাছি আসতে, কয়েকজন এস্কিমো একটা বড়ো তাঁবুর কাছে গিয়ে কাকে ডাকতে লাগলো। একজন মোটাগোছের লোক সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। তার পোশাক অন্যান্য এস্কিমোদের তুলনায় একটু বেশী পরিচ্ছন্ন। তার মুখে কালো চোঙের মতো কী একটা। তামাক খাচ্ছে বোধহয়, মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বোঝা গেল, এই লোকটাই এস্কিমোদের সর্দার। সর্দার ফ্রান্সিসদের দেখলো, তারপর তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো। একটু পরেই হাতে কী নিয়ে বেরিয়ে এলো। সেটা একটা ছুরি আর ছুঁচ। ফ্রান্সিসই সবার আগে ছিল। এস্কিমোদের সর্দার ছুরি আর ছুঁচটা ওর হাতে দিয়ে এস্কিমোদের ভাষায় বলল, 'কুয়অনকা।' কথাটার অর্থ 'তোমাকে ধন্যবাদ'।

ফ্রান্সিস সেটা না বুঝলেও এটা বুঝলো যে, এস্কিমো সর্দার ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বই করতে চায়। ফ্রান্সিস বিস্কোকে ডেকে বললো, 'বিস্কো জাহাজে যাও, রঙীন কাপড় যা আছে নিয়ে এসো।'

বিস্কো চলে গেলো। ফ্রান্সিস নরওয়ের ভাষায় বলল, 'আমরা বাট্টাহালিডে যাবো। রাজা এনর সোক্কাসন আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা তো এই দেশে এসেছি একজন পথ-প্রদর্শক পেলে খুবই ভালো হয়।'

এস্কিমো-সর্দার এবার ডানহাতের তর্জনী নিজের বুকে ঠেকালো। তারপর বলল, 'কালুটুলা'।

ফ্রান্সিস বুঝলো, ওর নাম কালুটুলা। তারপর ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বলল, 'তোমরা আমাদের বন্ধু হলে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবো।'

এর মধ্যে বিস্কো রঙীন কাপড় নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস সে-সব কালুটুলার হাতে দিল। কালুটুলা খুব খুশী দেখে অন্যান্য এস্কিমোরাও খুশী হলো। বারবার বলতে লাগলো 'কুয়অনকা।'

তারপর বলল, 'এখানকার ঠাণ্ডায় তোমাদের এ পোশাক চলবে না। কয়েকদিন অপেক্ষা করো। তোমাদের চামড়ায় পোশাক তৈরী করে দেবো।'

ফ্রান্সিস বলল, 'আপাততঃ আমাদের দু'টো পোশাক তৈরী করে দিলেই হবে।'

কালুটুলা মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল, ও তাই করবে, বাট্টাহালিডে যেতে হলে কীভাবে যেতে হবে, ওদিকে আবহাওয়া কেমন, এসব নিয়ে কিছু কথাবার্তা হলো। তারপর ফ্রান্সিসরা চলে এলো। এস্কিমোরা মেয়ে-পুরুষ সকলেই হাত নেড়ে ফ্রান্সিসদের বিদায় জানালো। গ্রীণল্যাণ্ডে এসে এস্কিমোদের কাছে এই সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে ফ্রান্সিস খুশীই হলো।

★ ★ ★

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেমে এলো জাহাজ থেকে। কালুটুলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলো। জানতে চাইলো পথ-প্রদর্শক পাওয়া গেছে কিনা? কালুটুলা কাকে যেন ডাকতে পাঠালো। একটু পরেই একজন বেশ বলশালী যুবক তাঁবুতে এলো। পরণে এস্কিমোদের মাথা কান-ঢাকা লোমের পোশাক।

কালুটুলা বলল—'এর নাম সাঙখু, ভাল্লুক শিকারে ওস্তাদ।'

সাঙখু দাঁত বের ক'রে হাসল। সে অল্প-অল্প নরওয়ের ভাষা বলতে পারে। বলল- 'আপনারা কবে যাবেন?'

—'দু' তিনদিনের মধ্যেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতে হবে।'

—'ঠিক আছে।' কালুটুলা বলল— 'আজ রাত্রে আমাদের এখানে নাচের আসর বসবে। আপনারা আসবেন।'

সেই রাতে আকাশটা অনেক পরিষ্কার ছিল। কিছু তারাও আকাশে দেখা যাচ্ছিল। চাঁদও। অল্প চাঁদের আলো পড়েছে বরফঢাকা বন্দর এলাকায়। ফ্রান্সিসরা দল বেঁধে চলল এস্কিমোদের তাঁবুগুলোর উদ্দেশ্যে। দূর থেকেই শুনতে পেল কুকুরদের ডাক। প্রত্যেক এস্কিমো পরিবারই কুকুর পোষে। কুকুর ওদের নানা কাজে লাগে। কুকুর ওদের শ্লেজগাড়ি চালায়, হারপুন দিয়ে শিকার করা, সীল অথবা সিন্ধুঘোটক কুকুরই কামড়ে ধরে নিয়ে আসে। কুকুরগুলোর গায়ে খুব ঘন লোম। তাঁবুর বাইরেই কুকুরগুলো থাকে। তুষার পড়লে, তুষারে একেবার ঢাকা পড়ে যায়। কী ক'রে তারই মধ্যে ফুটো করে শ্বাস নেয়, ঘুমোয়। ডাকলেই তুষার ঝেড়ে ফেলে উঠে বসে।

ওরা এস্কিমোদের বসতিতে পৌঁছে দেখল—একটা জায়গা ঘিরে সীলমাছের তেলে চুবোনো মশাল জ্বলছে। সেই আলোগুলোর মাঝখানে নাচের জায়গা। দু'জন এস্কিমো দু'টো ড্রাম নিয়ে এলো। সাঙখু আর ওর সঙ্গীরা নাচের জায়গায় দাঁড়াল। ড্রাম বাজনা শুরু হলো। সাঙখু আর ওরা নানান অঙ্গভঙ্গী ক'রে তালে-তালে নাচতে লাগল। সেই তালে-তালে একজন এস্কিমো বিচিত্র সুরে গান গাইলো। আবার কয়েকজন মুখ দিয়ে শব্দও করতে লাগল।

রাত বাড়তে লাগল। গুড়ি-গুড়ি মিহি তুষারকণার বৃষ্টি শুরু হলো। চাঁদ তারা ঢাকা পড়ে গেল। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিকে। ফ্রান্সিসরা আর বসলো না। ওরা জাহাজে ফিরে এলো।

পরদিন থেকে ফ্রান্সিস আর বসে-বসে সময় কাটাল না। সাঙখুর সঙ্গে এর মধ্যেই ওর বেশ ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। ও সাঙখুর কাছে শ্লেজগাড়ি চালানো শিখতে চাইল। সাঙখু খুশীই হলো এই প্রস্তাবে। ও ফ্রান্সিসকে নিয়ে একটা শ্লেজগাড়ির কাছে এলো। শিস্ দিয়ে কুকুরগুলোকে ডাকল। দু'পাশে ছ'টা-ছ'টা করে বারোটা কুকুরকে পর পর লম্বা লাগামের সঙ্গে জুড়লো। দু'জনে উঠে বসলো শ্লেজগাড়িটায়। শ্লেজগাড়ির কোন চাকা থাকে না। সব মিলিয়ে গাড়িগুলো লম্বায় প্রায় তের ফুট হয়। চওড়ায় চার ফুট। সাঙখু শিস্ দিয়ে চাবুক চালাল। কুকুরগুলো গাড়ি টেনে নিয়ে ছুটলো বরফের ওপর দিয়ে। ফ্রান্সিস অনুমানে বুঝল, গাড়ির গতি নেহাৎ কম নয়। বল্গা হরিণ টানলে এর চেয়ে অনেক বেশী গতি হয়। মাঝে-মাঝেই চাবুক চালাচ্ছে। বরফ ভাঙ্গার একটা ছড়-ছড় শব্দ উঠছে শুধু।

গাড়ি চালাতে-চালাতে সাঙখু বলল—'এই চাবুকই হলো আসল। শুধু একটা কুকুরকে চাবুক মারলে হবে না। সব ক'টা কুকুরকেই একসঙ্গে চাবুক মারতে হবে। আবার চাবুকের শব্দও করতে হবে। চাবুকের চামড়াটা ফিরিয়ে আনতে হবে সাবধানে। অসাবধান হলে লম্বা লাগামে চাবুকের চামড়াটা জড়িয়ে যায়। তখন চালক ছিট্‌কে বরফের মধ্যে পড়ে যায়।'

ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনল। সাঙখু এবার চালকের জায়গাটা

ফ্রান্সিসকে ছেড়ে দিলো। ফ্রান্সিস লাগাম ধরে খুব সাবধানে চাবুক চালাতে লাগলো। কুকুরগুলোর মাথার ওপর চাবুকের শব্দও করতে লাগলো। অত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও ওর চাবুকের চামড়াটা লম্বা লাগামের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো। ও প্রায় ছিট্‌কে পড়ে যাচ্ছিল। সাঙখু মুহূর্তে লাগাম শক্ত হাতে টেনে ধরে গাড়ি থামালো। চাবুকের চামড়াটার জট খুলে আবার গাড়ি ছোটালো সাঙখু। আবার ফ্রান্সিস চালকের জায়গায় বসলো। লাগাম ধরে গাড়ি চালিয়ে ওরা ফিরে এলো।

কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিস শ্লেজগাড়ি চালানো শিখে নিলো। ও এবার হ্যারিকে শ্লেজগাড়ি চালানো শেখাতে লাগলো। কিন্তু হ্যারির দুই-তিন দিন চেষ্টা করেও সুবিধে হলো না। ও হাল ছেড়ে দিলো।

এবার ফ্রান্সিস সাঙখুর কাছে শিখতে লাগলো, এস্কিমো আর ল্যাপদের যুদ্ধরীতি। ওরা অস্ত্র হিসাবে তীরধনুক, বর্শা আর চওড়া ফলাওলা কুঠার ব্যবহার করে। তীরধনুক, বর্শা তার কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু কুঠার চালানোটা নতুন। সাঙখু ঐ অঞ্চলের নামকরা ভালুক শিকারী। সে ফ্রান্সিসকে কুঠার চালানো শেখাতে লাগলো। কুঠার তরোয়ালের মত হাল্কা নয়, বেশ ভারী। কুঠার ঘোরাতে, আঘাত করতে বেশ দমের দরকার। প্রথম-প্রথম ফ্রান্সিস অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। পরে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেলো। খুব দ্রুত স্থান পরিবর্তন ও কুঠারের আঘাত হানা এসব শিখে গেলো।

এর মধ্যে এস্কিমো-সর্দার কালুটুলা ফ্রান্সিসদের জন্যে দু'টো এস্কিমোদের পোষাক তৈরী করিয়ে দিলো। সিন্ধুঘোটকের চামড়ায় তৈরী সেই মাথা-ঢাকা পোশাক। মুখের দিকে চারপাশে আর পোশাকের হাঁটুর কাছে বল্গা হরিণের লোম দিয়ে কাজ করা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পোশাক পরলো, কিন্তু ভীষণ শক্ত-শক্ত লাগলো। তখন কালুটুলা পোষাক দু'টোয় ভালো করে সীলমাছের তেল মাখাতে বললো।

তেল মাখাতে পোশাক দু'টো অনেক নরম হলো।

এবার যাত্রা শুরু করতে হবে। ফ্রান্সিসের বাবা দেড় মাসের মেয়াদ দিয়েছেন। এর মধ্যেই সব সেরে ফিরতে হবে। এসব জায়গায় আকাশে সূর্য বেশীক্ষণ থাকে না। তাই সব সময়ই একটা আবছা আলো থাকে। সূর্য অস্ত গেলেই একেবারে নিকষ অন্ধকার। কাজেই দিন থাকতেই পথ চলতে হবে।

একদিন সকাল থেকে যাত্রার উদ্যোগ চললো। যা-যা দরকার পড়তে পারে, সে সবই তোলা হলো শ্লেজ গাড়িটায়—শুকনো সীলমাছ, সিন্ধুঘোটকের মাংস, কাঠ, চকমকি পাথর, সীল মাছের তেল-মাখানো মশাল, কুঠার, বর্শা, তীরধনুক, তরোয়াল, তাঁবু। দু'টো শ্লেজগাড়িতে কুকুরগুলো জুড়ে দেওয়া হলো। একটা শ্লেজগাড়িতে সাঙখু আর হ্যারি থাকবে। অন্যটায় ফ্রান্সিস একা।

জাহাজ থেকে নেমে ফ্রান্সিস আর হ্যারি গাড়ি দু'টোর কাছে এলো। সব দেখে শুনে নিলো। এবার যাত্রা। সাঙখু, হ্যারি ফ্রান্সিস সবাই গাড়িতে উঠে বসলো। এস্কিমো সর্দার কালুটুলা আর কিছু এস্কিমো এসে দাঁড়ালো। তখন সকাল, সূর্যের ম্লান আলো পড়েছে দিগন্তব্যাপী বরফ-ঢাকা প্রান্তরে। ফ্রান্সিসদের বন্ধুরা জাহাজ থেকে হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানালো। গাড়ি দু'টো ছুটলো তুষার প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। শ্লেজগাড়ির চাপে বরফ ভাঙার খস্‌খস্‌ শব্দ শুধু। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। প্রথমে ওরা যাবে কোর্টল্ডে। সেখানে কিছু এস্কিমোদের বসতি আছে। সেখান থেকে রাজধানী বাট্টাহালিডে।

গাড়ি দু'টো চললো। চারদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। দুপুর নাগাদ একটা জায়গায় থামলো ওরা। খাবার খেলো, বিশ্রাম করলো, তারপর আবার যাত্রা করলো।

সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার নেমে এলো। তার মধ্যে দিয়েই গাড়ি দু'টো ছুটলো। রাত্রে আর এক জায়গায় বিশ্রাম নিলো। চকমকি ঠুকে মশাল জ্বালিয়ে কাঠ দিয়ে উনুন জ্বালাল। শুকনো মাংস রান্না করে খেলো। তারপর সেই তুষার প্রান্তরে তাঁবু খাটালো। রাতটা কাটালো তাঁবুতে। বাইরের উনুনের আগুন নেভালো না, সারারাত জ্বললো ওটা। আগুনে ওরা হাত-পা সেঁকে নিলো। সাঙখু বললো, 'আগুন থাকলে শ্বেতভল্লুক, হিংস্র নেকড়ে এসব ধারে-কাছে ঘেঁষবে না।'

পরদিন তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। আবহাওয়া বেশ ভালই থাকলো, তিনদিন নির্বিঘ্নেই কাটলো। কিন্তু তার পরদিনই আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা গেল। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেলো, হু-হু উত্তুরে হাওয়া ছুটলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুষার-ঝড়ের তাণ্ডব। তবে ঝড় বেশীক্ষণ রইলো না, পরেই তুষার-ঝড় বন্ধ হলো। ওরা তাঁবু খাটিয়ে রাতের মতো বিশ্রাম নিলো।

পরদিন তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। তখন দুপুরের কাছাকাছি সময়। একটা বরফের টিলামত পড়ল। সেটা ঘুরতেই একটা শ্বেত-ভালুকের মুখোমুখি পড়ে গেল ওরা। কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে লাগল। শ্বেত-ভালুকটা সামনের দু'পা তুলে আক্রমণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সিসের গাড়িটাই সামনে ছিল। সে গাড়ির গায়ে বেঁধে-রাখা কুঠারটা নিয়ে এক লাফে নেমে দাঁড়ালো বরফের ওপর। টিলাটার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো, যাতে আক্রান্ত হলে পিছিয়ে আসতে পারে। সাঙখুও কুঠার হাতে নেমে এলো। কুকুরগুলো সমানে ডেকে চলেছে।

বিরাট চেহারার ভালুকটা দু'পা তুলে গলায় গর্-গর্ শব্দ করতে-করতে দুলে দুলে ছুটে আসতে লাগলো! হাতের ধারালো নখগুলো বেরিয়ে আছে। মুখ হাঁ করা চক্চকে ধারালো দাঁত বেরিয়ে আছে। সাঙখু লাগামের দড়ি থেকে কুকুরগুলোকে খুলে দিতে লাগলো। ছাড়া পেতেই কুকুরগুলো একে-একে ভালুকটার চারপাশে জড়ো হতে লাগলো আর প্রাণপণে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগলো। আর একপাশ থেকে ফ্রান্সিসও এগিয়ে আসতে লাগলো। সাঙখু কুঠারটা এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগলো, আর ঘা-মারবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

এক সময় ভালুকটা সাঙখুর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্রান্সিস ভালুকটার পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর বিদ্যুৎগতিতে কুঠারের কোপ বসালো ভালুকটার পিঠে। ভালুকটা ঘা খেয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে। সাঙখুর হাতে প্রচণ্ড থাবা মারল। সাঙখুর হাত থেকে কুঠার ছিটকে পড়ে গেল, ও বরফের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ওদিকে ভালুকের পিঠ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। আহত পশুটা ভয়ংকর হয়ে উঠলো। গোঁ-গোঁ শব্দ করতে-করতে ওটা সাঙখুর দিকে ছুটলো।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল, 'সাঙখু, এই নাও।' বলে ও কুঠারটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল। সে শোয়া অবস্থাতেই কুঠারটা বরফ থেকে তুলে নিল! তারপর এক ঝট্কায় উঠে দাঁড়ালো। তখন ভালুকটার সঙ্গে ওর দূরত্ব দু'হাতও নয়। ভালুকটা থাবা মারার জন্য সামনের থাবাটা বাড়ালো। সে আর এক মুহূর্তও দেরী করল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে

প্রচণ্ড জোর কুঠার চালালো ভালুকটার মাথা লক্ষ্য করে। দু'চোখের ওপরে কপালে লাগলো ঘা'টা, মাথাটা দু'ফাঁক হয়ে গেল। প্রচণ্ড গর্জন করে ভালুকটা বরফের ওপর ধপাস্ করে পড়ে গেল। বার কয়েক নড়ে স্থির হয়ে গেল। বরফের ওপর রক্তের ধারা বইলো। সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বরফের ওপর বসে পড়লো।

ফ্রান্সিস ছুটে এলো, দেখলো সাঙখুর ডান হাত থেকে রক্ত পড়ছে। ভালুকটার থাবার নখের আঁচড় লেগেছে। ফ্রান্সিস কাটা জায়গাগুলোতে বরফ ঘষতে লাগলো। একটু পরেই রক্ত পড়া বন্ধ হলো। সে এবার উঠে কোমরে ঝোলানো ছুরিটা বের করলো। তারপর মৃত ভালুকটার কাছে গেলো। নিপুণ হাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে স্লেজগাড়িতে রাখলো। ফ্রান্সিসও গাড়িতে উঠলো, কুকুরগুলোকে আবার লাগামের সঙ্গে বাঁধা হলো।

আবহাওয়া বেশ ভালই চললো ক'দিন। তিনদিন নির্বিঘ্নেই কাটলো। কিন্তু তার পরদিনই আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা গেল। হঠাৎ সব আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেল। হু-হু করে উত্তুরে হাওয়া গর্জন করে ছুটলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুষার-ঝড়ের তাণ্ডব। সে-কী হাওয়ার প্রচণ্ডতা, যেন স্লেজগাড়িটা উল্টে ফেলবে। সেইসঙ্গে ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বরফকুচির প্রচণ্ড ঝাপটা।

দু'চোখ কুঁচকে দৃষ্টি রেখে, ফ্রান্সিস গাড়ি চালাতে লাগলো। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের বেগের মধ্যে গাড়ি চলতে লাগলো শামুকের গতিতে। ফ্রান্সিস কয়েক হাত দূরেও দেখতে পাচ্ছিল না। ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা, সেইসঙ্গে বরফকুচির ঝাপটা। হঠাৎ একসময় পাশে তাকালো। আবছা অন্ধকারে হ্যারিদের গাড়িটা দেখতে পেল না। ভাবলো ঝড়টা থামুক, তখন খোঁজ করা যাবে।

প্রায় আধঘণ্টা ঝড়ের এই তাণ্ডব চললো। তারপর আস্তে-আস্তে ঝড়ের গর্জন বন্ধ হলো। বরফকুচির ঝাপটা থেমে গেলো। আস্তে-আস্তে চারদিকে ঘন কুয়াশার আবরণ পাতলা হ'তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো ফুটলো। দিগন্তের দিকে অনুজ্জ্বল সূর্যটাকে দেখা গেলো। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগলো। কিন্তু হ্যারিদের গাড়ি কোনদিকে দেখতে পেল না। যতদূর চোখ যায়, শুধু বরফের শুভ্র প্রান্তর। হ্যারিদের গাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। ফ্রান্সিসের একটু দুশ্চিন্তা হলো। একেবারে একা পড়ে গেলো অপরিচিত জায়গায়। সঙ্গে সাঙখু নেই। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কে? তবু একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলো, যে হ্যারি সাঙখুর সঙ্গে আছে। ফ্রান্সিস সূর্যের দিকে তাকালো। উত্তর দিকটা ঠিক ক'রে নিলো। তারপর গাড়ির মুখ একটু ঘুরিয়ে সোজা উত্তর দিকে লক্ষ্য করে গাড়ি চালাতে লাগলো। কোর্টল্ড সোজা উত্তর দিকে।

সূর্য অস্ত যেতেই চারদিক অন্ধকার হ'য়ে গেলো। ফ্রান্সিস মাথার ওপর অস্পষ্ট ধ্রুবতারার দিকে দেখলো। ঠিক উত্তরে যাচ্ছে ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিকের অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে উঠলো। ফ্রান্সিস মাথার ওপর অস্পষ্ট ধ্রুবতারার দিকে দেখলো। ফ্রান্সিস রাত্রির মত বিশ্রামের জায়গা খুঁজে নিল। তাঁবু খাটাল। মশাল জ্বেলে আগুন জ্বালাল। সিন্ধুঘোটকের শুকনো মাংস রাঁধলো। কুকুরগুলোকে খেতে দিলো। তারপর নিজে খেয়ে শুয়ে পড়লো। চারদিকে অসীম নিঃশব্দ। একটু পরেই চাঁদ উঠলো। একটা নরম মৃদু আলো ছড়ানো চারদিকে। ফ্রান্সিসের অনেক চিন্তা এখন। গাড়িতে খুব বেশিদিনের রসদ নেই। রসদ ফুরোবার আগেই হ্যারিদের গাড়ির খোঁজ পেতে হবে, নয়তো কোর্টল্ড

পৌঁছতে হবে। এ-সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

*　　　*　　　*

ভোরবেলা উঠে তাঁবু গুটিয়ে নিলো। কুকুরগুলোকে লম্বা লাগামে বাঁধলো। তারপর গাড়ি ছোটালো। দিগন্তের ওপরে সূর্যকে লক্ষ্য রেখে দিক ঠিক ক'রে নিলো!

এইভাবে তিনদিন কেটে গেল। কিন্তু হ্যারিদের গাড়ির হদিশ পাওয়া গেল না। কোর্টল্ড পৌঁছানো হল না। ফ্রান্সিস এবার মজুত খাদ্য দেখতে গিয়ে দেখল, আর একদিনের মত খাদ্য আছে। খুব দুশ্চিন্তায় প'ড়ে গেল ফ্রান্সিস। সমুদ্রতীরে পৌঁছতে পারলে সীলমাছ, সিন্ধুঘোটক শিকার ক'রে দিন কাটানো যেত। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বরফের প্রান্তরে খাদ্য জুটবে কোত্থেকে?

সেদিনটা ও উপোস ক'রে রইলো। কিন্তু কুকুরগুলোকে খেতে দিলো। গাড়ি চালু রাখতেই হবে। এখন এই গাড়িই একমাত্র ভরসা।

দু'দিন কাটলো। খাদ্য শেষ। ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো কত জোরে আর গাড়ি টানবে? গাড়ির গতিও কমে গেলো। দু'দিনের উপবাসী ফ্রান্সিস কোনরকমে লাগাম ধ'রে নিয়ে বসে রইল। গাড়ি চললো ঢিমেতালে।

সেদিন একটা বরফের চাঙরার পাশটা ঘুরতেই চোখের পলকে একটা নেকড়ে বাঘ কুকুরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুকুরগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে লাগলো। ততক্ষণে নেকড়েটা একটা কুকুরের ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল। ফ্রান্সিস ধনুক হাতে নেবারও অবসর পেলন। ও নেমে গাড়ি থেকে একটা কুকুরকে খুলে নিয়ে গাড়ির পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো। বিজোড় হ'লে গাড়ি টানায় অসুবিধে হ'বে।

রাত্রে তাঁবু খাটালো। খাদ্য তো শেষ। নিজেও খেল না। কুকুরগুলোকেও কিছু খেতে দিতে পারলো না। ঘুমুবে তারও উপায় নেই। প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কা করছে সেই নেকড়েটা এসে না হাজির হয়। একবার খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। এটা আবার ঠিক আসবে। অন্য নেকড়ে বাঘ শেয়াল আসতে পারে। সারারাত ঘুমুতে পারলো না। মাঝে-মাঝে তন্দ্রা এসেছে। পরক্ষণেই তন্দ্রা ভেঙ্গে গেছে। নড়েচড়ে ব'সে তাঁবুর বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। হাতে তীর-ধনুক। তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে সারারাত।

পরদিন আবার গাড়ি চললো। অনাহারে শরীর দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। কুকুরগুলোর অবস্থাও তাই। ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসছে ফ্রান্সিসের। কিন্তু অনেক কষ্টে চোখ খুলে রেখেছে। হঠাৎ কুকুরগুলো ডেকে উঠলো। সে সজাগ হলো। তীর-ধনুক শক্ত হাতে ধরলো! ভালো ক'রে তাকাতে নজর পড়ল কী-যেন একটা বরফের ওপর দিয়ে আসছে। ঠিক যা ভেবেছে তাই। একটা ছাই-রঙা নেকড়ে বাঘ। ওটা সেই বাঘটাই। কারণ একটা কুকুর শিকার ক'রে ওটার সাহস বেড়ে গেছে। গুটি-গুটি মেরে নেকড়ে বাঘটা এগিয়ে আসছে। সে গাড়ি থামাল তারপর বাঘটার দিকে নিশানা ক'রে তীর ছুঁড়ল। দুর্বল হাতের ছোঁড়া তীর। নেকড়েটার পাশে বরফে গেঁথে গেল। নেকড়েটা একটু পেছনে সরে গেলো! তারপর আবার আসতে লাগলো। এবার ফ্রান্সিস মনে জোর আনল। নেকড়েটাকে না মারতে পারলেও ওটাকে আহত করতেই হবে। নইলে সবকটা কুকুর ও শিকার করবে। তখন এই বরফের প্রান্তরে মৃত্যু অনিবার্য। এবার নিশানা ঠিক ক'রে

সে তীর ছুঁড়ল। তীরটা এবার নেকড়েটার পেটের মধ্যে লাগলো। নেকড়েটা শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে সে আর একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা লাগলো কিনা ও বুঝতে পারলো না। কিন্তু নেকড়েটা একটা গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে পালালো। এই ক্ষণিক উত্তেজনার পর শরীরে আবার ক্লান্তি নামলো। অবসাদে ফ্রান্সিস পা ছড়িয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল। শক্ত হাতে লাগাম ধ'রে রাখতে পারছে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে আসছে। কখন সন্ধ্যে হয়েছে, রাত্রি নেমে এসেছে—তার খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা তীব্র আলো চোখে লাগতে ও চোখ মেললো। দেখল পরিষ্কার আকাশে দিগন্তের ওপর মধ্যরাত্রির সূর্য জ্বলছে। বিচিত্র বর্ণের আলোর বন্যা নেমেছে চারদিকে।

সে এক অপার্থিব অপরূপ দৃশ্য। দিগন্ত বিস্তৃত বরফের মধ্য থেকে কত রকমের কত বর্ণের আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো। দামী চুনী পান্নার পাথরের মতো মনে হ'তে লাগলো বরফের টুকরোগুলোকে। কোথাও তুষারকে মনে হ'তে লাগলো গলিত সোনার স্রোত। খুব উজ্জ্বল আর বর্ণাঢ্য হ'য়ে উঠলো চারদিক। আলো আর রঙের খেলা চললো কিছুক্ষণ। হঠাৎ সব আলো রং মুছে গেলো। মেঘের মত ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়ল মধ্যরাত্রির সূর্য। আবার অন্ধকার নেমে এল। ফ্রান্সিস ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলো। গাড়ি চলল টিকিয়ে-টিকিয়ে। কতক্ষণ ও এই পথে অসাড়ের মত পড়েছিল জানে না।

হঠাৎ অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট কুকুরের ডাক শুনতে পেল। ওর গাড়ির কুকুরও একটা ডেকে উঠলো। অবসাদগ্রস্ত শরীরটা একটু টেনে তুলে দূরে তাকাল। অন্ধকার কিছুই দেখতে পেল না। আবার কুকুরের ডাক। এবার অনেকটা স্পষ্ট। কুকুরের ডাক যেদিক থেকে আসছে, সেইদিকে গাড়ির মুখ ঘোরালো। টাল সামলাতে গিয়ে হঠাৎ ওর মাথাটা ঘুরে উঠলো। সে অজ্ঞানের মত হ'য়ে গেলো। হাতের লাগাম খুলে গেলো। ও গাড়িতে বসার আসন থেকে গড়িয়ে পড়ল বরফের ওপর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বোধটাই আর শরীরে সইলো না।

★ ★ ★

ফ্রান্সিস যখন চোখ খুললো, তখন দেখলো একটা তাঁবুর নীচে পশুলোমের বিছানায় ও শুয়ে আছে। শরীরের অসাড় ভাবটা কমেছে। তাঁবুটা বেশ বড়। সীলমাছের তেলের দীপ জ্বলছে। এস্কিমোদের মত পোশাক-পরা একটা লোক উনুনের ধারে বসে আছে। লোকটা একটা ছোট চামড়ার ব্যাগের মত নিয়ে এল। ফ্রান্সিস তাকিয়ে আছে। লোকটা হাসল। তারপর এস্কিমোদের ভাষায় কি বললো! ফ্রান্সিস শুধু 'গরম' এই কথাটা বুঝল। বুঝল, যে ব্যাগটায় গরম জল ভরা আছে। ও হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিল। তারপর উঠে ব'সে হাতে-পায়ে সেঁক দিতে লাগলো। আস্তে-আস্তে শরীরের অসাড় ভাবটা একেবারেই কেটে গেলো। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসকে সুস্থ হ'তে দেখে ও খুব খুশী হ'ল। হাতের ভঙ্গী করে বললো, ফ্রান্সিস কিছু খাবে কিনা। ফ্রান্সিস মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো। লোকটা আগুনের ধারে গেলো। থালায় করে গরম-গরম রুটি আর বল্গা হরিণের মাংস নিয়ে এলো। সে আস্তে-আস্তে খেতে লাগলো। উপোসী পেট মুচড়ে ওঠে। তবু খেতে হবে। সুস্থ থাকতে হবে। ও খেতে লাগলো।

খেতে গিয়ে এবার ঠোঁট দুটো জ্বালা করে উঠলো। আঙ্গুল বোলালো ঠোঁট দুটোয়। ঠাণ্ডায় ফেটে গেছে। আঙ্গুলে রক্তের ছোপ লাগলো। ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়েছে। কিছুই

মুখে তুলতে পারছে না। ফ্রান্সিস ইসারায় লোকটাকে কাছে ডাকলো। লোকটা কাছে এলো আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট দুটো দেখলো। লোকটা হাসলো। চলে গেলো তাঁবুটার কোণার দিকে। আঙ্গুলের ডগায় মাখনের মত হলদেটে কি একটা জিনিস নিয়ে এলো। ফ্রান্সিসের ঠোঁটে আস্তে-আস্তে লাগিয়ে দিল। জ্বালাভাবটা একটু কমলো। সে আবার খেতে লাগলো। ও খাচ্ছে, তখনই কয়েকজন তাঁবুতে ঢুকলো। সবারই পরণে এস্কিমোদের মতো পোশাক। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা দশাসই। তার কোমরে রূপোর বেল্ট মত। মাথা-ঘাড় ঢাকা টুপীটা মেরুশেয়ালের চামড়ার। লেজটা পেছনদিকে ঝুলছে। পরণের পোশাকও অন্যদের চেয়ে পরিষ্কার। ফ্রান্সিস বুঝল এই লোকটা এদের সর্দার। সর্দার এগিয়ে এসে এস্কিমোদের ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলো। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে না-বোঝার ভঙ্গী করলো। তখন সর্দারটি ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বলল, 'এখন কেমন আছেন?'

ফ্রান্সিস বললো, 'ভালো আছি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।'

সর্দার হেসে বললো, 'আর ঘণ্টাখানেক দেরি হলে আপনি ঠাণ্ডায় জমে যেতেন। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।'

—'কি হয়েছিল বলুন তো?'

—আপনার শ্লেজগাড়ির কুকুরের ডাক আমরা শুনেছিলাম। কি ব্যাপার দেখতে যাবো, তখনই দেখি আপনার শ্লেজগাড়িটা কুকুরগুলো অনেক কষ্টে টেনে আনছে। কাছে আসতে এবার দেখলাম, চালকের আসনটা শূন্য। বুঝলাম, চালকটি বরফের মধ্যে কোথাও পড়ে গেছে। আমরা মশাল জ্বেলে নিয়ে শ্লেজগাড়ি নিয়ে ছুটলাম। আপনার গাড়িটার চলার দাগ তখনও বরফের ওপর রয়েছে। ভাগ্যি ভালো তখন তুষারবৃষ্টি হয়নি। তুষারবৃষ্টি হলে ঐ দাগ ঢাকা পড়ে যেত। আমরা দাগ ধরে - ধরে কিছুদূর যেতেই দেখলাম, আপনি বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। ধরাধরি করে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর সেই লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর নাম নুয়ালিক। ওর শুশ্রূষাতেই আপনি সুস্থ হয়েছেন।'

ফ্রান্সিস হেসে নুয়ালিকের দিকে তাকাল। দেখুন, নুয়ালিকও হাসছে। ও হাত বাড়িয়ে নুয়ালিকের একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে এস্কিমোদের ভাষায় বলল, 'কুয়অনকা।'

নুয়ালিক কথাটা শুনে আরো খুশী হয়ে হাতটা ঝাঁকাতে লাগলো।

এবার সর্দার জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়লো হ্যারি আর সাঙখুর কথা। ও এতক্ষণ নিজের কথাই ভাবছিল। ফ্রান্সিস বললো, 'কোর্টেন্ডের উদ্দেশ্যে আমি আমার বন্ধু আর একজন এস্কিমো বেরিয়েছিলাম।

—'এই জায়গাই কোর্টল্ড। তবে আপনি বোধহয় অনেক ঘুরে-ঘুরে এসেছেন?'

—'বলতে পারেন, আমার বন্ধু এসে পৌঁছেছে কিনা? প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ে আমি ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।'

—'আমি তো ঠিক বলতে পারছি না' সর্দার বললো, 'আপনি ভাববেন না। বিশ্রাম করুন, আমি খবরের জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনারা এখানে কার কাছে আসছিলেন?'

—'এখান থেকে আমরা বাট্টাহালিড যাবো। আমরা ভাইকিং। রাজা এনর সোক্কাসনের

আমন্ত্রণে আমার এখানে এসেছি।'

—'তাই বলুন। আপনারা আমাদের রাজার অতিথি।'

এক্সিমো-সর্দার খুব খুশী। হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরলো। বললো, 'কিছু ভাববেন না। আপনার বন্ধুর খোঁজ করছি। কয়েকদিন বিশ্রাম করুন। বাট্টাহালিড্ যাবার ব্যবস্থা করে দেব।' বলে সর্দার সঙ্গের লোকদের কি নির্দেশ দিল, তারপর সবাইকে নিয়ে চলে গেল।

বেশী খেতে পারলো না ফ্রান্সিস। ঠোঁটের জ্বালা-জ্বালা ভাবটা কমলেও খিদেটা যেন একেবারেই মরে গেছে। তবু কিছু খাবার পেটে গেল বলেই শরীটায় যেন একটু সাড় এল। এবার ঘুমুতে পারলে অনেকটা ক্লান্তি কাটবে। সে পাশ ফিরে শুলো। কিন্তু তখনই তাঁবুর বাইরে হ্যারি ডাকছে শুনলো, 'ফ্রান্সিস - ফ্রান্সিস।'

—'ওঃ হ্যারি।'

হ্যারি ততক্ষণে তাঁবুতে ঢুকে ফ্রান্সিসের বিছানার দিকে ছুটে এসেছে। হ্যারি আর তাকে উঠে বসার সুযোগ দিলো না। শোয়া অবস্থাতেই ওকে জড়িয়ে ধরলো। ধরে রইল কিছুক্ষণ। ফ্রান্সিসই জোর করে ছাড়ালো নিজেকে। দেখলো হ্যারির চোখে জল। সে হাসলো, 'এই - কী ছেলেমানুষি হচ্ছে?'

সাঙখু তাঁবুর ভেতর ঢুকে দুই বন্ধুর কাণ্ড দেখে হতবাক। নুয়ালিক আগুনের ধারে বসেছিল। সাঙখু গিয়ে ওখানে বসলো। কথাবার্তা বলতে লাগলো।

হ্যারি বিছানার পাশে বসলো। বললো, 'তুষার-ঝড় কেটে যাবার পর দু'দিন আমরা তোমাকে খুঁজে বেরিয়েছি। তুষার-ঝড়ে তোমার গাড়ির চলার দাগ মুছে গিয়েছিলো। তাই তোমার গাড়ির চলার পথের কোন হদিশ পাইনি। তবু খুঁজেছি। এদিকে দেখি খাদ্য ফুরিয়ে আসছে। কুকুরগুলোও দিন-রাত ছুটে ছুটে ক্লান্ত। স্থির করলাম, কোর্টল্ডে চলে আসি। হয়তো তুমি এর মধ্যে কোর্টল্ডে চলে এসেছো। এখানে এসে তোমাকে পেলাম না। য়ুরোপের লোকেরা তো এখানে বেশী আসে না, তুমি এলে সঙ্গে সঙ্গেই খবর পেতাম।'

একটু থামলো হ্যারি। তারপর বলতে লাগলো, 'দু'দিন হল এখানে এসেছি। প্রতিদিন সকালে-বিকেলে বেরিয়েছি তোমার খোঁজে। যদি তোমার কোন হদিশ পাই। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হল। তারপর এই মাত্র একজন লোক গিয়ে তোমার এখানে আসার সংবাদ দিলো। শুনেই ছুটে আসছি।

হ্যারি একনাগাড়ে কথা বলে যেন হাঁপিয়ে উঠলো। ফ্রান্সিস হাসলো। তারপর ওর পথে কি ঘটেছে সবই বললো। তারপর বললো, 'মধ্যরাত্রির সূর্য দেখেছো কী? অপরূপ সেই দৃশ্য।'

—'না'। হ্যারি বললো, 'বোধহয় মেঘ-কুয়াশার জন্যে আমরা দেখতে পাইনি।' তারপর বললো, 'তুমি এখন ঘুমোও, রাত হয়েছে। কালকে তোমাকে আমাদের আস্তানায় নিয়ে যাবো।'

★ ★ ★

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখলো আচমকা উজ্জ্বল রোদ। ওর নিজের শরীরটাও বেশ ঝর্‌ঝরে লাগছে। ক্লান্তি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। নুয়ালিক এসে খাবার দিয়ে গেলো। তখনই হ্যারি আর সাঙখু এলো। হ্যারি বললো, 'এখন শরীর

কেমন?'

—'অনেকটা ভালো।'

—'আমাদের আস্তানায় যেতে পারবে তো?'

—'পারবো। কিন্তু সর্দার কখন আসবে?'

—'এটাই তো সর্দারের তাঁবু। আসবেন এক্ষুণি।'

ফ্রান্সিস বেরোবার জন্যে তৈরি হতে-হতে সর্দার এলো। ফ্রান্সিস বললে, 'আমার বন্ধু এসে গেছে। আমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আর নুয়ালিক আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

সর্দার কিছু বললো না, হাত বাড়ালো শুধু। ফ্রান্সিস ওর সঙ্গে হাত মেলালো। তারপর হ্যারি আর সাঙখুর সঙ্গে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরের আলো অন্যদিনের চেয়ে একটু উজ্জ্বল। ফ্রান্সিস বেশ খুশী মনে পথ চলতে লাগলো। একসময় ও হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার শ্লেজগাড়িটা?'

—'ওটা আমি কাল রাতেই নিয়ে গেছি। কুকুরগুলো তো আমারই পোষা কুকুর' - সাঙখু বললো।

★ ★ ★

ছোট্ট জায়গা 'কোর্টল্ড'। বেশীর ভাগই তাঁবু, তবে বড়-বড় তাঁবুও আছে। পাথরের বাড়িও আছে দেয়ালগুলো বেশ মোটা। সড আর পাথর দিয়েই বাড়িগুলো তৈরি। এমনি একটা সড আর পাথরে তৈরী বাড়িতে হ্যারিরা আস্তানা নিয়েছে। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখলো, বেশ ভারী-ভারী পাথরের ঘরটা, ভেতরটা বেশ গরম। শ্লেজগাড়ি থেকে জিনিসপত্র আগেই নামানো হয়েছিল। সিন্ধুঘোটকের চামড়া, সীলমাছের চামড়া, এসব দিয়ে সাঙখু ফ্রান্সিসের জন্য একটা বিছানা করে দিল। ফ্রান্সিস তাতে আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়লো। শরীরের দুর্বলতা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি।

বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস শ্লেজগাড়িটা নিয়ে বেরলো। কাছাকাছি ঘুরে ফিরে দেখলো। এমনি বিশ্রাম নিতে গিয়ে তিনদিন কেটে গেল। এর মধ্যে এস্কিমোদের সর্দার দু'দিন এসেছিল। কয়েকটা এডার পাখি দিয়ে গিয়েছিল খাবার জন্য।

ফ্রান্সিস সেদিন বললো, 'হ্যারি আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর দেরী করা ঠিক হবে না। বাবা দেড়মাসের মধ্যে কাজ সেরে ফিরতে বলেছেন। আর সময় নষ্ট নয়, চলো কালকেই বাট্টাহালিড রওনা দিই।'

—'বেশ! তুমি সুস্থবোধ করলে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে সাঙখু সঙ্গে থাকলে ভালো।'

—'দরকার নেই। দু'জনে একা গাড়ি নিয়ে যাবো।'

—'বেশ চলো, তাই যাওয়া যাবে।'

সাঙখু রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছিল। ফ্রান্সিস তাকে কাছে ডাকল। ও কাছে আসতে ফ্রান্সিস কোমরবন্ধনী থেকে দুটো মোহর বের করে ওর হাতে দিল। সাঙখু খুব খুশী হয়ে দাঁত বের করে হাসল। ফ্রান্সিস বললো, 'সাঙখু কাল সকালেই আমরা বাট্টাহালিড রওনা হচ্ছি। তুমি আঙ্গামাগাসালিকে ফিরে যাও'।

সাঙখুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ওর বোধহয় ইচ্ছা ছিল, ফ্রান্সিসদের সঙ্গে বাট্টাহালিডে যাবার। ফ্রান্সিস পরদিন সব মালপত্র বাঁধা-ছাদা করে শ্লেজগাড়িতে রাখল।

শুকনো সীলমাছ, সিন্ধুঘোটকের মাংস এসব নিল। খাবার-দাবার একটু বেশীই নিল। সাঙখু সঙ্গে থাকবে না, পথ হারালে যাতে বিপদে পড়তে না হয়।

সূর্য দেখে উত্তর দিকটা ঠিক করে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। একবার পেছন ফিরে দেখলো, সাঙখু ম্লানমুখে পাথরের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আগের দিন এস্কিমো-সর্দারের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে বলেছিল, এখান থেকে সোজা উত্তরে বাট্টাহালিড। পথে তুষার-ঝড়ের পাল্লায় না পড়লে চার-পাঁচদিন লাগবে। সেই অনুযায়ী ফ্রান্সিস সোজা উত্তর দিকে গাড়ি চালাতে লাগল। বরফের প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে শ্লেজগাড়ি বেশ দ্রুত গতিতেই ছুটলো।

সেই প্রান্তর দিয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মধ্যেই গলা-বরফের জায়গায় পড়তে লাগলো। গলা বরফের মধ্যে কুকুরগুলো পড়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসরা নেমে গাড়িটাকে টেনে পিছিয়ে আনতে লাগলো, তারপর শক্ত বরফ-এলাকা দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাতে লাগলো। তবু গাড়ি গলা বরফের মধ্যে পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিস এবার বুদ্ধি করে সন্দেহ হলেই গাড়ি থামিয়ে ফেলছিল। বরফের টুকরো তুলে ছুঁড়ছিল প্রান্তরের দিকে। বরফের টুকরোটা ডুবে গেলেই বুঝছিল গলা বরফ। পাশ কাটিয়ে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যেবেলা একটা জায়গা বেছে নিয়ে তাঁবু খাটালো। এস্কিমোদের মতো চকমকি পাথরে ইস্পাতের টুকরো ঠুকে আগুন জ্বালাল। সীলমাছের তেলের আলোয় তাঁবু গরম রাখা ও রান্না দুটোই চালাতে লাগলো। রাত কাটিয়ে পরদিন আবার পথ চলা।

যেদিন চাঁদ-তারার আলো স্পষ্ট থাকে, মেঘ-কুয়াশা কম থাকে, সেদিন রাত্রেও গাড়ি চালাতে লাগলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাট্টাহালিড পৌঁছতে হবে। মাঝে-মাঝে শক্ত-শক্ত বরফের বড়-বড় টুকরো ছড়ানো প্রান্তর পড়তে লাগলো। বরফের ধাক্কা বাঁচিয়ে কুকুরগুলো যাতে চোট না খায়, এইসব দেখে-শুনে চালাতে গিয়ে গাড়ি চলতে লাগলো ধীরগতিতে! ও-রকম এলাকা তিন-চার জায়গায় পড়ল।

এর মধ্যেই একদিন ফ্রান্সিসরা দেখলো অরোরা বোরোলিস বা 'মেরুজ্যোতি'। উত্তর-মেরুর চৌম্বকক্ষেত্র থেকে এই বিচিত্র আলোর উৎপত্তি। উত্তর দিগন্তের ওপরে আকাশটায় যেন লক্ষ-লক্ষ আতসবাজি জ্বলে উঠলো। বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আলোর মালা। চোখ ধাঁধানো আলো নয়, নরম জ্যোৎস্নার মত আলো। বিচিত্র সেই আলোর খেলা—এ-এক অভিজ্ঞতা।

পথে কখনও কখনও কয়েকটি এস্কিমো পরিবারের একত্র বসতি এলাকা দেখতে পেলো। এস্কিমোদের সীলমাছের চামড়ার তৈরী তাঁবুকে বলে 'টুপিক'। এসব টুপিকেও আশ্রয় জুটল মাঝে-মাঝে। এভাবে চলে-চলে পাঁচদিনের মাথায় ওরা বাট্টাহালিড পৌঁছলো।

* * *

বাট্টাহালিড নামেই রাজধানী। এমন কিছু বড় শহর-টহর নয়। তবে কোর্টল্ডের চেয়ে বেশ বড়। অনেকটা এলাকা জুড়ে মাটি আর পাথরের তৈরী বাড়ি-ঘর। এখানে শুধু এস্কিমোরাই থাকে না, য়ুরোপীয় শ্বেতাঙ্গরাও অনেক আছে। আবার চারদিকে এস্কিমোদের টুপিকও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

তখন সকাল। পাথরের বাড়িঘর থেকে, টুপিক থেকে অনেকেই ঔৎসুক্যের সঙ্গে ফ্রান্সিসদের দেখলো। রাজবাড়ি সহজেই পাওয়া গেল। পাথর, মাটি আর সড দিয়ে তৈরী রাজবাড়িটা বেশ বড়। এখানে য়ুরোপীয়রাও এস্কিমোদের মতো চামড়ার পোশাক পরে। রাজবাড়ির দিকে যেতে গিয়ে ওরা দূর থেকেই গীর্জাটা দেখতে পেল। বেশ উঁচু পাথরের তৈরী গীর্জাটা, তার মাথায় একটা বিরাট কাঠের ক্রশ।

ওদের গাড়ি রাজবাড়ির সামনে দাঁড়ালো। দেখলো, কুঠার হাতে দু'জন য়ুরোপীয় সৈন্য রাজবাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে ফ্রান্সিস নরওয়ের ভাষায় কথা বললো। কথা বুঝতে বা বলতে এদের কোন অসুবিধে হলো না। ওদের মধ্যে একজন রাজবাড়ির মধ্যে রাজাকে সংবাদ দিতে চলে গেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অপেক্ষা করতে লাগলো। একটু পরেই রাজা এনর সোক্কাসন নিজে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে-পেছনে এলেন আরো কয়েকজন। বোধহয় মন্ত্রী ও অমাত্যরা। ফ্রান্সিস ও হ্যারি মাথা নুইয়ে সকলকে সম্মান জানালো। ফ্রান্সিস ভাইকিং রাজার চিঠিটা রাজাকে দিল।

রাজা হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরলেন! বললেন, 'আপনারা এসেছেন, খুব খুশী হয়েছি। এখন কয়েকদিন বিশ্রাম করুন। আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। তারপর কাজের কথা ভাবা যাবে। চলুন রাজবাড়ির ভেতরে।'

রাজা ও অমাত্য সকলেরই পরণে ছাই রঙের গরম কাপড়ের আলখাল্লা মত। মাথা ঘাড় ঢাকা সেই কাপড়ে। কোমরে চেন বাঁধা, রাজার কোমরের চেনটা সোনার। ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজা ও অমাত্যদের সঙ্গে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল। কালো-কালো বড়-বড় পাথরের ঘরগুলো, বারান্দা, অলিন্দ। এসব পেরিয়ে একটা বড়-হলঘর। এটাই বোধহয় রাজসভাগৃহ। কারণ একটা পাথরের বেদী রয়েছে। তাতে লতাপাতা খোদাই করা। বল্গা হরিণের চামড়ার সময় তাতে। এটাতেই রাজা এসে বসলেন। আরো কিছু-কিছু কাঠের আসন রয়েছে, মন্ত্রী-অমাত্যরা সে-সব আসনে বসলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকেও দুটো আসনে বসতে দেওয়া হলো।

যদিও দিনের বেলা, তবু সভাগৃহে জ্বলছে কয়েকটা মশাল।

রাজা পাথরের বেদী থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'আপনারা সকলেই আমাদের পূর্বপুরুষ 'এরিক দ্য রেডে'র কথা জানেন। আরো জানেন তাঁর গুপ্তধনের কথা। বহুদিন চেষ্টা করেও আজও কেউ গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারে নি'। তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন, 'আপনারা জানেন, ভাইকিংরা বীরের জাতি। তাই ভাইকিংদের রাজার কাছে আমি এই গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা বলি। তখন তিনি ভাইকিং জাতির গর্ব ফ্রান্সিস এবং তার বন্ধুদের সাহায্য নেবার কথা বলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, ফ্রান্সিস ও তার বন্ধু এখানে এসেছেন। ফ্রান্সিস ও তাঁর বন্ধুরা এই গুপ্তধন খুঁজে বের করবেন, এই বিশ্বাস আমি রাখি। কারণ'—

এই বলে রাজা ফ্রান্সিসের আনা সোনার ঘণ্টা, হীরে, মুক্তো এসবের কথা সংক্ষেপে বললেন। রাজার বক্তৃতা শেষ হলে সকলে করতালি দিল। রাজা পাথরের সিংহাসনে বসে ফ্রান্সিসকে ইশারায় ডাকলেন। ফ্রান্সিস উঠে রাজামশাই-এর কাছে গেল। রাজা একজন এস্কিমোকে কাছে ডাকলেন। সাধারণ এস্কিমোদের চেয়ে এই লোকটি অন্যরকম। বেশ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান। রাজা তাকে দেখিয়ে বললেন, 'ফ্রান্সিস, এর নাম 'নেসার্ক'। নেসার্কই আপনাদের দেখাশুনো করবে। আপনারা ওর সঙ্গে যান'।

দু'জনে রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে এলো। নেসার্ক এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। পরিষ্কার নরওয়ের ভাষায় বললো, 'আমার সঙ্গে আপনারা আসুন'।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেসার্কের সঙ্গে সভাগৃহের বাইরে এলো।

নেসার্কের পেছনে আসতে-আসতে দেখল, একটা চত্বরে অনেক কুকুর বাঁধা। এর পরেই হরিণশালা, আঁকাবাঁকা শিঙ্‌ওলা অনেক বল্‌গা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। একটা জায়গায় তার দিয়ে ঘেরা। বোঝা গেল, শ্লেজগাড়ি চালাবার জন্যে কুকুর আর হরিণগুলোকে রাখা হয়েছে।

পাথরের বারান্দা দিয়ে যেতে গিয়ে, ওরা দু'পাশে কয়েকটা ঘর দেখল। কোনটা অস্ত্র-শস্ত্র রাখার ঘর, কোনটায় পুরনো আমলের জিনিসপত্র রাখা, কোনটায় সৈন্যরা থাকে। শেষের দিকে একটা ঘরের সামনে নেসার্ক দাঁড়াল। ঘরের দরজাটা শ্লেট-পাথরের তৈরী। নেসার্ক দরজাটা খুলল। দেখা গেল, ফ্রান্সিসদের শ্লেজগাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র এনে এই ঘরে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিস বুঝল, এটাই ওদের আস্তানা। দু'জন এস্কিমো ঘরটা গোছ-গাছ করতে লাগল। নেসার্ক ওদের বল্‌গা হরিণের চামড়া বিছিয়ে বিছানামতো করা হলো। এই দিনের বেলাতেও ঘরটা অন্ধকারমত। নিবু-নিবু হয়ে আসা একটা সীলমাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছিল।

প্রদীপটার সল্‌তে উস্‌কে দিয়ে নেসার্ক বললো, 'তাহলে আপনারা বিশ্রাম করুন, দরকার পড়লেই দয়া করে ডাকবেন'।

সব এস্কিমোরা চলে গেল। হ্যারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'এবার শোয়া যাক'। ও বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বললো, 'দেখছো ফ্রান্সিস, ঘরটা বেশ গরম'।

—'ঐ সীলমাছের প্রদীপের জন্যে। এই প্রদীপকে এস্কিমোরা নানা কাজে লাগায়'। ঘরময় পায়চারী করতে-করতে ফ্রান্সিস বললো।

—'তুমি কি সারাদিনই পায়চারী করবে না কি'?

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'জানো তো কোন কিছু গভীরভাবে চিন্তা করবার সময় আমি পায়চারী করি'।

—'হু, কী ভাবছো অত'?

—'এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের কথা। এখানকার রাজবাড়ির কোথাও আছে সেই ধনভাণ্ডার। কিন্তু কোথায়? কী সূত্র ধরে এগোলে ওটার হদিশ পাবো'?

—'রাজার সঙ্গে কথা বলো। দেখো সূত্র পাও কি না'?

—'হু, রাজবাড়ির অন্দরমহলটা ভালো করে দেখতে হবে। যে ঘরে এরিক দ্য রেড থাকতেন, সেই ঘরটাও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হবে। অনেক কাজ'।

—'এখন কয়েকটা দিন তো বিশ্রাম কর'।

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'বিশ্রাম করবার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে, বাবার হুকুম'।

সেই দিনটা ওরা অবশ্য শুয়ে-বসে কাটালো। নেসার্ক ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল। বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস নেসার্ককে ডেকে বললো, 'তুমি আমাদের শ্লেজগাড়িটা তৈরী রাখতে বলো। আমরা একটু ঘুরে ফিরে দেখবো'। সে মাথা নেড়ে চলে গেল।

শ্লেজগাড়িটা বিকালে রাজবাড়ির বাইরে আনা হলো। ফ্রান্সিস ও হ্যারি গিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি ছেড়ে দিল। বাট্টাহালিড এমন কিছু বড়ো শহর নয়। কয়েক পাক ঘুরতেই

সব বাড়িঘর, টুপিক দেখা হয়ে গেল। এবার ওরা গীর্জাটার কাছে এল। গীর্জাটা বেশ বড়ো, কালো-কালো পাথর গেঁথে তৈরী। এরিক দ্য রেড নিজে নাকি এটা তৈরী করিয়েছিলেন। ওরা গাড়ি থেকে নেমে গীর্জাটায় ঢুকলো। গীর্জার সামনের চত্বরে অনেক ক্রুশ পোঁতা। তার মানে এটাকে কবরখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওরা গীর্জার মধ্যে ঢুকলো। বেশ অন্ধকার-অন্ধকার ভেতরটা। মেঝে থেকে উঁচুতে দু'তিনটে কাঁচের জানলা। তাতে লাল-নীল-হলুদ নানা রঙের কাজ করা। তারই মধ্যে দিয়ে বাইরের একটু আলো এসে পড়েছে। মেঝের কিছু কাঠের বেঞ্চিমত পাতা। সামনে পাথরের বেদী। তার ওপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের একটা মূর্তি। বেশ বড় মূর্তিটা, পেতলের তৈরী। একটা কাঠের বেদীর ওপর সেটা রাখা, তার সামনে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। ভেতরটায় আর বিশেষ কোন সাজসজ্জা নেই। চৌকোনো পাথর দিয়ে মেঝেটা তৈরী। সব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, অনেকদিনের পুরনো গীর্জা। দেয়ালে কোথাও-কোথাও সবুজে শ্যাওলা ধরেছে।

গীর্জা থেকে ওরা যখন বেরিয়ে এল, তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো। বিছানায় গা এলিয়ে দিতে ফ্রান্সিস বলল, 'আর এভাবে সময় কাটানো নয়। কাল থেকেই কাজে নামতে হবে'।

—'বেশ তো, লেগে পড়ো'। হ্যারি এই বলে শুয়ে পড়লো।

পরদিন ফ্রান্সিস নেসার্ককে বললো, 'তুমি একটু রাজামশাইকে খবর দাও। যে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই'।

একটু পরেই নেসার্ক ফিরো এলো। বললো, 'আমার সঙ্গে চলুন। রাজা এনর সোক্কাসন আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন'।

ওরা দু'জনে চট্‌পট তৈরী হয়ে নিল। তারপর রাজবাড়ির অন্দরমহলের দিকে চললো। অন্দরমহলটা বড় কিছু নয়। বিশেষভাবে সাজানো-গোজানো কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে নেসার্ক বলল, 'আপনারা এই ঘরে যান'।

ঘরে ঢুকে ওরা দেখল, একটা গোল পাথরের টেবিলমত। চারপাশে কয়েকটা কালো ওক্ কাঠের চেয়ার, সবুজ গদী আঁটা। ফ্রান্সিস বুঝলো, এটা রাজার মন্ত্রণালয়। ওরা দু'জনে চেয়ারে বসল। একটু পরেই রাজা এলেন। পরণে সেই ঘাড়-মাথা ঢাকা হলদে গরম কাপড়ের হাঁটু পর্যন্ত আলখাল্লা। কোমরে সোনার চেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালো। রাজামশাই কাঠের চেয়ারে বসে বললেন, 'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস'?

—'দেখুন, আমরা খুব কম সময় নিয়ে এখানে এসেছি। কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে যেতে হবে। এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের সন্ধান আজ থেকেই করতে চাই। এজন্যে আপনার অনুমতি চাইছি'।

—'আমার কোন আপত্তি নেই। বলুন, কীভাবে অনুসন্ধান শুরু করতে চান'?

—'প্রথমে আমি অন্দরমহলের ঘরগুলো দেখবো'।

—'বেশ'। এই বলে রাজা হাতে একটা তালি বাজালেন। নেসার্ক এসে দাঁড়ালো মাথা নীচু করে। রাজা বললেন, 'তুমি অন্দরমহলের সবাইকে কিছুক্ষণের জন্যে দরবার ঘরে যেতে বলো'। সে চলে গেল।

—'আপনারা অন্দরমহলটা দেখতে চাইছেন কেন'?

—'এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন কোথায় আছে, তার একটা সূত্র পাই কিনা, সেইজন্যেই

অন্দরমহলটা দেখবো। তারপর দেখবো, এরিক দ্য রেড যে ঘরে থাকতেন, বিশেষ করে যে ঘরে তিনি জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়েছেন।' ফ্রান্সিস বললো।

—'অন্দরমহলের শেষ ঘরটাতেই এরিক দ্য রেড শেষ জীবনে থাকতেন। ঐ ঘরটাকে অনেকটা যাদুঘরের মতো করে রাখা হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত পোশাক, কালিদান-কলম, বইপত্র এসব রাখা আছে। আপনারা অন্য ঘর-টরগুলো দেখুন। ? যাদুঘরে সবশেষে আপনাদের নিয়ে যাবো। ঐ ঘরের চাবিটা শুধু আমার কাছেই থাকে।'

—'বেশ'।

নেসার্ক তখনই এসে বললো, 'চলুন।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চললো অন্দরমহলের দিকে। একই রকম পর-পর কয়েকটা পাথরের তৈরী ঘর, দরজাগুলো কাঠের। ঘরের ভেতরে বল্‌গা হরিণের চামড়ার বিছানা। শুধু রাজা-রানীর ঘরের মেঝেয় লতাপাতা আঁকা কার্পেট বিছানো। চোখ-ধাঁধানো সাজসজ্জা নেই সে-সব ঘরে। ফ্রান্সিস সবগুলো ঘরই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। সব ঘরই এক রকম, বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। একটু অন্ধকার-অন্ধকার ঘরগুলোয় সীলমাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। রাজা-রানীর শোয়ার ঘরটাই যা সুসজ্জিত।

রানী বিছানায় বসেছিলেন। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি রানীর ডান হাতে চুম্বন করে সম্মান জানালো। রানী একটা সবুজ রঙের নরম কাপড়ের গাউন পরেছিলেন। মাথায় কোন ঢাকা ছিল না। রানী অপরূপ সুন্দরী, গায়ের রঙ দুধে-আলতা মেশানো। গলায় একটা মুক্তোর মালা, সাজ-সজ্জায় জাঁকজমক কিছু নেই। তিনি সুরেলা গলায় বললেন, 'আপনারা ভাইকিংদের দেশ থেকে এসেছেন?'

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'ওর কাছে শুনলাম, আপনারা এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের সন্ধান করবেন।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আমার মনে হয়, এরিক দ্য রেডের যাদুঘরে কিছু সূত্র পেলেও পেতে পারেন।'

'এ কথা কেন বলছেন?'

—'কারণ, ঐ ঘরটাই সবচেয়ে পুরানো। এই ঘরগুলো তৈরী হয়েছে পরে।'

ফ্রান্সিস মনে-মনে রানীর বুদ্ধির প্রশংসা করল। ও বললো, 'আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা এখন ঐ যাদুঘরেই যাবো।'

রানী কোন কথা না বলে হাসলেন। ওরা রানীকে সম্মান জানিয়ে ফিরে চললো। ওরা মন্ত্রণালয়ে ফিরে এলো। রাজা ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

ফ্রান্সিস বললো, 'মহারাজা, এবার আমরা এরিক দ্য রেডের যাদুঘরটা দেখবো।'

ওরা চললো অন্দরমহল পেরিয়ে একেবারে শেষের দিকে। সেখানেই একটা ঘরের সামনে এসে রাজা দাঁড়ালেন। তাঁর কোমরে চেন-এর সঙ্গে বাঁধা দুটো বড়-বড় চাবি। তারই একটা খুলে নিলেন। ঘরে ঝুলছে মস্ত বড় একটা তালা! তিনি চাবি দিয়ে তালাটা খুললেন। বেশ ধাক্কা দিয়ে দিয়ে দরজাটা খুলতে হলো। বোঝাই গেল, ঘরটা অনেকদিন খোলা হয়নি।

ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকলো। ভেতরটা কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, আলো না হলে কিছুই দেখা যাবে না। নেসার্ক এইজন্যেই বোধহয় একটা মশাল নিয়ে এসেছিল। চক্‌মকি পাথর ঠুকে আলো জ্বালাল। এবার ঘরের পুরানো আসবাবপত্র

সব দেখা গেল। বেশীর ভাগই কালো ওক কাঠের তৈরী। চারদিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এরিক দ্য রেডের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র। একটা বিরাট পাথরের পাশে টেবিলের ওপর রাখা আছে রূপোর কলমদানি, রূপোর দোয়াত। পাশে একটা কাঠের আলমারী মত। তাতে রাখা আছে তাঁর ব্যবহৃত পোশাকপত্র। অত্যন্ত দামী যে-সব জাঁকালো পোশাক। সোনার কাজ করা বেল্ট। আর একটা জায়গায় আছে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। মিনে-করা খাপে ছোরা, হাতীর দাঁতের বাঁটে সোনার কাজ করা তরোয়াল। খাপটায় হীরে-বসানো, মিনে-করা সেটা।

পাথরের টেবিলের ওপর একটা বই সহজেই নজরে পড়ে। লাল রঙের চামড়ার মলাট দেওয়া বই। রাজা বইটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন। ফ্রান্সিস, চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। রাজা বইটা হাতে নিয়ে ফ্রান্সিসকে ডাকলেন, 'ফ্রান্সিস এই বইটার কথা আপনাকে বলেছিলাম, বোধহয় মনে আছে আপনার।'

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বইটা হাতে নিল। বইটা চামড়ায় বাঁধানো। ভেতরে উল্টে দেখল, বাইবেলের 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট'-এর অনুবাদ করেছিলেন, তাই না।'

—'হ্যাঁ, সবটাই তাঁর নিজের হাতের লেখা।'

ফ্রান্সিস বইটার পাতা উল্টে ভালভাবে দেখতে লাগলো। বহু পুরনো বই। বিশেষ কোন কালিতে লেখা, তাই লেখাগুলো এখনও স্পষ্ট। বইটার মলাটের পরের পাতাতেই তাঁর নিজের হাতের স্বাক্ষর। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি মনেপ্রাণে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। ফ্রান্সিস রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি আর কিছু লেখেন নি?

—'না'। রাজা বললেন, তবে বংশ পরম্পরায় একটা কথা চলে আসছে যে উনি নাকি 'নিউ টেষ্টামেন্ট'ও অনুবাদ করেছিলেন। তবে সেই বইটা আমরা এখনও কেউ চোখে দেখি নি'।

ফ্রান্সিস বইটা ভালো করে দেখলো। প্রাচীন পুঁথি যেমন হয় বৈশিষ্ট্যহীন। তিনি একজন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনিই প্রথম তাঁর তৈরী গীর্জার জন্যে য়ুরোপ থেকে ধর্মযাজক আনিয়েছিলেন। কাজেই খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, ও বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফ্রান্সিস ঘুরে-ঘুরে জিনিসপত্রগুলো দেখলো। কিন্তু গুপ্তধনের সূত্র পাওয়া যেতে পারে, এমন কিছু দেখলো না। তবু বইটার গুরুত্বকে ফ্রান্সিস মনে-মনে স্বীকার করলো। নরওয়ের ভাষায় অনুবাদ, কাজেই পড়তে অসুবিধে হবে না। ও রাজাকে বললো, 'একটা বিনীত নিবেদন ছিল আপনার কাছে।'

—'বলুন।'

—'আমি কয়েকদিনের জন্যে বইটা নিতে পারি।'

রাজা একটু ভাবলেন। বললেন, 'দেখুন এই ঘরের সব জিনিসই আমরা সযত্নে রাখি। কাউকে কিছু দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে—'একটু থেমে রাজা বললেন, 'আপনি আমার অতিথি। একটা গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা আমার কর্তব্য।'

ফ্রান্সিস বললো, 'দেখুন বইটা কতটা আমার কাজে লাগবে, তা এখনই বলতে পারছি না। তবে কোথায়-কীভাবে কোন্ সূত্র পাবো, তা এখনই বলা যায় না। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া—এই আর কি।'

—'বেশ, আপনি কয়েকদিনের জন্য নিন। তবে আর কাউকে নয়, আমার হাতেই

ফেরৎ দেবেন।'

—'হ্যাঁ, আপনাকেই দেবো।'

রাজা বইটা ফ্রান্সিসের হাতে দিলেন। বইটা নিয়ে ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো। হ্যারি বিছানায় বসতে-বসতে বললো, 'হঠাৎ বইটা নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?'

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'জানো তো আমাদের দেশের প্রবাদ — 'কোন কিছুকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না, এমন কি ধূলোকেও নয়। দেখাই যাক না কোন আলোর সন্ধান পাই কিনা? তা'ছাড়া বাইবেল অনেক দিন পড়া হয় নি। পড়লে একটু পুণ্যার্জন তো করা হবে!'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর হ্যারি শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস প্রদীপের আলোয় এরিক দ্য রেডের নিজের হাতের লেখা বাইবেলটা পড়তে লাগলো। পড়তে-পড়তে বুঝল-তাঁর বেশ সাহিত্যজ্ঞান ছিল। অনুবাদের ভাষা যথেষ্ট সাবলীল, অথচ কতদিন আগের লেখা। অনেক রাত পর্যন্ত বইটা পড়ে রেখে দিলো।

পরের দিনই বইটা পড়া শেষ হ'লো। হ্যারি বললো, 'কী হে কেমন লাগলো?'

—খুব স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। শুধু ধর্মজ্ঞানই নয়, তাঁর সাহিত্য জ্ঞানও ছিলো প্রসংশনীয়। তুমি পড়বে?'

—'দাও পাতা ওল্টাই। সময় তো কাটবে।' হ্যারি বইটা নিয়ে পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পড়ার পর বইটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে ডাকলো, 'ফ্রান্সিস?

'হুঁ।' ফ্রান্সিস তখনও একনাগাড়ে পায়চারী ক'রে চলেছে।

—'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো?'

—'কী ব্যাপার?'

—'প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আরম্ভের অক্ষরটা লাল রঙের মোটা অক্ষরে লেখা।'

—'বোধহয় সে আমলে এ-রকম রীতিই ছিলো।'

—'বেশ, তা' ঠিক হ'ল। কিন্তু অন্য কালিতে লেখা কেন।'

—'দেখা যাক।' হ্যারি একমনে বইটা পড়তে লাগলো।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস প্রদীপ জ্বেলে এলোমেলোভাবে বইটার পাতা ও'ল্টাতে লাগলো। একসময় ডাকলো, 'হ্যারি, বইটার বিশেষত্ব কিছু দেখলে?'

হ্যারি ডান হাতের চেটো ওল্টালো, বললো, 'উঁহু। তারপর বিছানায় কাত হ'য়ে শুলো। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস তখনও বইটার পাতা এলোমেলোভাবে ওল্টাচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হ'ল আচ্ছা লাল অক্ষরগুলো একত্র করলে কি কোন সাঙ্কেতিক কথা পাওয়া যায়। ও তাই করলো। চারটে পরিচ্ছেদের প্রথম অক্ষরগুলো একত্র ক'রে ভাবলো। কিন্তু কোন অর্থ দাঁড়ালো না। হাল ছেড়ে দিয়ে বইটা উল্টো ক'রে রেখে দিলো। প্রদীপ নেভাবার আগে বইটার দিকে আবার তাকালো। ভাবলো, আচ্ছা উল্টো দিক থেকে দেখা যাক। ও আবার বইটা খুললো। এবার উল্টো দিক থেকে প্রথম অক্ষরগুলো মনে-মনে সাজাতে লাগলো! দু'টো শব্দ পেলো, 'যীশুর চরণে।' ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠলো। একটা অর্থ তো আসছে। ও হ্যারিকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো।

হ্যারি উঠে ব'সে চোখ কচ্লাতে কচ্লাতে বললো, 'কী হলো?'

—'আমি' এক-একটা অক্ষর ব'লে যাচ্ছি, তুমি লেখ।'

—'লিখবো। কালি-কলম কোথায়?'

ফ্রান্সিস এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর নিজের বিছানায় বল্‌গা হরিণের চামড়াটা তুলে নিলো। চামড়ার উল্টো দিকটা পাতলা। সেদিকটা সাদাটে। বললো, 'এটাতে লেখ।'

—'কিন্তু কালি?'

ফ্রান্সিসকে সাঙখু একটা ছুরি দিয়েছিলো। ওটা ফেরৎ দেওয়া হয়নি। ও বিছানার পাশ থেকে ছুরিটা নিলো। ছুরিটা দিয়ে নিজের আঙ্গুলের ডগা একটুখানি কাটলো। তারপর ছুরির ডগায় একটু রক্ত মাখিয়ে নিয়ে ছুরিটা হ্যারির দিকে এগিয়ে বললো, 'এটা দিয়ে লেখো।

'তোমার যত পাগলামো।'

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে হাসলো। তারপর উল্টো দিক থেকে বইটার পরিচ্ছেদভাগ অনুযায়ী অক্ষর গুলো ব'লে যেতে লাগলো। ছুরির ডগায় রক্ত শুকিয়ে গেলে আবার আঙ্গুল থেকে রক্ত নিয়ে দিতে লাগলো। সব অক্ষর লেখা হলো। দুই বন্ধুই ঝুঁকে পড়ল সমস্ত লেখাটার ওপর। স্পষ্ট অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, 'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো।' দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকালো। এরা কল্পনাও করে নি যে উল্টোদিক থেকে অক্ষরগুলো সাজালে একটা অর্থ বেরিয়ে আসবে। অথচ তাই হলো। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠলো। বললো, 'হ্যারি, একেবারে অন্ধকারে ছিলাম। একটুআলোর আভাস পেয়েছি।'

—'কিন্তু কথাটা আমাদের কোন কাজে লাগবে?' হ্যারি বললো।

—'লাগবে-লাগবে। আজ না হয়, কাল। আসল কথা এরিক দ্য রেড সূত্র রেখে গেছেন। সেইটাই বুদ্ধি খাটিয়ে বের করতে হবে।'

—'তুমি কি এই কথাটাকে একটা সূত্র মনে কর।'

—'নিশ্চয়ই। নইলে অক্ষরগুলোকে এভাবে সাজিয়ে ব্যবহার করা হবে কেন? এটা অনেক ভেবেচিন্তেই করা হয়েছে।

—'হুঁ।' হ্যারি আর কোনো কথা বললো না।

ফ্রান্সিস বললো, 'একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম বিশ্বাসী। রাজবাড়ি নয়, গীর্জাটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। সমাধানের সূত্র আছে গীর্জাটাতেই, অন্য কোথাও নয়।'

—'হু' কথাটা চিন্তা করবার। হ্যারি বললো।

ফ্রান্সিস আবার লেখাটার দিকে ঝুঁকে পড়ে ভালো ক'রে পড়লো, 'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো, বইটার পাতাগুলো এলোমেলো ওল্টালো। কিন্তু আর কিছু বিশেষত্ব দেখলো না। পরদিনই ফ্রান্সিস নেসার্ককে দিয়ে রাজাকে খবর পাঠালো। মন্ত্রণাঘরেই রাজা ওদের সঙ্গে দেখা করলেন। ফ্রান্সিস বইটা ফেরৎ দিয়ে বললো, 'একটা ক্ষীণ সূত্র পেয়েছি বইটা থেকে।'

—'সত্যি।' রাজার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হলো।

ফ্রান্সিস তখন বইটার উল্টো দিক থেকে অক্ষর সাজিয়ে কীভাবে একটা অর্থপূর্ণ কথা পেয়েছে সে-সব বললো। রাজা বেশ আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'অবাক কাণ্ড আমরা তো কতদিনই বইটা দেখে আসছি। কিন্তু এভাবে তো ভাবি নি। আপনি যে কত বুদ্ধিমান, সেটা এতেই বোঝা গেলো।'

ফ্রান্সিস বললো, 'আমার মনে হয়, গীর্জাটাতেই আমরা সন্ধানের সূত্র পাবো। যীশুখৃষ্ট এবং খৃষ্টধর্মের সঙ্গে যোগ আছে, এই ধনভাণ্ডার গোপন রাখার ব্যাপারে।'

—'দেখুন চেষ্টা ক'রে। তবে যা করবার তাড়াতাড়ি করবেন।' রাজা বললেন।

—'কেন মহারাজ—' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—'আমাদের চিরশত্রু ইউনিপেড্‌দের আক্রমণের আশঙ্কা করছি।'

—'বলেন কি?'

—'হ্যাঁ। আমাদের গুপ্তচর সংবাদ এনেছে, উত্তরদিকে ওদের মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন চলছে। ওরা শ্লেজগাড়ি, অস্ত্র এ-সব সংগ্রহ করছে। যে কোনদিন আমাদের আক্রমণ করতে পারে।'

—'হুঁ। দেখি কাল থেকেই আমরা কাজে নামছি।'

—'তাই করুন। ওদের রাজা এভান্ডাসন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির লোক। বছর কয়েক হ'ল রাজা হ'য়েছে। এই বাট্রাহালিড জয় করার উদ্দেশ্য একটাই, এরিক দ্য রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করা। ওরা অসভ্য বর্বর। ওরা পাহাড়ের গুহায় নয়তো মাটিতে গর্ত ক'রে থাকে। এই হিংস্র মানুষদের দয়া-মায়া ব'লে কিছু নেই।' রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস আর কিছু বললো না। নিজের আস্তানায় ফিরে এল। হ্যারি তখন বেড়াতে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। বললো, 'রাজাকে সব বলেছো।'

—'হ্যাঁ।'

—'কি বললেন রাজা।'

—'খুব খুশী হলেন। কিন্তু হ্যারি?'

ফ্রান্সিস একটু থেমে বললো, 'একটা বিপদের সূচনা লক্ষ্য করছি।'

—'কি বিপদ?' হ্যারি জিজ্ঞাসা করলো।

ফ্রান্সিস রাজামশাইয়ের আশঙ্কার কথা বর্বর ইউনিপেড্‌দের কথা সব বললো।

—'তা'হলে এখন কি করবো?' হ্যারি চিন্তিত স্বরে বললো।

—'আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাবো। চলো কাল থেকেই লাগবো।'

—'বেশ—' হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো।

★ ★ ★

পরদিন ফ্রান্সিস নেসার্ককে দিয়ে একটা মশাল আনালো। বাইরে আজকের আকাশটা কিছু পরিষ্কার। তবু গীর্জার ভেতরের অন্ধকারে এই আলোয় কিছুই দেখা যাবে না। ভালোভাবে সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হ'লে আরো একটা মশাল চাই।

নেসার্ককে সঙ্গে নিয়ে ওরা গীর্জার দিকে চললো। কতদিনের পুরনো গীর্জা। কালো-কালো পাথরে শ্যাওলা ধ'রে গেছে। কবরখানা পেরিয়ে ওরা গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ালো। বিরাট শ্লেটপাথরের দরজা। দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে। নেসার্ক কোমরে ঝোলানো একটা লম্বা পেতলের চাবি বের করলো। ও যখন তালা খুলছে, তখন ফ্রান্সিস বললো, 'গীর্জাটা দেখাশুনা করবার কেউ নেই?'

—'একজন যাজক ছিলেন। তিনি বছর খানেক হলো মারা গেছেন। রাজামশাই নরওয়ে থেকে একজন নতুন যাজক আনার জন্য চেষ্টা করছেন।'

দরজা খোলা হ'ল। বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলতে হ'ল। ওরা ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকার ভেতরটা। নেসার্ক চকমকি ঠুকে মশালটা জ্বালালো। মশালের আলোয় বেশ

পরিষ্কার দেখা গেলো চারদিকে। পাথরের বেদীটা লাল সাটিনের কাপড়ে ঢাকা। ঢাকনাটায় হলুদ সুতোর কাজ করা। তা'তে ঝালর লাগানো।

পেছনের গলি জানলায় রঙীন কাঁচ। পাথরের বেদীটার ওপর একটা কাঠের বেদী। তার ওপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর বেশ বড় পেতলের মূর্তি। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মুখে ক্ষীণ হাসি। মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। চোখ দু'টো খুব সজীব, এক পাশে তাকিয়ে আছেন। ''যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো—'' কথাটা মনে হতেই ফ্রান্সিস যীশুর মূর্তিটার পায়ের দিকে তাকালো। দেখলো, যীশুর পায়ে পেরেক পোঁতা। ক্রুশের কাঠটা নীচের কাঠের বেদীটার মধ্যে ঢোকানো। ঐ কাঠটাই মূর্তিটার ভারসাম্য রক্ষা করছে। ফ্রান্সিস কাঠটা, কাঠের বেদীটা ভালো ক'রে দেখলো। কিন্তু কিছুই বিশেষত্ব পেল না। ফ্রান্সিস দেখছে, তখনই মশালের আলোটা আড়াল পড়ে গেলো। ও দেখলো, যীশুর মূর্তিটার পিছনে মেঝের কাছাকাছি এক কোণের দেওয়ালে একটা লোহার আংটা বেরিয়ে আছে। নেসার্ক তাতে মশালটা রেখেছে। ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হলো। অত নীচে মশাল রাখবার আংটা? আলো তো ঢাকা পড়ে যাবে।

নেসার্ককে বললো, 'অত নীচে মশাল রাখলে আলো তো ঢাকা পড়ে যাবে।'

নেসার্ক বললো, 'ওটা মশাল রাখারই আংটা। বরাবর উৎসবের দিনে ওখানেই মশাল রাখা হয়। এরিক দ্য রেডের আমল থেকে নাকি তা চলে আসছে। ও'পাশের দিকটা দেখিয়ে বললো, ও-দিকেও ঠিক এ-রকম একটা আংটা আছে। ফ্রান্সিস সেদিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ঠিক ও-রকমই একটি আংটা আছে। ফ্রান্সিস সেদিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ঠিক ও-রকমই একটি আংটা মেঝের কাছাকাছি দেয়ালে গাঁথা। হ্যারির দিকে ফিরে বললো, 'হ্যারি, ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত লাগছে না? অত নীচে মশাল রাখবার আংটা?'

—'হুঁ। হয়তো আগে কিছু রাখা হ'ত, এখন মশাল রাখা হয়।'

—'আগে কী রাখা হ'ত?'

—'এ-বিষয়ে আমরা সবাই অন্ধকারে। কারণ, ব্যাপারটা আজকের না অনেকদিন আগের।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক। তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

দু'জনে আর কিছুক্ষণ গীর্জাটার ভেতরে ঘোরাঘুরি করলো মনোযোগ দিয়ে সবকিছু দেখলো। তারপর আস্তানার দিকে ফিরে আসতে লাগল, তখনই একটু দূরে উত্তরদিকে পাহাড়টা দেখলো ফ্রান্সিস। এসে অবধি সব জায়গা দেখা হ'য়েছে, কিন্তু পাহাড়টা দেখা হয়নি। ও নেসার্ককে ডাকলো, 'নেসার্ক?'

—'বলুন?'

—'ঐ পাহাড়টার কী নাম?'

—'সক্কারটপ পাহাড়।'

—'কত উঁচু?'

—'খুব বেশী নয়?'

—'ও!'

—'পাহাড়টার ও'পাশের নিচের দিকে আমার টুপিক।'

--'চলো, তোমার টুপিক কালকে দেখতে যাবো।' হ্যারি বললো।

--'বেশ তো আপনারা গেলে আমাদের বুড়ো বাবা-মাও খুব খুশী হ'বে। নেসার্ক বললো।

পরের দিন দুটো শ্লেজগাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি চললো পাহাড়টার ওপাশে। সঙ্গে নেসার্ক। পাহাড়টাকে বাঁ দিকে রেখে ওরা ঘুরে ওপাশে গেলো। দূর থেকেই নেসার্কের টুপিক দেখা গেলো। আজকের দিনটা অন্যদিনের চেয়ে বেশ উজ্জ্বল। সাদা বরফের পাহাড়টা থেকে যেন আলো ছিটকে পড়ছে। আজকে শীতটাও একটু কম। খুব ভালো লাগছিলো ফ্রান্সিসের।

ওরা নেসার্কের টুপিকের সামনে এসে গাড়ি থামালো।

টুপিকের বাইরে দড়িতে হরিণের চামড়া শুকোতে দেওয়া হয়েছে, এস্কিমোদের তাঁবু যেমন হয়ে থাকে। নেসার্কের বাবা-মা বেরিয়ে এলো টুপিক থেকে। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ওরা জড়িয়ে ধরলো। এস্কিমোদের ভাষায় কি যেন বলতে লাগলো। নেসার্ক হেসে বললে, বাবা-মা বলছে, 'আমাদের গরীবের টুপিক। আপনাদের উপযুক্ত সমাদর করতে পারবো না বলে কিছু মনে করবেন না যেন।'

ওদের টুপিকের মধ্যে বিছানায় বসতে বললো। ওরা দুজনে বসলো। সকালেই নেসার্কের মা ওদের জন্য বল্গা হরিণের মাংস রেঁধে রেখেছিলো। তাই খেতে দিলো সঙ্গে রুটি এতো সুস্বাদু হয়েছে রান্না, যে এক বাটি মাংস ফ্রান্সিস এক লহমায় খেয়ে নিলো।

হ্যারি ওর কাণ্ড দেখে হাসলো। তারপর নিজের বাটি থেকে কিছুটা মাংস আর ঝোল ওর বাটিতে ঢেলে দিলো। নেসার্ক অবশ্য বলতে লাগলো, 'আরো মাংস আছে। আপনারা পেট ভরে খান।'

কিন্তু ফ্রান্সিস লজ্জায় চাইতে পারলো না।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা চারপাশটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখলো। দেখবার কিছুই নেই। শুধু বরফ আর বরফের বিরাট-বিরাট চাঁই পাহাড়টার গায়ে।

'বিদায় দেবার সময় ফ্রান্সিস নেসার্কের বাবা-মার হাত ধরে বার-বার বললো, 'কুয়অনকা! কুয়অনকা!'

এস্কিমোদের ভাষার এই শব্দটাই ও জানে শুধু। নেসার্ককে বললো, 'তুমি এরকমভাবে তোমাদের বসতি থেকে দূরে থাকো কেন?'

নেসার্ক হেসে আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়টা দেখালো। বললো, 'জ্যোৎস্না রাত্রে এই পাহাড়ের রূপ দেখেন নি। সে-যে কী অপরূপ দৃশ্য! টুপিকের ফাঁক দিয়ে সেই দৃশ্য দেখি। মনে হয়, সমস্ত পাহাড়টা যেন একটা বিরাট হীরের খণ্ড। মৃদু আলো ঠিকরোয় বরফের চাঁইগুলো থেকে। আমার কাছে এই সবকিছু ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে হয়। আপনারা হয়তো আমাকে পাগল ঠাওরাবেন কিন্তু—'

—'না নেসার্ক। তুমি যা বলছো, তা মিথ্যে নয়। তোমার মত দেখার চোখ, আর অনুভবের মন পাওয়া ভাগ্যের কথা।' ফ্রান্সিস নেসার্কের কাঁধে হাত রেখে কথাগুলো বললো।

নেসার্ক টুপিকেই থেকে গেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি একটা শ্লেজগাড়ি চড়ে বাট্টাহালিডে ফিরে এলো।

ফ্রান্সিসদের দিন কাটতে লাগলো। ও নেসার্কের কাছ থেকে গীর্জার চাবিটা নিয়ে

রেখেছে। কখনো হ্যারিকে নিয়ে কখনো একা গীর্জাটায় ঢোকে। চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখে — হয়তো এই গীর্জার নীচেই লুকনো আছে গুপ্তধন? কিন্তু কোথায়? পায়চারী করে আর ভাবে — কোথায়, কিভাবে লুকনো আছে সেই গুপ্তধন? কিন্তু ভেবে-ভেবে কূল-কিনারা পায় না। আর কোন নতুন সূত্রও পায় না।

রাজা সোক্কাসন মাঝে-মাঝে ডেকে পাঠান, জিজ্ঞাসা করেন — 'অনুসন্ধানের কাজ কেমন চলছে? ফ্রান্সিস বলে, 'চেষ্টা করছি, কিন্তু কোন সূত্র পাচ্ছি না।'

একদিন ফ্রান্সিস রাজাকে জিজ্ঞেস করল —'এরিক দ্য রেডের লেখা আর কোন বই আপনার যাদুঘরে আছে?'

'না! তবে শুনেছি, উনি 'নিউ টেস্টামেন্ট' ও অনুবাদ করছিলেন। কিন্তু সেই বইখানা আমরা কেউ চোখে এখনও দেখি নি।'

★ ★ ★

এভাবেই ফ্রান্সিসের দিন কাটতে লাগলো।

এর মধ্যেই একদিন ভোরবেলা রাস্তায় লোকজনের খুব হৈ-হৈ ডাকাডাকি শোনা গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও বাইরে এসে দেখলো, দলে-দলে এস্কিমোরা, রাজার সৈন্যরা কুঠার, বর্শা হাতে পাহাড়টার দিকে চলেছে। হ্যারিরও ঘুম ভেঙে গেল। ও এসে ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়ালো। কী ব্যাপার, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

একটু পরেই নেসার্ক এলো। ওরও হাতে কুঠার, ও হাঁপাচ্ছিল। বললো, গুপ্তচর খবর নিয়ে এসেছে, ইউনিপেড়রা সাক্কারটপ পাহাড়ের নীচে জড়ো হয়েছে। হয়তো এতক্ষণে আক্রমণ শুরু করবে। আপনারা বাইরে বেরোবেন না — রাজা হুকুম দিয়েছেন। আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।'

—'ওদের কি লোকজন বেশী?' ফ্রান্সিস জানতে চাইলো।

—'হতে পারে। এর আগে দু'দু'বার আমরা ওদের হঠিয়ে দিয়েছি। এবার তাই হয়তো বেশী লোকজন নিয়ে এসেছে'।

নেসার্ক আর দাঁড়ালো না। ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত স্লেজগাড়িতে উঠে পড়লো।

একটু বেলা হতেই যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল এখানে এসেও পৌঁছতে লাগলো। সন্দেহ নেই, মরনপণ যুদ্ধ চলেছে।

হ্যারি ডাকলো, 'ফ্রান্সিস?'

—'উ?'

—'এখন কী করবে?'

—'সন্ধ্যে নাগাদ যুদ্ধের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। রাত নেমে আসতে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। দুটো একটা করে স্লেজগাড়ি আহত-নিহতদের নিয়ে ফিরতে লাগলো। রাজবাড়ি বাইরের সব ঘরে আহতদের রাখা হলো। অনেক রাত পর্যন্ত আহতদের আর্তনাদ শোনা গেল।

তখন গভীর রাত, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ। ফ্রান্সিসের আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও আস্তে-আস্তে হ্যারিকে ধাক্কা দিলে। ঘুম ভেঙ্গে হ্যারি উঠে বসলো। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বললো, 'তরোয়ালটা হাতে নিয়ে তৈরী থাকো।' তারপর নিজে তরোয়াল হাতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তখনও দরজায় ধাক্কা দেওয়ার বিরাম নেই। ফ্রান্সিস বললো, 'কে?'

—'আমি — আমি নেসার্ক।' নেসার্ক ঘরে ঢুকেই বললো, 'চলো, আগে রাজামশাই কী বলেন শুনি।'

দুজনে নেসার্কের পিছু-পিছু রাজবাড়ির সামনে এলো। অল্প জ্যোৎস্নায় ওরা দেখলো, অনেকগুলো শ্লেজগাড়ি সাজানো হয়েছে। এসব কাজ চলেছে নিঃশব্দে। মশালও জ্বালানো হয়নি। বল্গা হরিণ-টানা একটা শ্লেজগাড়িতে রাজা-রানী বসে আছেন। রানীর কোলে ঘুমন্ত শিশু রাজকুমার। ওরা মাথা নুইয়ে রাজা-রানীকে সম্মান জানালো। রানীকে আগে ফ্রান্সিস দেখেছিল। কী সুন্দর উজ্জ্বল ছিল তাঁর রূপ। আজকে দেখলো মলিন মুখ বিমর্ষ, চিন্তাক্লিষ্ট।

রাজা ফ্রান্সিসকে কাছে ডাকলেন। কেমন ভগ্নস্বরে বললেন, 'দেখুন, যুদ্ধ আমাদের অনুকূলে নয়। আমার প্রজারা আমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করছে করবেও, কিন্তু আমাদের জয়ের কোন আশা নেই। আমরা কোর্টল্ডে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। আপনাদের জন্যে গাড়ী তৈরী রাখা হয়েছে, আসুন।'

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে বললো, 'না মহারাজ, আমরা এখানেই থাকবো। ইউনিপেড্‌দের সঙ্গে আমাদের তো কোন শত্রুতা নেই।'

—'তা' হলেও ওরা হিংস্র বর্বর। সভ্য রীতি ওরা মানে না।'

—মহারাজ, কব্জির জোরে নয়, বুদ্ধির জোরেই আমরা বেঁচে থাকবো। ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

রাজা সোক্কাসন ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন। ওদিকে রাজা ও অমাত্যদের পরিবারের লোকজন নিয়ে অন্য গাড়িগুলো রওনা হতে শুরু করেছে। রাজা সেদিকে একবার তাকালেন। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে ফিরে বললেন, দেখুন আমি আপনাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবার সব বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু আপনারা রাজী হলেন না। এরপরে আপনাদের যদি কোন ক্ষতি হয়, তার জন্যে আমাকে দায়ী করবেন না।'

—'না মহারাজ। আমরা নিজেদের দায়িত্বেই এখানে থাকছি।'

—'বেশ।' রাজা গাড়ি-চালককে ইঙ্গিত করলেন।

বল্গা হরিণে-টানা গাড়ি বরফের ওপর দ্রুতবেগে ছুটলো। অন্য গাড়িগুলোও ছুটলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের ঘরে ফিরে এলো। দু'জনেই আর ঘুমুতে পারলো না। হ্যারি একসময় বললো, 'এভাবে থেকে যাওয়াটা কী ভালো হলো?'

—'পালিয়ে গিয়েই বা কী হতো? অলস সময় কাটাতাম শুধু। কিন্তু এখানে থাকলে গুপ্তধনের খোঁজ চালিয়ে যেতে পারবো।'

—'কিন্তু ইউনিপেড়রা কি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে?'

—'দেবে, কারণ ওদের রাজা এভাল্ডাসনের লক্ষ্য এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন। আমরা ওর এই ধনলিপ্সাটাকেই কাজে লাগাবো। আমরা সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে দেবো, এই শর্তে আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

—'হুঁ কথাটা ঠিক। কিন্তু এভাল্ডসন কেমন লোক, তা এখনও জানি না।'

—'দেখা যাক।' এই সব কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বাকী রাতটুকু কেটে গেল।'

★ ★ ★

পরের দিন সকাল থেকেই আবার হৈ-হল্লা। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যেতে লাগল সৈন্যরা।

দুপুর নাগাদ আহত-নিহত সৈন্যদের নিয়ে গাড়ি ফিরতে লাগল। তার পেছনেই দলে-

দলে ইউনিপেড়্রা বাট্টাহালিডে ঢুকতে লাগল। বোঝাই গেল, রাজা সোক্কাসনের সৈন্যরা হেরে গেছে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি এই প্রথম ইউনিপেড্দের দেখলো। এস্কিমোদের মতই পোশাক ওদের। তবে অত্যন্ত নোংরা আর ছেঁড়াখোড়া। মুখে-হাতে কাদা মাখা, ঘাড় মাথা-ঢাকা নোংরা টুপীর মত। মাথায় খোঁচা-খোঁচা চুল তারই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে। চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওরা হিংস্র। ওদের হিংস্রতার নমুনা ফ্রান্সিস আর হ্যারি দেখলো। আহত এস্কিমোদের একটা গাড়ী রাস্তার পাশে ছিল। ইউনিপেড়্রা চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই গাড়ির ওপর। কুঠার চালিয়ে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে লাগল সেই আহতদের। তাদের করুণ চীৎকারে আকাশ ভরে উঠলো। আর একদল ইউনিপেড় কুঠার আর বল্লম হাতে কাছাকাছি টুপিকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারী শিশুদের কান্নার রোল উঠলো। ওরা বোধহয় কাউকে বেঁচে থাকতে দেবে না। নির্বিবাদে হত্যা করবে সবাইকে। শ্মশান করে ছাড়বে বাট্টাহালিড্কে।

ফ্রান্সিসরা দরজা বন্ধ করে সরে এল! বিছানায় বসলো না, পায়চারী করতে লাগলো। ওদিকে বিজয়ী ইউনিপেড্দের হৈ-হল্লা চীৎকার চলেছে। এক সময় হঠাৎ ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়লো। চিন্তিতস্বরে ডাকল, 'হ্যারি।'

—'বলো।'

—'আমরা কি ভুল করলাম?'

হ্যারি বিছানায় বসেছিল, এবার উঠে এসে ফ্রান্সিসের মুখোমুখি দাঁড়ালো। দৃঢ়স্বরে বললো, 'তুমি এই চিন্তাকে একেবারে প্রশ্রয় দিও না। আমরা যা করেছি, ঠিক করেছি, ঠিক করেছি। মনটা শক্ত করো।'

ফ্রান্সিস বুঝলো, হ্যারি ঠিক কথাই বলেছে। এখান থেকে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের পর, আর পালানোর প্রশ্ন ওঠে না। তা-ছাড়া এখন আর পালাবার উপায়ও নেই।

বাইরের হৈ-হল্লা সমানে চলেছে, তখন হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড জোরে লাথি পড়তে লাগল। শ্লেটপাথরের দরজা, ভেঙে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই তাড়াতাড়ি তরোয়াল তুলে নিল। তারপর ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে এগিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েই ঝট করে পেছিয়ে এলো। দু'জন ইউনিপেড় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো।

ফ্রান্সিস নরওয়ের ভাষায় চীৎকার করে বললো, 'কী চাই?'

ওরা এতক্ষণে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ওরা এস্কিমোদের দেখবে ভেবেছিল, দেখলো দু'জন য়ুরোপীয়ানকে। একজনের হাতে একটা রক্তমাখা কুঠার, অন্যজনের হাতে বর্শা। ফ্রান্সিসের কথা ওরা কিছুই বুঝল না। দু'জনে একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। তারপর কুঠার হাতে লোকটাই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসের ওপর। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তরোয়াল চালালো। কিন্তু তরোয়ালটা ওর বুক ছুঁয়ে গেল। চামড়ার নোংরা পোশাকটা দো ফালা হয়ে গেল।

ওদিকে অন্য লোকটা হ্যারিকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। হ্যারি ঝট্ করে বসে পড়লো। বর্শাটা ওর মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পাথুরে দেয়ালে লেগে ঝনাৎ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। ওদিকে কুঠার হাতে লোকটা ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে কুঠার চালালো। কিন্তু ভারী কুঠার নিয়ে তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করা যায় না, ফ্রান্সিস সেই সুযোগটা নিল। ঝট্ করে মাথা সরিয়ে কুঠারের ঘাটা এড়িয়ে, একমুহূর্ত দেরী করল না। নীচু হয়ে সোজা তরোয়াল বসিয়ে দিল লোকটার বুকে।

লোকটা 'অঁক' করে একটা শব্দ তুলে চিৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। তারপর গোঙাতে লাগল। ওদিকে বর্শা হাতছাড়া হওয়ায় অপর লোকটি খালি হাতে দাঁড়িয়ে রইল। একবার দরজার দিকে তাকালো, অর্থাৎ পালাবার ধান্দা। কিন্তু ফ্রান্সিস ওকে সেই সুযোগ দিল না। ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার ওপর। তারপর লোকটার পেটে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। লোকটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল। আগের লোকটি তখন মরে গেছে। ফ্রান্সিস জোরে শ্বাস ফেলে ফেলে বললো, —'দুটোকেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।'

ওরা তাই করল। লোক দুটোকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে বাইরে বরফের ওপর ফেলে দিল। অত লোকজনের ছুটোছুটি হৈ-হল্লার মধ্যে কারো নজরে পড়লো না ব্যাপারটা।

ওরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সারাটা দিন আর কেউ ওদের ঘরের দিকে এলো না। কিন্তু সন্ধ্যের পর ওদের দরজার সামনে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনলো ওরা। দরজা একটু ফাঁক করে দেখলো, একদল ইউনিপেড় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মশাল হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোধহয় রাজবাড়ির ঘরগুলোতে হানা দিতে বেড়াচ্ছে।

বিছানায় বসল দু'জনে। খুব চিন্তিত স্বরে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বললো, 'এখন কী করা যাবে?'

হ্যারি বললো, 'অতলোকের মোকাবিলা করতে যাওয়া বোকামি। লড়াই নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচতে হবে।'

হ্যারির কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় দমাদ্দম লাথি পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে দরজায় ধাক্কা। ফ্রান্সিস এগিয়ে দরজা খুলে পেছিয়ে দাঁড়ালো। ইউনিপেড়রা মশাল হাতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। কারোর হাতে বর্শা, কারোর হাতে কুঠার। মশালের আলোয় ওদের ভাবলেশহীন কাদা মাখা মুখ বীভৎস লাগছে দেখতে। ওরা ফ্রান্সিসদের দেখে একটু অবাক হলো।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো, 'হ্যারি তরোয়াল ফেলে দাও।'

দু'জনেই তরোয়াল ফেলে দিল। পাথরের মেঝেতে শব্দ হলো - ঝনাৎ - ঝনাৎ। ওরা যে যুদ্ধ চায় না, বরং আত্মসমর্পণ করছে, ফ্রান্সিস এটা ওদের বোঝাল। ওদের মধ্যে থেকে একজন বলশালী চেহারার লোক এগিয়ে এসে এস্কিমোদের ভাষায় কী বলল। সবটুকু না বুঝলেও ফ্রান্সিস বুঝল, ও বলতে চাইছে তোমরা এখানে কী করছো? ফ্রান্সিস চীৎকার করে নরওয়ের ভাষায় বললো, 'আমরা রাজা এভাল্ডাসনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ফ্রান্সিস বারবার কথা বলতে লাগল, আর রাজা এভাল্ডাসন শব্দটার ওপর জোর দিতে লাগল। ওরা ফ্রান্সিসের কথা না বুঝলেও রাজা 'এভাল্ডাসন' শব্দটা বুঝল। ওদের মধ্যে দু'একজন দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলে উঠে কুঠার তুলে ধরল। বলশালী লোকটা হাত তুলে ওদের নিরস্ত করল। তারপর একজনের হাত থেকে দড়ি নিয়ে এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিস আবার চীৎকার করে বললো, 'রাজা এভাল্ডসনের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই।' এদিকে বলশালী লোকটা ও আর একজন মিলে, ফ্রান্সিস ও হ্যারির হাত পিছমোড়া করে বেঁধে তারপর ফ্রান্সিসকে দরজার দিকে ধাক্কা দিল।

ফ্রান্সিস রাগে ফুঁসতে লাগলো। কিন্তু এখন এই পরিবেশে মাথা গরম করা বোকামি। এখন বাঁচতে হবে।

★ ★ ★

ইউনিপেড্‌দের দল ওদের নিয়ে চললো। রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল ওরা। তারপর সভাগৃহে ঢুকল। ফ্রান্সিস দেখলো, অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। রাজার পাথরের বেদীমত আসনটায় কে মোটামত একটা লোক হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল, এই লোকটাই ইউনিপেড্‌দের রাজা — 'এভাল্ডাসন'। রাজার পরণেও নোংরা পোশাক। মুখটা বেশ ভারী। কপালের ওপর খোঁচা - খোঁচা চুল নেমে এসেছে। মুখে সামান্য দাড়ি-গোঁফ। কুত্‌কুতে চোখ। দেখলো, রাজা একটা বল্গা হরিণের আস্ত ঠ্যাং থেকে মাংস ছাড়িয়ে খাচ্ছে। রাজার আসনের পাশেই একটা রক্তমাখা কুঠার পড়ে আছে। সেই বলশালী লোকটা একনাগাড়ে কী বলে যেতে লাগলো, আর রাজামশাই কুতকুতে চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগলো। লোকটার কথা শেষ হলে রাজামশাই মাংস খাওয়া থামিয়ে চীৎকার করে কী বলে উঠলো। দু-তিনজন ইউনিপেড্ ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের ধাক্কা দিতে লাগলো। ফ্রান্সিস বুঝলো না, রাজা কী আদেশ দিলো। তবে এটা বুঝলো, যে বিপদ কাটে নি। ও তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললো, 'রাজা এভাল্ডাসন আপনাকে একটা জরুরী কথা বলতে চাই।' এদিকে ইউনিপেড্‌রা ওদের দুজনকে ঠেলছে আর ফ্রান্সিস একনাগাড়ে কথাটা বলে চলেছে ওখানে। কেউই ওর কথা বুঝল না। এমন সময় অমাত্যদের আসনে বসা একজন লোক উঠে রাজাকে গিয়ে কী বললো, তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে ভাঙা - ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বললো - 'তোমার নাম কি?'

ফ্রান্সিস খুশী হল। অন্তত একজনকে পাওয়া গেল যে নরওয়ের ভাষা বোঝে। তখন উত্তর দিল — 'ফ্রান্সিস'।

ফ্রান্সিস এবার লোকটার দিকে তাকালো। দেখলো, একজন অল্প দাড়ি - গোঁফওয়ালা বৃদ্ধ। মুখ-চোখ বেশ শান্ত, যদিও পরণে সেই নোংরা চামড়ার পোশাক। বৃদ্ধ বললো, 'আমি ইউনিপেড্‌দের মন্ত্রী। একমাত্র আমিই নরওয়ের ভাষা একটু বুঝি, আর একটু বলতে পারি। রাজাকে তুমি কী জরুরী কথা বলতে চাও?'

—'আমরা জাতিতে ভাইকিং।' ফ্রান্সিস বললো, 'আমরা এখানে এসেছি, এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন খুঁজে বের করতে।'

এরিক দ্য রেডের নামটা শুনে রাজা মাংস খাওয়া থামিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো।

—'তোমরা কি কোন খোঁজ পেয়েছো?'

—'না, তবে একটা মূল্যবান সূত্র পেয়েছি।'

রাজামশাই এবার অস্বস্তি প্রকাশ করলো। মন্ত্রীকে ডেকে কি বললো। মন্ত্রীও ঐ ভাষায় কিছু বললো। রাজামশাই ঠ্যাং চিবুনো বন্ধ করে কি বলে উঠলো।

মন্ত্রী বললো, 'রাজা এভাল্ডাসন জানতে চাইছেন, তোমরা কী ধরনের সূত্র পেয়েছো'?

ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস করে বললো, "হ্যারির ওষুধে কাজ হয়েছে।" বোধহয় কতটা কাজ হয়েছে, বোঝার জন্য ফ্রান্সিস বলে উঠলো, 'তার আগে আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দিতে হবে।'

মন্ত্রীমশায় বলশালী লোকটাকে কি বললো। দু'জন এসে ওদের হাতের বাঁধন খুলে দিলো। ফ্রান্সিস তখন 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বইয়ের কথা, সাংকেতিক লেখা, এসব বলে গেলো।

রাজা অধৈর্য হয়ে বারবার মন্ত্রীকে কি বলতে লাগলো। মন্ত্রী কোন কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে ফ্রান্সিসের কথা শুনতে লাগলো। কথা শেষ হলে মন্ত্রী রাজাকে ইউনিপেড্দের ভাষায় সব বলে গেলো। রাজা ঠ্যাং ছুঁড়ে ফেলে সিংহাসনের ওপর এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। তারপর চীৎকার করে কি বলে উঠলো।

মন্ত্রী বললো, 'রাজামশায় বলছেন, 'এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন তাঁর এক্ষুণিই চাই।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসলো। বললো, 'রাজাকে বলুন, অত তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হলে, অনেক আগেই লোকে উদ্ধার করতো। যাকগে, আমরা আর কোন সূত্র পাই কিনা, সেই চেষ্টায় আছি।'

মন্ত্রী রাজাকে তাই বললো। রাজামশাই আবার কি বললো, মন্ত্রী বললো, 'রাজামশাই জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা কি পারবে?'

—'চেষ্টা করবো। তবে, দুটো শর্ত আছে।'

—'বলো।'

—'এক, যে ঘরে আমরা ছিলাম, সেই ঘরে আমাদের থাকতে দিতে হবে। দুই আমাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিতে হবে।'

মন্ত্রী রাজাকে সব কথা বললো। রাজা কপালে হাত বুলালো একবার। তারপর কি বললো। মন্ত্রী বললো, 'রাজামশাই আপনাদের শর্তে রাজী হয়েছেন। তবে তাঁরও একটা শর্ত আছে।'

—'সেটা কী?'

—'তোমরা একজন যখন বাইরে বেরোবে, অন্যজনকে তখন ঘরে থাকতে হবে। দু'জনে একসঙ্গে কোথাও যেতে পারবে না।'

ফ্রান্সিস রাজার মুখের দিকে তাকালো। দেখলো, অল্প-অল্প গোঁফের ফাঁকে রাজা মিষ্টি-মিষ্টি হাসছে। ও বুঝলো, বর্বর অসভ্য হলে কি হবে, রাজা এভাল্ডাসন নির্বোধ নয়। ও সেই শর্তে রাজী হল। এখন যা শর্ত দেবে, তাই মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মন্ত্রী বললো, 'কবে থেকে কাজে লাগবে?'

—'কাল থেকেই।'

—রাজা আবার আসনে বসলো। আরো কয়েকজন এস্কিমোদের ধরে আনা হয়েছে। এবার তাদের বিচার হবে বোধহয়।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো।

★ ★ ★

পরের দিন ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দরজার বাইরে কাদের চলাফেরার শব্দ শুনলো। ও দরজা খুললো। দেখলো, দু'জন ইউনিপেড্ কুঠার হাতে দরজায় পাহারা দিচ্ছে। তার মানে রাজা এভাল্ডাসন ওদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়নি। হ্যারিকে ডেকে তুলল ও, পাহারার কথা বললো। হ্যারি বললো, 'এসব মেনে নিতেই হবে — উপায় নেই।'

সারাদিন ফ্রান্সিসরা ঘরে বসে কাটালো। বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস বেরলো। পাহারাদার দু'জনও ওর সঙ্গে - সঙ্গে চললো। সে গীর্জায় গেল, কোমরে গোঁজা ছিল চাবিটা।

ও দরজা খুলে গীর্জায় ঢুকলো, ঘুরে - ঘুরে দেখতে লাগল চারদিক। আজকেও সেই কড়া দুটো ওর নজর কাড়লো। এত নীচে দুটো কড়া গাঁথার অর্থ কী? এ সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার আস্তানায় ফিরে এলো।

এদিকে ইউনিপেড্রা এসে বাট্রাহালিডের যে কটা পাথরের বাড়ি ছিল, সে - কটা রাজ বাড়ির ঘরগুলো যত টুপিক ছিল দখল করে নিয়েছে। টুপিকের বাইরে আগুন জ্বেলে ওরা মাংস ঝল্সায়, খায় আর অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা করে।

সেদিন ওরা দু'জনে বিছানায় বসে আছে। বাইরে যথারীতি পাহারাদার দু'জন পাহারা দিচ্ছে। হ্যারি ডাকল, 'ফ্রান্সিস।'

—'বলো।'

—'আমাদের একজনকে পালাতেই হবে।'

—'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম। দেখ, গুপ্তধন খুঁজেছি, এই ধোঁকা দিয়ে বেশীদিন চলবে না। তার আগেই আমাদের কাউকে আঙ্গামাগাসালিকে যেতে হবে - বন্ধুদের নিয়ে আসতে হবে। তারপর কোর্টল্ড থেকে রাজা সোক্কাসনের যত সৈন্য আছে, সবাইকে একত্র করে বাট্রাহালিড আক্রমণ করতে হবে। এখান থেকে ইউনিপেড্দের তাড়াতেই হবে।'

—'তাহলে তুমিই পালাও -' হ্যারি বললো।

—'পালালে তো আমাকেই পালাতে হবে, তুমি এত ধকল সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু আমি পালালে তোমার না কোন বিপদ হয়।'

—'শোন -' হ্যারি বললো, 'তুমি পালালে আমি বলবো যে, আমি একটা নূতন সূত্র পেয়েছি। রাজা এরিক দ্য রেডের যাদুঘরটা আমাকে ভালো করে দেখতে হবে। প্রত্যেকদিন অনেকক্ষণ ধরে ঐ যাদুঘরে কাটাবো। এভাবে রাজা এভাল্ডাসনের বিশ্বাস অর্জন করবো। যাদুঘরের জিনিসপত্র নাড়া-চাড়া করবো। পাথরে মেঝে খুঁড়তে বলবো, এ-সব করতে-করতে তুমি লোকজন নিয়ে আসতে পারবে। তারপর শেষ লড়াই'।

হুঁ তাই করো। আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

পরের সারাটা দিন ফ্রান্সিস বা হ্যারি কেউই বেরলো না। সারাদিন এই পরিকল্পনা নিয়েই পরামর্শ করল। একটু রাত হতে ফ্রান্সিস তৈরি হলো। বেশী পোশাক পরলো, বিছানা থেকে হরিণের চামড়াটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালো। তরোয়ালটাও নিল। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর ও ঘরের বাইরে এলো। পাহারাদার দু'জন ওর সাজসজ্জা দেখে একটু অবাকই হলো। তবে এও বোধহয় ভাবলো যে ঠাণ্ডার রাত, তাই বেশি পোশাক পরেছে।

ফ্রান্সিস গীর্জার দিকে হাঁটতে লাগল। পাহারাদার দু'জন পেছনে চললো। ওরা তো আর জানে না, সে মনে-মনে কী ফন্দী এঁটেছে?

গীর্জায় পৌঁছে সে চাবি দিয়ে বিরাট তালাটা খুললো। ভেতরে ঢুকে চকমকি ঠুকে মোমবাতি জ্বালাল। এটা-ওটা দেখতে লাগল। দরজার বাইরে পাহারাদার দু'জন দাঁড়িয়ে রইল।

একটু রাত হলে, একজন পাহারাদার দরজায় ঠেস দিয়ে বসে ঘুমুতে লাগল। অন্যজন দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস দেখলো, এই সুযোগ। ও আংটায় বসানো একটা মশাল নিয়ে দরজার কাছে এলো। যে লোকটা জেগেছিল, তাকে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝালো

যে, মশালটা ও জ্বালাতে পারছে না। ও যেন এসে জ্বেলে দিয়ে যায়। লোকটা গীর্জার ভেতরে ঢুকলো। হাতের কুঠারটা মেঝের উপর রেখে, চকমকি পাথরে ইস্পাতের টুকরো ঠুকতে লাগল। ফ্রান্সিস অভিজ্ঞতা থেকে জানতো, এখানকার ঠাণ্ডায় মশাল জ্বলতে সময় লাগে। লোকটা চকমকি ঠুকে চলল। আস্তে-আস্তে গীর্জার বাইরে চলে এলো ফ্রান্সিস। ঘুমন্ত লোকটাকে ঠেললো কয়েকবার। ঠেলতেই লোকটা উঠে দাঁড়াল। চোখ কচলে দেখে সামনে ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে ওকে বোঝাল যে, গীর্জার ভেতরে তোমার বন্ধু তোমাকে ডাকছে। লোকটা ঘুমচোখে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখল না। ও তাড়াতাড়ি গীর্জার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ফ্রান্সিস এই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল, ও সঙ্গে-সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে দরজাটা বন্ধ করল। তারপর চাবি বের করে তালা লাগিয়ে দিল। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়, সে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এলো। তারপর বরফের ওপর দিয়ে ছুটে চললো সাক্কারটপ পাহাড়টার দিকে। উপায় নেই, ওই পাহাড়টা ডিঙাতে হবে। পাহাড়ের ধার দিয়ে যেতে গেলে, ওরা শ্লেজগাড়ি চালিয়ে ওকে সহজেই ধরে ফেলবে। কিন্তু গাড়ি তো আর পাহাড়ে উঠতে পারবে না।

বরফের ওপর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে পাহাড়ের নীচে পৌঁছে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। এতটা পথ একছুটে চলে এসেছে, এতক্ষণ মেঘ-কুয়াশায় অন্ধকার ছিল চারদিক। এবার মেঘ-কুয়াশা কেটে গেল। আকাশে দেখা গেল পূর্ণিমার চাঁদ। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। ইউনিপেড্‌রা যখন এখনও শ্লেজগাড়ি নিয়ে তাড়া করেনি, তার মানে ঐ পাহারাদার দুটো গীর্জা থেকে বেরোতে পারেনি। গীর্জাটা লোকালয় থেকে একটু দূরেই। ওরা দরজা ধাক্কা দিলেও কারো কানে সে শব্দ পৌঁছবে না। তাছাড়া ইউনিপেড্‌রা অনেকেই আগুন জ্বেলে মাংস ঝলসাচ্ছে আর আগুনের চারপাশে বসে ড্রাম পেটাচ্ছে আর গাইছে, হৈ-হল্লা করছে। কাজেই দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ কানেই যাবে না।

বরফের চাঁইয়ের ওপর সাবধানে পা ফেলে-ফেলে ফ্রান্সিস পাহাড়টায় উঠতে লাগল। দম নেবার জন্যে মাঝে-মাঝে থামছে, আবার উঠছে। এত উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তার মধ্যেও পাহাড়ের গায়ে চাঁদের মৃদু আলো পড়ে, যে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে, তা ওর দৃষ্টি এড়ালো না। সত্যিই, অপূর্ব দৃশ্য। সারা পাহাড়টা থেকে একটা নরম আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নেসার্ক যে কেন এই সৌন্দর্যকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেছে, এবার তার কারণ খুঁজে পেল ও।

এমন সময় চূড়োয় পৌঁছল ফ্রান্সিস। চাঁদটা তখন কিছুটা পূর্বদিকে ঢলে পড়েছে। ঘুরে দাঁড়াতে চূড়োর ওপাশে ওর দৃষ্টি পড়ল। ও চমকে উঠলো একটা দৃশ্য দেখে। চূড়োর ওপাশেই পাহাড়ের বুকে একটা বিরাট জলাশয়, প্রকৃতির কি আশ্চর্য খেয়াল! সেই টলটলে জলের ওপর কোথাও-কোথাও স্বচ্ছ কাঁচের মত বরফের পাতলা আস্তরণ। সেই জলাশয়ে চাঁদের আলো পড়ে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। সে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলো। তারপর জলাশয়ের ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পাহাড়ের পেছন দিকে এলো। উঁচু-নীচু বরফের চাঁইয়ের ওপর পা রেখে-রেখে ও নীচে নেমে এলো। অস্পষ্ট দেখতে পেল নেসার্কের চামড়ার তাঁবু।

ও যখন তাঁবুর সামনে পৌঁছল, তখন একেবারে দম শেষ। একটু দাঁড়িয়ে থেকে দম নিল। তারপর তাঁবুর চামড়া একটু সরিয়ে ডাকল, 'নেসার্ক - নেসার্ক।'

ও জানতো, নেসার্ক রাজার সঙ্গে কোর্টল্ডে চলে গেছে। থাকলে এখানে তার মা-বাবা আছে। বারকয়েক ডাকার পর কার নড়া-চড়ার শব্দ পেল। ও এবার একটু গলা চড়িয়ে ডাকল, 'নেসার্কের মা আছেন? নেসার্কের মা?'

এস্কিমোদের ভাষায় কে বলে উঠলো, 'কে?'

ফ্রান্সিস বুঝলো, এটা নেসার্কের মার গলা, ও খুশী হলো। অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমি ফ্রান্সিস, নেসার্কের বন্ধু'।

এবার চকমকি ঠোকার শব্দ শুনলো ও। প্রদীপ জ্বালল, দেখল নেসার্কের মা বিছানা থেকে উঠে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ আলোতে বুড়ী ফ্রান্সিসকে চিনে হাসল, মুখে বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হলো। ফ্রান্সিস এস্কিমোদের ভাঙা-ভাঙা ভাষায় বললো, 'আমি পালিয়েছি, এখানে থাকব—শ্লেজগাড়ি চাই'।

নেসার্কের মা মাথা নাড়ল, অর্থাৎ শ্লেজগাড়ি নেই। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। শ্লেজগাড়ি না পেলে কোর্টল্ড পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। অগত্যা একটা শ্লেজগাড়ি বাট্টাহালিড্ থেকে চুরি করতে হবে। ফ্রান্সিস এবার অন্য বিছানাটার দিকে তাকাল। কিন্তু নেসার্কের বাবাকে দেখতে পেল না। জিজ্ঞেস করলো, 'নেসার্কের বাবা কোথায়?'

বুড়ী কথাটা শুনে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো। বুঝলো, নেসার্কের বাবা মারা গেছে। ফ্রান্সিস বললো, 'কবে উনি মারা গেলেন?'

বুড়ী বললো 'ইউনিপেড্‌রা ওকে মেরে ফেলেছে।'

বলে হাত দিয়ে কুঠারর চালাবার ভঙ্গী করল, অর্থাৎ কুঠার দিয়ে মেরেছে। বুড়ী নিজে বোধহয় কোনরকমে পালিয়ে বেঁচেছে।

ফ্রান্সিস নেসার্কের বাবার বিছানায় বসে, হাতের ভঙ্গী করে বললো, 'এখন ঘুমোব।'

বুড়ী মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। সে শুয়ে পড়লো। অনেক চিন্তা মাথায় ভীড় করে এলো। শরীর প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো। আর চিন্তা না করে ও ঘুমাবার চেষ্টায় পাশ ফিরে শুলো।

পরের সারাটা দিন ও টুপিকেই রইল। একবারও বেরুলো না। ইউনিপেড্‌রা নিশ্চয়ই ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুপুরে নেসার্কের বুড়ী-মা ওকে খুব যত্ন করে খেতে দিল। এত সুস্বাদু রান্না অনেকদিন খায়নি ও। পাছে বুড়ীর কম পড়ে যায়, এইজন্যে সে একটু কম করেই খেলো।

টুপিকের ফাঁক দিয়ে ফ্রান্সিস সারাক্ষণ বাইরের দিকে নজর রাখলো। বিকেলের দিকে দেখলো দূরে একটা শ্লেজগাড়ি পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাঁক নিচ্ছে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি গুঁড়ি মেরে টুপিক থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর বরফের কয়েকটা চাঁইয়ের আড়ালে পাহাড়টার নীচে এলো। একটা বিরাট বরফের মধ্যে আত্মগোপন করলো। একটু পরেই একটা শ্লেজগাড়ি টুপিকের সামনে এসে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিস আড়াল থেকে দেখলো, সেই শক্তিশালী চেহারার লোকটা টুপিকের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এস্কিমোদের ভাঙা-ভাঙা ভাষায় বলছে, 'ভেতরে কে আছিস্ — বেরিয়ে আয়।' বুড়ী বেরিয়ে এলো। লোকটা তেমনি চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, এখানে ইউরোপিয়ান একজন এসেছিলো?'

বুড়ী জোরে - জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

লোকটা বিশ্বাস করলো না। টুপিকের ভেতরে ঢুকলো। একটু পরে বেরিয়ে এলো। গাড়িতে উঠতে-উঠতে বললো, 'কাউকে দেখলে খবর দিবি'।

বুড়ী মাথা নেড়ে বললো, 'আচ্ছা।'

বরফের ওপর ছড় - ছড় শব্দ তুলে শ্লেজগাড়িটা চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কুকুরগুলোর ডাক শোনা গেলো। তারপর গাড়িটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলো। ফ্রান্সিস বরফের ফাটলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। বুঝলো, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। ইউনিপেড্‌রা নিশ্চয়ই হন্যে হয়ে খুঁজছে। কোর্টল্ডের দিকে পালাতে হবে। কিন্তু তার জন্যে একটা শ্লেজগাড়ি চাই।

ও সন্ধ্যে থেকে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলো। ঘুম থেকে উঠে খেয়ে নিলো। তারপর বুড়ী আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। রাত একটু গভীর হতেই ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কোমরে ঝুলিয়ে, চামড়ার আর পশুর লোমে তৈরী চাদরটা গলায় জড়িয়ে নিলো। তারপর টুপিক থেকে বেরিয়ে এলো। বুড়ীকে ডাকলো না।

বাইরে কালকের রাতের মতোই জ্যোৎস্না পড়েছে। অপরূপ দেখাচ্ছে বরফের পাহাড়টা, যেন চাঁদের নরম আলো গায়ে মেখে শূন্যে ভাসছে ওটা।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে ফ্রান্সিস বেশ কিছুক্ষণ পর বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে গীর্জাটার কাছে এলো। গীর্জা, পাথরের বাড়িগুলোর আড়ালে - আড়ালে গুঁড়ি মেরে রাস্তার ধারে চলে এলো। অনেকক্ষণ থেকেই ইউনিপেড্‌দের ড্রাম বাজানো, হৈ-হল্লা শুনতে পাচ্ছিল। একবার দেখলো, পাশে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। অনেক ইউনিপেড্ আগুনটার চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে। ড্রামের বাদ্যি চলছে, গানও গাইছে অনেকে। আর আগুনে মাংস ঝলসানো চলছে।

ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগলো, যদি কোন শ্লেজগাড়ি পাওয়া যায়। দেখলো, শ্লেজগাড়ি কয়েকটাই আছে। কিন্তু কুকুর আর বল্গা হরিণগুলো খুঁটিতে বাঁধা। হরিণ বা কুকুরগুলো নিয়ে গিয়ে গাড়িতে জোড়া, বেশ ঝুঁকির ব্যাপার। ও যখন ভাবছে শেষ পর্যন্ত এই ঝুঁকি নিতেই হবে, তখনই দেখলো, একটা শ্লেজগাড়ি রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো লোক নামলো গাড়িটা থেকে। ম্লান চাঁদের আলোয় ও একটা লোককে চিনলো, সেই শক্তিশালী চেহারার লোকটা। সঙ্গীটিকে নিয়ে লোকটা আগুনের কুণ্ডের দিকে যেতে লাগলো। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, একেবারে তৈরী শ্লেজগাড়ী পাওয়া গেছে। লোকটা বোধহয় এই গাড়ি চড়ে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ফ্রান্সিস পাথরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর বরফের ওপর গুঁড়ি মেরে-মেরে শ্লেজগাড়িটার কাছে এলো। ইউনিপেড্‌রা তখন ড্রাম পেটাচ্ছে, হৈ-হল্লা করছে। সে আস্তে-আস্তে গাড়িটাতে উঠে বসল। ধীরগতিতে গাড়িটা পাথরের বাড়ির আড়ালে-আড়ালে চালিয়ে নিয়ে কিছুটা দূরে এলো। এমন সময় ঐ অগ্নিকুণ্ডের দিক থেকে, কে যেন চীৎকার করে বললো। ও দেখলো, কয়েকজন ইউনিপেড্ কুঠার হাতে ছুটে আসছে। ও এবার কুকুরগুলোর গায়ে জোরে চাবুক হাঁকালো। কুকুরগুলো জোরে ছুটতে লাগল। গাড়ি ছুটল দ্রুতগতিতে। একটু পরেই গাড়িটা বরফের প্রান্তরে এসে পৌঁছল। ও পেছনে তাকিয়ে দেখলো, বিস্তৃত তুষার প্রান্তরে লোকজন বা গাড়ির কোন চিহ্ন নেই।

গাড়ি চললো, ফ্রান্সিস আর গাড়ি থামাল না। বাকী রাতটুকু সমান গতিতে চালাতে লাগলো। বলা যায় না, বল্গা হরিণ-টানা শ্লেজগাড়ি নিয়ে যদি ইউনিপেড্‌রা ওর নাগাল পায়।

পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত গাড়ি চালালো। কিন্তু গাড়ির গতি কমে এলো।

কুকুরগুলো অনেকক্ষণ ছুটে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে নিজেও যথেষ্ট ক্লান্তবোধ করছিল, তাই গাড়ি থামালো। কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিলে, তারা বসে জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল। সে এবার গাড়িটায় কী-কী আছে পরীক্ষা করে দেখলো, সিন্ধুঘোটকের শুকনো মাংস, সীলমাছের টুকরো যত্ন করে রাখা। ঠ্যাং চর্বি-নাড়িভুঁড়ি এসব কুকুরের খাদ্যও আছে। শুকনো কাঠের টুকরো পেল কিছু, কিন্তু তাঁবু নেই। সেই খোলা প্রান্তরে ও চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বেলে মাংস রাঁধলো। নিজেও খেলো, কুকুরগুলোকেও খেতে দিল। তারপর আবার সব গুটিয়ে নিয়ে দক্ষিণমুখো গাড়ি চালালো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোর্টল্ড পৌঁছতে হবে।

সন্ধ্যে হলো, তবু ফ্রান্সিস গাড়ি থামালো না। একটু রাত হতে গাড়ি থামিয়ে আবার আগুন জ্বেলে রান্না করলো। নিজে খেলো, কুকুরগুলোকেও খেতে দিল। তারপর উন্মুক্ত বরফের প্রান্তরে বল্গা হরিণের চামড়া পেতে শুয়ে পড়লো। পায়ের কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাখল। ওর ভাগ্য ভাল, তুষার বৃষ্টি হলো না, শান্তিতেই কাটল রাতটা।

পরদিন আবার যাত্রা। এই পথে অনেক চাঁই-ভাঙা বরফ ভেঙে গাড়ি চালাতে হলো। খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে গিয়ে গাড়ির গতি গেল কমে। এবড়ো খেবড়ো সেই বরফের প্রান্তর পেরোতে দুপুর গড়িয়ে গেল। দুপুরে বিশ্রাম করে খাওয়া দাওয়া সেরে, সে আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে কোর্টল্ডের পাথরের বাড়িঘর নজরে পড়ল। বির্বিঘ্নে পথটা পার হতে পেরেছে বলে, সে মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো।

রাজা সোক্কাসনের বাসস্থান খুঁজে পেতে বেশী দেরী হলো না। একটা পাথরের বাড়িতে পুত্র ও রানীকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। বাড়িটার চারদিকে পাহারা দিচ্ছে একদল সৈন্য। ফ্রান্সিসকে দেখে ওরা চিনতে পেরে পথ ছেড়ে দিল।

একটা ঘরে বল্গা হরিণের চামড়ার বিছানায় রাজা সোক্কাসন বসেছিলেন। একটা মৃদু আলো জ্বলছিল ঘরে। ফ্রান্সিস রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। রাজা কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। রাজার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখ-মুখ দেখে সে মনে ব্যথা পেল। আস্তে-আস্তে বাট্টাহালিডে কী ঘটেছে, কী করে ও পালালো এইসব কথাই বলে গেল। রাজা শুনে গেলেন। তারপর বিষাদগ্রস্ত স্বরে বললেন, 'ফ্রান্সিস, আমি রাজ্যোদ্ধারের কোন আশাই দেখছি না। বাকী জীবনটা আমাকে এখানেই নির্বাসনে কাটাতে হবে।'

ফ্রান্সিস বললো, 'উদ্যম হারাবেন না মহারাজ। আমি একটা পরিকল্পনা ছকে নিয়েছি। যদি সফল হই, তাহলে আপনি আবার রাজ্য ফিরে পাবেন।'

রাজা কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

—'আচ্ছা নেসার্ক কোথায়?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'ও আঙ্গাগাসালিকে গেছে, খাবার-দাবার জিনিসপত্র আনতে।'

—'কবে ফিরবে।'

—'আজকেই ফেরার কথা।'

—'তাহলে আমি কিছুক্ষণ পরে আসবো।'

ফ্রান্সিস ঘরের বাইরে এলো। ও নুয়ালিকের খোঁজে বেরলো। খুঁজতে-খুঁজতে ও

স্থানীয় এস্কিমো-সর্দারের তাঁবুতে এলো। নুয়ালিক তাঁবুতেই ছিল, তাকে দেখে হাসল। ফ্রান্সিস বললো, 'নুয়ালিক, একটা থাকবার আস্তানা দাও।'

নুয়ালিক সব কথা বুঝল না, শুধু হাসতে লাগলো। ফ্রান্সিস তখন অঙ্গ-ভঙ্গী করে বোঝালো, ও শুয়ে থাকবার জায়গা চায়। নুয়ালিক মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝালো, তার একটা আস্তানা ও করে দেবে। সেটা করে দিলও। বড় তাঁবুটার কোণার দিক থেকে একটা ছোট ছেঁড়া তাঁবুর জায়গাগুলো দেখে ফ্রান্সিস হতাশ হলো। এই ছেঁড়া তাবুতে কি থাকা যাবে? নুয়ালিক ওর মনের ভাব বুঝতে পারল। একটু হেসে ও নিজের তাঁবু থেকে ছুঁচ আর চামড়া-পাকানো সুতো নিয়ে এলো। এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁবুটা সেলাই করে একেবারে নতুনের মতো করে দিল। তাঁবুর ভেতরে একটা কাঠের পাটাতনমতো পেতে দিল। তার ওপর সিন্ধুঘোটকের চামড়া পেতে দিল। ফ্রান্সিস চুরি-করা শ্লেজগাড়িতে কিছু বিছানার সরঞ্জাম পেল। সে-সব পেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সুন্দর বিছানামত হয়ে গেল। একটা সীলমাছের তেলের প্রদীপও জ্বেলে দিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ এই নতুন আস্তানাটায় রইলো। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে পরবর্তী যে কাজগুলো করতে হবে, সে-সব ভাবল। সবার আগে নেসার্ককে চাই। একমাত্র সেই হ্যারির খোঁজ আনতে পারবে। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে উঠে পড়লো। চললো, যে বাড়িতে রাজা আছেন সেইদিকে। বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছল যখন তখন রাত হয়েছে। বাইরে একজন এস্কিমো সৈন্য ভাবভঙ্গীতে জানালো, রাজা শুয়ে পড়েছেন। এখন দেখা হবে না। ফ্রান্সিস ওকে বারবার বলতে লাগলো, 'নেসার্ক ফিরেছে কিনা, সেই খবরটা আমার চাই।'

সৈন্যটা কিছুই বুঝতে পারল না। তখন সে বারবার 'নেসার্কে'র নাম করতে লাগল। সৈন্যটা তখন আঙ্গুল দিয়ে একটা তাঁবু দেখালো। তাহলে নেসার্ক ঐ তাঁবুটাতেই আছে।

ফ্রান্সিস তাঁবুটার কাছে গিয়ে নেসার্কের নাম ধরে ডাকতেই, সে বেরিয়ে এলো। ও তো ফ্রান্সিসকে দেখে অবাক, ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। দুজনে তাঁবুটাতে ঢুকল। আরো দু'জন এস্কিমো সৈন্য ভেতরে শুয়ে আছে। নেসার্ক বাট্টাহালিডের খবর জিজ্ঞেস করলো। সে সব ঘটনা বলে গেল, হ্যারীর বন্দীদশার কথাও বললো। এবার নেসার্ক জিজ্ঞেস করলো, 'আমার বাবা-মার সংবাদ কিছু জানেন?'

—'তোমাদের তাঁবুতেই আমি প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

—'বাবা-মা ভালো আছে তো?'

'এ্যাঁ - হ্যাঁ - হ্যাঁ।' ফ্রান্সিস আমতা - আমতা করে বললো।

নেসার্কের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিল। বললো, 'সত্যি করে বলুন।'

ফ্রান্সিস একটু ভাবল, এখন সামনে অনেক কাজ। নেসার্ক যদি বাবার মৃত্যুসংবাদে ভেঙে পড়ে, তাহলে সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে।

হ্যারি এখনও বন্দী, যা করবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। তবু বাবার মৃত্যু-সংবাদ ছেলের কাছে গোপন রাখা উচিত হবে না। সে নেসার্কের কাঁধে হাত রাখলো। তারপর বলতে লাগলো, 'নেসার্ক আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। আমার বন্ধুকে বাঁচাতে হবে। বাট্টাহালিড্ ইউনিপেড্দের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে। এখন তোমার সাহায্য না পেলে আমি কিছুই করতে পারবো না।'

—'আপনি সত্যি কথাটাই বলুন। যত দুঃখের হোক, আমি সহ্য করবো।'

—'তোমার বাবাকে ইউনিপেড্‌রা মেরে ফেলেছে।'

নেসার্ক শুধু একবার তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর মাথা নীচু করে বসে রইলো। একটু পরেই ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো। ফ্রান্সিস বুঝলো, ও নিঃশব্দে কাঁদছে। সে ওর দু'কাঁধে হাত রেখে ডাকল, 'নেসার্ক, ভাই কেঁদো না, বরং প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবো।'

নেসার্ক ক্ষাণিকক্ষণ চুপ করে থেকে চোখ মুছলো। তারপর সহজ গলায় বললো, 'আমি এর প্রতিশোধ নেবো।'

ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বললো, 'আমিও তাই বলি। ভেঙে পড়লে চলবে না। মনকে শক্ত করে কর্তব্যগুলো করে যেতে হবে। এখন এছাড়া উপায় নেই।'

—'আপনি কি ভেবেছেন বলুন'। নেসার্ক সহজ গলায় বললো।

—'আমার মূল পরিকল্পনা কার্যকর করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন হ্যারিকে, মানে আমার বন্ধুকে মুক্ত করে আনা। এটা আমরা পারবো না। কারণ আমাদের ওরা সহজেই চিনে ফেলবে।'

—'আমি চেষ্টা করবো।' নেসার্ক বললো, 'আপনি জানেন না, আমি অনেকদিন ইউনিপেড্‌দের হাতে বন্দী ছিলাম। ওদের ভাষা, জীবনযাত্রার পদ্ধতি সবই আমি জানি।'

—'তাহলে একমাত্র তুমিই পারবে।'

—'বেশ, এখন আপনি কী করবেন?'

—'কাল সকালেই আমি রাজা সোক্কাসনের কাছে একটা বল্গা হরিণ-টানা শ্লেজগাড়ি চাইব। গাড়ি নিয়ে আমি আঙ্গামাগাসালিকে যাবো। আমার বন্ধুদের নিয়ে এখানে আসব। তার পরের পরিকল্পনাটা এখানে এসে তৈরী করবো। তুমি ততোদিন কোথাও যাবে না, এখানেই থাকবে। ইউনিপেড্‌দের রাজা এভাল্ডাসন যে কোন মুহূর্তে আমার বন্ধুকে মেরে ফেলতে পারে।'

ঠিক আছে, আপনি আপনার বন্ধুদের নিয়ে আসুন। আমি এখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।

ফ্রান্সিস ওর হাত জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিল। তারপর তাঁবুর বাইরে চলে এলো। নিজের তাঁবুতে ফেরার সময় দেখলো, দিগন্তবিস্তৃত বরফের প্রান্তরে মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে। ও হিসেব করে দেখলো, এখন শুক্লপক্ষ চলছে। তার মানে আরও বেশ ক'দিন রাত্রে চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না।

পরদিন সকালেই নেসার্ককে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস রাজার সঙ্গে দেখা করলো। সে মোটামুটি তার পরিকল্পনা বললো। রাজা যেন কিছুটা আস্বস্ত হলেন। বললেন, 'তুমি পারবে ইউনিপেড্‌দের তাড়াতে?'

—'চেষ্টার ত্রুটি করবো না। এখন আমার একটা দ্রুতগামী গাড়ি চাই।'

—'তুমি আমার গাড়িটাই নাও। আমি তো আর এখন কোথাও বেরোচ্ছি না।' সেইমত নির্দেশ দিলেন।

বাইরে এসে ফ্রান্সিস নেসার্ককে বললো, 'তুমি গাড়িটা নিয়ে আমার তাঁবুর কাছে এসো। প্রায়োজনীয় সব জিনিস গাড়িটাতে দিও। আমিও আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে তৈরী থাকবো।

তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে ফ্রান্সিস তৈরী হয়ে নিল। একটু পরেই নেসার্ক রাজার বল্গা

হরিণে টানা গাড়িটা নিয়ে হাজির হলো। সব দেখে-শুনে সে দক্ষিণমুখো গাড়ি চালাতে লাগলো।

বল্গা হরিণে - টানা গাড়ি। তুষারের প্রান্তর দিয়ে অত্যন্ত বেগে ছুটে চললো। ও স্থির করল, সন্ধ্যের আগে আর গাড়ি থামাবে না। কিন্তু বিকেলের দিকে কুয়াশার গাঢ় আস্তরণের সামনে সব কিছু ঢেকে দিল। একটু পরেই প্রায় মাথার কাছে নেমে আসা মেঘ - কুয়াশা, তুষারবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ওর গাড়ি ধীরে-ধীরে চললো। ওর সমস্ত পোশাক তুষারে ঢেকে গেল।

ওর ভাগ্য ভালো বলতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপটা শুরু হলো। মেঘ - কুয়াশা উড়ে গেল, হাওয়ার বেগের প্রচণ্ডতাও কমলো। সন্ধ্যের মুখে আকাশে মেরু-নক্ষত্র দেখা দিল। একটু পরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোও দেখা গেল। ফ্রান্সিস বুঝল, হরিণগুলোর বিশ্রাম দরকার। নিজেও ক্লান্ত, এবার বিশ্রাম চাই। দুটো চাঁইয়ের কাছে এসে ও গাড়ি থামালো। দুটো চাঁইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় তাঁবু খাটালো। চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বেলে, শুকনো মাংস রাঁধলো। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লো। নানা চিন্তা মাথায় ভীড় করে এলেও, ওরই মধ্যে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন আবার পথ চললো। গাড়ির গতি যথেষ্ট বাড়িয়ে দিল। একেবারে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত একনাগাড়ে গাড়ি চালালো। দুপুরে বিশ্রামও নিল না, কিছু খেলোও না। সন্ধ্যেয় গাড়ি থামলো, রাত্রির মতো বিশ্রাম।

তিনদিনের দিন ও আঙ্গামাগাসালিক বন্দরে পৌঁছল। দূর থেকে সাঙুই ওকে প্রথম দেখলো, তখন দুপুর। সাঙখু ছুটতে-ছুটতে কাছে এলো। গাড়ি থামিয়ে সাঙখুকে তুলে নিল। যেতে যেতে বললো, 'কেমন আছো সাঙখু?'

সাঙখু হেসে মাথা ঝাঁকালো।

সমুদ্রের ধারে এসে থামল। দেখলো, ওদের জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে ও বন্ধুদের ডাকতে লাগলো। জাহাজের ডেকেই দাঁড়িয়ে ছিল বিস্কো। ফ্রান্সিসকে দেখে ওর মুখ খুশীতে ভরে উঠলো। ও ছুটোছুটি করে সবাইকে ডাকতে লাগলো। সবাই এসে ডেক-এ জড়ো হলো। কিন্তু ওরা বেশ অবাক হলো ফ্রান্সিসের সঙ্গে হ্যারিকে না দেখে। ওরা তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিল। ফ্রান্সিস আর সাঙখু সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে জাহাজে উঠে এলো। সব বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল। হ্যারির কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো।

ফ্রান্সিস সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলে গেল। তারপর সবাইকে সম্বোধন করে বললো, 'ভাইসব, অনেক বিশ্রাম করেছো। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। সাঙখুর সঙ্গে কয়েকজন চলে যাও। অন্ততঃ চারটে শ্লেজগাড়ি আর কুকুর জোগাড় করে আনো। আমরা এক্ষুণি কোর্টল্ড রওনা হবো।'

বিস্কো বললো, 'ফ্রান্সিস, আমাদের আধঘন্টা সময় দাও। আমরা খেয়ে-দেয়ে তৈরী হয়ে নিচ্ছি। তোমারও নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি?'

—'বেশ আমিও খেয়ে - দেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারতে হবে।'

সাঙখু শ্লেজগাড়ি যোগাড় করতে চলে গেল। একটু পরেই এস্কিমো - সর্দার কালুটুলা এলো। বোধহয় সাঙখুর কাছে খবর পেয়েছে। ও মুখ গম্ভীর করে ফ্রান্সিসের কাছে সব শুনলো তারপর ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বললো, 'ইউনিপেড্‌রা বর্বর অসভ্য।

ওদের বিশ্বাস করো না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধুকে বাঁচাও'।

কালুটুলা আর কোন কথা না বলে জাহাজ ছেড়ে চলে গেল।

সমুদ্রের ধারেই সব শ্লেজগাড়ি তৈরী হয়ে নিল। ফ্রান্সিস সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস গাড়িতে তুলে নিতে বললো। গোটাদশেক কুঠারও নিতে বলে দিলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই তৈরী হয়ে গাড়িতে এসে বসল। ফ্রান্সিসও তার গাড়িতে উঠলো এমন সময় কুঠার হাতে সাঙখু এসে হাজির। বললো, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।'

অগত্যা ওকেও গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো। রওনা হবার আগে ফ্রান্সিস গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বললো, 'চাবুক চালাবার সময় সাবধান, যেন চাবুকটা লম্বা লাগামে আটকে না যায়। কারো অসুবিধে হলে সাঙখুকে ডেকো, ও সব বুঝিয়ে দেবে।'

ফ্রান্সিস গাড়িতে বসে ওর গাড়ি ছেড়ে দিলে। দেখা গেল, সবাই ওর পেছনে পেছনে গাড়ি চালাতে শুরু করলো।

যাত্রা শুরু হলো, গাড়ির মিছিল চললো। গাড়ি চলাকালে বরফ ভাঙার খসখস শব্দ, ওদের কথাবার্তা, ডাকাডাকির শব্দে নির্জন বরফের প্রান্তর মুখর হয়ে উঠলো। কিছু দূরে যেতেই দুটো গাড়ি আটকে গেল। সেই চাবুক লাগামে আটকে যাওয়ার ব্যাপার। সাঙখু উঠে এসে চাবুক খুলে আবার গাড়ি চালু করল। আবার সব গাড়ির একসঙ্গে চলা শুরু হলো।

ফ্রান্সিস যতটা তাড়াতাড়ি কোর্টল্ডে পৌঁছবে ভেবেছিল, তা আর হলো না। প্রায় পাঁচদিন লেগে গেল। এখানে পৌঁছে তারা আগের তাঁবুটাতে আস্তানা নিল। পথে তুষার-ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হলো না বলে ওরা খুশী হলো।

সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিস সবাইকে নিজের তাঁবুতে ডাকলো। সবাই এলে সে বললো, 'ভাইসব, আমাদের আর দেরী করা চলবে না। আমি নেসার্ককে নিয়ে কাল সকালেই বাট্টাহালিডে রওনা হবো। তোমরা দুপুর নাগাদ রওনা দেবে। সাঙখু তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তোমরা কুকুরটানা গাড়িতে যাবে, কাজেই তোমাদের ওখানে পৌঁছতে দেরী হবে। তোমরা পৌঁছবার আগেই আমরা হ্যারিকে মুক্ত করবো। তার পরের কাজ ওখানে তোমরা পৌঁছবার পর ঠিক করব।

সভা ভেঙে গেল। কথা বলতে-বলতে ওর বন্ধুরা নিজেদের তাঁবুতে চলে গেল। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে সে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভাবতে লাগলো।

ভোর হতেই নেসার্ক ওর কাছে এলো। রাজা সোক্কাসনের বল্গা হরিণ-টানা শ্লেজগাড়িটা ওর তাঁবুর বাইরে রাখা ছিল। খুব তাড়াতাড়ি সব গোছ-গাছ করে নিয়ে ও আর নেসার্ক গাড়িতে উঠে বসল। বন্ধুরা কয়েকজন এসে বিদায় জানালো। ও গাড়ি ছেড়ে দিতে বললো। নেসার্ক গাড়ি চালাতে লাগলো। ও গাড়ি চালাতে ওস্তাদ। নিপুণ হাতে বেশ দ্রুতগতিতে ও গাড়ি চালাতে লাগলো।

গাড়ি চললো বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। বেশ দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দুপুরের একটু আগে ওরা দুটো মেরুভল্লুক দেখলো। কাছাকাছি আসতে দেখলো, একটা মা-ভালুক আর বাচ্চা। নেসার্ক গাড়ি চালাতে-চালাতে বললো, 'বাচ্চাটা ধরবো নাকি?'

—'না।' ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বললো, 'এখন প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে মূল্যবান।'

নেসার্ক আর কোন কথা না বলে গাড়ি চালাতে লাগলো। ভালুক দুটোর কিছু দুরে গাড়িটা চললো। নেসার্ক বেশী কাছে গেল না। এক মা ভালুক তার ওপর সঙ্গে বাচ্চা আছে। হয়তো আক্রমণ করে বসতে পারে।

কিছুদূর এগিয়ে ওরা তাঁবু খাটালো। রান্না-খাওয়া সেরে আবার গাড়ি ছোটালো। পথে ওরা মেরু জ্যোতি দেখলে,া, কি অপরূপ দৃশ্য। ফ্রান্সিস আগেও দেখেছে, তাই খুব অবাক হলো না। তাছাড়া ওর মনে তখন নানা চিন্তা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মত মনের অবস্থা নয়।

দিন চারেকের মধ্যেই ওরা বাট্টাহালিডের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তখন সকাল, আকাশে মেঘকুয়াশা নেই। অনুজ্জ্বল রোদে ওরা দুর থেকে বাট্টাহালিডের ঘর-বাড়ি, টুপিক দেখতে পেল। ফ্রান্সিস তখন গাড়ি চালাচ্ছিল, ও গাড়ি থামালো। আর এগুনো ঠিক হবে না। ইউনিপেড্‌দের নজরে পড়ে যেতে পারে ওরা। গাড়ি থামিয়ে তাঁবু খাটালো। একটু বিশ্রাম করে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারল।

তারপর ফ্রান্সিস নেসার্ককে বললো, 'নেসার্ক, তুমিতো আমাদের থাকবার ঘরটা দেখেছ। আমার বন্ধু হ্যারি ঐ ঘরেই আছে। খুব সাবধানে তাকে মুক্ত করতে হবে।

—'এখন নয়, আমি রাত্রে যাবো।' নেসার্ক বললো।

—'বেশ-' ফ্রান্সিস বললো।

'সন্ধ্যে গেল, রাত হলো। রাত বাড়তে নেসার্ক একটা কুঠার হাতে নিল। তারপর তাঁবু থেকে বেরলো। ওখানে শ্লেজগাড়ি নিয়ে যাওয়া চলবে না, হেঁটে যেতে হবে। ফ্রান্সিস নেসার্কের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল, নেসার্ক মৃদু হাসল। তারপর বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে বাট্টাহালিডের দিকে হাঁটতে লাগলো। আকাশে ভাঙা চাঁদ, মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে বরফের ওপর। নেসার্ক হেঁটে চললো।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ সেই বরফের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তাঁবুতে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুমুতে পারলো না। নানা চিন্তা ভীড় করে এলো। মাঝে-মাঝে তন্দ্রা এলো। পরক্ষণেই তন্দ্রা ভেঙে উঠে বসতে লাগলো। নেসার্ক কখন ফেরে এই চিন্তা। হ্যারি কেমন আছে, কে জানে?

রাত শেষ হয়ে এসেছে তখন। নেসার্কের ডাকে ওর তন্দ্রা ভেঙে গেলো। নেসার্ক বিছানায় বসে হাঁপাতে লাগলো। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। ফ্রান্সিসের মন চিন্তাকুল, উৎকণ্ঠিতও। তবু কোন প্রশ্ন করলো না। একটু পরে নেসার্ক বললো, 'আপনাদের ঐ ঘরে হ্যারি নেই।'

ফ্রান্সিস চমকে উঠে বসলো। 'তবে ও কোথায়?'

—'তার হদিশ করতে পারিনি, তবে খবর জোগাড় করেছি যে, কিছু এস্কিমোকে রাজা এভাল্ডাসান রাজবাড়িতে বন্দী করে রেখেছে। কাল রাত্রে সেখানে খোঁজ করবো'।

পরের দিনটা শুয়ে বসে কাটালো। আবার রাত হলে নেসার্ক কুঠার হাতে বাট্টাহালিডের দিকে চললো।

সারারাত ফ্রান্সিস দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারলো না। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। আবার উঠে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ায়। দেখে নেসার্ক আসছে কিনা। শেষরাতের দিকে নেসার্ক ফিরে এলো। বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলো। তারপর ডাকলো 'ফ্রান্সিস?'

—'বলো। হ্যারিকে পেলে?'

—'একটা দুঃসংবাদ আপনাকে দিতে হচ্ছে।'

—'শীগগির বলো।'

—'হ্যারি - মারা গেছে।'

ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ওর বুক থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ও দ্রুত এগিয়ে এসে নেসার্কের দু'কাঁধে হাত রাখলো, 'সব বলো নেসার্ক।'

রাজবাড়িতে যারা বন্দী আছে, তাদের মধ্যে হ্যারিকে দেখলাম না। তাহলে হ্যারিকে কোথায় রাখা হয়েছে? রাজবাড়ির অন্য ঘরগুলো, টুপিকগুলো, সব জায়গায় খুঁজে-খুঁজে দেখলাম। হতাশ হলাম, কোথাও হ্যারি নেই।' নেসার্ক একটু থামলো। তারপর বলতে লাগলো, 'ওদের নাচ - গানের এক আসরে গিয়ে বসলাম। সেখানেই ইউনিপেড্‌দের এক সর্দারের সঙ্গে ভাব জমালাম।

—'হ্যাঁ, ঐ লোকটাকে আমি চিনেছি। আমাদের দেখাশুনার ভার ছিল ঐ লোকটার ওপরে। ওর শ্লেজগাড়িটা নিয়েই আমি পালিয়েছিলাম।

—'তারপর?'

—'কথায়-কথায় ও বললো, একদিন রাত্তিরে ওরা নাকি দেখে, হ্যারি ঘরে মরে পড়ে আছে।'

—'তাহলে ওরা হ্যারিকে মারেনি?'

—'ও তো তাই বললো। ওরা আর বৈদ্যি-টদ্যি ডাকেনি, একটা বিদেশীর জন্যে কে আর ঝামেলা অতো পোহায়? ওরা মৃতদেহটা সক্কারটপ পাহাড়ের এক গুহায় ফেলে দিয়েছিল।'

ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইলো। ও নিজেকে সংযত করার অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। একসময় দু'হাতে মুখ ঢেকে ও কেঁদে উঠল। নেসার্ক ওর কাঁধে হাত রাখলো সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ফ্রান্সিসের কান্না বন্ধ হল না। ওর বারবার হ্যারির কথা মনে হতে লাগলো। হ্যারির হাস্যোজ্জ্বল মুখ, ওর কথা বলার ভঙ্গী ও প্রতিজ্ঞাদৃঢ় মুখ, সবই মনে পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিস কাঁদতে লাগলো।

সে যখন একটু শান্ত হল, তখন ভোর হয়ে গেছে।

একটু বেলায় ফ্রান্সিসের বন্ধুরা এসে পৌঁছল। বিস্কো ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। দেখলো, সে শুয়ে আছে। ওরা এল, অথচ সে একবারও তাঁবুর ভেতর থেকে বেরল না, এটা বিস্কোর কাছে একটু অদ্ভুত লাগলো। ও বুঝলো, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। ও আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের গায়ে ধাক্কা দিল। বললো, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

ফ্রান্সিস এতক্ষণ চোখ চাপা দিয়ে শুয়ে ছিল। এবার চোখের ওপর থেকে হাতটা সরালো। বিস্কো দেখলো, ফ্রান্সিসের চোখে জল। বলে উঠলো 'কী হয়েছে ফ্রান্সিস?'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারলো না। বিস্কো বুঝলো, হ্যারি নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যারি কেমন আছে?'

ফ্রান্সিস ভগ্নস্বরে আস্তে - আস্তে বললো, 'বিস্কো হ্যারি মারা গেছে।'

বিস্কো চমকে উঠে বললো, 'বলো কি?'

তখন ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে নেসার্ক যে খবর এনেছে, সব বললো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসের বন্ধুরা খবরটা শুনলো। এতক্ষণ ওরা বেশ খুশীমনে তাঁবুতে কাটাচ্ছিল। নতুন দেশ, ভালোই লাগছিল ওদের। হ্যারির মৃত্যুসংবাদ মুহূর্তে ওদের সবাইকে স্তব্ধ করে দিলো। সবাই নিঃশব্দে ফ্রান্সিসের তাঁবুতে এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। তারপর ধীরস্বরে বলতে লাগলো, 'ভাইসব, আজকে আমাদের বড় শোকের দিন। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু হ্যারি মারা গেছে। কিন্তু আমি কোনদিন হার মানি নি, আজকেও মানবো না। হ্যারির মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেবই। একটু থেমে ও বলতে লাগলো, 'ভাইসব, আমি পরিকল্পনা ছকে রেখেছি। আজ রাত্রেই আমরা বাট্টাহালিড্‌কে ডানদিকে রেখে অনেকটা ঘুরে সক্কারটপ পাহাড়ে যাবো। সবাই সারাদিন বিশ্রাম করে নাও। সন্ধ্যের পরেই অন্ধকার হলে আমরা আবার যাত্রা শুরু করব।'

সবাই আস্তে - আস্তে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গেল। সন্ধ্যের পর ভাইকিংদের মধ্যে কর্মতৎপরতা শুরু হল। সবাই বরফের প্রান্তরে এসে দাঁড়ালো।

বিস্কো ফ্রান্সিসকে ডাকতে এল। 'ফ্রান্সিস, আমরা তৈরী, চলো।'

ফ্রান্সিস তাঁবুর বাইরে এল। বিস্কো বললো, 'আমরা কি শ্লেজগাড়িতে যাবো।'

–'না।' ফ্রান্সিস বললো, 'গাড়ির কুকুর নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না, ডাকবে। তাহলে আমরা ধরা পড়ে যাবো। আমাদের হেঁটে যেতে হবে। সবাইকে কুঠার নিতে বলো।

পরপর সবাই দাঁড়াল। একটু রাত হতেই যাত্রা শুরু হলো। আকাশে ভাঙা চাঁদ উঠল একটু পরেই। নরম জ্যোৎস্না পড়ল বরফের প্রান্তরে। শুধু জুতোর তলায় বরফ ভাঙার শব্দ আর উত্তরে হাওয়ার শন্‌-শন্‌ শব্দ। চারদিকে আর কোন শব্দ নেই।

প্রায় মাঝরাতে ওরা সক্কারটপ পাহাড়ের তলায় গিয়ে পৌঁছল। তারপর ঘুরে পাহাড়ের পেছনে গেল। সেখান থেকে পাহাড়ে ওঠা শুরু হল। এতদূর হেঁটে এসে তারপর পাহাড়ে ওঠা। সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

বিস্কো ফ্রান্সিসকে বললো, 'সবাই খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে দাও।'

ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল। দৃঢ়স্বরে বললো, 'না। আজ রাতের মধ্যেই সব সারতে হবে। পাহাড়ে উঠতে শুরু কর।' এই কথা বলে ফ্রান্সিস সবার আগে পাহাড়ে উঠতে লাগলো।

ফ্রান্সিসের সহ্যশক্তি দেখে সকলেই অবাক হল। তাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না, ও এতটা পথ হেঁটে এসেছে। ওর সর্বাঙ্গে যেন প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। বাকী সকলের আর বসা হল না। ওরা ফ্রান্সিসের পেছনে - পেছনে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। কেউ - কেউ চাঁদের মৃদু আলোয় বরফের পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে লাগলো। পাহাড়ের প্রায় চূড়োর কাছাকাছি ওরা পৌঁছল, তখন বিস্ময়ে সবাই হতবাক হয়ে গেল। সম্মুখে গলা জলের বিরাট সরোবর। তাতে চাঁদের আলো পড়ে এক বিচিত্র রূপময় জগৎ রচনা করেছে। উত্তুরে হাওয়ার মাঝে-মাঝে মৃদু ঢেউ।

ফ্রান্সিস সকলের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর বললো, 'ভাইসব বরফ কেটে এই গলা জলের স্রোত আমরা বাট্টাহালিড্‌রে দিকে নামিয়ে দেবো। ভাসিয়ে দেবো। ভাসিয়ে দেব, তছনছ করে দেব সবকিছু। একটু থেমে বললো, 'এবার সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও কারণ এর পরে আর বিশ্রাম করার অবকাশ পাবে না। এই জলধারা নামতে

শুরু করলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমাদের পাহাড়ের পেছন দিকে নেমে যেতে হবে, নইলে সেই জলধারায় আমরাও ভেসে যাবো।

সবাই বরফের ওপর বসল। তখনও অনেকে হাঁপাচ্ছিল। ওখান থেকে কুয়াশার জন্যে বাট্টাহালিড্‌দের ঘর বাড়ী, তাঁবু গীর্জা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ইউনিপেড্‌দের ড্রাম বাজনা, হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছিল। বসে রইল অনেকে। কেউ-কেউ বরফের ওপর শুয়ে পড়লো। সকলেই অবাক হয়ে চাঁদ, পাহাড়, সরোবর দেখছিল।

কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। কুঠার হাতে নিয়ে বরফের ওপর কুঠার চালাল, শব্দ উঠল ঠক্। বেশ শক্ত বরফ। ফ্রান্সিসের দেখাদেখি আর সবাই উঠে দাঁড়াল। সবাই মিলে বরফের ওপর কুঠার চালাতে লাগলো। শুধু হাওয়ার শন্ - শন্ শব্দ, মানুষের শ্বাসের শব্দ আর বরফে কুঠারের আঘাতের শব্দ।

ঠক্ - ঠক্ - বরফ ভাঙার কাজ চলছে। রাত শেষ হয়ে এল প্রায়। চাঁদ দিগন্তের দিকে অনেকটা ঢলে পড়েছে। খাল কাটা শেষ হল। আবার একটু বিশ্রাম করে নিল সবাই। এবার সরোবরের দিক থেকে কয়েকটা বরফের চাঁই ভেঙে ফেলার পরই সরোবরের জল খাল দিয়ে নীচের দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস কুঠার শূন্যে ঘুরিয়ে চীৎকার করে বললো, আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। সবাই পাহাড়ের পেছন দিকেআসতে শুরু কর।'

সবাই ছুটল পাহাড়ের পেছন দিকে। বরফের চাইয়ে সাবধানে পা রেখে - রেখে সবাই নামতে লাগলো।

ওদিকে মুক্ত জলস্রোত ছুটলো নীচের দিকে। গলা জল বরফের চাঁইয়ের ফাটলগুলোতে ঢুকতে লাগলো। বরফের চাঁইগুলো আল্‌গা হয়ে যেতে লাগলো।

প্রচণ্ড শব্দে চাঁইগুলো ফেটে যেতে লাগলো। বড়-বড় বরফের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিসদের কাটা খাল বড় হতে লাগলো। মুহুর্মুহু বরফের চাঁই ফাটতে লাগলো। জলপ্রপাতের মত জলধারা প্রচণ্ড বেগে ছুটল বাট্টাহালিড্‌রে দিকে। জলধারার প্রথম ধাক্কাতেই টুপিকগুলো খড়কুটোর মত ভেসে গেল। ফ্রান্সিসরা নামতে-নামতে বুঝতে পারছিল, মুর্হমুহু বরফের চাঁই ফাটার ধাক্কায় পাহাড়টা কেঁপে - কেঁপে উঠছে। বাট্টাহালিড্‌রে দিক থেকে ভেসে এল চীৎকার, কান্না-কাটির শব্দ। বিরাট-বিরাট বরফের চাঁই পাহাড়ের নীচে ভেঙে পড়তে লাগলো। গীর্জা, রাজবাড়ি আর অন্য সব পাথরের বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়ল। গীর্জার চূড়োর কাঠের ক্রুশটা ভেঙে পড়ল। শুধু রাজবাড়িটার বিশেষ কোন ক্ষতি হলো না। তবে জলের প্রচণ্ড ধাক্কা থেকে রেহাই পেল না কিছুই।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো বরফ ফাটার শব্দ এবং জলস্রোত। ফ্রান্সিসরা ততক্ষণ অপেক্ষা করল পাহাড়ের ওপাশে। তারপর সবাই আসতে লাগল বাট্টাহালিড্‌রে দিকে। প্রান্তরের বরফ আর শক্ত নেই। যেখান দিয়ে জলধারা বয়ে গেছে সেখানে বরফ আর কাদায় জায়গাটা দুর্গম করে তুলেছে। তারই মধ্যে দিয়ে ওরা হেঁটে চললো।

ওরা যখন বাট্টাহালিডে ঢুকল দেখলো, এখানে - ওখানে ইউনিপেড্ সৈন্যরা মরে পড়ে আছে। একটা টুপিকও দাঁড়িয়ে নেই, সব ভেসে গেছে। শুধু রাজবাড়ি আর চূড়াভাঙা গীর্জাটা দাঁড়িয়ে আছে। রাজবাড়িটার অনেক জায়গায় পাথরের দেওয়ালের পাথর খসে পড়েছে। ফ্রান্সিস ভেবেছিল, এই জলধারায়, ইউনিপেড্ সৈন্যরা ভেসে

গেছে। কিন্তু রাজবাড়ির কাছাকাছি আসতেই, বেশ কিছু সৈন্যকে রাজবাড়ি থেকে আসতে দেখলো।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললো 'এখনও কিছু ইউনিপেড্ আছে। তোমরা তাদের মোকাবিলা করো। আমি গীর্জাটায় যাচ্ছি।'

ফ্রান্সিস একা গীর্জার দিকে চললো। এর মধ্যেই ভাইকিংদের সঙ্গে অবশিষ্ট ইউনিপেড্দের রাস্তায়, রাজবাড়িতে লড়াই শুরু হয়ে গেল। ইউনিপেড্রা কুঠার চালাতে ওস্তাদ। ভাইকিংরা কুঠার ফেলে তরোয়াল বের করে ওদের সঙ্গে লড়তে লাগলো। চাঁদের মৃদু আলোয় এই লড়াই চললো! উভয়পক্ষের চীৎকার ছুটোছুটিতে বাট্টাহালিড্ জেগে উঠলো।

ফ্রান্সিস গীর্জাটার দরজায় এসে দাঁড়ালো। দরজাটা হাঁ করে খোলা। বোঝা গেল, তালাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ও ভেতরে ঢুকল। অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ছে না। তবে জানলা দিয়ে যে অল্প চাঁদের আলো আসছিল, তাতে দেখলো, জানলার কাঁচ অনেকটা জায়গায় ভেঙে গেছে। কেমন ফাঁকা লাগছে বেদীটা। সেই আলোতেই ও দেখলো, যীশুর বড় মূর্তিটা মেঝেয় পড়ে আছে। হয়তো জলের ধাক্কায় পড়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে কোথায় পড়ে আছে, দেখা যাচ্ছে না। ও মেঝের কাছে কড়াটার কাছে গেল। দেখলো, একটা মশাল আটকানো রয়েছে। চক্‌মকি ঠুকে মশাল জ্বালতে গেল। কিন্তু বরফজলে ভেজা মশাল সহজে জ্বলতে চায় না। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মশাল জ্বললো। মশালের আলোয় দেখলো, যীশুর মূর্তিটা মেঝেয় উবু হয়ে পড়ে আছে। একটা হাত ভেঙে গেছে। ও মূর্তিটা তোলার জন্য হাত লাগালো। উঃ অসম্ভব ভারী। কয়েকজন মিলে ছাড়া যাবে না। এটা একার কর্ম নয়।

হঠাৎ দরজায় একটা ধাক্কার শব্দ হলো। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। মশালের অল্প আলোয় দেখলো, কে যেন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও ভাবল, কোন ভাইকিং বন্ধু বোধহয়। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল, লোকটার হাতে কুঠার। ভাইকিংদের হাতে তো কুঠার থাকার কথা নয়। ও মূর্তিটা ডিঙিয়ে পিছিয়ে এলো।

ভালোভাবে আলো পড়তেই দেখলো রক্তমাখা কুঠার হাতে রাজা এভান্ডাসন। মুখটা হিংস্র, চোখের দৃষ্টি কুটিল। ও বুঝলো, এই অসভ্য বর্বর রাজা সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। ফ্রান্সিসও সেইভাবে নিজেকে তৈরী করে নিল। এক ঝটকায় খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ফেলল।

রাজা এভান্ডাসন একবার দাঁত বের করে হাসল। বিড়-বিড় করে ওর নিজের ভাষায় কি বললো। তারপর কুঠার ওপরের দিকে তুলে কোপ দেওয়ার ভঙ্গীতে ছুটে এলো ওর দিকে। ও তৈরীই ছিল, একপাক ঘুরেই তরোয়াল চালালো। রাজার টুপিটা কেটে গেল, রক্ত বেরলো। রাজা আবার কুঠার উঁচিয়ে আসতেই তরোয়াল চালালো ফ্রান্সিস। কুঠারের সঙ্গে তরোয়াল লেগে ঝন্‌ঝন্ শব্দ উঠলো। কুঠারের সঙ্গে লড়াই করতে ফ্রান্সিস অভ্যস্ত নয়। কাজেই বারবার সরে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল। আর সুযোগ পেলেই তরোয়াল চালিয়ে রাজাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো। ঐ মশালের আলোতে দু'জনের লড়াই চললো। দু'জনেই পরিশ্রান্ত হলো। জোরে জোরে শ্বাস পড়তে লাগলো দু'জনের।

ফ্রান্সিস ক্লান্ত হলো বেশী। কারণ সন্ধ্যের পর থেকে ও একরকম বিশ্রামই পায়নি।

অতটা পথ হেঁটেছে, পাহাড়ে উঠেছে, খাল কেটেছে, তারপর কাদা বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এখানে এসেছে। এই মোকাবিলার আগে একটু বিশ্রামের দরকার ছিল। কিন্তু এখন আর সে-সব ভেবে লাভ নেই। সম্মুখে মৃত্যুদূতের মতো দাঁড়িয়ে রাজা এভাল্ডাসন। হিংস্র বর্বর রাজা। ফ্রান্সিস নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চললো লড়াই। ও বেশ বুঝতে পারল, তার দম ফুরিয়ে আসছে। জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল ও।

এক সময় রাজা এপাশ-ওপাশ কুঠার ঘোরাতে-ঘোরাতে এগিয়ে এলো। একবার কুঠারের ফলাটা ওর প্রায় মাথা ছুঁয়ে গেল। ও সঙ্গে-সঙ্গে তরোয়াল চালালো, রাজার মাথাটা লক্ষ্য করে। কিন্তু রাজা দ্রুত মাথা সরিয়ে নিল। কোপটা পড়ল রাজার কাঁধে। কাঁধ থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু তরোয়ালটা বের করে নিয়ে আসার আগেই রাজা কুঠারটা তুলে মারতে উদ্যত হলো। ও মেঝেয় পড়ে থাকা যীশুর মূর্তিতে পা লেগে বেদীর ওপর চিৎ হয়ে পড়ল। ঠিক মাথার ওপর রাজার উদ্যত কুঠার। ডান কাঁধে তরোয়ালের গভীর ক্ষতের জন্য রাজা কুঠারটা সবল হাতে ধরতে পারছিল না। তবু ঐ অবস্থাতেই কুঠারে ঘা দিলে ওর বুকেই সেটা লাগবে।

ফ্রান্সিসের তখন অসহায় অবস্থা। কিন্তু কুঠারের ঘাটা নেমে আসার আগেই হঠাৎ রাজার হাতটা কেমন যেন অবশ হয়ে এলো। হাত থেকে কুঠারটা পড়ে গেল মেঝেয়। রাজা হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। ও এক ধাক্কায় রাজাকে সরিয়ে দিল। বেদীর গা থেকে গড়িয়ে রাজা উপুড় হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। ও দেখলো, রাজার পিঠে একটা কুঠার আমূল বিঁধে আছে। মুখ তুলে দেখলো, দরজার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে। লোকটা এগিয়ে আসতে ও দেখলো, নেসার্ক। তাহলে নেসার্কই দূর থেকে কুঠার ছুঁড়ে মেরেছে- নির্ভুল নিশানা।

নেসার্ক কাছে এলে ফ্রান্সিস হাঁপাতে - হাঁপাতে বললো, 'নেসার্ক তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। রাজার কুঠারের শেষ ঘাটা আমি বোধহয় এড়াতে পারতাম না।'

ও দেখলো, নেসার্কের চোখে জল। সে মৃদুস্বরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো 'শেষ অবধি বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।'

এমন সময় আরো কয়েকজন ভাইকিং এসে গীর্জায় ঢুকল। তারা ফ্রান্সিসকে অক্ষত দেখে খুশীই হলো। ওরা বললো, 'ফ্রান্সিস, ইউনিপেড্‌দের প্রায় সবাই মারা গেছে, বাকীরা পালিয়েছে। এখন বাট্টাহালিড্‌ ওদের হাত থেকে মুক্ত।'

ফ্রান্সিস হাসল, তারপর পাথরে বেদীটায় হেলান দিয়ে বসল। ভাইকিংরা ঘুরে ঘুরে গীর্জাটা দেখতে লাগল। একজন বেদীটার ওপরে উঠলো। দেখলো, আরও ওপরে আর একটা কাঠের বেদী। ও জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা ফ্রান্সিস, এই কাঠের বেদীটার ওপর কী ছিল?'

—'ঐ যে মেঝেয় যীশুর মূর্তিটা আছে, সেটা বসানো ছিল?'

—কিন্তু এই ঢোকানো গর্তটার মধ্যে কী যেন একটা রয়েছে?'

—'কী রয়েছে?'

—'একটা বইয়ের মত কিছু!'

—'বই?'

ফ্রান্সিস কথাটা বলেই মেঝে থেকে লাফিয়ে তাড়াতাড়ি বেদীটার ওপর উঠলো। দেখলো, যে কাঠের বেদীটায় মূর্তিশুদ্ধ ক্রুশটা বসানো ছিল, তার মধ্যে 'চৌকোণ গর্ত

রয়েছে। একটা লাল মলাটের মত কিছু দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে উঠলো, 'শীগগির মশালটা নিয়ে এসো।'

একজন ছুটে গিয়ে মশালটা নিয়ে এলো। ও দেখলো, ঠিক এরিক দ্য রেডের 'ওল্ড টেষ্টামেন্টের' বইয়ের মত লাল মলাট। ও বইটা আস্তে-আস্তে বের করে মলাট ওল্টালো। লেখা দেখল, 'নিউ টেস্টামেন্ট।'

এই বইটার কথা রাজা সোক্কাসন বলেছিলেন। কিন্তু এই বইটা কোথায় আছে, তা কেউ জানত না। সেই চামড়ার তৈরী কাগজে এরিক দ্য রেডের নিজের হাতে লেখা। সেই প্রথম অক্ষরগুলো মেলায়। কিন্তু শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। প্রায় অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে। শরীর আর চলছে না, মনও আর কিছু ভাবতে পারছে না। ওদিকে ভোর হয়ে এসেছে, বাইরে ফ্যালকন পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস বইটা হাতে নিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কয়েকজন চলে যাও। আমাদের তাঁবু জিনিসপত্র শ্লেজগাড়িগুলো সব এখানে নিয়ে এসো। এখানে সবকিছু জলে ভিজে গেছে। শুকনো বিছানাপত্র খাবার চাই।' কথাটা বলে ক্লান্ত পায়ে গীর্জার দরজার দিকে এগুলো। আর সবাই ওর পেছনে-পেছনে আসতে লাগল।

গীর্জার বাইরে এসে নেসার্ক ফ্রান্সিসকে বললো, 'আমি আমাদের টুপিকে যাচ্ছি।'

ও মাথা নেড়ে বললো, 'বেশ - কিন্তু তোমাকে কালকেই কোর্টল্ড রওনা হতে হবে। রাজা সোক্কাসনকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

—'ঠিক আছে, আমি কালকেই যাবো।' নেসার্ক কথাটা বলে চলে গেল।

যে ঘরটায় ফ্রান্সিস আর হ্যারি আস্তানা নিয়েছিল, সেই ঘরটার সামনে ও এলো। শ্লেটপাথরের দরজা সরিয়ে ও ভেতরে ঢুকল। তখন আলো ফুটেছে, সেই ম্লান আলোয় দেখলো, বিছানার সবকিছু ভিজে গেছে। ভেজা বিছানাটা মেঝেয় ফেলে দিল ও। তারপর পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

★ ★ ★

তখন বেশ বেলা হয়েছে। এতক্ষণ কেউ আর ফ্রান্সিসকে ডাকেনি। ও একটু ঘুমিয়ে নিল। সবাই তাঁবু খাটাতে, জিনিসপত্র গোছ-গাছ করতে ব্যস্ত। এমন সময় ওরা দেখলো নেসার্ক শ্লেজগাড়ি চালিয়ে আসছে। নেসার্কের সঙ্গে ও কে বসে? এ কী। এ যে হ্যারি! কাছাকাছি যারা ছিল গিয়ে গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। সে কি উল্লাস তাদের। হ্যারি বেঁচে আছে? অন্যরাও খবর পেল। হ্যারি গাড়ি থেকে নামতে সবাই ওকে এক এক করে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি হাত নাড়ছিল আর হাসছিল। হ্যারিকে বেশ রুগ্ন দেখাচ্ছিল। তবু বেঁচে আছে তো। সবাই হৈ-হৈ করতে-করতে ছুটল ফ্রান্সিসের ঘরের দিকে। আচমকা এই হৈ-চৈতে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও চোখ কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে উঠে বসলো।

বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'হ্যারি বেঁচে আছে, হ্যারি বেঁচে আছে।'

ফ্রান্সিস নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তখনই হ্যারিঘরে ঢুকল। সে এক লাফে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো। হ্যারির চোখও শুকনো রইল না। হ্যারি বেশ জোর করে ফ্রান্সিসের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হল। দু'জনেই হাসি-হাসি মুখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

এক সময় ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি হয়েছিল হ্যারি?'

—'সে এক কাণ্ড!' হ্যারি বলতে লাগলো, 'জানো তো আমার মৃগীরোগের মত একটা

অসুখ হয়েছে। তোমার মনে আছে বোধহয়, জাহাজে একবার অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিলাম।'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে।' ফ্রান্সিস বললো।

—'এখানেই একদিন রাত্রে আমার ও-রকম হল। বোধহয়, যে আমাকে রাতের খাবার দিতে এসেছিল, সেই পাহারাদারটাই আমাকে ঐ অবস্থায় প্রথম দেখে। জানি-না ওরা বদ্যি-টদ্যি ডেকেছিল কিনা। বোধহয় নয়। নিজেরাই ধরে নিয়েছিল, আমি মরে গেছি। তারপর আমাকে ওরা সক্কারটপ পাহাড়ের দুটো বরফের ফাটলের মধ্যে রেখে আসে। যখন আমার জ্ঞান ফিরলো দেখি, বরফের ফাটলের মধ্যে আমি পড়ে আছি। একে শরীর দুর্বল তার ওপর ভয়ানক ঠাণ্ডায় তখন হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। ভেবে দেখলাম, এইভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকলে আমার মৃত্যু অবধারিত। কাজেই শরীরের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি একত্র করে উঠে বসলাম। তারপর দাঁড়ালাম। দেখলাম, পায়ের কোন সাড় পাচ্ছি না। কোনরকমে ফাটলের বাইরে এলাম। কোথায় যাবো এবার? বাট্টাহালিডে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। হঠাৎ মনে পড়ল, ওপাশে নেসার্কের টুপিক আছে। তুমি আর আমি ওখানে গিয়েছিলাম। হ্যারি থামলো।

—'তারপর ?'

—'অসাড় পা দুটো হিঁচড়ে-হিঁচড়ে চললাম পাহাড় পেরিয়ে। তখনই গলা জলের জলাশয়টা আমি দেখেছিলাম। অপূর্ব সেই দৃশ্য। বরফের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করি, আবার চলি। এভাবে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন ভোর হয়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কারই ছিল। নেসার্কের টুপিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আর চলার ক্ষমতা নেই তখন। বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চললাম। একটু থামি, দম নিই, তারপর আবার শরীরটা বরফের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে চলি। অনেক কষ্টে নেসার্কের টুপিকের সামনে এলাম। নেসার্কের মা তখন চামড়া শুকোতে দিচ্ছিল। আমাকে দেখে ঠিক চিনল না। আমার তখন কথা বলার শক্তিও নেই। নেসার্কের মা আমাকে ধরে ধরে টুপিকের মধ্যে নিয়ে গেল। কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বাললো। তারপর আমার গায়ে, হাতে পায়ে, সেঁক দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ সেঁক চললো। আমি আস্তে - আস্তে হাত-পায়ের সাড় পেলাম। একটু পরেই বেশ সুস্থ বোধ করলাম। আমি বারবার নেসার্কের মাকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর ওখানেই থেকে গেলাম। নেসার্কের মাকে অবশ্য বললাম, আমরা নেসার্কের সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। কিন্তু বুড়ী-মা আমার কোন কথাই বুঝল না। তার ছেলের মত আমাকে সেবা করে একেবোরে সুস্থ করে তুললো।'

—'তারপর থেকে ওখানেই রইলে?'

—'হ্যাঁ। অবশ্য ভেবেছিলাম শ্লেজগাড়ি চড়ে কোর্টল্ড যাবো। কিন্তু গাড়ি পাইনি ওখানে। তাছাড়া শরীরও দুর্বল, সাহস পেলাম না।' একটু থেমে বললো, 'নেসার্কের তাঁবুতেই অপেক্ষা করতে লাগলাম তোমাদের জন্যে। তারপর গত রাতে ঘন-ঘন বরফের চাঁই ভাঙছে কেন, প্রথমে বুঝলাম না। একটু ভেবে-চিন্তে বুঝলাম, পাহাড়ের ওপরের দিকে যে সরোবরটা দেখেছিলাম, তার জলের ধারা নেমে আসাতেই বরফের চাঁই ভাঙছে, তাই পাহাড়টা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বুঝলাম, খাল কেটে জল নামানো হয়েছে, আর এর পেছনে তুমি আছো। তখন মনে-মনে সহস্রবার তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করলাম। তারপর সকালেই নেসার্ক এলো। সব শুনলাম ওর কাছে।'

এতক্ষণ ফ্রান্সিস গভীর মনোযোগের সঙ্গে হ্যারির কথা শুনছিল। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, যীশুর বেদিতে পাওয়া এরিক দ্য রেডের 'টেষ্টামেন্ট' বইটার কথা। ও তাড়াতাড়ি পোশাকের পকেট থেকে বইটা বের করে বললো, 'এই বইটা দেখো।'

—'এটাতো এরিক দ্য রেডের লেখা বাইবেল - আগেই দেখেছি।'

—'সেটা ছিল একই রকম দেখতে 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট'। এটা 'নিউ টেষ্টামেন্ট' - অন্য খণ্ডটা।'

—'কোথায় পেলে এটা?'

—হ্যারি সাগ্রহে বইটা হাতে নিল। ফ্রান্সিস কী করে বইটা পেল, রাজা এভান্ডাসনের মৃত্যু - সব বললো।

হ্যারি আস্তে - আস্তে বললো, 'এবার বোঝা যাচ্ছে ঐ সাংকেতিক কথাটার অর্থ -'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো।' অর্থাৎ মূর্তির পায়ের নিচেই ছিল এটা।'

মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভাবলো হ্যারি। তারপর মাথা তুলে বললো, 'ফ্রান্সিস এই বইটাতে নিশ্চয়ই কোন সংকেত আছে।'

মুখ ফিরিয়ে নেসার্ককে বললো, 'রাজবাড়ি থেকে আমাদের জন্য এক টুকরো কাগজ আর কালি নিয়ে এসো।'

তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর। আমি সংকতেটা উদ্ধার করছি।'

—'মাথা খারাপ? তুমি সংকেত উদ্ধার করবে, আর আমি শুয়ে থাকবো? উঁহু সেটি হবে না। আমার বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গেছে'।

একটু পরেই নেসার্ক কাগজ-কলম নিয়ে এলো। দুই বন্ধু বইটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। হ্যারি বইটার পাতা পেছন থেকে ওল্টাতে লাগলো আর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম মোটা অক্ষরটা বলে যেতে লাগলো আর লিখতে লাগলো। নেসার্ক, সাঙখু আর ভাইকিং বন্ধুরা অবাক হয়ে দুই বন্ধুর কাণ্ড দেখতে লাগলো। হ্যারি সবগুলো অক্ষর বললো। লেখা হল সব অক্ষরগুলো। দুই বন্ধু উত্তেজনায় ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর। স্পষ্ট অর্থবহ কথা, 'যীশুর দৃষ্টির সম্মুখে কিছুই গোপন থাকে না।' দুই বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। ফ্রান্সিস বললো, 'কী বুঝছো হ্যারি?'

—'আমার মনে হয়, এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন ঐ গীর্জাতেই আছে। যীশুর মূর্তি তৈরী করা এবং এখানে বেদীর ওপর রাখার পেছনে নিশ্চয়ই এরিক দ্য রেডের কোন উদ্দেশ্য ছিল।'

—'তা - তো বুঝলাম। কিন্তু এই সংকেত থেকে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিশ পাবে?'

—'নিশ্চয়ই পাবো। তবে গভীরভাবে ভাবতে হবে। সেইজন্যে সময় চাই।'

—'বেশ ভাবো।' ফ্রান্সিস বললো।

বন্ধুরা সবাই চলে গেল। দুই বন্ধু পাথরের ওপর বসে রইলো। একটু পরে সাঙখু আর দু'জন ভাইকিং শুকনো চামড়া দিয়ে ওদের বিছানা তৈরী করে দিয়ে গেল। হ্যারি বিছানায় শুয়ে কাগজের লেখাটা পড়তে লাগলো। সেই দিনটা ওরা শুয়ে-বসে ঘরেই কাটাল! বাইরে বেরোলো না।

পরদিন নেসার্ককে ওরা কোর্টল্ড পাঠাল রাজা সোক্কাসনকে এখানে নিয়ে আসতে। তাঁর রাজত্ব তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই একটা কর্তব্য শেষ হবে।

নেসার্ক বলগা হরিণ-টানা গাড়িটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

দু'জনে ঘরের দিকে ফিরে আসছে, তখনই ফ্রান্সিস বললো, 'হ্যারি, তুমি তো এসে গীর্জাটাকে দেখোনি।'

—'না।'

—জলের ধাক্কায় নীচুদিকের জানলাটার কাঁচ ভেঙে গেছে, গীর্জার মাথার ক্রুশটা ভেঙে গেছে, মূর্তিটাও মেঝের ওপর পড়ে আছে। একবার দেখে আসি চলো।'

-'বেশ চলো।' এই বলে গীর্জার দিকে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস তিন-চারজন ভাইকিং বন্ধুকে ডেকে নিল।

ওরা গীর্জার সামনে গিয়ে পৌঁছল। ফ্রান্সিসের মাথায় তখনও ঐ সাংকেতিক কথাটা 'যীশুর দৃষ্টির সম্মুখে কিছুই গোপন থাকে না' ঘুরছিল। ও নানাভাবে কথাটা ভাবতে-ভাবতে গীর্জার অন্ধকার পরিবেশে ঢুকলো। ভাঙা জানলার মধ্য দিয়ে যেটুকু আলো আসছে, তাতেই যা দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বন্ধুদের বললো, 'মূর্তিটা তুলে বেদীতে বসাতে হবে। হাত লাগাও সবাই।'

সবাই মূর্তিটার কাছে এল। ধরাধরি করে মূর্তিটা তুললো। তারপর কাঠের বেদীটায় বসাতে গিয়ে দেখলো, উল্টোমুখো হয়ে যাচ্ছে।

হ্যারি বলে উঠলো, আরে উল্টো হয়ে যাচ্ছে, সোজা করে বসাও।'

কথাটা ফ্রান্সিসের কানে যেতেই ও চমকে উঠলো। পর-পর কয়েকটা কথা ওর মনে বিদ্যুৎ ঝলকের মত খেলে গেলো, 'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো', পায়ের নীচেই পাওয়া গেল বাইবেলের পরের খণ্ড, দুটো বই-এর উল্টো দিক থেকে অক্ষর সাজিয়ে অর্থময় ইঙ্গিতপূর্ণ কথা পাওয়া গেছে, মূর্তিটার মুখও যদি উল্টোদিকে করা যায়, 'যীশুর দৃষ্টির সম্মুখে কিছুই গোপন থাকে না।'

উল্টোদিকের মুখ দৃষ্টির লক্ষ্য। কিসের দিকে সেই দৃষ্টি? ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠলো, 'মূর্তিটা উল্টোদিকে মুখ করেই রাখো। দেখো রাখা যায় কিনা।'

সকলেই ফ্রান্সিসের এই কথায় আশ্চর্য হলো। হঠাৎ উল্টোমুখী করে মূর্তি রাখার কল্পনা ওর মাথায় এলো কেন? যাহোক ওরা মূর্তিটা উল্টোমুখী করে বেদীতে বসাল। আশ্চর্য! ঠিক মাপে আটকে গেলো।

ফ্রান্সিস পায়ের জুতো খুলে ফেললো। তারপর এক লাফে বেদীটার ওপর উঠলো। ওর কাঁধের কাছে পেতলের মূর্তিটা। ফ্রান্সিস মূর্তিটার মুখের কাছে মুখ আনল। মূর্তির চোখের দৃষ্টিটা সামনের দিকে নয়। একটু তেড়চা। আশ্চর্য!

ফ্রান্সিস চীৎকার করে ডাকলো, 'হ্যারি, শীগগির উঠে এসো'।

হ্যারিও জুতোটা খুলে উঠলো।

ও বললো, 'হ্যারি, মূর্তিটার দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাকাও।'

হ্যারিও মূর্তিটার মুখের কাছাকাছি বাঁ-দিকের আংটাটা। ও বলে উঠলো, 'ফ্রান্সিস, আংটাটা!'

ফ্রান্সিস তখন ঘর-ময় পায়চারী করতে করতে বলছে 'মেঝের অত কাছে আংটা - মশাল রাখবার জন্য? অসম্ভব।' পায়চারী থামিয়ে বলে উঠলো, এরিক দ্য রেডের গুপ্ত-ধনভাণ্ডার আমাদের হাতের মুঠোয়। আংটায় আটকানো পাথর সরাতে হবে। সবাই যাও, কুঠার নিয়ে এসো। পাথরের খণ্ড আলগা করে তুলতে হবে।'

হ্যারি বেদী থেকে এক লাফে নেমে এল। ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'সাবাস্ ফ্রান্সিস - সাবাস্! তুমি সংকেতটা ঠিক ধরতে পেরেছ।'

ফ্রান্সিস তখন নীচু হয়ে আংটাটা যে পাথরের গায়ে ওটা পোঁতা আছে, সেটা পরীক্ষা করতে লাগলো। দেখলো পাথরটা বেশ বড়।

বন্ধুরা কুঠার নিয়ে এসে হাজির হল। ফ্রান্সিস ওদের বললো, 'দু'জন দু'দিক থেকে পাথরের জোড়ের খাঁজে কুঠারের কোপ বসাও।'

দু'জন দু'দিকে দাঁড়িয়ে কুঠারের কোপ বসাতে লাগলো। কিন্তু অনভ্যস্ত হাতের কোপ ঠিক জোরে পড়ছিল না। ওদিকটা কিছু অন্ধকার থাকাতেই এটা হয়তো হচ্ছে।

ফ্রান্সিস বললো, 'মশাল জ্বালিয়ে আনো।'

মশাল আনা হলো অল্পক্ষণের মধ্যেই। আবার কুঠার চালালো ওরা, কিন্তু ঠিক জোরে লাগলো না। পাথরের চাকলা উঠে এলো শুধু। এর মধ্যেই মুখে-মুখে সবাই জেনে গেছে যে, গুপ্ত ধনভাণ্ডার খোঁড়া হচ্ছে। সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিস মুখ তুলে সকলের দিকে তাকাল। বললো, 'নেসার্ক নেই, মুস্কিল হলো।'

হঠাৎ সাঙখুর দিকে নজর পড়লো। ভালুক শিকারী ও, কুঠার চালাতে ওস্তাদ। ফ্রান্সিস তাকে ডেকে বললো, 'ঠিক পাথরের জোড়ের ওপর কুঠার চালাও। পাথরটা তুলে নিতে হবে।'

সাঙখু কুঠার হাতে এগিয়ে এলো। ঠিক জোড়ের মুখে কুঠারের কোপ পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরটা আলগা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস সাঙখুকে থামতে বললো। তারপর আংটাটা ধরে টানতে লাগলো। বুঝলো, পাথরের জোড় এখনও খোলেনি। আবার সাঙখু কুঠার চালাতে লাগলো। পাথরটা আরো আলগা হতে ফ্রান্সিসের নির্দেশে থামল ও। তারপর হাঁপাতে লাগলো। ফ্রান্সিস কয়েকজনকে একসঙ্গে আংটাটা ধরে টানতে বললো। চার-পাঁচজন মিলে আংটাটা ধরে টানতে লাগলো। আস্তে - আস্তে পাথরটা দেয়াল থেকে বেরিয়ে এলো। আরও কয়েকটা হ্যাঁচকা টান পড়তেই হুড়-মুড় করে পাথরটা খুলে এলো। ফ্রান্সিস মশালটা নিয়ে খোঁদলের কাছে ধরে দেখলো, সিঁড়ির মতো পাথর পাতা। কিন্তু আরো পাথর না খসালে ঠিব বোঝা যাচ্ছে না - নামবার সিঁড়ি কিনা? একটা পাথর খুলে আসাতে খুব সুবিধে হলো। আশেপাশে পাথরগুলোর জোড় আলগা হয়ে গেল। দু'একজন মিলে টানতেই পাথরগুলো খুলে আসতে লাগলো।

ফ্রান্সিস মশাল এগিয়ে নিয়ে দেখলো, একটা গহ্বরের মতো। নীচের দিকে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে, অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ও কিছুক্ষণ মশাল হাতে দাঁড়িয়ে, ভেতরের বদ্ধ বাতাসটা বেরিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর মাথা নীচু করে ঢুকে দেখলো, ভেতরটা বেশ বড়। মাথা না নামিয়ে ও সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলো। পেছনে-পেছনে চললো হ্যারি।

একটা ঘরের মতো জায়গায় এসে সিঁড়িটা শেষ হয়েছে। ঘরটার দেয়াল পাথরের তৈরী। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট কাঠের বাক্স। সোনার পাত নিয়ে বাক্সটায় নানা কারুকাজ করা। মিনে করা আছে তাতে। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠলো মিনে করা সোনার পাত। বাস্কটা বেশ পরিষ্কার, ঠাণ্ডা ও বরফের দেশ বলেই বাক্সটায় ধুলোর আস্তরণ পড়েনি।

বাক্সটায় খোলার দিকটায় দেখা গেল, একটা রূপোর তালা ঝুলছে। রূপোর তালাটাতেও মিনের কাজ করা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। লা ব্রুশের গুপ্তধনের বাক্সগুলোর দ্বিগুণ এই বাক্সটা। ওরা দু'জনেই বাক্সটার কারুকাজ দেখে অবাক হলো। হঠাৎ হ্যারি ওর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'ফ্রান্সিস ডান কোণায় দেখো।'

ফ্রান্সিস মুখ তুলে ডানদিকে মশালটা বাড়াতে নিজে ভীষণভাবে চমকে উঠলো। দেখলো, এস্কিমোদের পোশাকপরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ডানহাতটা বাড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে - মৃত মানুষ, ভীষণ শীতের দেশ বলেই অবিকৃত আছে মৃতদেহটা। কিন্তু বড় জীবন্ত। এবার ও মৃতদেহটার বাড়ানো হাতের দিকে লক্ষ্য করল। দেখলো, হাতের তেলোয় একটা বড় আকারের সোনার চাবি। ও আস্তে-আস্তে হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে নিল। কী ঠাণ্ডা মৃতের হাতটা।

চাবিটা দিয়ে তালা খুললো ফ্রান্সিস। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললো। দেখলো, মশালের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে সোনার মোহর, হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্না বসানো বিচিত্র সব অলঙ্কার। মোহর, অলংকারে বাক্সটা ঠাসা। দামী মণি-মুক্তো বসানো খাপে ভরা কয়েকটা ছোরা। কয়েকটা ছোট্ট সোনার কুঠার, মিনের কাজ করা তাতে।

ওদিকে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা বাইরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কতক্ষণে এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখবে। এদিকে সিঁড়ি দিয়ে একজনের বেশী নামা যায় না। ফ্রান্সিস ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। বললো, 'হ্যারি, চলো আমরা বাইরে যাই। ওরা একে একে দেখে যাক্।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে পর-পর ওপরে উঠে এলো। ওরা আসতেই সবাই একজন-একজন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ধনভাণ্ডার দেখে যেতে লাগলো। দু'চারজন মৃত এস্কিমোটাকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। ওরা দেখে একে-একে ওপরে উঠে আসছে যখন, বিস্ময়ের ঘোর তখনও তাদের কাটেনি। এত ধনসম্পদ? একসঙ্গে?

সবারই দেখা হলো। ফ্রান্সিস তখন বললো, 'এবার বাক্সটা ঘরে নিয়ে যেতে হবে। এখানে এত ধনসম্পদ ফেলে রাখা যাবে না - কে - কে যাবে যাও।'

চার- পাঁচজন ভাইকিং তৈরী হলো। দু'জনে ঘরের ভেতরে নামল। বাক্সটার দু'পাশে দুটো পেতলের কড়া। সেই দুটো ধরে ওরা বাক্সটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলো। বেশ ভারী বাক্সটা - বেশ পরিশ্রম হলো ওটা তুলে আনতে। অন্য দু'জন তখন একে-একে সিঁড়ি বেয়ে বাক্সটা বাইরে নিয়ে এলো। তারপর চারজন বাক্সটা কাঁধে তুলে নিয়ে গীর্জার বাইরে এলো। তারপর সবাই মিলে চললো, ফ্রান্সিসের আস্তানার দিকে। ওরা খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। হৈ-হৈ করতে করতে বরফ-কাদার মধ্যে দিয়ে চললো-গানও ধরল কে যেন।

ফ্রান্সিস ও হ্যারির ঘরে বাক্সটা রাখলো ওরা। তারপরেও এসব নিয়ে বসে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললো। তারপর নিজেদের তাঁবুতে, রাজবাড়ির যে সব ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, সে-সব ঘরে ফিরে গেলো।

পরের দিন ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘর থেকে বেরলো না। শুয়ে-বসে দিনটা কাটিয়ে দিল। রাত হলে ভাইকিংরা তাঁবুর সামনে আগুন জ্বেলে, অনেক রাত পর্যন্ত আনন্দ

হৈ-হল্লা করলো। আগুনের চারপাশে ঘুরে - ঘুরে নাচল, গান গাইল।

পরের দিন, তখন বিকেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের ঘরে বসে কথাবার্তা বলছে। ফ্রান্সিস বললো, 'বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, দেড় মাসের মধ্যে ফিরবো। কিন্তু বোধহয় কথা রাখতে পারবো না। যা বুঝতে পারছি আরো কয়েকদিন দেরী হবেই। এখন রাজা সোক্কাসন এলে বাঁচি। সব ধনদৌলত তাঁর হাতে না তুলে দেওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

ওদের এসব কথাবার্তা চলছে, তখনই একজন ভাইকিং এসে খবর দিল, 'রাজা সোক্কাসন নিজে এসেছেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি তৈরী হয়ে বাইরে বেরোতে যাবে, তার আগেই রাজা এসে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে রানী। দু'জনেই মাথা নীচু করে সম্মান জানালো। রাজা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরলেন। ও তখন ভাবছে, রাজা-রানীকে কোথায় বসাব? রাজার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বললো, 'আপনাদের কোথায় যে বসতে দিই?'

রানী হেসে বললেন, 'আমরা এখানেই বসছি।'

রানী হ্যারির বিছানায় বসলেন, রাজা ফ্রান্সিসের বিছানায়। বসেই যখন পড়েছেন, তখন আর কী করা যাবে?

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা তো এখনো এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখেন নি।'

কথাটা শেষ করেই ও চাবি দিয়ে বাক্সটার তালা খুলে ডালাটা তুললো। রাজা-রানী দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক। এত মূল্যবান সম্পদ?

রানী বিছানা থেকে নেমে কিছু গয়নাগাঁটি তুলে-তুলে দেখলো।

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা এসে গেছেন। বাক্সটা লোক পাঠিয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে যান। এবার আমাদের ছুটি দিন।'

রাজা কিছুক্ষণ বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার তুমিই আবিষ্কার করেছ— এর সবটাই তোমার প্রাপ্য।'

ফ্রান্সিস বললো — 'না মহারাজ। উত্তরাধিকার সূত্রে এই সম্পদ আপনারই প্রাপ্য।'

রাজা মাথা নাড়লেন, 'না, তা হয় না। তোমাকেই নিতে হবে এই ধন ভাণ্ডার।'

হ্যারি এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার এগিয়ে এসে বললো, 'মহারাজ এবার আমি একটা কথা বলবো?

—'বলো।'

—'বলছিলাম, আপনি যদি ফ্রান্সিসকে অর্ধেক ধনভাণ্ডার দেন, তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকে না।'

ফ্রান্সিস ভেবে দেখলো, এ ছাড়া সমাধানের কোন পথ নেই। ও বললো, 'আপনি যখন আমাকে দিতেই চান, তখন অর্ধেক দিন। তাতেই আমি খুশী হবো।'

—'বেশ।' রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রানী বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'আজ রাত্রে রাজবাড়িতে আপনাদের সকলের নিমন্ত্রণ। আসবেন কিন্তু।'

—'নিশ্চয়ই।' ফ্রান্সিস বললো। আবার ওরা রাজা-রানীকে সম্মান জানালো। রাজা ও রানী চলে গেলেন।

★ ★ ★

রাত্রে ফ্রান্সিসরাও রাজবাড়িতে খেতে গেল। একটা বড় ঘরে খাওয়ার আয়োজন করা

হয়েছে। সব এস্কিমো সৈন্যরা ওদের মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। ফ্রান্সিসকে বসতে হলো রাজা ও রানীর মাঝখানে। নেসার্কের মুখে পরে ফ্রান্সিস শুনেছিল, এটা একটা নাকি দুর্লভ সম্মান। অন্য দেশের রাজা - মহারাজাকেই এই সম্মান দেওয়া হয়। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চললো। রাজা ওদের বিদায় জানাতে রাজবাড়ির প্রধান ফটক পর্যন্ত এলেন। তখনই ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কবে ফিরে যাবেন?'

—'কালকে দুপুর নাগাদ আমার দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হব।'

রাজা বললেন, 'ধনভাণ্ডার দু'ভাগ করার দায়িত্ব মন্ত্রীকে দিয়েছি। কাল সকালেই তোমার প্রাপ্য অর্ধাংশ পৌঁছে দেওয়া হবে।'

একটু আমতা - আমতা করে ফ্রান্সিস বললো, 'যদি কিছু মনে না করেন আর একটা অনুরোধ।'

—'বলো।'

—'ধনভাণ্ডারের বাক্সটা আমার খুব পছন্দ। বড় সুন্দর বাক্সটা।'

রাজা হেসে উঠলেন। এ আর বেশী কথা কি। ওটা তোমাকেই দেব।'

ওরা রাজার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল নিজেদের আস্তানায়।

★ ★ ★

পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হল ভাইকিংদের কর্মতৎপরতা। সবাই হাত লাগালো জিনিস-পত্র গোছগাছ করতে। কথাবার্তা, ডাকাডাকিতে মুখর হয়ে উঠলো বাট্টাহালিড্। ওরা যাবার আয়োজনে ব্যস্ত, তখনই রাজার বলগা হরিণে টানা স্লেজগাড়িটা নিয়ে নেসার্ক এল। গাড়িটায় এরিক দ্য রেডের অর্ধেক ধনভাণ্ডারসহ বাক্সটা রাখা। নেসার্ক ফ্রান্সিসকে বললো, 'রাজার নির্দেশে এই বাক্সটাসহ আপনাকে আঙ্গামাগাসালিখ বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই রওনা হবার জন্যে তৈরী হল। রাজা সোক্কাসন, মন্ত্রী, কয়েকজন অমাত্য এলেন ওদের বিদায় জানাতে। রাজা ফ্রান্সিসকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ফ্রান্সিস এসে গাড়িতে উঠলো।

যাত্রা শুরু হল।

সকলেই খুশী। আবার স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে। হৈ-হৈ করে বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলো। দিনটা মেঘ আর কুয়াশায় মুক্ত। রোদ খুব উজ্জ্বল নয়। তবু অনেকদূর পর্যন্ত আলো ছড়ানো দেখা যাচ্ছে। চীৎকার করে ওরা কুকুরগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছে। বাতাসে চাবুকের ঘা-এর শব্দ উঠছে। বেশ জোরেই চললো স্লেজগাড়িগুলো। সবার সামনে ফ্রান্সিসের গাড়ি। নেসার্ক চালাচ্ছে গাড়িটা। ও-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। তুষার আর বরফে ঢাকা প্রান্তরে পথ বলে কিছু থাকে না। শুধু দিক ঠিক করে গাড়ি চালাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, হিমবাহ আর গলা বরফের এলাকার দিকে। গাড়ি যেন হিমবাহ আর গলা বরফের মধ্যে গিয়ে না পড়ে। সামনে রয়েছে নেসার্ক। ও-ওর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সব দিকে নজর রেখে চলেছে।

দু'দিন বেশ নির্বিঘ্নেই কাটল। কিন্তু কোর্টল্ড পৌঁছবার আগের দিন বিকেলের দিকে কুয়াশায় চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। ফ্রান্সিস গাড়ি চালক সবাইকে নির্দেশ দিল গাড়ি থামিয়ে আসন্ন ঝড়ের মোকাবিলা করতে। নইলে ঝড়ের মধ্যে যে কোন গাড়ি দলছুট হয়ে যেতে পারে। ফ্রান্সিসের এই ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ওর নির্দেশমতো

গাড়িগুলো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরেই শুরু হলো তুষারবৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে প্রবল ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্টা। কেউ-কেউ কুকুরগুলোর আড়ালে, বরফের ওপর উবু হয়ে রইলো। ফ্রান্সিস এর আগেও ঝড়ের কবলে পড়েছে। কিন্তু আজকের ঝড়টা আরো প্রচণ্ড। নাক-মুখ চাপা দিয়ে সে গাড়িতে বসে রইলো। প্রায় সকলেরই এক অবস্থা। শুধু নেসার্ক আর সাঙখু ঝড়ের মধ্যে বলগা ও কুকুরগুলোর পরিচর্যা করতে লাগলো। এগুলোর গায়ে জমা তুষার পরিষ্কার করে দিতে লাগলো। গাড়ির লাগাম, দড়ি-দড়া ঠিক করতে লাগলো।

ভাগ্য ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝড়ো হাওয়া কমলো। তুষারবৃষ্টিও কমে এলো। আবার যাত্রা শুরু হল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার গাঢ় হলো। রাত্রি নামলো। ওরা সে রাত্রের মত থামলো। তাঁবু খাটাল, রান্না করে খাওয়া-দাওয়া সারলো। তারপর রাতের মত ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হল। দুপুরের দিকে ওরা কোর্টল্ড পৌঁছল। একদিন পুরো বিশ্রাম নিল। তারপর আবার যাত্রা।

কয়েকদিন পরে আঙ্গামাগাসালিক বন্দরে পৌঁছল। পথে তুষারঝড়ের কবলে পড়তে হয়নি। যাত্রা নির্বিঘ্নেই শেষ হল। পথে সাঙখু একটা শ্বেতভাল্লুক শিকার করেছিল। ছুরি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভালুকটার চামড়া ছাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল। হ্যারি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য কোর্টল্ডে একদিন বিশ্রাম নিয়ে হ্যারি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

আঙ্গমাগাসালিকে ওরা পৌঁছল বিকেলের দিকে। তখনই চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। শ্লেজগাড়িগুলো থেকে জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে অন্ধকার হয়ে আসার আগে জাহাজে তোলা হল। খুব উৎসাহের সঙ্গে সবাই কাজ করে গেল। রাত্রে জাহাজ চালানো বিপজ্জনক। কারণ এখানকার সমুদ্রে বহুদূর পর্যন্ত হিমশৈল ভেসে বেড়াচ্ছে। কোন একটার সঙ্গে অন্ধকারে ধাক্কা লাগলে জাহাজডুবি হবে। কাজেই স্থির হল সকালে রওনা হব। রাত্রি হল। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা নৌকো করে তীরে এল। কালুটুলার তাঁবুতে গেল। কালুটুলা খুব খুশী হল। আগুন জ্বেলে এস্কিমোরা আগুনের চারপাশে নাচছিল, ড্রাম বাজাচ্ছিল, গান গাইছিল। ওরা সেই নাচ-গানের আসরে যোগ দিল। অনেক রাত-পর্যন্ত নাচ-গান চললো। তারপর জাহাজে ফিরে এল।

পরদিন নেসার্ক ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এল। ফ্রান্সিস নেসার্ককে জড়িয়ে ধরল। আবেগে ও কথা বলতে পারছিল না। নেসার্কের এক অবস্থা। ফ্রান্সিস বাক্স থেকে একটা মনিমুক্তোখচিত খাপওয়ালা ছোরা বের করে রেখেছিল। সে ওটা নেসার্কের হাতে দিল। নেসার্ক নিতে রাজী হচ্ছিল না। তখন ফ্রান্সিস বললো, 'এটা তোমাদেরই অতীতের এক রাজার সম্পত্তি। এটা তোমারই প্রাপ্য।'

নেসার্ক নিল ছোরাটা। ওর চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর ওপর ফ্রান্সিসের কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। ও বার-বার ফ্রান্সিসকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো। তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বলগা হরিণে-টানা শ্লেজগাড়িটা নিয়ে চলে গেল।

এবার এস্কিমো সর্দার কালুটুলা আর সাঙখুর কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি কালুটুলার তাঁবুতে গেলো। জাহাজে যে ক'টা রঙীন কাপড় ছিল সব নিয়ে

গেল। রঙীন কাপড়গুলো কালুটুলাকে উপহার দিল। কালুটুলা বার-বার বলতে লাগলো 'কুয়অনকা' অর্থাৎ 'তোমাকে ধন্যবাদ'। সাঙখুকে ওরা জড়িয়ে ধরল। ওদের জন্যে অনেক করেছে সাঙখু। ফ্রান্সিস দু'জনকে দুটো মুক্তো দিল। ওরা রঙীন কাপড় আর মুক্তো পেয়ে খুব খুশী হল। ওরা জাহাজে ফিরে এল। এবার স্বদেশের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা। দড়ি-দড়া ঠিক করে পাল খাটিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। বরফের দেশ পেছনে পড়ে রইল। জাহাজ চললো দক্ষিণমুখো। সমুদ্রের জলে এখানে-ওখানে হিমশৈল ভাসছে। তার মধ্য দিয়ে ধাক্কা এড়িয়ে সাবধানে জাহাজ চালাতে লাগলো। ওরা খুব দক্ষ জাহাজচালক।

★ ★ ★

জাহাজ চলতে লাগলো। কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, সমুদ্রে আর হিমশৈল ভাসছে না। এবার বেশ গরম বোধ হতে লাগলো। ভাইকিংরা এস্কিমোদের মাথাঘাড় ঢাকা পোশাক ছেড়ে তাদের পোশাক পরতে লাগলো। সমুদ্র শান্ত। বাতাসও বেগবান। পাল ফুলে উঠলো। জাহাজ চললো দ্রুতগতিতে। একদিন শুধু ঝড়ো আবহাওয়ার মধ্যে পড়লো ওরা। কয়েক ঘণ্টা পরেই সে আবহাওয়া আর রইলো না।

জাহাজ একদিন ভাইকিংদের দেশে পৌঁছলো। তখন দুপুরবেলা। বন্দরে লোকজনের ভীড় ছিল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ ভিড়লে অনেকেই ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে চিনলো। ওরা হৈ-হৈ করে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের ফেরার খবর রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়লো। হাজার-হাজার লোক জাহাজঘাটায় এসে ভীড় করলো। চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'ফ্রান্সিস, তোমরা কি এনেছ, আমাদের দেখাও।'

অগত্যা ফ্রান্সিস ওর বন্ধুদের এরিক দ্য রেডের বাক্সটা নিয়ে গিয়ে দেখাতে বললো। ওরা বাক্সটা বাইরে নিয়ে এলো। কয়েকজন মিলে উঁচু করে বাক্সটা দেখাতে লাগলো। হীরে-জহরৎ আর চুনী-পান্নার কারুকাজ করা ছোরা, কুঠার দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল। এবার বন্ধুরা অনেকে এসে বললো, 'ফ্রান্সিস, অনেকদিন আমরা বাড়ি-ছাড়া। আমাদের বাড়ি যেতে দাও।'

ফ্রান্সিস কী আর করে। বললো, 'আমি আর হ্যারি থাকছি। রাজার সৈন্য না-আসা পর্যন্ত আরো কয়েকজন থাকো। বাকীরা বাড়ি যাও।'

অনেকেই জাহাজ থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ী ধরতে ছুটল। ফ্রান্সিস বিস্কোকে বললো, 'তুমি বাড়ি যাবার সময় রাজপ্রাসাদে আমাদের আসার সংবাদটা দিয়ে যেও।'

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, বেশ কিছু বন্ধু জাহাজে ফিরে এলো। এক সময় বিস্কোও ফিরে এলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এর অর্থ বুঝলো না। কী ব্যাপার? ওরা সব ফিরে এলো কেন? ওরা সবাই কেমন ফ্রান্সিসকে এড়িয়ে-এড়িয়ে যেতে লাগলো। ফ্রান্সিস যত ওদের ফিরে আসার কারণ জানতে চাইল, ওরা ততোই কোন কথা না বলে সরে-সরে যেতে লাগলো।

হ্যারি এবার বিস্কোকে ধরলো। আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, 'কী হয়েছে বলো তো? তোমরা ফ্রান্সিসকে অমন এড়িয়ে-এড়িয়ে যাচ্ছে কেন?'

বিস্কো একটু চুপ করে রইলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'হ্যারি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, ফ্রান্সিসের মা দিন-পাঁচেক আগে মারা গেছেন। যারা বাড়িতে গেছে, তারাই খবরটা শুনেছে। ফ্রান্সিসের এই দুঃখের দিনে ওর পাশে না থেকে, বাড়িতে শুয়ে

আরাম করবো? তাই ফিরে এসেছি।'

হ্যারি মহা সমস্যায় পড়লো। ওকে কীভাবে এই ভীষণ শোকাবহ কথাটা জানাবে? তখনই দেখলো, ফ্রান্সিস তার দিকেই আসছে। ও এসেই জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার বলো তো? ওরা এ-রকম ব্যবহার করছে কেন?'

হ্যারি নিজেও ফ্রান্সিসের মাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। এ-রকম মা পাওয়া ভাগ্যের কথা। এই খবর শুনে পর্যন্ত বুকে একটা টনটনে ব্যথা ও অনুভব করছিল। প্রাণপণে সেই ব্যথাটা সহ্য করছিল। একটু ধরা গলায় ও বললো - 'তুমি বাড়ি যাও।'

—'সে কি! তুমি একা থাকবে?'

—'তা কেন? বিস্কো থাকবে, যারা ফিরে এসেছে, তারাও থাকবে।'

ফ্রান্সিস এবার ঘুরে হ্যারির চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। একটু গম্ভীর স্বরে বললো, 'কী ব্যাপার বলো তো? তোমাদের সকলের ব্যবহারেই আমি কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছি। মনে হচ্ছে, তোমরা আমার কাছে কিছু লুকচ্ছো।'

—'তুমি বাড়ি যাও।' হ্যারি সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারলো না। ওর গলার ব্যথা-কাতর ভাবটা চাপা থাকল না।

হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করে উঠলো ফ্রান্সিস, 'বাড়ি যাবো না আমি।'

তারপর দ্রুত এগিয়ে হ্যারি গলার কাছে জামাটা মুঠো করে চেপে ধরে দাঁতচাপা স্বরে বলে উঠলো, 'পরিষ্কার বলো, কী হয়েছে?'

হ্যারির প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো। হ্যারি তবু চুপ করে রইলো। কোন কথা বললো না।

—'হ্যারি -ই-ই।' ক্রুদ্ধস্বরে ফ্রান্সিস বলে উঠলো।

হ্যারি শান্ত স্বরে বললো, 'আমার জামা ছেড়ে দাও।'

ফ্রান্সিস ওর জামা ছেড়ে দিল। হ্যারি আগের মতই শান্তস্বরে বললো, 'দুঃখের সঙ্গে বলছি, কথাটা তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করলে।'

'হ্যাঁ -হ্যাঁ বলো'। ফ্রান্সিস একটু হাঁপাতে - হাঁপাতে বললে।

—'পাঁচদিন আগে তোমার মা মারা গেছেন।'

ফ্রান্সিস কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা কথাও বলতে পারল না। চোখের সামনে ও যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও আস্তে-আস্তে জাহাজ-ঘাটার সঙ্গে লাগিয়ে রাখা পাটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজঘাটায় নামলো। বিস্কো ছুটে এলো হ্যারির কাছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'ওকে এই অবস্থায় একা ছেড়ে দিলে?' বলেই ও ফ্রান্সিসের দিকে ছুটে যেতে গেল।

হ্যারি ওকে আটকে দিল। বললো, 'ওকে একাই যেতে দাও, আমরা বরং জাহাজে থাকি।'

ওদিকে ফ্রান্সিসকে জাহাজ থেকে নামতে দেখে, জনতার ভীড়ে উল্লাসধ্বনি উঠলো- 'ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হও।'

ইতিমধ্যে সবাই ঘিরে ধরলো ফ্রান্সিসকে। সকলেই ওর সঙ্গে করমর্দন করতে চায় ওর গায়ে হাত দিতে চায়। কিন্তু ওর নিরাসক্ত উদাসীন ভাব দেখে সকলেই একটু আশ্চর্য হলো। ফ্রান্সিস দৃঢ় পায়ে ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে গেল। সবাই ওকে যাবার পথ করে দিল। সে কোন দিকে তাকালো না। সোজা গিয়ে একটা গাড়িতে উঠলো,

গাড়ি চলতে শুরু করলো। কেউই তার এই নিরাসক্ত ব্যবহারের কারণ বুঝলো না। তবু দু'পাশে ভীড় করে লোকেরা গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে যেতে লাগলো।

ফ্রান্সিস হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, 'গাড়ি জোরে চালাও।'

গাড়ির কোচম্যান সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। ভীড় পেছনে রইলো। গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটল। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। আস্তে-আস্তে গাড়ি থেকে নামলো। দেখলো, সেই নীলফুলের লতাগাছটা দেয়ালের গায়ে আরো - আরো অনেকদুর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। কত নীলফুল ফুটে আছে। এই গাছটা তো মা-ই লাগিয়েছিল।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো ফ্রান্সিস। ফুলে-ফুলে ছেয়ে আছে সারা বাগানটা। মার বরাবরের অভ্যেস ছিল, খুব সকালে বাগানটার পরিচর্যা করা। দাঁত-ফোকলা মালীটাকে নিয়ে সারা সকালটাই মার এই বাগানে কাটতো। ফুলগাছের জটলার মধ্যে থেকে মালীটা তখনি উঠে দাঁড়ালো - হাতে বেল্‌চা। বোধহয় ফুলগাছের নীচের মাটি আল্‌গা করে দিচ্ছিল। ওকে দেখেও কিন্তু বরাবরের মত ফোকলা দাঁতে হাসলো না। কেমন চুপ করে, একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

ফ্রান্সিস বাড়ির ভেতর ঢুকল। যেখানে যে জিনিস থাকবার, তাই আছে। মা যেমন করে ঘরদোর সাজিয়ে রাখত, সেভাবেই সাজানো রয়েছে। ও নিজের ঘরে ঢুকলো। বিছানা আসবাবপত্র সব পরিচ্ছন্ন ভাবে গোছানো, যেমন বরাবর দেখে এসেছে। বিছানায় বসলো একটু, ভালো লাগলো না বসে থাকতে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মার ঘরে। সব পরিপাটি সাজানো। বিছানাটা বরাবরের মতো সুচারুভাবে পাতা, যেন এক্ষুণি এসে শোবে। শেষের দিকে মা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যখন-তখন এসে বিছানায় শুয়ে থাকতো। বাবার ঘরে গেল ও, সেই একই ভাবে সাজানো-গোছানো। দেয়ালে মার একটা ছবি, হাতে আঁকা রঙিন ছবি। ও এক দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ছবিতে হাসি-হাসি মুখ। এমনি হাসিহাসি মুখেই মা বলতো-'হ্যারে, কবে তোর পাগলামি সারবে? বুড়ী মা'টার কথা কি তোর একবারও মনে পড়ে না?'

ফ্রান্সিস আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। পাগলের মত সারা বাড়িতে প্রতিটি ঘর ঘুরে বেড়ালো। বাবা আর ছোট ভাইটা বাড়ি নেই। কাউকে পেলো না, শূন্য বাড়ি - মা নেই। ভাবতে-ভাবতে ছুটে এলো নিজের ঘরে। তারপর বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলো। সমস্ত শরীর ওর কাঁপতে লাগলো। বুকটা যেন খালি হয়ে গেছে - শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। শরীরের এই অবস্থা নিয়ে ও কাঁদতে লাগলো।

কখন বিকেল হয়েছে ও জানে না। হঠাৎ বাবার ডাক শুনলো, 'ফ্রান্সিস—'

ও বিছানা থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসলো। দেখলো, বাবা আর ছোট ভাই দরজায় দাঁড়িয়ে। ও চোখ মুছে নিল। বাবা আস্তে-আস্তে এসে বিছানায় ওর পাশে বসলেন। একটু কেশে নিয়ে সহজভাবেই বললেন, 'রাজবাড়িতে তোমাদের ফেরার সংবাদ পেয়েছি।'

একটু থেমে বললেন, 'শরীর ভালো আছে তো?'

ফ্রান্সিস মাথা নাড়লো। ভাবলো, বাবা এত সহজ ভাবভঙ্গীতে কথা বলছেন, যেন কিছুই হয়নি। ও বাবার মুখের দিকে তাকালো! বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উঠে চলে গেলেন। ছোট ভাইটা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস ওকেই ডাকল, ও কাছে আসতে জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যারে, মা খুব কষ্ট

পেয়েছিল?'

—'নাঃ।' ভাইটি মাথা নাড়লো। বললো, 'সেদিন বিকেল থেকে হঠাৎ শরীরটা ভালো লাগছে না বলে, বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। বাবা বাড়িতেই ছিলেন। রাজবৈদ্যকে ডেকে আনা হলো। মা তখনও জ্ঞান হারায় নি! কেবল তোমার কথা বলছিল — 'পাগল ছেলেটা এখনও ফিরলো না - ওকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, ওর ভাইয়ের চোখেও জল এলো। একটু সুস্থির হয়ে ফ্রান্সিস বললো, 'তারপর?'

—'সন্ধ্যের সময় মা জ্ঞান হারালো। রাজবদ্যি ওষুধ-টষুধ দিল, কিন্তু কাজ হলো না। সারারাত এভাবে কাটালো। ভোরের দিকে একটু জ্ঞান ফিরেছিল, চারদিকে তাকাচ্ছিল মা। তারপর আবার অজ্ঞান। একটু বেলা হতেই মা—'

ও আর বলতে পারল না। ফ্রান্সিস অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা পাখি কিচ্ কিচ্ শব্দ করে একবার ঘরে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। ও একসময় চোখ ফিরিয়ে দেখলো, ভাইটি ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

রাতের দিকে হ্যারি-বিস্কোরা কয়েকজন এলো। সবাই চুপ-চাপ বসে রইলো, কথা বললো না বেশী। আগে যখন আসত, কত কথা হতো ওদের মধ্যে। কিন্তু আজকে সবাই চুপচাপ। ফ্রান্সিস এখনও মার মৃত্যুশোকের ধাক্কাটা পুরোপুরি সামলাতে পারেনি। তাই ওর মন চাইছিল অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে। তাই জিজ্ঞেস করলো, 'এরিক দ্য রেডের' গুপ্তধন কীভাবে আনা হলো?'

—'সব উৎসব, শোভাযাত্রা রাজা বাতিল করে দিয়েছেন। রাজবাড়ির একটা গাড়িতে করে বাক্সটা এনে রাজার যাদুঘরে রাখা হয়েছে।' হ্যারি বললো।

—'আসল কথা তোমার মার মৃত্যুতে রাজা অত্যন্ত শোক পেয়েছেন। তিনি কোনরকম আনন্দ-উৎসব এ সময় করতে চান না।' বিস্কো বললো।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বললো না। আরো কিছুক্ষণ বসে রইলো ওরা। তারপর একটু রাত হতে সকলে চলে গেল।

ফ্রান্সিস যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। কোথাও বেরোয় না। চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকে। কখনও কখনও মার ঘরে গিয়েও বসে থাকে। সেদিন মার ঘরের কাছে এসে দেখলো, বাবা একদৃষ্টিতে মার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। চোখের জল গাল বেয়ে পড়ছে। এই ঘটনাটা ওর মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। বুঝলো, বাবাকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বড় চাপা স্বভাবের মানুষ। বুঝলো, বাবার শোক ওর চেয়ে কিছু কম নয়।

সারাদিন ফ্রান্সিসের একা-একা কাটে। রাতের দিকে বন্ধুরা আসে। একটু কথাবার্তা হয়, তারপর ওরা চলে গেলে আবার ও একা। এভাবেই দিন কাটতে লাগলো ওর। এর মধ্যে একদিন রাজা রাজপরিবারের একটা গাড়ি পাঠালেন ফ্রান্সিসের কাছে। কোচ্ম্যান এসে ওর সঙ্গে দেখা করলো। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে রাজার একটা চিঠি ওর হাতে দিল। চিঠিটা পড়লো ও। ছোট্ট চিঠি—

'স্নেহের ফ্রান্সিস,

তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তবু আমার কাছে একবার এসো।'

নীচে রাজার স্বাক্ষর। রাজা ডেকেছেন কাজেই একবার যেতেই হবে। ও যখন

সাজপোশাক পরছে, তখনই মার কথা মনে পড়লো। রাজবাড়িতে যাবার সময় মাই ওকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিত। পোশাক পরতে থাকা ওর হাতটা থেমে গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। ও আবার পোশাক পরতে লাগলো। অনেকদিন পরে আয়নায় নিজের মুখ দেখলো। বেশ রোগাই হয়ে গেছে, ও ওটা বুঝলো। মাথায় শেষবারের মতো চিরুনী বুলিয়ে ও গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

গাড়ি চললো। গ্রীনল্যাণ্ড থেকে এসে পর্যন্ত ও বাড়ির বাইরে বেরোয় নি। এতদিন পরে পথে বেরিয়ে ওর ভালোই লাগলো। জমজমাট বাজারের কাছে আসতে গাড়ির গতি কমে এলো। রাস্তার ভীড়ের মধ্যে যারাই ওকে চিনল, তারাই হেসে হাত নাড়লো। অগত্যা ওকেও কখনও-কখনও হাত নাড়তে হলো, হাসতে হলো!

একসময় গাড়ি রাজবাড়িতে এসে পৌঁছল। রাজার একজন দেহরক্ষী ওকে রাজবাড়ির মধ্যে নিয়ে চললো। সাজানো-গোছানো দেয়ালে, জানলায় নানা কারুকাজ করা অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে মন্ত্রণা কক্ষের সামনে এসে দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরটা দেখিয়ে দিতে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে দেহরক্ষী চলে গেল। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকে দেখলো, রাজা বসে আছেন। সামনে শ্বেতপাথরের বিরাট গোল টেবিল। আঁকা-বাঁকা আবলুস কাঠের পায়াঅলা কয়েকটা সবুজ গদীআঁটা চেয়ার টেবিল চারপাশে পাতা। রাজাকে ও মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। রাজা ওকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ফ্রান্সিস, তোমার মার মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক পেয়েছি। রাজবাড়ির উৎসবে উনি বড় একটা আসতেন না। তবু যে ক'দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি তাঁর কথাবার্তা ব্যবহারে এটা বুঝেছিলাম, উনি খুব শিক্ষিতা ও রুচিশীলা মহিলা ছিলেন।'

রাজা থামলেন। ফ্রান্সিস কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না, ও চুপ করে রইলো।

রাজা একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে যে-কারণে ডেকে পাঠিয়েছি সেটা বলি।'

—'বলুন।'

—'এরিক দ্য রেডের যে ধনসম্পদ তুমি এনেছ, সেটা কী করতে চাও?'

—'আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।'

—'তা হয় না ফ্রান্সিস। এনর সোক্কাসন এটা ব্যক্তিগতভাবে তোমাকেই দিয়েছেন। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

—'আমি এখন - মানে - ঠিক গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছি না।'

রাজা একটু চুপ করে রইলেন তারপর বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছে। তোমার এই মানসিক অবস্থায় - ঠিক আছে, তুমি পরেই বলো।'

—'তাহলে আমাকে যাবার অনুমতি দিন।'

—হ্যাঁ, এসো। আমরা পরে কথা বলবো।' রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে সম্মান জানালো। তারপর ঘরের বাইরে চলে এলো। দেহরক্ষী ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে পাশে নিয়ে দেউড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

ফ্রান্সিসের দিন একইভাবে কাটতে লাগলো। তবে এখন ও আর বাড়িতে সবসময় থাকে না। মাঝে-মাঝে বিকেলের দিকে বেরোয়। লোকজনের ভীড় এড়িয়ে সমুদ্রের ধারে আসে। নোঙর করা জাহাজগুলো দেখে। লোভ হয়, আবার একটা জাহাজ নিয়ে

বেরিয়ে পড়তে। সাত-পাঁচ ভাবে, আর একা-একা সমুদ্রের তীরে ঘোরে।

একদিন এইরকম সমুদ্রের তীরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্য করেননি, রাজবাড়ির একটি সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়ি ওর কাছাকাছি এসে থামলো। ও নিজের মনেই সমুদ্রের দিকে মুখ করে হাঁটছিল। ঝালর লাগানো রঙীন পোশাক পরা রাজবাড়ীর কোচম্যান ওর সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বললো, 'আপনাকে রাজকুমারী ডাকছেন।'

ফ্রান্সিস ঘুরে তাকিয়ে দেখলো, 'রাজকুমারী মারিয়া একা গাড়িটায় বসে আছে। ওকে দেখে মৃদু হাসল। ও গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেল। রাজকুমারীকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। রাজকুমারী বললো, 'খুব যদি ব্যস্ত না থাকেন, আমার গাড়িতে আসতে পারেন।'

ফ্রান্সিস একটু দ্বিধায় পড়লো, ওর মন চাইছিল একা-একা ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু ওদিকে রাজকুমারীর আমন্ত্রণও উপেক্ষা করা যায় না। অগত্যা ও গাড়িতেই উঠল। রাজকুমারীর নির্দেশে গাড়ি চললো। ঝলমলে পোশাক পরা রাজকুমারী, গাড়ির ভিতরে একটা তৃপ্তিদায়ক সুগন্ধ, ডুবন্ত সূর্যের আলো, ঘোড়ার পায়ের শব্দ– এই সবকিছু হঠাৎ ওর ভালো লাগলো।

রাজকুমারীর সেই উচ্ছলতা আজকে নেই। হয়তো শোকগ্রস্ত ফ্রান্সিসের সামনে সেটা বেমানান লাগবে, এই জন্যেই রাজকুমারী চুপ করে রইলো। গাড়ি চললো। একসময় রাজকুমারী বললো, 'আপনার মার মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোক পেয়েছি।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইলো। কোন কথা বললো না। রাজকুমারী বলালা, 'আপনার শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে।'

ফ্রান্সিস চুপ করে রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইলো। কোন কথা বললো না। রাজকুমারী বললো, 'আপনার শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। রাজকুমারী বললো, 'যদি আপনার ইচ্ছে হয়, আমাদের বাড়ি যেতে পারেন। অনেকদিন আপনার মুখে গল্প শুনিনি।'

প্রথমে ওর যেতে ইচ্ছে হলো না। একা থাকতেই ভালো লাগছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছে হলো। ওখানে গেলে, রাজকুমারীর সঙ্গে কথাবার্তা বললে হয়তো মনটা একটু শান্ত হবে। ফ্রান্সিস বললো, 'আজকে নয়, আর একদিন গাড়ি পাঠাবেন যাবো।'

মারিয়া তারপর ওর গ্রীনল্যাণ্ড অভিযান নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো। ফ্রান্সিস ওর কথা বলার প্রিয় বিষয় পেয়ে গেল। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ও মধ্যরাত্রিতে সূর্য দেখবার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস সেই আগের ফ্রান্সিস হয়ে গেল। উৎসাহের সঙ্গে ও বরফের দেশে ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো। মারিয়া খুশী হলো যে, ফ্রান্সিস ওর শোকাহত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে মারিয়া পর পর গল্প শুনতে লাগলো। গাড়ি এসে দাঁড়ালো ফ্রান্সিসদের বাড়ির দরজায়।

মারিয়া আগেই কোচ্‌ম্যানকে সেই নির্দেশ দিয়েছিল। ফ্রান্সিস অগত্যা গল্প থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো। মারিয়া মৃদুস্বরে বললো, 'আবার গাড়ি পাঠাবো – আসবেন কিন্তু।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো।

আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল। ও আবার আগের মতই হয়ে উঠলো। বন্ধু - বান্ধবেরা আসে, জোর আড্ডা ও গল্প-গুজব চলে।

এর মধ্যে মারিয়া দুদিন গাড়ি পাঠিয়েছিল। ফ্রান্সিস সেজে-গুজে রাজবাড়ি গেছে। এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন আবিষ্কারের গল্প বলেছে। গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে মারিয়া সেই গল্প শুনেছে। গল্প বলতে-বলতে কখনও মার কথা মনে পড়েছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থেকেছে ও। মারিয়া বুঝতে পেরেছে সেটা। মৃদুস্বরে বলেছে, 'মার কথা ভেবে মন খারাপ করো না। আমি তোমার একজন শুভার্থী বন্ধু। তোমার মনে কোন দুঃখ না থাক, এটাই আমি চাই।'

এই সহানুভূতির কথায় ফ্রান্সিস দুঃখ ভোলে। বলে, 'আমি জানি। তাই তোমার কাছে এলে আমি দুঃখ ভুলে যাই।'

এরকম মাঝে-মাঝেই ফ্রান্সিস রাজবাড়িতে যেতে লাগল। মারিয়ার সঙ্গে ওর হৃদ্যতা বেড়েই চললো।

★ ★ ★

ফ্রান্সিসের বাবা একদিন সন্ধ্যেবেলা ওকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো। ও ঘরে ঢুকে দেখলো, বাবা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। ও বললো, 'বাবা, আমাকে ডেকেছিলে?'

—'হ্যাঁ।' বলে বাবা ফিরলেন 'বসো - একটা জরুরী কথা আছে।'

ফ্রান্সিস বসলো। বাবা একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'দেখো, তোমার মা বেঁচে থাকলে তিনিই সব ব্যবস্থা করতেন। যাকগে কথাটা হলো - রাজামশায়ের খুব হচ্ছে, তুমি রাজকুমারী মারিয়াকে বিয়ে করো।'

ফ্রান্সিস অনুমান করেছিল, এমনি একটা কথা উঠবে। কাজেই ও খুব আশ্চর্য হলো না এতে।

বাবা বলতে লাগলেন, 'রাজা - রানী দু'জনেই কয়েকদিন ধরেই বলছেন।' একটু থেমে বললেন, 'রাজকুমারী মারিয়াকে ছোটবেলা থেকেই জানি। ওর মতো বুদ্ধিমতী সহৃদয় মেয়ে হয় না। আমার মত যদি জানতে চাও তাহলে বলি, এই বিয়ে হলে আমি খুব খুশী হবো। তোমার মা বেঁচে থাকলে তিনিও খুশী হতেন।'

ফ্রান্সিস বাবার মুখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারলো না। মাথা নীচু করে আস্তে-আস্তে বললো, 'তুমি খুশী হলে আমার আপত্তি নেই।'

বাবা হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। এগিয়ে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

রাজামশাই একদিন রাজসভায় বিয়ের কথাটা ঘোষণা করলেন। রাজ্যের লোকেরা খুব খুশী হলো। বন্ধুরা দল বেঁধে এসে ফ্রান্সিসকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

রাজকুমারী মারিয়া এরপর আর গাড়ি পাঠায় না। ফ্রান্সিসও লজ্জায় আর রাজবাড়ি যায় না। এক শুভদিনে নগরের সবচেয়ে বড় গীর্জায় রাজকুমারী মারিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সিসের খুব আড়ম্বর করে বিয়ে হয়ে গেল। সাতদিন ধরে উৎসব চললো। 'এরিক দ্য রেডের' গুপ্তধনের বাক্সটা রাজকুমারী যৌতুক হিসেবে পেলো।

একে রাজকুমারীর বিয়ে, তাও আবার সকলের প্রিয় ফ্রান্সিসের সঙ্গে। দেশের অধিবাসীরা আনন্দে যেন পাগল হয়ে গেল। হৈ-হল্লা, খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান সাতদিন ধরে চলল।

হাজার-হাজার বাজী পুড়লো রাতের আকাশে।